নন্দনতত্ত্ব

(Aesthetics)

ডক্টর সুধীর কুমার নন্দী এম. এ., এল্. এল্. বি.,

পি. এইচ. ডি. (ক্যাল), সাহিত্যভারতী (বিশ্বভারতী),

স্যার আশুতোষ মুখার্জী গোল্ড মেডালিষ্ট (ক্যাল), গ্রিফিথ্

রিসার্চ প্রাইজম্যান, প্রাক্তন রিসার্চ ফেলো ও রিসার্চ স্কলার,

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়; সিনিয়র ফেলো, ইণ্ডিয়ান

ইনষ্টিট্যুট অফ্ এ্যাড্ভান্সড্ ষ্টাডি, সিমলা; ক্ষুদিরাম

বসু স্মারক অধ্যাপক, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়;

স্নাতকোত্তর অধ্যাপক, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ব-

বিদ্যালয়; প্রধান দর্শনশাস্ত্রাধ্যাপক, মৌলানা

আজাদ কলেজ, রিসার্চ ডিরেক্টর, রামকৃষ্ণ

মিশন ইনষ্টিট্যুট অব কালচার,

কলকাতা।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

[পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি সংস্থা]

NANDANTATTWA

by Dr. Sudhir Kumar Nandi

প্রকাশকাল—ডিসেম্বর, ১৯৭৯

প্রকাশক :

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

আর্য ম্যানসন (নবমতল)

৬এ রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার

কলকাতা-৭০০০১৩

মুদ্রাকর :

শ্রীসুধাতোষ বসু

ইম্প্রেশন

৩৩ বি মদন মিত্র লেন

কলকাতা-৭০০০০৬

প্রচ্ছদ : শ্রীকমল শেঠ

Published by : Prof. Dibyendu Hota, Chief Executive Officer, West Bengal State Book Board under the Centrally Sponsored Scheme of Production of books and literature in regional language at the University level, launched by the Government of India, the Ministry of Education and Social Welfare (Department of Culture), New Delhi.

ডক্টর সুধীর কুমার নন্দীর নন্দনতত্ত্বের পাণ্ডুলিপির কিছু [illegible] পেলাম। একদা সংস্কৃত ভাষায় কাব্যজিজ্ঞাসার বিশেষ পরাকাষ্ঠা [illegible] এবং সংস্কৃত জ্ঞানীগুণীরা যে সমস্ত সত্যের আবিষ্কার করেছিলেন, তাদের মূল্য আজো অব্যাহত। ইউরোপে প্লেটো-আরিষ্টটলের সময় থেকেই সৌন্দর্যের স্বরূপ ও প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা শুরু হ'ল কিন্তু তা সত্ত্বেও বহুযুগ পর্যন্ত ইয়োরোপে নন্দনতত্ত্বের স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকৃত হয় নি। বাঙলা ভাষায় কাব্য-জিজ্ঞাসা ও নন্দনতত্ত্বের সাহিত্য যে আজো আশানুরূপ বিকাশলাভ করে নি একথা আমাদের মানতেই হবে।

বাংলা সাহিত্যের গত একশো দেড়শো বছরে যে বিস্ময়কর বিকাশ তার ফলে সমালোচনা ও বিচারের ক্ষেত্রেও যে সমৃদ্ধ সাহিত্য গড়ে উঠবে, এ আশা অসঙ্গত ছিল না। সাহিত্য বিচার ও সমালোচনার বিকাশ খানিকটা হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের সময় থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথের পরবর্তীদের মধ্যেও অনেকেই সাহিত্য সমালোচনায় ব্রতী হয়েছেন, কিন্তু সমালোচনার মূল সূত্র বা সৌন্দর্যতত্ত্ব নিয়ে আলোচনার দিকটা অনেকখানিই খালি রয়ে গিয়েছে। মূল সূত্র নিরূপণের চেষ্টা হয় নি বলে সমালোচনার মধ্যে অসঙ্গতি, মতবিরোধ ও অনিশ্চয়তার পরিমাণও অত্যধিক। একথার অর্থ এ নয় যে, মূলসূত্র নির্ধারিত হলেই সমালোচনায় মতানৈক্যের অবকাশ থাকবে না। বিজ্ঞান ব্যক্তিনিরপেক্ষ কিন্তু তা সত্ত্বেও বিজ্ঞানের সূত্রের মধ্যেও মতবিরোধের পরিচয় মেলে ; এক যুগের স্বীকৃত সত্য অন্য যুগে অস্বীকৃত হয়। সাহিত্য ও শিল্পকলার ক্ষেত্রে এ ধরনের মতবিরোধের অবকাশ অনেক বেশী। তাছাড়া মূলসূত্রের বিষয়ে মতৈক্য হলেও সূত্রের প্রয়োগ বা দৃষ্টান্ত নিয়ে মতবিরোধ দূর হবে না। সবাই মানে যে, কর্তব্য সকলেরই করণীয় কিন্তু কর্তব্য যে কী, তা নিয়ে মত বিভাগ ও দ্বন্দ্বের অন্ত নাই। তবু একথা বলা চলে যে, মূলসূত্রের বিচারে সৌন্দর্য সম্বন্ধে আমাদের ধারণা স্পষ্টতর হয় বলে মতভেদ থাকলেও সে মতভেদ আমাদের রসভোগের সহায়তা করে।

যাঁরা সৌন্দর্যতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেন, তাঁরা বহুক্ষেত্রে সাহিত্য বা শিল্পের সাক্ষাৎ প্রয়োগে অনভিজ্ঞ, আবার যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে সমালোচক, শিল্প

বা সাহিত্যের সঙ্গে তাঁদের পরিচয় থাকলেও দর্শনের বিচার ও পদ্ধতির সঙ্গে অপরিচয়ের ফলে তাঁদের আলোচনা অনেক ক্ষেত্রে বিশিষ্ট দৃষ্টান্তেই সীমাবদ্ধ থাকে, কোন সামান্য সূত্র বা সার্বিক অভিজ্ঞতার স্তরে পৌছায় না। ডক্টর মনীষীর আলোচনায় একটি বৈশিষ্ট্য যে, তিনি একাধারে দর্শন-সন্ধানী ও সাহিত্য-সমালোচক। সামান্য বিচারের মধ্যেও তাই প্রত্যক্ষভাবে শিল্প ও সাহিত্যের আলোচনা এসে পড়ে এবং সমালোচনার প্রত্যেক স্তরেই সার্বিক সূত্রের সঙ্গে তাঁর পরিচয়ের লক্ষণ মেলে। তাঁর সমস্ত বক্তব্য হয়তো আমরা গ্রহণ করতে পারি না—দর্শন বা সাহিত্যের ক্ষেত্রে কারো সঙ্গেই ষোল আনা মতৈক্যের সম্ভাবনা নাই বল্লেই চলে—কিন্তু তাঁর মত মানি আর না মানি, তাঁর বিচারে ও আলোচনায় আমাদের জ্ঞান ও আনন্দ বৃদ্ধি হবে এ বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই। আশা করি যে, তিনি তাঁর সন্ধান ও সাধনা অব্যাহত রেখে নন্দনতত্ত্ব ও সমালোচনার বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাঙলা সাহিত্যের সমৃদ্ধি সাধনে সার্থক হবেন।

কলিকাতা
১লা মে, ১৯৫৯ } হুমায়ুন কবির

উৎসর্গ পত্র

ডক্টর সুবোধ মিত্র

ভিষগ্রত্নেষু

ভূমিকা

নন্দনতত্ত্ব বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ছবি দেখে ভালো লাগা, গান শুনে মুগ্ধ হওয়া—এ ত আমাদের সকলেরই অভিজ্ঞতার কথা। জীবনের কোন না কোন সময়ে আমরা এই শিল্পানন্দের আস্বাদন করেছি। এর স্বাদ না কী ব্রহ্মের আস্বাদ জনিত আনন্দের সমানধর্মা! এ কথা ঋত্বিক পণ্ডিতজন বলেন। আমরা ব্রহ্মের সান্নিধ্য লাভ করিনি। তাই তার আনন্দের স্বরূপ সম্বন্ধে সম্যক্ অজ্ঞ। তবে এ কথা অনস্বীকার্য যে শিল্পানন্দের প্রকৃতি ব্রহ্মানন্দের মতই রহস্যময়, দুর্জ্ঞেয় এবং অনির্ণেয়। এই দিক থেকে এতদুভয়ের মধ্যে যে মিল রয়েছে, তার ধর্ম নির্ণয় নন্দনতত্ত্বের জিজ্ঞাসার বিষয়। আবার শিল্পানন্দের শরীক কে হ'বে? সহৃদয়হৃদয়সংবাদী মানুষ কী রসোপলব্ধি করে সংস্কার-বলে? অনুকূল জীবনচর্যার মধ্য দিয়ে শিল্পে এই অধিকার লাভটুকু ঘটে কী না, তারও বিচার প্রয়োজন। নন্দনতত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত এই ধরনের নানা সমস্যা রয়েছে। শিল্পে অধিকারীভেদবাদ স্বভাবতই শিল্পে সার্বিকতা সম্বন্ধে বিতর্ক-মূলক আলোচনার অবতারণা করে। অধিকারীভেদবাদের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীরূপে জড়িত হ'ল শিল্পে প্রয়োজনবাদতত্ত্বটি। শিল্পে অধিকার লাভ করার পূর্বের প্রত্যয়টি হল আমাদের জীবনে শিল্পের স্থানের গুরুত্ব। শিল্পের জন্য ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও শিল্পরসের আস্বাদনের জন্য আকুতিটুকু থাকলে আমাদের মনে শিল্প-অভাববোধের বোধন ঘটে। শিল্পরস আস্বাদন না করার জন্য আমরা পীড়া বোধ করি, ফলে আমাদের মধ্যে শিল্পরসানুভূতির আকাঙ্ক্ষা প্রবল হয়ে ওঠে। 'মহৎ ক্ষুধা'র পীড়নে আমরা পীড়িত হই। তখনই গরুড়ের মহতী ক্ষুধার মতই আমাদের শিল্পক্ষুধা জাগ্রত হয়। মহাকবি বাল্মীকিকে দেখি এই ক্ষুধার তাড়নায় সৃষ্টিচঞ্চল হয়ে উঠেছেন, তমসা নদীর তীরে উদ্‌ভ্রান্ত মহাকবি পদচারণা করছেন। মহৎ সৃষ্টির উষালগ্নে মহাকবির সেই উদ্বিগ্ন মুখচ্ছবি আমরা কল্পনানেত্রে প্রত্যক্ষ করেছি। এই মহৎ সৃষ্টিকালে শিল্পীর মনোবিকলন, তাঁর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য, শিল্পে আনন্দের অভিব্যক্তি, পাঠকের মনে তার বিস্তার—এ সব গূঢ় তত্ত্বের আলোচনা সন্নিবিষ্ট হয়েছে এই গ্রন্থের ক্ষুদ্র পরিসরে। নন্দনতাত্ত্বিক সূত্রগুলির উপস্থাপনা ও ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে প্লেতো-ভরতমুনির ঐতিহ্যবাহকতা এই গ্রন্থের কোথাও কোথাও লক্ষিত হ'বে। অবশ্য সমালোচনার কষ্টিপাথরে এদের মতের মূল্যায়ন করার প্রয়াস পেয়েছি। যাঁরা শিল্পমত নিয়ে শুধু আলোচনা করেছেন, তাঁদের মতের পর্যালোচনা করেছি। যাঁরা ছবি এঁকেছেন, গান বেঁধেছেন, কবিতা লিখেছেন, পাথরের মূর্তি

পড়েছেন, স্থাপত্যকর্মে কীর্তিমান হয়েছেন, তাঁদের শিল্পকর্মের মধ্য থেকে তাঁদের শিল্পদর্শনের সূত্রগুলি নির্ণয়ের প্রয়াস পেয়েছি। গল্পকার, উপন্যাসকার, নাট্যকার এঁদের সৃষ্টি সৌন্দর্যের অন্তরে যে সৌন্দর্যদর্শন বাসা বেঁধে আছে, তার উদ্ধারণ ঘটিয়েছি শিল্পীর মরমী দৃষ্টির সঙ্গে নৈয়ায়িকের ন্যায়-সতর্ক দর্শনভঙ্গীর সমন্বয় ঘটিয়ে। এই গ্রন্থের নামকরণ করেছি আধুনিক বাংলা সাহিত্যে কবিগুরুর দেওয়া 'নন্দনতত্ত্ব' শব্দটিকে সবিনয়ে গ্রহণ ক'রে। শিল্পরসে আপ্লুত হয়ে কেন যে নন্দিত হই, তারই ব্যাখ্যা এই গ্রন্থের মধ্যে সন্নিবদ্ধ। গ্রন্থের নামকরণে গ্রন্থের বিষয়বস্তুর প্রতি প্রত্যক্ষ ইঙ্গিতটুকু রয়ে গেছে। গ্রন্থের নাম চয়ন ব্যাপারে সহধর্মিনী লীনা এবং কন্যা ধৃতির পক্ষপাতিত্ব নিঃসন্দেহে আমার সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করেছে। রসতত্ত্ব, শিল্পতত্ত্ব, সৌন্দর্যতত্ত্ব প্রমুখ শব্দগুলির আবেদনও ব্যঞ্জনাময়। কিন্তু 'নন্দনতত্ত্ব' জয়ী হ'ল, তার কারণ ওঁদের পক্ষপাতিত্ব ও 'নন্দনতত্ত্ব' নামটির অনৈতিহাসিকতা এবং আমার আকৈশোর রবীন্দ্রপ্রীতি।

অধ্যাপক হুমায়ুন কবির হ'লেন আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক। পাণ্ডুলিপির খণ্ডাংশ দেখে এক সময় তিনি আমাকে যে মূল্যবান 'আশীর্বাণীটি' পাঠিয়েছিলেন সেটি গ্রন্থের মুখবন্ধে সন্নিবিষ্ট করে দিলাম। তাঁর কাছে আমার ঋণের শেষ নেই। তাঁর উৎসাহ ছাড়া এই গ্রন্থের প্রণয়ন ব্যাপারে হয়ত উদ্যোগী হতেই সাহস পেতাম না।

পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ব্যাপারে অনলস পরিশ্রম করেছেন আমার ছাত্রী কল্যানীয়া ডক্টর সুচেতা গোস্বামী (মৈত্র)। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ এই গ্রন্থটির প্রকাশভার নিয়ে আমাকে উৎসাহিত করেছেন। তাঁরা সকলে একান্তভাবে আমার ধন্যবাদার্হ। ইম্প্রেশন প্রেসের কর্মাধ্যক্ষ সুধাতোষবাবু ও তাঁর সহকর্মীদের ও তাঁদের ঐকান্তিক সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানাই। রবীন্দ্রনাথ অঙ্কিত ছবিটির মুদ্রণের অনুমতি দেওয়ার জন্য বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাই; আর রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষকেও ধন্যবাদ জানাই অবনীন্দ্রনাথ অঙ্কিত ও যামিনী রায় অঙ্কিত ছবি দুটির পুনর্মুদ্রণের অনুমতি দেওয়ার জন্য। তাঁদের সহযোগিতা ব্যতীত গ্রন্থটির নয়নাভিরাম সৌষ্ঠব সম্পন্ন হ'ত না।

ডিসেম্বর, ১৯৭৯
মৌলানা আজাদ কলেজ
কলকাতা।

শ্রীসুধীর কুমার নন্দী

সূচীপত্র

চতুর্থ স্তবক

পঞ্চম স্তবক

ষষ্ঠ স্তবক

অবতরণিকা

ললিতকলা ও দর্শন

শিল্প-দর্শন সম্বন্ধীয় কোন আলোচনা করতে হলে শিল্প এবং দর্শন এতদুভয়ের মধ্যেকার সম্বন্ধটুকু নির্ণয় করা প্রয়োজন। বাহ্যতঃ দার্শনিক এবং শিল্পীর মধ্যে ব্যবধান দুস্তর ; শিল্পীর বিবেচ্য হল শিল্প-উপাদানের আনুকূল্যে স্নায়বিক উত্তেজনা, শিল্পরূপ থেকে আনন্দ আহরণ ও আবেগপ্রতিধ্বনির আকর্ষণীয়তা। দার্শনিকের উদ্দেশ্য হল তর্কশাস্ত্রসম্মত সম্বন্ধে সম্বন্ধ আবেগরঞ্জিত বিষয়সমূহের নিরুত্তাপ আলোচনা করা ; সামান্য এবং নির্বিশেষ ভাবই দার্শনিকের আলোচনার উপজীব্য। শিল্পী সুন্দরের উপরতলার খবর রাখে, দার্শনিক সত্যের বিশ্লেষণ করেই তৃপ্ত। তাদের আঙ্গিক, তাদের ভাষা, তাদের আকাঙ্ক্ষা সব কিছুই পরস্পরের থেকে একান্তরূপে পৃথক, তবে কবি-শিল্পী ও দার্শনিকের মধ্যে অন্ততঃ এইটুকু সাদৃশ্য আছে যে উভয়েই কথার ব্যবহার করে। তবে একজন একটা বিশিষ্টরূপকে বোঝাবার জন্য অবেগপ্রসূ শব্দরাজির ব্যবহার করেন ; অন্যজনা সামান্য নির্বিশেষ ভাবটুকু দ্যোতিত করার জন্য অথবা কোন অন্তর্নিহিত ভাবকে প্রকট করার জন্য যে ভাষার আশ্রয় নেন তার মধ্যে রঙ নেই, চাকচিক্য নেই। শিল্পীরও সৃষ্টি-ন্যায় রয়েছে তবে তা শিল্প-উপাদানগুলিকে সুসংহত করার অথবা শিল্পীর বিভিন্ন চিত্তবৃত্তিগুলিকে সমন্বিত করার পদ্ধতিমাত্র। চিন্তাবিদের নির্বস্তু আভ্যন্তরীণ তর্কপদ্ধতির সঙ্গে শিল্পীর ন্যায়ের অনেক প্রভেদ। দর্শন এবং শিল্পের মধ্যে এক ধরনের নৈতিক বৈরিতা রয়েছে বলে মনে হয়। কবি কীট্‌সের সমগ্র কাব্য জুড়ে সৌন্দর্যের যে সূক্ষ্ম নমনীয়তা বিরাজিত তা কবিমানসের সত্য ধারণা থেকে জাত ; দর্শনের বিচারগত শৃঙ্খলাবোধটুকু সব রকম মানসপ্রক্রিয়া থেকে অনুপস্থিত হলেও তাঁকে খুঁজে পাওয়া যায় বিবাগী শিল্পকর্মের বৈরাগ্যে। শিল্পী বিচারগত ধারণাশ্রয়ী সূত্রগুলি সম্বন্ধে সঙ্গতভাবেই সন্দিহান ; তাঁর কাজ হল কল্পনাজাত রূপের সৃষ্টি ; সে রূপ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। চিন্তাবিদ্ অপরপক্ষে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপকে

কৃপার চোখে দেখেন ; চিন্তার সঙ্গে আবেগকে যুক্ত করার পক্ষপাতী নন। তিনি চিন্তার সাংগঠনিক আকারের প্রতি আগ্রহশীল, সে আকার সত্যাশ্রয়ী। কবি এবং চিত্রকরের দৃষ্টি বিষয়ের প্রতি নিবদ্ধ থাকে ; দার্শনিকের দৃষ্টিও বিষয়াশ্রয়ী। তবে তাঁর চিন্তার প্রান্তিক বিষয়টুকু হল অনন্ত সত্তা অথবা আপন চিন্তার বিভিন্ন সূত্রের সংজ্ঞা ও সম্বন্ধ।

কিন্তু শিল্প ও দর্শনের মধ্যে বিরোধিতা থাকা সত্ত্বেও শিল্প ও দর্শন চিন্তার মধ্যে সৌসাদৃশ্য আছে ; একে অপরকে দ্যোতিত করে। শিল্পী যখন শুধুমাত্র কুশলী কারুকার নন, তখন তাঁর বিষয়বস্তুর নির্বাচনে, শিল্প উপকরণের যথাযথ মনোনয়নে, তাঁর শিল্পকর্মের পূর্ণাঙ্গ প্রতিক্রিয়ায় তিনি জীবনের ও জগতের ভাষ্য রচনা করেন। তিনি তাঁর কল্পনাশ্রয়ী পন্থায় একজন যথার্থ দর্শনবেত্তা। দার্শনিক সংজ্ঞা এবং প্রমাণকে আশ্রয় ক'রে, উদ্ভাবন এবং সমন্বয়ের পথে জীবন এবং জগৎকে যেভাবে দর্শন করেন তাকে সবটুকু অভিজ্ঞতার সমন্বয়ে আঁকা একটি ছবির সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে, বুদ্ধি-আশ্রয়ী একটি রাগিণী অথবা কবিতার সঙ্গেও তার তুলনা চলতে পারে ; যদিও এই দার্শনিক আলোচনার ভাষা হল গল্পের ভাষা। প্লেতো-সৃষ্ট সক্রেতিস চরিত্রের মুখে আমরা শুনি, দর্শন হল সূক্ষ্ম সঙ্গীত ; এই গুরু-গম্ভীর সঙ্গীত নিত্য জঙ্গম, যদিও এর উৎস-ভূমি দার্শনিকের মতে যে মন তা একেবারেই অনড়।

শিল্প এবং দর্শনের সৌসাদৃশ্যের কথা বাদ দিলেও দার্শনিক শিল্পকে অথবা শিল্পীকে ন্যায়সঙ্গতভাবে উপেক্ষা করতে পারেন না কেননা দার্শনিককে সামগ্রিক চিন্তার আশ্রয় নিতে হয়। দার্শনিক যে বিচারটুকুর অনুধাবনে নিত্য যত্নবান এবং যে প্রজ্ঞাটুকুকে তিনি আবিষ্কার করেন এই সৃষ্টির মধ্যে, শিল্পীও তাঁকেই খুঁজে ফিরছেন তাঁর আপন ছোট্ট সৃষ্টির ভুবনে আপনার শিল্প উপকরণটুকুকে আশ্রয় ক'রে। শিল্পীর সৃষ্টির জগতে আমরা দার্শনিকের চিন্তা-শৃঙ্খলার প্রতিমাকে দেখি ; দার্শনিক এই চিন্তা-শৃঙ্খলাটুকুকে বিশ্বজগতে প্রত্যক্ষ করার জন্য সকরুণ প্রয়াস করে চলেছেন। শিল্প দার্শনিকদের সযত্ন দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে কারণ দার্শনিক যে শৃঙ্খলাটুকু প্রদর্শন করার জন্য যত্নবান, শিল্পীর শিল্পকর্মে তারই প্রতিষ্ঠা, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে যে প্রজ্ঞার নিদর্শন রয়েছে শিল্প তারই অনুকার। অবশ্য আর একটি কারণেও শিল্প দার্শনিকদের মনোযোগের বস্তু। শিল্পে নীতি, সত্য, জ্ঞান, এগুলি সম্বন্ধেও যে সব সমস্যার অবতারণা করা হয় কোন দার্শনিকই তাকে অবহেলা করতে পারেন না।

আমরা জানি যে নৈতিক বিচারে দার্শনিকেরা শিল্পকে একটি বড় সমস্যা বলে বিবেচনা করেন। দার্শনিকেরা এ সমস্যাটিকে নিয়ে বিব্রত। বিশ্বতত্ত্ব ব্যাখ্যায় অথবা চিন্তাপ্রণালীর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে সাধারণতঃ আবেগ ও ইন্দ্রিয়কে বাদ দেওয়া হয়। কিন্তু ইন্দ্রিয়গত যে জীবন, আবেগের যে প্রভাব তার বিশ্লেষণ ও বিবেচনা প্রয়োজন। যে কোন নৈতিক পরিকল্পনার বিবেচনাকালে এগুলি সম্বন্ধে আলোচনা দরকার এবং যে কোন নৈতিক পদ্ধতির সংজ্ঞাদানের সময়েও এদের যথাযথ মর্যাদা দান করা আবশ্যক। ভালই হোক্ আর মন্দই হোক্ জীবনে এদের প্রভূত প্রভাব এবং মানুষের প্রবৃত্তিগত জীবনের উপরও এদের প্রতিক্রিয়া অনস্বীকার্য। ইন্দ্রিয় এবং আবেগ সম্পর্কিত আলোচনা তাই আবশ্যিকবিষয়রূপেই দর্শন শাস্ত্রের উপজীব্য হয়েছে।

দার্শনিক প্লেতো প্রমুখ দর্শনবেত্তাগণ তাই শিল্পকে নৈতিক শৃঙ্খলার উপায় এবং উৎসরূপে কল্পনা করেছেন। শিল্পকে অবশ্য সন্দেহের চোখেও দেখা হয়েছে; যখনই কোন দার্শনিক আত্মাকে জীবদেহের উপরে স্থান দিয়েছেন, অধ্যাত্মবিদ্যাকে দেহতত্ত্ববাদের উপরে প্রতিষ্ঠা করেছেন, তিনি তখনই চারুকলা সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে উঠেছেন; অধিকাংশ খ্রীষ্টীয় নীতিবাগীশের বেলায় এইটাই ঘটেছে। শিল্পের রহস্যে যাঁরা দীক্ষিত তাঁরা পুরোপুরি এ থেকে রস গ্রহণ করতে পারেন। তাই সাধারণের এ বিষয়ে আগ্রহের অন্ত নেই। শিল্পী সাধারণ মানুষের মনোযোগ সহজেই আকর্ষণ করেন, তার চারিত্রিক দার্ঢ্য সহজেই শিল্পী ক্ষুণ্ন করে দিতে পারেন বলেই অনেকের বিশ্বাস। খ্রীষ্টীয় ও অন্যান্য কৃচ্ছ্রসাধনতন্ত্রে বিশ্বাসী নীতিদার্শনিকের দল এঁদের দলে আছেন; মহাদার্শনিক প্লেতোও এঁদেরই দলে দলী যখন তাঁকে আর আমরা 'সম্মোহিত ও সম্মোহনকারী' কবি বলে মনে করতে পারি না। তিনিই এঁদের প্রজ্ঞাবান প্রবক্তা; গতানুগতিক কৃচ্ছ্রসাধনবাদীদের সন্দেহটুকু সম্বন্ধে আর কোন আপত্তি চলল না যখন ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষণের দ্বারা এই সন্দেহ সমর্থিত হ'ল। চারুকলার মধ্যে যে যৌন আবেদনের অনুরণন প্রতিধ্বনিত হচ্ছে, যৌন আবেদনের যে প্রচ্ছন্ন প্রতিক্রিয়া শিল্পের অন্তরশায়ী তাকে অস্বীকার করা চলে না; শিল্পের রূপ এবং উপাদানের মধ্যে যৌন অভিলাষের যে প্রচ্ছন্ন লীলা চলে, যৌন আবেগের যে রূপান্তর ঘটে নন্দনতাত্ত্বিক প্রয়াসে, এসব কথা মনঃসমীক্ষকদের অন্তর্দৃষ্টিতে ধরা পড়ে গেল। গোঁড়া নীতিবাগীশদের সন্দেহ সমর্থিত হল মনঃসমীক্ষকের গবেষণায়; এ সব তথ্য থেকে যে কোন

সিদ্ধান্তই গৃহীত হোক না কেন, এ কথা সত্য যে প্রাচীন গোঁড়া নীতিবাগীশ এবং আধুনিক মনঃসমীক্ষকের মধ্যে এই সব তথ্যের নির্ভুলতা সম্বন্ধে কোন দ্বিমত রইল না।

শুধু মাত্র দেহ এবং আত্মাকে কেন্দ্র ক'রে এই বিবাদ আবর্তিত হয়নি ; বিবাদের হেতু অন্যত্র রয়েছে। 'রিপাব্লিক' গ্রন্থের শেষে সক্রেতিস কেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও কবিকে তাঁর আদর্শ রাষ্ট্র থেকে নির্বাসিত করলেন ? এর পূর্বে ত কবিকে তিনি মাত্র নিন্দা করেছিলেন। প্লেতো কিন্তু এ কথা ভাবেন নি যে শিল্পী শুধুমাত্র আমাদের পশুসত্তাটাকে জাগিয়ে তোলে ; তিনি কবির নিন্দা করেছেন কেননা কবিরা মানুষের মনকে বিপথগামী করে। বস্তুর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপের মোহে মানুষকে মুগ্ধ করে। এই ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বস্তুরূপটুকুকে কল্পনার অন্ধকারের আশ্রয়ে আবার কবি নতুন করে বিন্যাস করেন। আর এই বস্তু-রূপ-টুকু আবার হল প্লেতো কথিত Idea বা মহাভাবের ছায়ামাত্র। মানুষের বুদ্ধি যে সৌধ গড়েছে তার নির্মাণে ইন্দ্রিয় এবং চিন্তা কতখানি অবদান রেখে গেছে সে সম্বন্ধে বহুদিনের পুরাণো একটা মতভেদ রয়েছে। বিশুদ্ধ প্রজ্ঞাবাদীদের দৃষ্টি-কোণ থেকে শিল্পদেউলের পূজারীদের সম্বন্ধে, কারুকারদের সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করা হয়েছে ; তাঁদের শিল্প-উপকরণ ও শিল্পের বিষয়বস্তুই এই সন্দেহের অবকাশটুকু দিয়েছে। দর্শনেতিহাসে বার বার এর সাক্ষাৎ আমরা পেয়েছি। যখনই প্রজ্ঞাবাদীরা শিল্পের সমর্থনে কিছু বলেছেন তখন তাঁদের বক্তব্যের মধ্যে আমরা দেখেছি শিল্পের উপকরণ এবং শিল্পের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতায় সেই সব অপরিবর্তনীয় আকার অথবা সত্তার দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করে, যে সত্তা পরিদৃশ্যমান সুন্দর ভুবনের অন্তরালে আপনাকে গোপন করে, আবার কখন বা চকিত আলোকে আপনাকে প্রকাশ করে। প্লেতোর Symposium এ আমরা শিল্প সম্বন্ধে এই ধরনের অভিমত পেয়েছি।

দেহ এবং আত্মা, ইন্দ্রিয় এবং মন এদের পারস্পরিক দ্বন্দ্বের মধ্যেই আমরা দার্শনিকদের শিল্প সমালোচনার সূত্রটুকু খুঁজে পাই। অবশ্য এ ধরনের দ্বন্দ্বে উৎসব প্রেষণাকে অস্বীকার করেও বলা যায় যে দার্শনিক শিল্প সম্বন্ধে অজ্ঞ হয়েও তাকে পুরোপুরি অস্বীকার করতে পারেন না। এর একটি অন্য কারণও আছে। যে সব দর্শন আকারসর্বস্ব ন্যায়শাস্ত্র অথবা পরাবিদ্যায় পর্যবসিত হয় না তারা অবশেষে নীতিশাস্ত্রের আকার গ্রহণ করে। নীতিশাস্ত্র, তা তার উৎস যা-ই হোক না কেন, তার লক্ষ্যে যাই থাকুক না কেন, সে যে কোন

ধরনের অনুশাসনই প্রয়োগ করুক না কেন, নৈতিক অথবা সৎজীবনের বিশ্লেষণ এবং বিবেচনাই তার উপজীব্য। নৈতিক জীবন, সৎজীবন হল ইহলোকের জীবনধারার ভবিষ্যতের কার্যসূচী মাত্র; অবশ্য তা পরলোককেও দ্যোতিত করতে পারে। জীবন যাত্রা নির্বাহের জন্য নীতিসম্মত সৎজীবনের ধারণার প্রয়োজন; এই ধারণাটুকু আমাদের অশুভ ও অসৎ জীবনচর্যা থেকে মুক্তি দেয়; কল্যাণের স্পর্শে আমরা ধন্য হই। ইহজীবনে সুখ লাভ করি; পরজীবনে মোক্ষের প্রত্যাশা রাখি। মার্কামারা সুখবাদীদের কথা ছেড়ে দিলে এ তত্ত্ব সর্বতোভাবে স্বীকার্য যে কল্যাণের ধারণাটুকু সর্বতোভাবে ভবিষ্যৎ জীবনকে আশ্রয় করে আছে; এই ক্ষণস্থায়ী ভবিষ্যৎ কালের অঙ্গীকারটুকু সম্বন্ধে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে। অধিকাংশ দর্শনমতকেই সুখবাদীদের বিরুদ্ধে স্টোয়িক মতবাদ প্রভাবিত করেছে; সুখান্বেষণ নয়, কর্তব্য-পালনই হ'ল মানুষের প্রধান করণীয় ও নৈতিক জীবনের উদ্দেশ্য। সমাগত বর্তমানের পরিবর্তে দূরাশ্রয়ী ভবিষ্যৎ, এই মুহূর্তের দাবীর চেয়ে অতীতের সামাজিক ও ধর্মীয় রীতি-নীতি এই-কর্তব্যের স্বরূপটুকু নির্ণয় করেছে।

শিল্প উদাহরণের সাহায্যে অথবা ভাবে ভঙ্গীতে এই তত্ত্বই আমাদের শিখিয়েছে যে জীবনের প্রাপ্যবস্তুটুকু বর্তমান কলাশ্রয়ী। এই প্রাপ্তি সম্ভব হয় ইন্দ্রিয়জ আনন্দের পাদ পীঠে, আমাদের মনের আবেগ-মুক্তিতে। মুহূর্তের আনন্দকে চিরায়ত করার নামই হল শিল্প; শিল্পের আনন্দটুকুই শিল্পসৃষ্টির উদ্দেশ্য, তা সে আনন্দ যত সূক্ষ্মই হোক না কেন; শিল্পে এই আনন্দের ভূমিকাটুকু এতোই গুরুত্বপূর্ণ যে দার্শনিক সান্তায়ন শিল্পের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বললেন—শিল্প হল আনন্দের মূর্তিমান বিগ্রহ। জগতে আমাদের দায়িত্ব অনেক, অনেক কর্তব্য সমাধানের গুরুভার আমাদের স্কন্ধে; তাই শিল্প আমাদের জীবনের ক্ষণিক পলায়মান মুহূর্তগুলিকে সর্বোচ্চ মর্যাদা দানে প্রয়াসী হয়; এই মর্যাদা দানটুকুর কোন আত্যন্তিক উদ্দেশ্য নেই। তাই এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই যে নীতিবিদ শিল্পকর্মকে অপ্রয়োজনীয় মনে করেন, শিল্পের আনন্দকে চিত্তবিক্ষেপ বলে ভাবেন এবং শিল্প-রমণীয়তা থেকে জাত সুখবোধকে কর্তব্য থেকে বিচ্যুতি বলে গণ্য করেন। Walter Peter এই প্রসঙ্গে লিখেছিলেন যে অভিজ্ঞতার ফলশ্রুতি নয়, অভিজ্ঞতাটুকুই লক্ষ্য।

নীতিশাস্ত্রের দ্রাক্ষাকুঞ্জে যে কর্মীটি আগ্রহ সহকারে কাজ করেছেন তিনি ফল আশা করেন। কিন্তু মনুষ্যকর্মের একটি মূল্যবান নিদর্শনকে খেয়ালী

অনুজ্ঞার দ্বারা নস্যাৎ করে দেওয়া যায় না; দার্শনিকের কৃতিকেও অস্বীকার করা চলে না। যখন তাকে নস্যাৎ করার যুক্তি আমরা খুঁজে পাই বলে ভাবি, তখনও কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সে বেঁচে থাকে। যাঁরা দর্শনচিন্তায় তন্ময় হয়ে আছেন তাঁদের চোখে এর অস্তিত্বের যথেষ্ট যৌক্তিকতা আছে। ভালোর জন্যই হোক আর মন্দের জন্যই হোক, দার্শনিকেরা আপন আপন দর্শনব্যবস্থার মধ্যে বহু নিন্দিত ও 'নির্বাচিত' শিল্পের জন্য একটু স্থান করে রেখেছেন। ইন্দ্রিয় মন ভোলায়, কল্পনা দর্শকের মত বদলায়; তবুও নীতিশাস্ত্রবিদেরা ইন্দ্রিয় এবং কল্পনা উভয়কেই আপন আপন মর্যাদায় নৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সাধকপ্রবর সেণ্ট অগস্টিন যখন গার্হস্থ্য-আশ্রম ত্যাগ করেন তখন তিনি অলংকার শাস্ত্র এবং সৌন্দর্য—এতদুভয়কেই পরিত্যাগ করেছিলেন। অবশ্য সন্ন্যাসগ্রহণের পরে তিনি অলঙ্কার শাস্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন সৌন্দর্যের পক্ষে ওকালতি করার জন্য। সুন্দরের সীমায়িত রূপদর্শনের মধ্যে সেই অলক্ষ্য মহারূপের দর্শন মেলে এবং এই পথেই স্বয়ং ভগবানের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। সেণ্ট বোনাভেন্তুরা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে ভগবদ্‌বচনের ভাষারূপে কল্পনা করেছিলেন এবং সন্তদের কল্পনা করেছিলেন সেই ভাষার কবি হিসেবে।

শিল্প সম্বন্ধে মানুষের স্পর্শকাতরতা সুবিদিত; ভগবান যে কোন নির্দেশই দিন না কেন, প্রজ্ঞা যা কিছু প্রমাণের প্রয়াসই করুক না কেন, ভগবান এবং মানুষের প্রজ্ঞা এরা উভয়েই শিল্পকে আপন আপন উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য ব্যবহার করেছে। তাই Republic গ্রন্থে শিল্পকে সত্যের অপলাপ চিত্রণের মাধুর্যময় মাধ্যমরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। সে অনৃতভাষণে মানসিক ব্যাধির নিরাময় হয়। শিশুরা এবং শিশুধর্মী বয়স্ক মানুষদের মধ্যেও অনেকেই বুদ্ধির আবেদনে সাড়া দেয় না; চিত্রকল্পের আবেদনে এরা সারা দেয়। দু' হাজার বছর পরে ঋষি তলস্তয় বললেন যে শিল্প-কর্মের মহৎ উদ্দেশ্য ও গুরু দায়িত্ব হল মানুষকে আপনার মনুষ্যত্বের জ্ঞানটুকু দান করা, মানুষ যে ঈশ্বরের পুত্র সেই সত্যটুকু সম্বন্ধে অবহিত করা। শিল্প আপনার প্রসাদগুণে ও সর্বজন-বোধ্যতায় নীতিশিক্ষার বাহনরূপে গণ্য হতে পারে। সে ক্ষেত্রে নীতিশিক্ষা ও নৈতিক নির্দেশবাণী ফলপ্রসূ হয় না; সে ক্ষেত্রে শিল্প প্রায়শঃই কার্যকরী হয়।

এ সত্যটুকু দার্শনিকদের কাছে সম্প্রতি গ্রাহ্য হয়েছে যে শিল্পের মাধ্যমে যে শুধুমাত্র নৈতিক সত্য অথবা নীতিসারটুকু পরিবেশিত হয় তা নয়, শিল্পচর্চায় ও শিল্পানন্দ আস্বাদনের ক্ষেত্রে শিল্পগুলিকে আমরা নীতি-দর্শনের দৃষ্টান্ত অথবা শব্দ

ব্যতিক্রমরূপে গ্রহণ করতে পারি। মন যে সত্য প্রমাণ করতে চায়, চিত্রকল্প তাকে ফুটিয়ে তোলে। নীতিবাগীশেরা শৃঙ্খলা, একতা ও পারম্পর্যকে নৈতিক জীবনের আবশ্যিক উপাদানরূপে গণ্য করেন; তাঁদের মতে মানুষকে উপায়রূপে গণ্য না ক'রে উপেয়রূপে গণ্য করা উচিত। তাঁরা আমাদের শেখালেন যে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারকে লঘু ব্যাপারের ঊর্ধ্বে স্থান দিতে হবে, যা অকারণ অনিমিত্তিক তাকে গ্রাহ্য না করে যা সারবান তাকেই গ্রহণ করতে হবে। তাঁরা সমন্বয়ের জন্য শৃঙ্খলা দাবী করেছেন, স্থিতির জন্য কেন্দ্রীকরণ চেয়েছেন এবং শান্তির জন্য জটিলতা পরিহার করেছেন। এই ধরনের নৈতিক জীবনের উপাদানের এবং শিল্প-উপাদানের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নেই। শিল্পের গুণ তার সৌরভ, তার স্বাদ, তার অসামান্যতা—এ সবই হল শিল্প-উপাদানগুলির বিশেষ রীতিতে সমস্যা সমাধানের ফলমাত্র। সিজানের আঁকা ছবি অথবা বীঠোফেনের কোয়ার্টেট যে অসামান্যতার দাবী করে তা তাদের আপন আপন উপাদান এবং উপকরণগুলিকে সম্বন্ধিত করার বিশেষ পদ্ধতির উপর নির্ভরশীল। ঐ ছবিটির কোন একটি উপাদান যদি ভিন্নভাবে সন্নিবিষ্ট হত তাহলে ছবিটির প্রকৃতি ভিন্ন হত; কোয়ার্টেটের বিষয়বস্তুর রূপান্তর ঘটালে কোয়ার্টেটটিও ভিন্ন হত। শিল্পের সমগ্রতার মধ্যে সমন্বিতরূপেরই প্রতিষ্ঠা; এই সমন্বয়, এই ঐক্যের অসদ্ভাব ঘটলে তা ছবিই বলুন আর সঙ্গীতই বলুন, উভয়েরই চরিত্রহানি ঘটায়। শিল্পকর্মের মধ্যে যে সুষ্ঠু শৃঙ্খলাটুকু শিল্পী বহু আয়াসে রচনা করেন, তা থেকে যদি কখনো বিচ্যুতি ঘটে তবে পারম্পর্য লুপ্ত হবে, ঐক্য বিনষ্ট হবে এবং সৃষ্টিশীল শিল্প মাধুর্যের যে অনন্যতা, শিল্প-কর্মের কোথাও তার চিহ্নমাত্র থাকবে না। বার বার ভুল করেও সেই ভুলের নিবারণ-প্রয়াসের মাধ্যমে শিল্পী তাঁর শিল্পরীতিকে আয়ত্ত করেন; তাঁর সহজাত নৈতিক প্রবৃত্তির তাড়নায় তিনি কেবলমাত্র অলংকরণকর্মটুকুর পক্ষপাতিত্ব করেন না। তিনি হিংসাকে পরিত্যাগ করেন যখন হিংসা শক্তির বিকৃত মূর্তি পরিগ্রহ করে। তাঁর বক্তব্যে বাহুল্য বর্জিত হয়। তিনি তাঁর সৃষ্টির উপাদানকে, তাঁর রীতি ও আঙ্গিককে এবং তাঁর আপন শিল্পীসত্তাটুকুকে পরিপূর্ণ মর্যাদায় গ্রহণ করেন। এ এক পরম বিস্ময়ের কথা।

পোলোনিয়স বলেছিলেন যে, নিজের কাছে মিথ্যাচরণ করো না। অনেক সময় শিল্পীরা তাঁদের সুদীর্ঘ জীবনচর্যার মধ্য দিয়ে আপনার শিল্পীসত্তাটুকুর পরিচয় পান; শিল্পের যে শৃঙ্খলা তারই মাধ্যমে এই পরিচয় ঘটে। শিল্পী

আপন শিল্পকর্মের মধ্যে যে কঠোর-শৃঙ্খলাটুকুর সৃষ্টি করেন তা বহিরাগত কোন সন্ন্যাসধর্মের কর্ম বলে গণ্য হতে পারে না। শিল্পী আপনার সৃষ্টির অনুকূলে যেভাবে নিজ মানস-প্রবণতা ও আঙ্গিককে কেন্দ্রীভূত করেন তাকে কোনভাবেই কোন নৈতিক আদর্শ খর্ব করতে পারে না। আমরা শিল্পকলার মধ্যে উপায়কে উপেয়ের মর্যাদা দেবার যে প্রবণতাটুকু দেখি তা কোন নৈতিক তত্ত্ব অথবা নীতি আচরণের মধ্যে খুঁজে পাই না। সিজানের ভাষায় যে-শিল্পকে পূর্ণশিল্প বলা হয়েছে সেই ধরনের শিল্পকর্মে কোন কিছুই কেবলমাত্র উপায়রূপে গণ্য হয় না। শিল্পের সকল উপাদানই সামগ্রিক শিল্পসত্তার অঙ্গস্বরূপ। শিল্প-অতিরিক্ত কোন উদ্দেশ্য যদি শিল্পকর্মকে অনুপ্রাণিত করে তবে তা যেমন শিল্পীর নিজের কাছে ধরা পড়ে, তেমনি আবার তা বোদ্ধা দর্শকের দৃষ্টিও এড়ায় না। প্রতারণা, পেশাদারী-কৌশল, নাটকী আঙ্গিক, আবেগ-উদ্বেলতা, চটকদারী অভিনবত্ব—এসব দিকে নিম্নশ্রেণীর শিল্পী দৃষ্টি দেন, ফলে তাঁর জাগতিক সাফল্য হয়ত সহজে আয়ত্তে আসে ; কিন্তু এই পথে কোন শাশ্বত শিল্পসৃষ্টি সম্ভব হয় না।

শিল্পের জগতে উপায় এবং উপেয়কে, উদ্দেশ্য এবং সৃষ্টিকে, বক্তব্য এবং বলার ভঙ্গীকে পৃথক করা যায় না। অবশ্য আমরা একথা বলছি না যে শিল্পী অন্যান্য মানুষের মত সুযোগ-সন্ধানী নন ; তিনি ভণ্ড অথবা নির্বোধের মত ব্যবহারও করতে পারেন তাঁর প্রতিবশীদের সঙ্গে ; কিন্তু তিনি যেখানে সার্থক শিল্প-স্রষ্টা সেখানে তাঁর নন্দনতাত্ত্বিক বৈরাগ্য, তাঁর সত্যানুরাগ, শিল্প উপাদান এবং আঙ্গিকের সুষ্ঠু-সমন্বয় সাধনে তাঁর নিবিড় আগ্রহ, তাঁর বক্তব্য এবং বক্তব্য নিবেদনের ভঙ্গী বিষয়ে ঐকান্তিক নিষ্ঠা—এসবের অপ্রতুলতা কখনই ঘটে না। বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং নির্লিপ্ত দর্শন-আলোচনা ক্ষেত্রে আমরা যে সমগ্রতা ও সমন্বয়ের নৈতিক আদর্শের সন্ধান পাই, তার দেখা পাওয়া যায় সার্থক শিল্পীর শিল্প-এষণায়।

যে কাল সমাগত, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, যা একান্তরূপে সত্য তার অন্তরেও যে কল্যাণ অনুস্যূত রয়েছে এ ধারণা নৈতিক-আদর্শ-উৎসারিত। যা ঘটেছে তারই স্মারকচিহ্ন হল শিল্পকর্ম। শিল্প সমারোহ বর্তমান কালকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। যে-কোন আদর্শ জীবনের কথাই আমরা কল্পনা করি না কেন, সেই জীবনটুকুকে আমাদের ব্যবহারিক জীবনে একদিন না একদিন সত্য করে তুলতে হবে। দূর ভবিষ্যৎ কোন না কোন সময়ে বর্তমানের রূপ

পরিগ্রহ করবেই। যে পরম শান্তি আমাদের কাম্য তাকেও আমরা বর্তমান পটভূমিতে পেতে চাই। স্বর্গ, আদর্শ, ভাবরাজ্য, এসবই হল জীবনের পরিণতি মাত্র ; জীবন যা হবে, যা হতে পারে তারই কল্পিত রূপ। স্বর্গরাজ্যের প্রশস্ত অঙ্গনে, ভাবরাজ্যের সীমান্তে সেই সব আদর্শ, সেই সব মূল্যবোধ, সেই সব মহৎগুণ আত্মগোপন করে থাকে, যা আজও আমরা আমাদের জীবনে এবং কর্মে সত্য করে তুলতে পারিনি। নৈতিক সংস্থাগুলির মধ্যে আমরা নীতি-আদর্শকে কর্মে রূপায়িত করার আঙ্গিকটুকুকে প্রত্যক্ষ করেছি, মূল্যবোধকে দৈনন্দিন জীবনে প্রকট হতে দেখেছি। যে নৈতিকতত্ত্বে ভবিষ্যৎকালের পরিপ্রেক্ষিতে কোন আদর্শের প্রতিষ্ঠা নেই, তা যদি অশুভকে দূরীকরণের পথ নির্দেশও করে তবে তা প্রতারণার নামমাত্র হবে। কৃচ্ছ্রসাধন, আত্মোৎসর্গ ও কঠোর শৃঙ্খলার প্রবর্তনা যদি কেবলমাত্র আত্মদমন ও আত্মদানের জন্যই করা হয় তবে তাকে আত্মনিপীড়ন ছাড়া অন্য কিছুই বলা চলবে না। কল্যাণকে, শুভকে আমরা 'সুখ' বা 'স্বর্গীয়-শান্তি' আখ্যায় ভূষিত করতে পারি ; কিন্তু যখন আমরা এই সুখটুকু ভোগ করি, এই স্বর্গীয় শান্তিতে অবগাহন করে উঠি তখন তা আর ভবিষ্যতের অঙ্গীকার মাত্র নয়, তা হল বর্তমানকালের উপজীব্য আমাদের অভিজ্ঞতার বিষয় ; তা হল একান্তরূপে বাস্তব।

সুতরাং বলা যেতে পারে যে শিল্পের রূপে ও রেখায় তার আত্যন্তিক লক্ষ্যটুকু আপনাকে প্রকাশ করে ; কল্পিত মূল্যবোধের দৃষ্টান্ত হিসাবে শিল্পকর্ম গভীর মনোযোগের দাবী রাখে। এই নন্দনতাত্ত্বিক মূল্যবোধের সমগোত্রীয় মূল্যবোধ আবার নীতিতত্ত্বের উপজীব্য। নীতিশাস্ত্রের উপজীব্য যে শুভাশুভের ধারণা আমাদের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে তাদের আমরা প্রত্যক্ষ করি শিল্পের জগতে। নীতিশাস্ত্র যেসব শুভ এবং কল্যাণের কথা আমাদের শুনিয়েছে তারা সকলেই প্রায় কোন না কোন শিল্পকর্মের মধ্যে আপনাদের প্রতিষ্ঠা করেছে। এ কী সেই দার্শনিক স্পিনোজা-কথিত আমাদের বৃহত্তর সত্তার বোধ, আমাদের কল্যাণবোধ, যার সাহায্যে স্পিনোজা মনুষ্য-কর্মের বিচার করেছেন? সঙ্গীতে এবং বিয়োগান্ত নাটকে আমাদের যে দ্রুত ধাবমান বহুমুখী অভিজ্ঞতার আস্বাদন ঘটে তার জুড়ি অন্য কোথাও মেলা ভার। সৃজনে ও সৃষ্টকর্মের রসাস্বাদনে এতত্ত্ব সমান ভাবে সত্য। দার্শনিক নীটসে, শিল্পের এই গুণ ও চারিত্র-ধর্ম অবলোকন করেছিলেন। তিনি একে 'ডায়োনিজীয়' আখ্যায় ভূষিত করেছিলেন। শিল্পের যে আত্যন্তিক শক্তিটুকুর আমরা সন্ধান পাই তা শুধুমাত্র

বিচার বিশ্লেষণ করে পাওয়া যায় না। শিল্পকর্মের এই শক্তি, এই প্রাণ, দর্শক ও শ্রোতাদের মধ্যেও সংক্রমিত হয়ে যায়। শিল্পী সৃজনকালে এই শক্তিটুকু আস্বাদন করেন ও তাঁর শ্রোতা অথবা দর্শকের অন্তরে এই শক্তির সঞ্চার করে দেন। শিল্পীর এই কাজটুকু হল যথার্থ শিল্পীজনোচিত। যদি নীতিশাস্ত্রের কাজ হয় জীবনে শৃঙ্খলা আনয়ন করা, জীবনে শক্তির সঞ্চার করা, যার ফলে জীবন সুস্থ ও স্বস্থ হয়ে উঠতে পারে, তাহলে আমরা বলব যে ঠিক এই কাজটুকুই শিল্পও সম্পন্ন করে। মানব-অভিজ্ঞতাকে উন্নত করে, প্রশস্ত ও করে এই চারু শিল্প।

নৈতিক চিন্তা আদিকাল থেকে জীবনকে প্রশস্ত, পর্যাপ্ত ক'রে তুলতে চেয়েছিল। আর এই পর্যাপ্তিটুকু আমরা দেখেছি শিল্পের শব্দ, রঙ এবং কথার উদার দাক্ষিণ্যে। জীবনে এই উদারতা, এই প্রাচুর্য, এই দাক্ষিণ্যের একান্ত অভাব। শিল্পে ইন্দ্রিয়জ উপাদানের প্রাচুর্য, তীক্ষ্ণ তীব্র আবেগের গভীরতা আমাদের এ সম্বন্ধে অবহিত করে যে, বুদ্ধি ও কৌশলের যথাযথ ব্যবহার করলে জীবনও শিল্পপদবাচ্য হয়ে উঠতে পারত; অবশ্য যদি ব্যক্তি-জীবনকে এবং সমাজকে আমরা একটি সামগ্রিক শিল্পের বিষয়বস্তু করে তুলতে পারি তবেই এটি সম্ভব হয়। শিল্পে যে রূপ, যে রঙ, যে প্রাণটুকু প্রত্যক্ষ করি তা শুধুমাত্র শিল্পের জগতেই আবদ্ধ হয়ে থাকবে কেন? অবশিষ্ট জীবনটা শুধুমাত্র ছকে বাঁধা, প্রাণহীন, বর্ণ-বৈচিত্র্যহীনই বা হবে কেন? একটা শ্রেণীগত ঐতিহ্যের বশবর্তী হয়ে আমরা বিশ্বাস করি যে, বস্তু ব্যবহারিক এবং সুন্দর এই দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত হতে পারে। যাঁরা লাভ করার জন্য ব্যবসা করেন তাঁরা এই বিভাগে বিশ্বাস করেন। কারুকলার প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আমরা লক্ষ্য করেছি যে ব্যবহারগত প্রয়োজনে কাজে লাগানো হয় এমন জিনিষে সুন্দরের স্পর্শটুকু এসে লাগতে পারে; যে সমাজে সকলকে উপেয় হিসাবে গণ্য করা হয় সেখানে সকলেই এমন কাজে অংশ গ্রহণ করতে পারে যে কাজ শিল্প-প্রাণনায় অনুপ্রাণিত। যে সমাজে যূথবদ্ধতার প্রকোপে মানুষের সকল প্রয়াসই প্রাণহীন এবং মৃত সেই সমাজের মানুষের শিল্পকর্মে কেবলমাত্র আমরা এই প্রাণ-শক্তির প্রাবল্যটুকু প্রত্যক্ষ করি।

নীতিবাগীশের দল নীটশে কথিত এই ডায়োনিজীয় গুণটি সম্বন্ধে বড়ই সংশয়যুক্ত, তা সে শিল্পেই হোক কিংবা জীবনেই হোক। দুর্বার প্রাণশক্তি সমাজে বন্য বর্বতার সূচনা করতে পারে, আবার ব্যক্তিগত জীবনে

তা মূর্ছারোগেরও সূত্রপাত করে। এরা উভয়েই পরম ক্ষতিকর। মানুষ মধ্যাহ্নবেলার কলরবমত্ত কীট পতঙ্গ মাত্র নয়। জীবনে সাধনার প্রয়োজন ; এই জীবনকে বিচার করতে হবে ভবিষ্যৎ কালের পটভূমিতে। ভালোভাবে বাঁচতে হলে ন্যূনতম সমন্বয়টুকু সাধন করতে হবে। বিশৃঙ্খলার বিকল্প হচ্ছে শৃঙ্খলা। সৎ-জীবনে নিয়ন্ত্রণের দরকার। জীবনের উদ্যানে পরিশ্রম করতে হয়, তবেই না বর্ণোজ্জ্বল পুষ্প সমারোহে দশদিক আকীর্ণ হয়ে উঠবে। অন্যথায় আগাছায় চতুর্দিক ভরে যাবে। হয়ত দৈবাৎ এখানে ওখানে দু'একটি বাহারে ফুল ক্ষণিকের জন্য মুখ তুলবে। এই ক্ষেত্রেও শিল্প হল দৃষ্টান্তআশ্রয়ী নীতি শিক্ষক। দার্শনিক নীটশে শুধুমাত্র শিল্পের ডায়োনিজীয় গুণটির কথাই বলেন নি। তিনি শিল্পের এ্যাপোলোনীয় গুণটির কথাও বলেছেন। শিল্পে যেমন প্রাণবন্যার উদ্দামতা আছে তেমনি আবার তা স্থৈর্য ও শান্তির প্রতীক। শিল্পে আমরা যে পরিমাণে এদের দেখা পাই ঠিক সেই পরিমাণে জীবনে এদের দেখা পাই না।

ঊনবিংশ শতকের শেষ পাদে শিল্পের পলায়নী-প্রবৃত্তিটুকু নিয়ে যে বাদানুবাদ চলেছিল তা আজও অব্যাহত আছে। ভাবাবেগের দ্বারা চালিত হয়ে একদল পণ্ডিত এই গজদন্তমিনারকে সমর্থন করেছেন আবার অন্য আর একদল এর বিরোধিতাও করেছেন। যদি শিল্পকে 'পলায়ন' আখ্যাই দেওয়া হয়ে থাকে তা হলে নিশ্চয়ই তার যুক্তিসঙ্গত কারণ রয়েছে। মানুষের মনের আভ্যন্তরীণ জটিলতা ও বিশৃঙ্খলা থেকে মুক্তিই হল এই শিল্পকর্ম ; স্নায়বিক বিকারের বেদনার শান্তিও এই শিল্পকর্মে পাওয়া যায়। বিশৃঙ্খল সমাজের ব্যাপক বিকারের হাত থেকে পালিয়ে গিয়ে শিল্পের জগতে নিষ্কৃতি পায় ; জাগতিক নৈরাজ্য, মানসিক জটিলতা—এদের হাত থেকেও মুক্তি পাওয়া যায় শিল্পের সৌন্দর্যলোকে। চিত্রের শৃঙ্খলাবদ্ধ স্থানিক সংস্থানে, তার বিস্তারে ও গুরুত্বে, সঙ্গীতের শব্দ শোভাযাত্রার সুস্পষ্টতায়, কাব্যের ছন্দোময় আনন্দের মধ্যে আমরা শৃঙ্খলাকে পাই, সমন্বয়কে প্রত্যক্ষ করি, শান্তরসের আস্বাদন করি। নীতিবাগীশের দল সমন্বয়ের মধ্যে যে মূল্যটুকুকে প্রত্যক্ষ করেন তা শিল্পের সীমিত প্রাকারের মধ্যে সহজ লভ্য। শিল্পের এই সমন্বয়ধর্মী রূপটুকু শুধুমাত্র সান্ত্বনাই দেয় না অথবা পলায়নের সুযোগটুকুই দেয় না, আগামী দিনের সমাজ ব্যবস্থার পূর্ণাঙ্গ চিত্রটুকু তারা আমাদের সামনে তুলে ধরে। তারা হল অনাগত ভবিষ্যতের পূর্বাভাস।

আত্ম নিয়ন্ত্রিত শৃঙ্খলাটুকু শিল্পকর্মের উপাদান এবং আঙ্গিকের মধ্যে প্রতিষ্ঠা পায়, এই শিল্প-শৃঙ্খলা সেই বৃহত্তর জীবন-শৃঙ্খলাকে দ্যোতিত করে, এই বৃহত্তর জীবন শৃঙ্খলার প্রসাদে আমরা বন্য-বর্বরতার হাত থেকে সমাজকে রক্ষা করি, স্নায়বিক বিকার থেকে ব্যক্তি মানসকে রক্ষা করি ; অন্যদিকে এই শৃঙ্খলাই একনায়কতন্ত্রের লৌহনিগড় থেকে মানুষকে মুক্তি দেয়। শিল্পে মানুষ তার পরিমিত ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যকে ফিরে পায়, জীবনে এইটুকুরই অভাব। সমাজে— তা সে গণতান্ত্রিকই হোক অথবা একনায়কতান্ত্রিকই হোক, সেখানে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের প্রতিষ্ঠা সহজসাধ্য নয়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, শিল্পী এবং নীতিবিদেরা স্থান পরিবর্তন করেছেন। অতীতে নীতিবিদ শিল্পীকে উপদেশ দিয়েছেন ; এখন আমরা এটুকু বুঝতে পারছি যে শিল্প থেকে নীতিবিদেরা কিছু কিছু নির্দেশনা গ্রহণ করতে পারেন। কেননা. নীতিবিদ জীবনের মূল্য সম্বন্ধে, সঙ্গতি-প্রাণ-উজ্জ্বল, ঐশ্বর্যবান, তীক্ষ্ণ, তীব্র, জীবনায়ন সম্বন্ধে যে সব তত্ত্ব কথা বলেন তার সবটাই শিল্পীর প্রতিভা আপন সৃষ্টিতে প্রমূর্ত করে দিয়েছেন। বোদ্ধা রসিকের দল বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শিল্প-সম্ভারে আপন আপন জীবনচর্যার উপাদান এবং উপকরণকে প্রত্যক্ষ করেছেন। জীবন যখন আপনাকে উপলব্ধি করে—তখন তার সম্ভাব্য যে রূপ, সেই রূপই শিল্পে আমরা প্রত্যক্ষ করে থাকি। শিল্পের অতিপ্রত্যক্ষ এই রূপ দর্শককে এবং শ্রোতাকে নতুন নতুন জীবনচর্যায় অনায়াসে উদ্বুদ্ধ করে ; তর্ক করে অথবা আদেশ দিয়ে মানুষকে বশ করা যায় না। শিল্প আপন ঐশ্বর্যময় রূপটুকু দেখায় আর সেই রূপে বোদ্ধা রসিকজন মুগ্ধ হয়। তাঁরা শিল্পকে ভালবাসেন।

এই ভাবে শিল্পকর্মের মাধ্যমে আমরা যে সব মূল্যকে ইন্দ্রিয়গোচর করে তুলি, তারা আমাদের কল্পনার উপরে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করে। প্লেতো থেকে তলস্তয় পর্যন্ত সকল দার্শনিকেরাই—এ বিষয়ে একমত যে শিল্পের ভাষা হল সর্বজনীন ভাষা ; সূত্রের ভাষা হ'ল আদেশ নির্দেশের ভাষা—এদের চেয়ে অনেক বেশী শক্তিমান, ব্যাপকতর ভাষা হল শিল্পের ভাষা। ধর্মে আমরা বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের কথা শুনেছি ; যাঁরা অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে সামাজিক তাঁরা সমবায় প্রচেষ্টার কথা বলেছেন। শিল্পে অবশ্য এই বিশ্বভ্রাতৃত্ব এবং সমবায় প্রচেষ্টা, এতদুভয়কেই আমরা প্রত্যক্ষ করি। মানুষের কাছে অত্যন্ত মূল্যবান যে আবেগগত জীবন তার গভীরে শৃঙ্খলাটুকু রয়েছে। সেইটুকু শিল্পীর শিল্পকর্মে

সুপ্রকট ; প্রকৃতির উন্মাদনা এখানে অনুভূতির বিমল আনন্দে রূপান্তরিত হয়। কবিতার ভাষায় সব শিল্পই কথা বলে। এই কথায় যেন ছবি আঁকা হয়। সে ছবির ভাষায় মানুষের আবেদন ধ্বনিত হয়ে উঠে। মানুষের নৈতিক জীবনের নিয়ন্তা হিসেবে এই সব শিল্পকর্মের কার্যকারিতা অনস্বীকার্য। স্বৈরাচারী একনায়কেরা সঙ্গীতের. চিত্রের এবং কথার অন্তর্নিহিত শক্তির তত্ত্বটুকু জানেন। বাস্তববাদী নীতিবিদেরও এই শক্তিটুকু সম্বন্ধে অবহিত হতে হবে।

দর্শনের নৈতিক দিক সম্বন্ধে এবং শিল্পের সঙ্গে দর্শনের সম্বন্ধের প্রসঙ্গে আমাদের, আর একটু বক্তব্য আছে। মানুষ যে সব বিশ্বাস এবং আদর্শকে আশ্রয় করে জীবন যাপন করে, নীতিবিদেরা সেগুলি সম্বন্ধে অতিমাত্রায় সচেতন। এই আদর্শ এবং বিশ্বাসগুলি যেন শিল্পীর শিল্পকর্মে মূর্তি পরিগ্রহ করে। মানুষের কল্পনায় শিল্পীর প্রতিভার প্রসাদে এরা জীবন্তরূপে প্রতিভাত হয়। এদের এই সজীব অতিপ্রত্যক্ষ রূপটুকুর নৈতিক প্রভাব দূর প্রসারী। এরা মানুষের নীতিজ্ঞানকে সক্রিয় ক'রে ন্যায়বুদ্ধির কাছে যা সুপারিশ করে, যে আদর্শের কথা বলে, শিল্পে সেই আদর্শের মনোহরণ মূর্তি আমরা প্রত্যক্ষ করি। শিল্পকলার জগতে আমাদের অনুভূত মূল্যটুকুর সঙ্গে সর্বজন-স্বীকৃত মূল্যবোধের কোন প্রভেদ থাকে না।

দার্শনিকেরা চারুকলার নৈতিকতা সম্বন্ধে যে অনুসন্ধান করেন তা অনীহা-প্রসূত। ওঁরা বলেন যে শিল্পকর্ম মানুষের আনন্দের উৎস। দার্শনিকেরা হয় এই আনন্দকে অস্বীকার ক'রে নস্যাৎ করতে চেয়েছেন অথবা এই নন্দনতাত্ত্বিক আনন্দের ন্যায়সঙ্গত ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। মানুষের সামগ্রিক ধ্যানধারণার ক্ষেত্রে শিল্পের স্থান নির্ণয় করার চেষ্টাও এঁরা করেছেন। কিন্তু শিল্প সম্বন্ধে দার্শনিকদের যে আগ্রহ দেখা যায় তার সম্ভবত সূক্ষ্মতর কারণ আছে। শিল্পের যে সূক্ষ্ম কারুকার্য আমাদের মনোযোগ আকৃষ্ট করে, আবেগ উদ্রিক্ত করে, তার মধ্যে আমরা দর্শনের, বিশেষ করে অতীন্দ্রিয় ভাববাদী দর্শনের সমস্যা এবং তার সমাধানের ইঙ্গিতটুকু প্রত্যক্ষ করি। কবিরা বলেছেন যে সুন্দরই হল সত্য এবং সত্যই হল সুন্দর। দার্শনিকেরা অনেক বিচার বিবেচনা করে অবশ্য অনুরূপ সত্যে উপনীত হয়েছেন।

দার্শনিকেরা সত্যের যে সব সংজ্ঞা দিয়েছেন তার বিস্তারিত আলোচনা করা স্থানাভাববশতঃ সম্ভবপর হচ্ছে না। সত্যের যে ক্রিয়াশীলতা প্রমেয়, ইন্দ্রিয় অগোচর বস্তুসত্তার সঙ্গে যার অবিরোধ তাকেই দার্শনিকেরা সত্য

আখ্যায় ভূষিত করেছেন ; ঘটনার বোধগম্য সার্বিক বর্ণনাকেও অনেকে সত্য বলেছেন। কিন্তু যে ঘটনাটি সত্যকে প্রমাণ করে, সত্য এবং যে ঘটনা পরস্পর অবিরোধী, সত্য যে ঘটনাটি বর্ণনা করে মাত্র, সেই ঘটনার ব্যাখ্যা করা সহজসাধ্য নয়। কোন বর্ণনার সাহায্যেই ঘটনাটিকে যথাযথ ব্যাখ্যাত করা যায় না। এটি অনন্যসাধারণ, প্রত্যক্ষগোচর এবং নৈর্ব্যক্তিক। এটি ইন্দ্রিয়োপাত্তের সমন্বয়, কোন সামান্য বচনের দ্বারা এর বর্ণনা করা যায় না। অথচ টেস্টামেণ্টের জিহোবার মতই ঘটনাটি হল একক এবং অনন্য। যে বর্ণনা, যে আলোচনা ঘটনাটিকে বিশ্লেষণ করে, নিশ্চয়ই তা ঘটনাটির অস্তিত্বের সমার্থক নয়। জাতিবাচক বিশেষ পদগুলি সাধারণ পদ মাত্র। বিজ্ঞানের ভাষা এমন কী ব্যবহারিক বুদ্ধির ভাষাও বহুল পরিমাণে নির্বিশেষ এবং সাধারণ ; এই ভাষায় সবার মধ্যে পাওয়া যায় এমন ন্যূনতম সাধারণ গুণের অস্তিত্বের কথা, শ্রেণীর কথা, পুনরাবির্ভাবের কথা, শ্রেণী-গড়ের বর্ণনা, এসবই পাওয়া যায়। অভিজ্ঞতা আপন অব্যবহিতত্বে অনন্য, আপন স্বাতন্ত্র্যে অনির্বচনীয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভাষার মাধ্যমে আমরা ঘটনার স্বাতন্ত্র্যটুকু বোঝাতে পারি না। শুধুমাত্র তার সম্ভাব্য অনুষ্ঠানটুকু নির্দেশ করতে পারি। প্রত্যেকটি শিল্পের নিজস্ব ভাষা আছে, শিল্পী এই ভাষার মাধ্যমে তাঁর জীবনের স্বাদটুকু তাঁর চোখে দেখা বিশ্বভুবনের ছবিখানি, তাঁর অভিজ্ঞতার স্বর্ণোজ্জ্বল আবেগ বিহ্বলতাটুকু পরিবেশন করেন। সেই পরিবেশনায় শিল্পী তাঁর শিল্প-আঙ্গিক ও নৈতিকবোধটুকুর সমন্বয় ঘটিয়ে যে প্রতিমা সৃষ্টি করেন, যে শব্দসম্পদের ঐশ্বর্য বিকাশ করেন, যে কথা, যে রেখার বিন্যাস করেন তা অনবদ্য।

শিল্পের জগতে যে সত্যের কথা বলছি তা শুধুমাত্র কথার কথা নয়। বস্তুর যে বাহ্য সত্যটুকু অপ্রাসঙ্গিক এবং অসংলগ্ন তাকে আমরা সত্য বলে স্বীকার করি না। ঘটনা এবং ঘটনাসন্নিবেশকে এবং আমাদের আবেগগত জীবনকে আশ্রয় ক'রে যে বাহ্য সত্য রয়েছে তাও স্বীকার্য নয়। জলের উপাদন সম্বন্ধে যে বৈজ্ঞানিক সূত্রটুকু আমরা জানি তার দ্বারা জলের আস্বাদ পাই না, জলের ওপরকার ঝিকিমিকিটুকু দেখি না। জ্যোতির্বিদ যখন বলেন চন্দ্র হল দু'শ তিরিশ হাজার মাইল দূরে অবস্থিত একটি মৃত তারকামাত্র তখন তাঁর উক্তির সত্যতা কবি-কথার সত্যতাকে ব্যাহত করে না ; কবি বলেন, চন্দ্র হল আঁধার রাতের রাণী। Wagner's Tristan-এ প্রেমের যে ছবি আমরা অঙ্কিত

দেখেছি তার সঙ্গে প্রেমের শরীর-স্থান-বিস্তার কোন মিলই খুঁজে পাই না। সত্যের নানান্ রূপভেদ ; তা নৈতিক, কাব্যিক অথবা নাটকীয়ও হতে পারে। কোন একটি ঘটনা আমার কাছে যেভাবে প্রতিভাত হয়, তার মধ্যেই তার সত্যটুকু নিহিত থাকে। ব্যক্তিনিরপেক্ষ উদাসীনতার মধ্যে সত্যের প্রতিষ্ঠা ঘটে না। মানুষের আবেগ ও কল্পনার উপর যে প্রতিক্রিয়া ঘটে তা হল শিল্প-সত্যের সামগ্রিক রূপের অঙ্গস্বরূপ। ইন্দ্রিয়গোচর যে রূপ আবেগের যে রঙ একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয় তার সবটুকু শিল্পী শিল্পসত্যরূপে পরিবেশন করেন।

শিল্পের কথায় মানুষের ইন্দ্রিয় ও হৃদয় সায় দিলেও দার্শনিক শিল্পের এই ভাষাকে সন্দেহ করেন। কেননা, শিল্পের ভাষা প্রমাণযোগ্য নয়। যেমন বিজ্ঞানের সূত্রগুলি পরীক্ষণের সাহায্যে প্রমাণ করা যায় তেমন ক'রে শিল্প-সত্য প্রমাণযোগ্য নয়। ন্যায় শাস্ত্র-সম্মত পথে শিল্প-সত্যের প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। তাই বৈজ্ঞানিক সত্য অথবা তর্কশাস্ত্র সম্মত সত্যের সঙ্গে তুলনায় শিল্প সত্যকে, শিল্পের নৈতিক এবং কাব্যিক সত্যকে বড়ই অনির্দিষ্ট এবং অর্থহীন বলে মনে হয়। তবুও এমন অনেক দার্শনিক আছেন যাঁরা সাধারণ বুদ্ধির সঙ্গে একমত যে শিল্পের সত্য হল বিশেষ-আশ্রিত সর্বাশ্রয়ী-সত্য ; তর্কশাস্ত্রের অথবা বৈজ্ঞানিক সত্যের থেকে এ সত্য অনেক বেশী গ্রাহ্য কেননা শিল্পসত্যে আমাদের অভিজ্ঞতার যাথার্থ্যটুকু অনুস্যূত হয়ে যায়। শিল্পের বিন্যাসপ্রকরণ প্রকৃতির বিন্যাস প্রকরণ থেকে স্বতন্ত্র ; আমরা যা দেখি, শুনি এবং অনুভব করি তার ভাষ্য রচনাকালে যে ব্যাকরণের প্রয়োজন হয়, সেইটুকুই হল শিল্পের অবদান। শিল্পের ভাষার সুস্পষ্টতায় আমরা বস্তুসত্য-টুকুকে অবলোকন করি ; বস্তু সম্বন্ধীয় সত্যটুকু শিল্পলোকে এহ বাহ্য।

দর্শন এবং বিজ্ঞানের সূক্ষ্ম আলোচনা বস্তুর অন্তর স্পর্শ করলেও শিল্পের ভাষা যে গভীরে পৌঁছায় তারা সেখানে পৌঁছায় না ; অভিজ্ঞতার কোন কোন ক্ষেত্রে শিল্পের ভাষা ছাড়া অন্য কারো প্রবেশ নেই ; শিল্প ব্যতীত অন্য কোন ভাষায় তার প্রকাশ সম্ভব নয়। এক শিল্প থেকে অন্য শিল্পে ভাষান্তরিত করাও সম্ভব নয় ; এক শিল্পের আঙ্গিক অন্য শিল্পে ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। শিল্পের ভাষা বিজ্ঞানের ভাষায় বা ব্যবহারিক জীবনের ভাষায় রূপান্তর গ্রহণ করে না। অস্পষ্ট গূঢ়ার্থবাদীদের মত শিল্পীরাও যে ভাষা বলেন তা যেমন প্রমাণ করা যায় না, তেমনি আবার তা অপ্রমাণও করা যায় না। শিল্প তার অভিনব প্রকাশে

মানুষের আত্ম-দর্শনের জন্য আর একটি বাতায়ন খুলে দেয়, তার মধ্য দিয়ে আর একটি বিশ্বভুবনের দর্শন মেলে। সম্মোহিত দর্শক তৎকালের জন্য ঐ ভুবনটিকেই সত্য জ্ঞান করেন। শিল্পব্যতীত অন্য কিছুর আনুকূল্যে সেই জগতে প্রবেশ লাভ করা যায় না।

যে সব মানুষের সঙ্গে আমরা নিত্যনিয়মিত বাস করছি তাদের স্বরূপ সম্বন্ধে আমরা অন্ধ এবং অজ্ঞ। কখন বা ভিন্নধর্মী চরিত্রবহুল একটি উপন্যাস পড়ে আমরা এমন কতকগুলি চরিত্রের সংস্পর্শে আসতে পারি যাদের দেখা আমরা হয়ত দৈনন্দিন জীবনে পেয়েছি। অথচ উপন্যাসটি পাঠ করে পরিচিত সেই সব মানুষের চরিত্র সম্বন্ধে যে অন্তর্দৃষ্টি লাভ করি তা তাদের সঙ্গে দৈনন্দিন জীবনের নিয়মিত ব্যবহারেও সম্ভব নয়। সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করলে এই অন্তর্দৃষ্টিটুকু পাওয়া যায় না। শিল্পীর আঁকা গাছের ছবি দেখে বা নিসর্গ চিত্র দেখে যে সত্য উপলব্ধি করি তা হয়ত পূর্বে উপলব্ধি করিনি—গাছটি বা প্রাকৃতিক দৃশ্যটি দেখার পরেও। আঙ্গিক মাধ্যমে তাঁর শিল্পদৃষ্টির যে পরিচয় পাই তা অনন্য সাধারণ। শিল্পীর দৃষ্টি বস্তুর অন্তরে প্রবেশ করে; তাই তিনি যা দেখেন এবং যা দেখান তা সহজলভ্য নয়। আমরা বস্তুর যে রূপটি শিল্প মাধ্যমে দেখি তা বস্তুর সত্তাটিকে উদ্‌ঘাটিত করে; যদি শিল্পীর দৃষ্টি দূর-বিস্তৃত হয় এবং তার আঙ্গিক পরিণতি লাভ ক'রে থাকে তা হলে সহজেই তিনি ভগবানের রূপটুকু আপন চিত্রে ফুটিয়ে তুলতে পারেন। কোন দার্শনিক কোন ভগবদ্‌তত্ত্ববাদী ঈশ্বরের সেই রূপটুকু, সেই সত্তাটুকুর বর্ণনা এবং ব্যাখ্যা করতে পারেন না। সর্বোপরি যে ঘটনাটি আমরা প্রত্যক্ষ করেছি তার অনন্য-সাধারণতা শিল্পের ভাষায় যেভাবে ফুটে ওঠে এমনটি আর অন্য কোন ভাষায় হয় না। তাই অন্য ভাষায় শিল্পের প্রকাশভঙ্গীটুকু অনায়ত্ত। বিজ্ঞান অথবা সহজ ব্যবহারের ভাষায় তার সন্ধান মেলে না। তারা নিয়ন্ত্রণের শৈলী নিয়েই ব্যস্ত থাকে; বস্তুর আত্যন্তিক ধর্মটুকু সম্বন্ধে তারা উদাসীন। শিল্পের ভাষা হল উপলব্ধির ভাষা, এই ভাষায় বস্তুর সত্তাটুকু সহজেই উদ্‌ঘাটিত হয়। দার্শনিক যে ভাষায় কথা বলেন তার দ্বারা এই উদ্‌ঘাটন সম্ভব নয়। শিল্পীর প্রতিভাই এই সত্তাটুকুর স্বরূপ ব্যাখ্যানে সক্ষম। সাধারণ বুদ্ধির দৌলতে, অবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণের কল্যাণে আমরা যে বস্তুনিরপেক্ষ চিন্তায় অভ্যস্ত হয়ে পড়ি তা থেকে শিল্প আমাদের মুক্তি দেয়। আমরা প্রত্যক্ষ ভাবে ইন্দ্রিয় মাধ্যমে যে সামগ্রিক অভিজ্ঞতাটুকু লাভ করি তার অসাধারণত্ব আমাদের চোখেই পড়ে না; কেন

না সাধারণ বুদ্ধিতে এটা ধরা পড়ে না ; বস্তুর ব্যবহারিক দিকটা ব্যবহারগত জীবনের কল্যাণে ক্রমে ক্রমে বস্তু থেকে পৃথক হয়ে পড়ে। বৈজ্ঞানিক আলোচনায় এই ব্যবহারিক দিকটির অন্তর্গত তত্ত্বাবলীকে সুসম্বদ্ধ ক'রে উপস্থাপিত করা হয়। শিল্প সমগ্র বস্তু সত্তাটিকে মেলে ধরে ; তা তত্ত্ব বা ব্যবহারিক দিকটাকে নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে না। আর এক অর্থে বলা যায়, সে শিল্পকে উদঘাটিত করে। আমাদের বিশেষ বিশেষ অভিজ্ঞতা, গোলাপের সৌগন্ধ, বন্ধুর উপস্থিতি, তার কণ্ঠস্বরের ধ্বনিচ্ছন্দ এক অচিন্তনীয় সুষমায় মণ্ডিত হয়ে ওঠে। ইন্দ্রিয়-সংবেদনের দ্বারা আমাদের কোন একটি মুহূর্তের দুর্লভ অভিজ্ঞতার আনন্দের রশ্মিচ্ছটা আমাদের সমগ্র সত্তাকে আলোকিত করে তোলে। সেই আলো, সেই আনন্দ কেবলমাত্র সংবেদন দিয়ে, ইন্দ্রিয়-গোচরতা দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। আমাদের আবেগ-বিহ্বলতার সবটুকু, দয়িতের কায়িক উপস্থিতি বা সুন্দরের আবির্ভাব পুরোপুরি ব্যাখ্যা করে না। শিল্পলোকের বাইরে ধর্মের এবং প্রেমের ক্ষেত্রেও আমরা এই আতিশয্য এবং দৈবী ব্যঞ্জনার সন্ধান পাই। কোন কোন শিল্পকর্মের মধ্যে আমরা এই অদ্ভুত শক্তির সন্ধান পাই যে শক্তি ব্যবহারিক জগৎবহির্ভূত সাধারণ বুদ্ধির নাগালের বাইরে থাকা এক ধরনের সত্যের সন্ধান দেয়। সেই সত্যটুকু তর্কশাস্ত্র-কথিত বিধিবিধানেরও অলভ্য। ভূগোলবিদ্যা ভূসংস্থানের যে পারস্পরিক সম্বন্ধের কথা বলে তার প্রতিরূপ আমরা শিল্পকর্মে খুঁজে পাই না। এই অতীন্দ্রিয় সত্তাটুকুর ব্যঞ্জনা হয়ত স্বরগ্রামের সামান্য পরিবর্তন করে শিল্পী আপন শিল্প কর্মে সংযোজিত করে দেন। মোজার্টের সোনাটাতে আমরা এর দৃষ্টান্ত পেয়েছি। ভ্যানগগের স্বর্ণোজ্জ্বল বর্ণসম্ভারে এর ইঙ্গিত আছে ; মহাকবি সেক্সপীয়রের নিম্নোদ্ধৃত ছত্র দুটিতে এর নিশানা রয়েছে :

"For God's sake let us sit upon the ground
And tell sad stories of the death of kings."

ব্যবহারিক জীবনের ও বিজ্ঞানের স্থূল আলোচনা শিল্পের এই উত্তুঙ্গ লোকে নিষিদ্ধ ; সুন্দরের আমন্ত্রণের হাতছানিতে, বিয়োগান্ত শিল্পের নির্দেশে আমরা সেই পরম রমণীয় শিল্পলোকে প্রবেশ করি। এই দুর্লভ মুহূর্তে শিল্পেরও ধর্মের শক্তি প্রায় অনুরূপ চারিত্র-ধর্ম অর্জন করে ; তাদের একাত্ম বললেও মিথ্যা বলা হয় না। তারা এক হয়ে যায়। ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই ধরনের সত্যের প্রকাশ সম্ভব হয়। গ্রীসদেশে ধর্মীয় অনুষ্ঠান কালক্রমে নাটকে

পরিণত হয়েছিল; গ্রীক নাটকের বিষয়-মাহাত্ম্যে ও চারিত্রধর্মে তা একেবারে ধর্মীয় নাটকরূপে গণ্য হয়েছে। ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের ঈশ্বর আরাধনার সমাবেশ পদ্ধতির মধ্যে তা অনস্বীকার্য। দার্শনিক প্লেতোর কবিদের সম্বন্ধে খুব অনুকূল মনোভাব না থাকলেও কবিদের কল্পনা এবং সৃষ্টিশক্তি সম্বন্ধে তাঁর ধারণা স্পষ্ট ছিল; তাঁদের সামগ্রিক দৃষ্টিতে বস্তুর যে রূপটি ধরা পড়ে তা সাধারণ মানুষের চোখে ধরা পড়ে না, একথা প্লেতো জানতেন। কাব্যরসিক তাঁদের দৃষ্টিতেও বস্তুর এই অন্তরশায়ী রূপটুকু উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

ইন্দ্রিয়গোচরতার বাইরে বস্তুর এই যে রূপের কথা বলা হচ্ছে এ রূপটুকুর যাথার্থ্য কেমন করে প্রমাণ করা যাবে এটাই হল সমস্যা। আর যদি প্রমাণ না মেলে, তবে কেমন করে একে সত্য বলে গ্রহণ করা যায়? আর যাথার্থ্য প্রমাণ না করলে একে জ্ঞানের মর্যাদা দেওয়া চলে না। এর উত্তরে বলা সেই পিয়ানো-বাদকের গল্পই আমরা বলব। বীটোফেনের 'সোনাটা' বাজিয়ে শোনালেন সেই পিয়ানো-বাদক; তাকে প্রশ্ন করা হল এর অর্থ কী? তিনি তার অর্থের ব্যাখ্যা না করে আর একবার সেটি বাজিয়ে শোনালেন। শিল্প যে গভীরতর সত্যের কথা বলে তা কেবল শিল্পের নিজস্ব ভাষার মাধ্যমেই বলা যায়। সাধারণ বুদ্ধির অতীত দৈনন্দিন কথাবার্তার নাগালের বাইরে যে অতীন্দ্রিয় সত্তা রয়েছে তার দেখা পাওয়া যায় শিল্পের চকিত কিরণ-দীপ্ত অপ্রত্যাশিত মুহূর্তে। সহজে তার দেখা পাওয়া ভার। এই ক্ষণিকের দেখায় অতীন্দ্রিয় সত্তার প্রমাণ মেলে না। যাঁরা শিল্পরসিক, যাঁদের কানে ঐ সূক্ষ্ম সুরটুকু ধরা পড়ে, শব্দার্থের সূক্ষ্মতর ব্যঞ্জনা যাঁদের কাছে সুপরিস্ফুট হয়ে ওঠে সহজে, তাঁরা বারেবারে ঐ শিল্প-রসের আস্বাদন ক'রে অতীন্দ্রিয় সত্তাটুকুকে প্রত্যক্ষ করেন আপনার কবিদৃষ্টির প্রসঙ্গে। এইভাবে জানা ছাড়া এই সকল জানার অতীত অতীন্দ্রিয় সত্তাকে জানার অন্য পথ নেই। সেই সত্তা দুর্জ্ঞেয়; একে অনির্বচনীয়ও বলা হয়েছে। শিল্পী যখন তাঁর আপন শিল্পের ভাষায় কথা বলেন তখন তাঁকে বোঝা যায়। যাকে দুর্জ্ঞেয় এবং অসংজ্ঞেয় বলে মনে হয় শিল্প তাকেই প্রমাণ করে; শিল্প অভিজ্ঞতার দিক্‌সীমার বিস্তার ঘটায়, শিল্প যে নতুন ব্যঞ্জনাটুকু সংযোজিত করে দেয় উপাদান পরীক্ষণের সাহায্যে তাকে প্রমাণ করা দুরূহ। শিল্পে এই যে নতুন অর্থ এবং ব্যঞ্জনার সাক্ষাৎ আমরা পাই তা সহজ বুদ্ধিতে অলভ্য। অভিজ্ঞতার অন্যান্য ক্ষেত্রে যদি তাকে না পাই, যদি সাধারণ বুদ্ধি প্রাকৃতজনের ন্যায় তাকে আবিষ্কার করতে না পারে

তা হলে তাকে অস্বীকার করা চলে না ; শিল্পের ভাষার ধরন-ধারণ ভিন্ন ; তাই সাধারণ ভাষার স্থায়রীতি এক্ষেত্রে অচল। বস্তু সত্তার সাক্ষাৎ মেলে উপলব্ধির পথে আর এই উপলব্ধি আসে প্রেমের, ভক্তির পথে, শিল্পের ভাষার মাধ্যমে। এই উপলব্ধি আকস্মিকতার দ্বারা চিহ্নিত।

দার্শনিকেরা যখন সত্য এবং জ্ঞানের স্বরূপ নির্ধারণে ব্যাপৃত তখন নন্দনতাত্ত্বিক এবং ধর্মীয় অভিজ্ঞতায় পাওয়া বস্তুর অন্তরশায়ী সত্তাটুকুর কথা ভেবে তাঁরা হয়ত থমকে দাঁড়ান। সম্প্রতি কোন কোন দার্শনিক এই সত্যটুকু স্বীকার করেছেন যে শিল্প-সৃষ্টি এবং শিল্প-রসাস্বাদন সমগ্র অভিজ্ঞতাকে এক অভিনব আলোকে আলোকিত করে তোলে। সমগ্র মানব-অভিজ্ঞতার পূর্ণাঙ্গ পরিণতি ঘটে এই ধরনের নন্দনতাত্ত্বিক অভিজ্ঞতায়। সম্প্রতিতম কালে জন ডিউই এবং হ্যাভলক এলিসের মত চিন্তাবিদেরা সমগ্র মানব অভিজ্ঞতাকে শিল্পরূপে কল্পনা করেছেন এবং শিল্প বলতে তাঁরা বুঝেছেন মানুষের বুদ্ধি-বৃত্তির সাধারণ বিকাশটুকুকে। মানুষের জীবনকে যদি কালের আধারে বিধৃত 'পরীক্ষণ প্রবাহ' বলে গ্রহণ করা হয় তা হলে বুদ্ধিকে তারা সেই পরীক্ষণ ক্রিয়ার নিয়ামক হিসেবে গ্রহণ করবেন ; বৃহত্তর অর্থে শিল্পচর্চা হল বুদ্ধির ব্যবহার মাত্র, সেক্ষেত্রেও আনুষঙ্গিক অবস্থাকে বুঝতে হবে, সুযোগ এলে তার সদ্ব্যবহার করতে হবে, উদ্দাম কল্পনার পাখায় ভর করে অজানার পথে ছুটতে হবে আবার স্বপ্নকে বিবেচনার নিগড় দিয়ে বেঁধে স্বস্থ করতে হবে। পরিবর্তনশীল পরিবেশের মধ্যে আকস্মিক ভাবেই মানুষ জন্ম নিয়েছে। বিজ্ঞানী মানুষ, সাধারণ মানুষ এঁদের মনেও শিল্পীর মতই ভাব বিষয়বস্তু ও স্বজ্ঞার অভ্যুদয় ঘটে। কিন্তু এই সব ভাবকে যথাযথ অনুধাবন করতে হলে আমাদের বুদ্ধি, শৃঙ্খলাবোধ এবং আত্মনিয়ন্ত্রণটুকু একান্তই প্রয়োজন। আমাদের চিন্তার খোরাক, আমাদের ভাব-ভাবনা এসবই আমরা প্রকৃতি থেকে আহরণ করি এবং এদের সমন্বয়ের পথ ধরেই আমাদের জীবনের আদর্শকে রূপায়িত করা সম্ভব হয়। শিল্পের ক্ষেত্রে বুদ্ধি সফলকাম হয় কেন না শিল্পের জগৎ আপেক্ষিক সারল্যের দ্বারা চিহ্নিত। জীবনে বুদ্ধির জয় ঘটলে আমরা সেই জয়ের কেতনকে শিল্প আখ্যা দিতে পারি। শিল্প যেখানে সার্থক শিল্প হয়েছে সেক্ষেত্রে আমরা বুদ্ধির জয়লাভেরই উজ্জ্বল নিদর্শন পেয়েছি ; তাই শিল্প সব সময়েই বুদ্ধিগ্রাহ্য। শিল্প-উপকরণের আদর্শায়িত রূপসৃষ্টির মাধ্যমে শিল্পী সুস্থ এবং সুশৃঙ্খল পথে রসাস্বাদনের সুযোগ দেন নি রসিকজনকে। সমাজনীতি এবং শিল্প সম্বন্ধে যে ধরনে

সমালোচনা করা হয় তার দ্বারা আমাদের উপরোক্ত বক্তব্য সমর্থন লাভ করে। সমালোচনার মান নির্ণয় করে মানুষের বুদ্ধি। মানুষ আপন আন্তর প্রকৃতি এবং বাইরের জগৎ সম্বন্ধীয় জ্ঞান লাভের জন্য স্ব-উদ্ভাবিত পন্থায় যে বিচার বিশ্লেষণ করে তারই নাম হল সমালোচনা। শিল্পচর্চার ক্ষেত্রে সমালোচনা অনুচারী ; কেন না যখন শিল্প উপকরণের যথাযথ ব্যবহারে ত্রুটি ঘটে, তাদের বিন্যাসে বিশৃঙ্খলা ঘটে, আমাদের রসোপলব্ধির স্বচ্ছতায় ছায়াপাত ঘটে, তখন শিল্প-সমালোচনার সূত্রপাত হয়।

শিল্পবস্তু প্রত্যক্ষ করার সময়ে যদি আমরা মনোযোগ দৃঢ়নিবদ্ধ করি, তখনও শিল্প-সমালোচনার উদ্ভব ঘটে। বৈজ্ঞানিক, সাধারণ মানুষ এবং শিল্পীও আপন আপন আঙ্গিকের উপযোগিতাটুকু প্রত্যক্ষ করার জন্য নিজ নিজ মূল্যমানটুকু প্রয়োগ করেন স্ব স্ব অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে। সমালোচনার অর্থ হল প্রত্যক্ষণকে বুদ্ধির আলোয় ভাস্বর করে অতিনির্দিষ্ট করে দেওয়া। সমালোচনার অর্থ বিধিবদ্ধ করে দেওয়া নয়, সমালোচনাকে অস্পষ্ট উপভোগ বলাও চলে না। সমালোচনার মাধ্যমে মানুষের রুচিবোধ শুদ্ধ, তীব্র ও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। শিল্পীই হোক আর জীবনই হোক, উভয়ক্ষেত্রেই সমালোচনা মানব-অভিজ্ঞতাকে আত্মসচেতন, সুনির্দিষ্ট ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করে তোলে। সমালোচনার পথে কল্পনা বর্ধিত ও পরিপুষ্ট হয়। শিল্পের সমালোচনার মুখ্য উদ্দেশ্য হল বিভিন্ন মূল্যায়ন পদ্ধতির আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ণয় করা ; শিল্প-সমালোচনার এই লক্ষ্যটুকু যথাযথ অনুধাবন করলে আমরা দর্শনের মূল উদ্দেশ্যটুকুও উপলব্ধি করতে পারব। দর্শন হল সমালোচনা কর্মের মূল্যায়ন। মূল্যবোধের সংজ্ঞা দান ও বিভিন্ন মূল্যবোধকে পৃথক রূপে চিহ্নিত করার যে প্রয়াস, সেই কাজটুকু হল দর্শন শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত।

দর্শন এবং শিল্প এরা পরস্পর মধ্যে অনুস্যূত ; এই পারস্পরিক মিলটুকু দুটি অর্থে ব্যাখ্যা করা যায়। প্রথমতঃ শিল্প এবং দর্শন, উভয়কেই সৃষ্টি ও নির্মাণ কর্ম বলা চলে। চিত্রী যখন ক্যানভাসের উপর ছবি আঁকেন, তখন তিনি বস্তুতঃপক্ষে একটি ক্ষুদ্র জগতের সৃষ্টি করেন। রং রেখা প্রমুখ উপায়ের সাহায্যে তিনি তাঁর মানস চিত্রটিকে ফুটিয়ে তোলেন ; ঘরটি, ঘরের মধ্যে মানুষগুলি, ফুল ও ফলের সমারোহ, এ সব মিলিয়ে সমন্বিত একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র অঙ্কন করেন ; একটি বিশেষ পরিপ্রেক্ষিতে আলো-ছায়ার সম্মিলন ঘটিয়ে তিনি আপন মনের একটি বিশেষ ধরনের প্রতিক্রিয়াকে রূপায়িত করে তোলেন।

আলো, রেখা ও রঙ তার শিল্পকর্মের উপাদান। কবি তাঁর কাব্যে অতীতে দেখা শত শত ঘটনার স্মৃতি, অতীতে শোনা রাগরাগিণীর রেশটুকু যুক্ত করেন ; কাব্য অনবদ্য হয়ে ওঠে। গায়ক স্বরগ্রামের অনন্ত সীমাহীন বৈচিত্র্যটুকু আপনার সঙ্গীতের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করেন ; সোনাটা এবং সিমফনি জন্ম নেয়।

শিল্পীর মতই দার্শনিকও সবটুকুকে গ্রহণ করেন না, প্রয়োজনমত বাছাই করে তিনি আপনার জগৎটুকু নির্মাণ করেন। মানুষের অভিজ্ঞতার সীমা-সংখ্যাহীন ইন্দ্রিয়োপাত্তের মধ্য থেকে তিনি তাঁর প্রয়োজনমত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী নির্বাচন করে নেন, এবং এই ঘটনাবলীর শ্রেণীবদ্ধ-করণের মৌল নীতিগুলির মধ্য থেকে কতকগুলি নীতি বাছাই করে নেন। এই নির্বাচিত নীতিগুলির সাহায্যে তিনি তাঁর দর্শন-সংস্থা গড়ে তোলেন, তাঁর নীতি-সংস্থা গঠন করেন, জীবন, জগৎ ও অদৃষ্ট সম্বন্ধে আপনার চিন্তা থেকে একটি সামগ্রিক দর্শনচিন্তার রূপদান করেন। আমরা মনে করি (এবং শিল্পীরাও অনেকে তাই মনে করেন) যে শিল্পীরা শিল্প উপাদান এবং ঘটনাবলীকে নির্বাচন ক'রে ভাবাবেগের দ্বারা চালিত হয়ে এদের সমন্বিত শিল্প রূপটুকু সৃষ্টি করেন ; অবশ্য শিল্পীর এই হৃদয়াবেগ বিবেচনার দ্বারা বল্গায়িত ও পরিশীলিত। দার্শনিকও এই ধরনের কাজই করেন। মানব-চিন্তার ইতিহাসের বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে দেখা যায় যে আমাদের জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে দার্শনিক-জনোচিত ধারণাটুকু একটি ছবি অথবা একটি কবিতার মতই নন্দনতাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়া মাত্র। যখন এই দার্শনিক ধারণার মধ্যে অঙ্গাঙ্গীযোগ স্থাপিত হয়ে পূর্ণ ঐক্যের প্রতিষ্ঠা ঘটে তখন তার থেকে আবার নন্দনতাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়ার উদ্ভব হয়। কোন রকম বদ্ধ সংস্কারের বশবর্তী না হলে দর্শন আলোচনাকেও একটি মূর্তি, একটি কবিতা অথবা একটি সুরম্য উপাসনাগৃহের মতই সুন্দর বলে মনে হতে পারে। সঙ্গীতের কাঠামোটির মত দর্শনের মধ্যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সুষমাটুকু থাকে না ; আবেশ-উদ্দীপনা হয়ত এমন কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত ও বশীভূত হয়ে দর্শন আলোচনার মধ্যে আত্মগোপন করে থাকে যে এদের স্বতন্ত্র অস্তিত্বটুকু বোঝাই যায় না ; তাই বলা হয় যে দর্শন-চিন্তা হল চিন্তার আবেগ-মুখর রূপ ; একে আবেগের উত্তাপরহিত প্রতিমাও বলা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ দার্শনিক স্পিনোজার *Amardei intellectuales*এর কথা বলা যায়। যাঁরা সহানুভূতির সঙ্গে দর্শনের মর্মকথাটুকু বিচার করতে সক্ষম হন তাঁরা কাব্যপাঠের মতই দর্শনপাঠ করে আবেগের দ্বারা অভিভূত হয়ে পড়েন, তাঁদের কাছে কোণারকের

মন্দিরগাত্রের কারুকর্ম দেখা এবং একটি দর্শন-গ্রন্থ পাঠ করা একই কথা। দর্শন গ্রন্থে দার্শনিকের চিন্তা ও অনুভূতি প্রতিফলিত হয়। তাঁর যুগ ধর্ম ও তাঁর দর্শন চিন্তায় ছায়াপাত করে।

দর্শনের রূপটুকু আমাদের কাছে 'গ্রহ বাহ্য' কেন না তার গঠন-উপাদানে খুব চাকচিক্য থাকে না। প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয় যে দর্শন আলোচনা সত্যানুসন্ধানে ব্যাপৃত ; সৌন্দর্য্যের প্রতি তার আকর্ষণ থাকে না। কিন্তু দর্শন-আলোচনারও একটা সুনির্দিষ্ট রূপ এবং গঠনসুষমা থাকে। কান্টের *Critique of Pure Reason* গ্রন্থের রচনাশৈলীর অনবদ্য সুষমা বহু পাঠকের মনোরঞ্জন করেছে। শিল্পীর শিল্প-রূপের মতই দার্শনিকের রচনাশৈলী তার দর্শন-চিন্তাটুকুকে পরিবেশন করার আধার মাত্র। দর্শনের মধ্যে সেই কল্পনার প্রসার, সেই কল্পনার মুক্তিটুকু ঘটে যা শিল্পকর্মের মধ্যে সহজলভ্য। ছবি আঁকার সময়, কবিতা লেখার সময় আমরা পৃথিবীকে যে চোখে দেখি ঠিক সেই ধরনের আলোকোজ্জ্বল দৃষ্টিতে দর্শনগ্রন্থ লেখার সময় আমরা জগৎ ও জীবনকে দেখে থাকি। তাই বিভিন্ন দর্শনমতে এতো পার্থক্য। একই জগতকে বিভিন্ন দার্শনিক বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে থাকেন। যেমন Breughel, Cezanne, Watteau এবং Degasএর ছবিতে দেখা জীবন-জগতের রূপ ভিন্ন, যেমন Beethoven, Mozart, Debussy'র সঙ্গীতে পাওয়া জগতের ও জীবনের আলেখ্য বিভিন্ন, তেমনিধারা বিভিন্ন দার্শনিকের জীবন ও জগৎ সম্বন্ধীয় ব্যাখ্যাও ভিন্নতর। দর্শনচিন্তার যথার্থ রূপ হল স্বজ্ঞা আশ্রয়ী। দর্শন-চিন্তায় অন্তর্দৃষ্টির প্রাধান্য অনস্বীকার্য। দার্শনিক যেভাবে পৃথিবীকে দর্শন করেন, তাঁর সেই বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী তাঁর দর্শন-মতকে রূপ দেয়, তাঁর দার্শনিক মূল্যায়নটুকুকে মর্যাদা দান করে।

পরমবাদী ব্রাডলি থেকে আরম্ভ করে প্রয়োজনবাদী ডিউই পর্যন্ত বিভিন্ন মতবাদী প্রায় সকল দার্শনিকই আমাদের বলেছেন যে অভিজ্ঞতা হল অসংজ্ঞেয়, অনির্বচনীয়। অভিজ্ঞতার মূলে রহস্য বাসা বেঁধে আছে। কখন কখন আকস্মিক ভাবে এই রহস্যের অংশ বিশেষের উদ্ঘাটন হয়, এটি ঘটে আমাদের অব্যবহিত অন্তর্দৃষ্টির ফলে। মহাকাব্যের মতই দর্শনচিন্তায়ও আমরা এই রহস্যের একটি বৃহৎ অংশের উদ্ঘাটন করি। অতীন্দ্রিয়বাদীরা, দুর্জ্ঞেয়বাদীরা সকল অস্তিত্বের মূলে যে অনির্বচনীয় সত্তা অবস্থান করছে তাকে 'একক' আখ্যায় ভূষিত করেছেন। এই একই মহত্বরূপে রূপায়িত হয়েছে। শিল্পীরা এই

রহস্তের যাথার্থ্য উদ্‌ঘাটন করেছেন। রসিক স্রজনই যথার্থ অতীন্দ্রিয়বাদী, তিনি সৃষ্টি রহস্তে সেই এককে দেখেছেন, যে দর্শনটুকুতে আবেগবিহ্বলতা রয়েছে, তার তীব্রতাও অনস্বীকার্য। তাঁর চোখে অভিজ্ঞতা সেই মুহূর্তের জন্ত সহস্র শিখায় দেদীপ্যমান, শিল্পী যে বিশ্বজগতের সঙ্গে একাত্ম হয়ে পড়েন, সেই জগতে একচ্ছত্র-শৃঙ্খলার রাজত্ব। সে জগৎ নিত্য নব-প্রাণনায় অনুপ্রাণিত। প্লোটাইনাসের ভাষায় বলি, শিল্পী স্নন্দরের অনুধ্যানে সেই একের সঙ্গে, সেই অনন্ত মহাসত্তার সঙ্গে একাত্ম হয়ে ওঠেন। আর দর্শনের ভাষাতেই হোক অথবা শিল্পের ভাষাতেই হোক মর্ত্যবাসী মানুষ প্রত্যক্ষ করে সেই অনন্তের রূপ, অন্তের অন্তরে সঞ্চারিত করে সেই অনুভূতির সত্যটুকু।

প্রথম স্তবক

মূল্যবোধ ও শিল্পবোধ

শিল্পের মর্মকথা

শিল্পে বাস্তবতা

শিল্পে সার্বিকতা

শিল্পে অধিকার ভেদ

শিল্পীর বৈরাগ্য

শিল্পে প্রয়োজনবাদ

শিল্প ও আনন্দ

শিল্প ও কল্পনা

প্রথম স্তবক

মূল্যবোধ ও শিল্পবোধ

নন্দনতত্ত্বের প্রথম প্রশ্নটি হল শিল্পমূল্যায়নের ও শিল্পবোধের প্রশ্ন। মানুষের আত্যন্তিক জীবন জিজ্ঞাসার সঙ্গে তাঁর শিল্পজিজ্ঞাসাও ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। এই শিল্পজিজ্ঞাসা মানুষের মূল্যবোধকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। মূল্যবোধ হল অনুশীলনের ফল। এই অনুশীলন-প্রবৃত্তিই মানুষের কৃষ্টিকে ধারণ এবং বহন করেছে। মানুষের সভ্যতার পরিশীলিত রূপ হল এই কৃষ্টি। সভ্যতা অর্থে সাধনা; জাতি যখন সামগ্রিক ভাবে সাধনায় সিদ্ধ হয় তখন তাকে সভ্য জাতি আখ্যা দেওয়া হয়। সুসভ্য জাতি অর্থে আমরা সামগ্রিক সাধনায় সিদ্ধ একটি জাতির মানসচিত্রকে অবলোকন করি। এই সভ্যতারও কেন্দ্রবিন্দু হল সেই মানদণ্ড বা মাপকাঠিটি, যা দিয়ে মানুষের কৃতিকে যাচাই করা যায়। তা হলে এমন কথা বোধহয় বলা চলে যে মানুষের মূল্যবোধই হল তার শিল্প, তার সভ্যতা, তার কৃষ্টির নিয়ামক। উপমার ভাষায় বলা চলে যে মানুষের এই মূল্যবোধটুকু যেন নদীর বুকে জেগে থাকা একটি ছোট্ট দ্বীপ; জীবনের চলমানতা, তার গতিময়তা একে স্পর্শ করে, আঘাত করে; তার আংশিক পরিবর্তনও করে। কিন্তু তার পূর্ণ বিলোপ সাধারণতঃ ঘটায় না। জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী হিন্দুরা বলেন যে, এটি আবার বংশ পরম্পরাক্রমে সঞ্চারিত করে দেওয়া যায় উত্তরপুরুষদের মধ্যে। এই মূল্যবোধই হল মানুষের 'কালচার' বা 'সংস্কৃতি'। বড় ঘরের ছেলে, কৃষ্টিসম্পন্ন পিতার পুত্র, এরা সহজাত প্রকৃতি বশেই 'কালচার্ড' হন; অর্থাৎ এঁদের মূল্যবোধটুকু সহজাত। এঁরা সহজেই সংস্কৃতির তিলকধারী বলে সমাজে পরিচিত হন। এই ধরনের প্রচলিত বিশ্বাসের মর্মকথাটি হল এই যে এঁদের মূল্যবোধটুকু মহাবীর কর্ণের কবচকুণ্ডলের মতোই সহজ ও স্বাভাবিক; জীবনের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় এঁরা সহজেই উত্তীর্ণ হয়ে যান এই সহজাত মূল্যবোধটুকুর দাক্ষিণ্যে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রাক্কালে মহাবীর কর্ণের সঙ্গে পাণ্ডবমাতা কুন্তীর সাক্ষাৎকারের সে ইতিকথাটি আমরা বিস্ময়ের সঙ্গে পাঠ করি, তার মধ্যে পাই মানবতাবাদী কর্ণের কৃষ্টিসিদ্ধ মননের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। মানুষের যে মূল্যবোধ একদিন মৈত্রেয়ীকে বলতে উদ্বুদ্ধ করেছিল, "যেনাহং নামৃতাস্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাম্"? তারই অনুরণন শুনি মহামতি কর্ণের উক্তিতে—

'মাতঃ, যে পক্ষের পরাজয়,
সে পক্ষ ত্যজিতে মোরে করো না আহ্বান।'

মৈত্রেয়ীর যে মূল্যবোধ জাগতিক সকল ঐশ্বর্যকে তুচ্ছ ক'রে অপ্রমত্ত মনে মৃত্যুঞ্জয়ী জীবনসাধনায় তাকে ব্রতী করে, সেই মূল্যবোধই মহামতি কর্ণকে রাজ্যলোভ জয় করতে প্রেরণা দিয়েছে। এ তো আমরা প্রান্তিক উদাহরণের উল্লেখ করলাম। এগুলিকে কেন্দ্র করে আমরা মানুষের নিত্যদিনের কর্মে যে মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠা দেখি তার বিশ্লেষণ ও চরিত্র নিরূপণ কর্মে ব্রতী হতে পারি। এই মূল্যবোধই আমাদের চেনাশোনা জগতটার সব রূপ, সব রস, সব গন্ধ, সব সংগীত ও সকল ঐশ্বর্যের আধার। বাতাসে গাছের পাতা কাঁপে, নদীর জলে ঢেউ ওঠে, আকাশে মেঘ ভেসে যায়, এ সবই হল প্রাকৃতিক ঘটনা। সেই প্রকৃতিতে সুন্দরকে প্রতিষ্ঠা করা, তাকে আবিষ্কার করা এ হল মানুষের মূল্যবোধের কৃতি। আমি যখন গোলাপের দিকে চোখ মেলে তাকিয়ে সুন্দর বললেম তখন এই সুন্দর-বলার পিছনে আমার পরিশীলিত মূল্যবোধটি গোপনে গোপনে কাজ করেছে। পুরুষের মূল্যবোধই নারীকে সুন্দরী করেছে; আবার নারীর মূল্যবোধই পুরুষকে 'শালপ্রাংশুমহাভুজ' করেছে। আমাদের মূল্যবোধই কাল্পনিক রামায়ণের ইতিবৃত্তকে সত্যের মর্যাদা দিয়ে মহত্তম সত্যের জয়তিলক তার কপালে এঁকে দিয়েছে। তাইতো দেবর্ষি নারদ মহাকবি বাল্মীকিকে বলতে পারেন—'সেই সত্য যা রচিবে তুমি'। মানুষের মূল্যবোধের মধ্যেই আমাদের জাগতিক সত্যাসত্যের ধারণা অনুস্যূত। এখানে এ কথাটি স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে কোনো একটি মূল্যের আলোকে কাল্পনিক কাহিনী যখন ভাস্বর হয়ে ওঠে তখন তাও মহাসত্যের মর্যাদা দাবি করতে পারে। অর্থাৎ সত্য শুধুমাত্র ব্যক্তিনিরপেক্ষ বস্তুনির্ভর ঘটনা, Existence মাত্র নয়; সত্যের চারিত্র্য-ধর্মও নিরূপিত হয় মানুষের মূল্যবোধের আশ্রয়ে।

প্রধানতঃ মূল্য হল ত্রিবিধ, সত্য, শিব এবং সুন্দর—এই ত্রিমূর্তিই হল মানুষের মূল্যবোধের প্রতীক। সাধারণভাবে আমরা বিশ্বাস করি যে যা আছে তার যথাযথ বর্ণনা দেওয়াই হল সত্যকথা বলার নামান্তর। সত্যবাদী যিনি তিনি ক্যামেরার চোখের মতো হুবহু ছবিটি ধরে দেবেন, হরবোলার হুবহু নকল করবেন। যিনি তা না করবেন তিনিই অনৃতভাষণের অপরাধে অপরাধী। ক্লাসিক উদাহরণ, সর্বজ্যেষ্ঠ পাণ্ডব যুধিষ্ঠির। তিনি 'অশ্বত্থামা হত ইতি গজ' এই উক্তি করে নিত্যকালের অনৃতভাষণের অপরাধে অপরাধী হয়ে রইলেন।

সত্যবাদী যুধিষ্ঠিরের সমগ্র জীবনব্যাপী সত্যসাধনা একটি ছোট্ট বিপর্যয়ের মুখে পর্যুদস্ত হয়ে গেল। আমাদের চোখে পাণ্ডব-প্রধানের সেই গগনচুম্বী, মহিমময় রূপটি খর্ব হয়ে গেল কেন-না, আমাদের সত্যাশ্রয়ী যে মূল্যবোধ তার সঙ্গে সংঘাত বাধল যুধিষ্ঠিরের ঐ 'অশ্বত্থামা হত ইতি গজ' উক্তিটির ; আবার এমনই মজার কথা যে এই সত্য মূল্যবোধের প্রয়োগের মধ্যে ফাঁক থেকে গেলেও সাহিত্য-কৃতির জগতে আমরা তাকে দোষের মনে করি নি। যেমন ধরা যাক মহাকবি সেক্ষপীয়রের 'ম্যাকবেথ' নাটকটির কথা ; Witches বা প্রেতিনীদের 'ডানসিনান্স ফরেস্টের' সচল হয়ে বেড়ানোর সম্বন্ধে যে ভবিষ্যৎ বাণীটি ম্যাকবেথের রক্ষাকবচ হিসাবে গণ্য হয়েছিল এবং পাঠক তার অসম্ভাব্যতার সম্বন্ধে যখন কোন সন্দেহই পোষণ করে নি তখন চলমান 'ডানসিনান্স ফরেস্টকে' প্রত্যক্ষ করে পাঠক অবিশ্বাস তো করেই নি, বরং ম্যাকবেথের জীবনে আসন্ন বিপৎপাতের আশঙ্কায় শঙ্কিত ও স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। এখানে পাঠক সত্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়েও অসত্যকে সত্যরূপে প্রত্যক্ষ করে যে শঙ্কা ও সংশয় ভোগ করে তা মূলতঃ নন্দনতাত্ত্বিক। অবশ্য মূল্যবোধের সমগ্র ইতিকথাটিই নন্দনতত্ত্ব-আশ্রয়ী।

অসত্যকে সত্যরূপে গণ্য করে পাঠক বা দর্শক যখন সুখ, দুঃখ, আনন্দ, বেদনা, সংশয়, বিস্ময় প্রমুখ অনুভূতির ঘূর্ণাবর্তে আত্মহারা হয়ে পড়ে, তখন তার মধ্যে কোনো ফাঁক থাকে না। জীবনের তথাকথিত অসত্যকে শিল্প-সত্য রূপে গ্রহণ করার মধ্যে যে যুক্তি আছে, তা হল নন্দনতত্ত্বগত। এই তত্ত্বের স্বপক্ষে ওকালতি করেছেন মহাকবি রবীন্দ্রনাথ এবং ইংরেজ কবি কীটস্। রবীন্দ্রনাথ সত্যকে বললেন 'রূপের ট্রুথ'। দার্শনিক একে বললেন Coherence। এই 'রূপের ট্রুথ' হ'ল coherence এবং তার সূতিকাগার হল রবীন্দ্রনাথের মতে আমাদের মনের 'সুমিতিবোধ'। শিল্পের ট্রুথকে রূপের ট্রুথ বলে যে মূল্যধারণাকে নির্দিষ্ট করার প্রয়াস আমরা পেয়েছিলাম তা কিন্তু অত সহজে সার্থক হবার নয়। এই রূপের ট্রুথ বা সুমিতিবোধ কথাটির কোন নির্দিষ্ট অর্থ নেই। অবশ্য আধুনিক পণ্ডিতেরা বলবেন কোনো কথারই সুনির্দিষ্ট অর্থ নেই এবং অর্থ হল সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তিনির্ভর। এই তত্ত্বটির সত্যকে স্বীকার করলে আমাদের মূল্যবোধের ভিত্তি-ভূমিটি সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয়ে পড়ে। জ্ঞাতা-নির্ভর বা Subjective যে রসবোধ তা হল আমাদের সব রকম মূল্যায়নের মাপকাঠি।

তা হলে এ প্রশ্ন এখানে উঠবে যে রসবোধই যদি আমাদের সব রকমের মূল্যবোধের মাপকাঠি হয় তা হলে রসিক কে? কেন-না, যিনি রসিক হবেন তিনি এই ধরনের মূল্যায়নের যথার্থ অধিকারী। রসিকের স্বরূপ নির্ধারণ করা অত্যন্ত দুরূহ কর্ম। ভোজদেব তাঁর 'শৃঙ্গারপ্রকাশ' গ্রন্থে বলেছেন যে জীবন-শিল্পীরাই হল সত্যিকারের শিল্পরসিক। অর্থাৎ জীবনের মূল্যমানের সঙ্গে শিল্পের মূল্যমানের কোনো মৌল পার্থক্য নেই। অবশ্য ভোজদেবের এই মতটি ভারতীয় নন্দনতত্ত্বে কারো কারো দ্বারা শ্রদ্ধার সঙ্গে গৃহীত হলেও পশ্চিম দেশীয় নন্দনতত্ত্বে তার প্রয়োগ সার্থকতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে। আমাদের প্রাচীন রসশাস্ত্রে কথিত 'চতুঃষষ্ঠিকলা' অথবা জৈনাগমে বর্ণিত দ্বিসপ্ততি কলার অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ না হলে ভোজদেবের জীবনশিল্প ও চারুশিল্পের স্বাঙ্গীকরণ গ্রহণ করা বুদ্ধিমান পাঠকের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়বে। জীবন এবং শিল্পের বিস্তার কল্পনায় যদি একই হয় তবেই ভোজদেবের অনুমান সিদ্ধরূপে গৃহীত হবে।

পূর্বেই বলেছি আমাদের মূল্যবোধ হল ত্রিমূর্তি। সত্য হল তার অতি প্রকটরূপ অর্থাৎ সত্যমূল্যে মানুষের অধিকাংশ অভিজ্ঞতারই মর্যাদা নির্ণীত হয়। মহাকবি রবীন্দ্রনাথ এই সত্যমূল্যেই ধরিত্রীর কাছ থেকে মাটির একটি তিলক ললাটে পরতে চেয়েছিলেন। মনীষী রঁমা রঁলা এই সত্যমূল্যেই শিল্পের যাচাই করতে চেয়েছিলেন। তাঁর মতে শিল্প বা Art যদি মিথ্যার বেসাতি করে তা হলে সে শিল্পে তাঁর কোনো প্রয়োজন নেই। অথচ একথা স্বীকার না করে উপায় নেই যে শিল্প সত্যের মতই আমাদের সংবেদন এবং প্রতিক্রিয়াগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করে। বুদ্ধি দিয়ে যাকে অসত্য বলে জানি তাকেই শিল্পসত্য বলে গ্রহণ করি এবং তাকে জীবনসত্যের সব মর্যাদাই দিই; স্থান-বিশেষে সেই মর্যাদাটুকু জীবনসত্যের মতোই আমাদের সংবেদন এবং প্রতিক্রিয়াগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করে। বুদ্ধি দিয়ে যাকে অসত্য বলে জানি তাকেই শিল্পসত্য বলে গ্রহণ করি এবং তাকে জীবন সত্যের সব মর্যাদাই দিই; স্থলবিশেষে সেই মর্যাদাটুকু জীবনসত্যের প্রাপ্য মর্যাদাকেও অতিক্রম করে যায়। শিল্পসত্য যখন জীবনসত্যের আসনে প্রতিষ্ঠিত তখন একটি অদ্ভুত সমস্যার সৃষ্টি হয় এবং পাঠক ও দর্শক এই সমস্যা সম্পর্কে একেবারেই অবহিত হন না। উদাহরণ দিলে হয়তো আমাদের বক্তব্যটা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। মনে করা যাক আমরা সেক্সপীয়রের 'ওথেলো' নাটকের অভিনয় দেখছি। শুভ্রবসনা অপূর্ব

রূপলাবণ্যময়ী ডেসডিমনা দুগ্ধফেননিভ কোমল শয্যা-আশ্রয়ী, ঘুমে অচেতনা ; মহাবীর ওথেলো সন্তর্পণে ডেসডিমনার শয়নকক্ষে প্রবেশ করছেন ; মুর সেনাপতির সমগ্র মুখমণ্ডলে আহত প্রেমের, আহত দর্পের ছায়া পড়েছে ; ক্রুর প্রতিহিংসাবৃত্তি সেনাপতির দুই চোখে জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছে। তিনি যখন সন্তর্পণে 'Put out the light and then Put out the light' আবৃত্তি করতে করতে অতি নাটকীয় ভঙ্গীতে ডেসডিমনার দিকে এগিয়ে যান তখন সমগ্র দর্শকসমাজ রুদ্ধ নিশ্বাসে সেই চরম নাটকীয় মুহূর্তটির জন্য অপেক্ষা করে। মহিলা দর্শকেরা অনেকেই হয়তো সংজ্ঞা হারায়। পুরুষ দর্শকদের মধ্যে অনেকেই হয়তো পকেট থেকে রুমাল বের করে চোখ মোছে। অথচ মজার কথা এই যে দর্শকেরা সবাই জানে যে এটি হল অভিনয়। নাট্যসত্যে জীবনসত্যের প্রলেপটুকুও নেই এবং এটি যে মিথ্যা, দর্শকগণ সে সম্বন্ধে সকলেই সচেতন। তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ হল এই যে দর্শকেরা কেউই চোখের সামনে নরহত্যা সংঘটিত হতে দেখেও তা নিবারণের কোন রকম চেষ্টা করে না। অভিনীত নাটক সম্বন্ধে দর্শকরা যে তার এক ধরনের মিথ্যাত্ব সম্বন্ধে সচেতন থাকে এটি তার প্রমাণ। অবশ্য এইটুকু বললেই নাট্যবস্তুর সত্যাসত্য সম্বন্ধে শেষ বিচার হল না। কেন-না যাকে মিথ্যা বলে বুদ্ধি দিয়ে জানি এবং প্রান্তিক বিশ্লেষণে বুদ্ধি সহজেই যার অসত্যটুকুকে ধরে ফেলে, তাকে কিন্তু দর্শকমনের সর্ববিধ সংবেদন ও প্রতিক্রিয়ার ব্যাপারে দর্শকেরা সত্য বলে গ্রহণ করে। ডেসডিমনার হত্যার দৃশ্যে যে বীভৎস এবং ভয়ানক রসের অবতারণা করা হয় তার প্রতিক্রিয়া দর্শকদের মধ্যে অতিমাত্রায় প্রকট। কেউ-বা কাঁদে, কেউ-বা মুহ্যমান হয়ে পড়ে আবার কেউ-বা সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলে। নাট্যের বিষয়বস্তুকে মিথ্যা জেনেও এই ধরনের প্রতিক্রিয়া দর্শকদের মনে কেমন করে সম্ভব হয়, এটাই হল বড় প্রশ্ন ; এবং এই প্রশ্নটি আমাদের আত্যন্তিক শিল্পমূল্যবোধের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। নাট্যের বিষয়বস্তুর সঙ্গে, নাট্যে উপস্থাপিত চরিত্রের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাওয়ার-তত্ত্ব কিন্তু উপরোক্ত সমস্যা সমাধান করতে অপারগ। কেন না, দর্শক যদি নাট্যে উপস্থাপিত নিগৃহীত চরিত্রের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করে তা হলে তার প্রধান কর্তব্য হবে আত্মরক্ষার চেষ্টা। একাত্ম না হয়ে দর্শক যদি 'সহমর্মী' হয় তা হলেও ঐ নিগৃহীত চরিত্রকে রক্ষা করার দায়িত্ব তার উপর বর্তায়। এক্ষেত্রে ডেসডিমনাকে ওথেলোর হাতে থেকে

বাঁচাবার দায়িত্ব তার। দর্শক কিন্তু সে দায়িত্ব গ্রহণ করে না। তার নাট্যবোধের পক্ষে এ দায়িত্বটুকু অপ্রাসঙ্গিক। সহৃদয় হৃদয় সংবাদী পাঠক বা দর্শক জানে যে তার সামাজিক দায়িত্বের সঙ্গে শিল্পরসিক হিসাবে তার দায়িত্বের অনেক প্রভেদ আছে। নাট্যরসিক নাট্যের বিষয়বস্তুর সঙ্গে বা চরিত্রের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাওয়ার তত্ত্ব 'এহ বাহ্য'। একাত্ম হয়ে যাওয়া মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে রসবোধের পরিপন্থী বলেই গণ্য হয়। সহমর্মিতাবোধ সেই একাত্মতার পথে একটি বিরাট পদক্ষেপ। সুতরাং সহমর্মিতাবোধও রসোপলব্ধির পথে বাধাস্বরূপ। কেননা, মনস্তাত্ত্বিক দূরত্ব রসোপলব্ধির প্রধান সহায়ক। শিল্পরসিক যদি শিল্পের উপজীব্যের সঙ্গে একাত্ম অনুভব করে তা হলে নাট্যের কুশীলবদের মতই জাগতিক দুঃখভোগ বা জাগতিক আনন্দভোগ করবে। শিল্পানন্দ, যাকে 'ব্রহ্মাস্বাদ সহোদর' বলা হয়েছে তা কিন্তু জাগতিক অভিজ্ঞতা-জাত আনন্দ থেকে একটু ভিন্ন ধরনের ; উদাহরণ দিই—নাট্যে বা কাব্যে উপস্থাপিত আনন্দঘন পরিবেশটুকু দর্শনে আমাদের মনে যে আনন্দ সঞ্জাত হয় তা হল সাক্ষী হওয়ার আনন্দ। উপনিষদ কথিত সেই দুটি পক্ষীর কথা বলা যেতে পারে, যে পক্ষীটি ভোক্তা, তার মধুফল ভক্ষণজনিত যে আনন্দ, সেই আনন্দের সঙ্গে দ্রষ্টা পক্ষীটির দর্শনজনিত আনন্দের একটু প্রভেদ আছে। দ্রষ্টা পক্ষীর আনন্দের অনুরূপ আনন্দ থেকেই শিল্প জন্ম নেয়। ভোক্তা পক্ষীর আনন্দটুকু প্রয়োজনের সঙ্গে সম্পৃক্ত। ভোক্তা পক্ষীর ক্ষেত্রে ভোজ্য বস্তুর আস্বাদন থেকে আনন্দের উৎপত্তি হচ্ছে আর দ্রষ্টা পক্ষীর ক্ষেত্রে অপরের আনন্দের আস্বাদন থেকে তার অন্তরে শিল্পানন্দের জন্ম। এই প্রসঙ্গে একথা বিশেষভাবে লক্ষিতব্য যে দ্রষ্টা পক্ষীর ক্ষেত্রে এই দর্শনজনিত আনন্দটুকু ভোক্তা পক্ষীর ভিন্নতর ফলাস্বাদনজনিত বেদনাদায়ক অনুভূতি থেকেও জন্ম নিতে পারে। আর এই সম্ভাবনা রয়েছে বলেই আমাদের জাগতিক জীবনের দুঃখও শিল্পের উপজীব্য হতে পারে। শুধু হতে পারে তাই নয়, বস্তুতঃপক্ষে এমন মতও রয়েছে যে আমাদের জাগতিক চরমতম দুঃখ পরম নন্দনতাত্ত্বিক আনন্দের আকর—
"Our sweetest songs are those that tell of saddest thoughts."
নাট্যরসের ক্ষেত্রে এই সত্যটিকে সহজেই উপলব্ধি করা যায়। মঞ্চে যখন কোনো বিয়োগান্ত নাটকের অভিনয় হয় তখন তা থেকে রসিকজন আনন্দে সুধা পান করে। নাটকীয় পরিস্থিতি যতই দুঃখজনক হোক না কেন তা থেকে আনন্দ পান সহৃদয়হৃদয়সংবাদী দর্শকের দল। এ সত্যটি একটু

Paradoxical; কেমন করে রসিক সুজন এই দুঃখজনক বিয়োগান্ত নাটক থেকে রস আহরণ করে, তা হল শিল্পলোকের দুর্গম রহস্যের কথা। কেমন করে এটি ঘটে তার ব্যাখ্যা করা সহজসাধ্য নয়। তাই বোধ হয় শিল্পকে 'মায়া' বলা হ'ল। প্রকৃতির সামগ্রিক জীবন ইতিহাস থেকে, তার নীরস অনুর্বরতা থেকে রস আহরণের দৃষ্টান্ত হয়তো মেলে। পাথুরে পাহাড়ের বুকে শেকড় চালিয়ে বটগাছকে বাঁচতে দেখেছি। কিন্তু সে যুক্তি তো শিল্পের জগতে প্রযোজ্য হবে না। তা এই কারণে হবে না যে উপমা তর্কবিধি নয়। সুতরাং এই দৃষ্টান্তের পরিপ্রেক্ষিতে বিয়োগান্ত নাট্য পরিস্থিতি থেকে সহৃদয় হৃদয়সংবাদী মানুষের আনন্দলাভের তত্ত্বটুকু অব্যাখ্যাত থেকে যায়। এই দুর্জ্ঞেয়তা রয়েছে বলেই শিল্পতত্ত্ব প্রসঙ্গে আমাদের তন্ত্রশাস্ত্রে বলা হল যে শিল্পী কেমন করে জীবন-সত্য থেকে শিল্প-সত্য সৃষ্টি করেন সে তত্ত্বটুকু রহস্যাবৃত এবং সে রহস্যের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তাঁরা উপমার আশ্রয় নিয়েছেন। উপমাটি হল, জীবন-সত্য এবং শিল্প-সত্য যেন দুটি গাছ। শিল্পী এক গাছ থেকে আর এক গাছে উড়ে বসলেন; কিন্তু কেমন করে কোন্ পথে তিনি উড়ে গেলেন তার নিশানা কোথাও রইল না। বোধহয়, শিল্পের এই দুর্জ্ঞেয়তা শিল্পমূল্যায়নের রহস্যকে বেশী করে ঘনীভূত করেছে। শিল্প-মূল্যবোধ আমাদের একটি মৌল মূল্যবোধ। সে বোধ প্রয়োজনের কথা জেনেও প্রয়োজনকে অস্বীকার করেছে। তবে প্রয়োজনবোধের সঙ্গে শিল্পমূল্যবোধের বিভেদ রেখাটি কোথায় কী ভাবে টানা যায়, তা নিরূপণ করাও দুরূহ কর্ম। কেন-না, রবীন্দ্রনাথের 'মহুয়া' কাব্যগ্রন্থটির কথা বলতে পারি। সেখানে কিন্তু এই প্রয়োজনবোধের সঙ্গে শিল্পবোধের শুভদৃষ্টি ঘটেছে। তাদের মিলনও হয়েছে 'যদিদং হৃদয়ং তব, তদস্তু হৃদয়ং মম' পর্যায়ের। সুন্দরের সঙ্গে এখানে শিল্পের সমীকরণ ঘটে। তাই বলতে পারি যে এই ধরনের ব্যতিক্রমে মানুষের প্রয়োজনবোধ এবং শিল্পবোধ একাত্ম হয়েছে। অবশ্য এই ধরনের নজীর বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে অতিমাত্রায় বিরল।

'মহুয়া' কাব্যগ্রন্থের প্রসঙ্গে মানুষের প্রয়োজনবোধের সঙ্গে শিল্পের কী সম্পর্ক তা নিয়ে আলোচনার অবকাশ আছে। মানুষের এই প্রয়োজনবোধকেই কেন্দ্র করে মানুষের মূল্যজগতে 'শিবের' প্রতিষ্ঠা। মানুষের মূল্যায়নের যে ত্রিমূর্তির কথা পূর্বেই বলেছি তার মধ্য মূর্তিটি হল শিব এবং এই শিব মানুষের প্রয়োজনকে কেন্দ্র ক'রে তার সামগ্রিক কল্যাণের মূর্তিটিকে গড়ে তুলেছে।

এই শিবই আবার নীতিশাস্ত্রে 'শ্রেয়' এবং 'প্রেয়' রূপে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। নীতিশাস্ত্রে যে শিবকে আমরা আদর্শ বা লক্ষ্য রূপে স্থাপিত করতে চেয়েছি সে শিব হল নীতিশাস্ত্রের মানদণ্ডে নিরূপিত। নীতিশাস্ত্রের নানান মতবাদিতায় তার রূপও বিভিন্ন; কোথাও বা ব্যষ্টিকল্যাণকে আশ্রয় করেছে, আবার কোথাও-বা তা সমষ্টি কল্যাণের মধ্যে অন্তর্গূঢ় আদর্শরূপে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। মানুষের আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষকে অবলম্বন করেই মানুষের সমগ্র সমুন্নত মানবিক মহিমার চিত্রটি আঁকা হয়েছে। এই সামগ্রিক কল্যাণই মানুষের আরাধিতব্য এবং শ্রেয়ের নিশানা। এই মূল্যের মহত্বটুকু শুধুমাত্র নীতিশাস্ত্রের সীমানায় আবদ্ধ নেই, তার বিস্তার ঘটেছে মানুষের সর্ববিধ চিন্তায় ও কর্মে। শ্রীঅরবিন্দ যখন বলেন, তার সাধনায় তিনি ব্যক্তিগত মুক্তি চান নি, সে মুক্তিটুকু তিনি চেয়েছেন সমস্ত মানুষের হয়ে—তখন মানুষের উচ্চতম কল্যাণের পরমতম সামগ্রিক রূপটুকু প্রত্যক্ষ করি। স্বামী বিবেকানন্দ যখন নির্বিকল্প সমাধির অনাবিল আনন্দে নিত্য অবগাহন স্নান করতে চান তখন তাকে ব্যষ্টি-কল্যাণের মহত্তম চিত্র বলেই গ্রাহ্য করা যেতে পারে। সেই ব্যষ্টি-কল্যাণ কিন্তু মহত্তম মর্যাদায় ভূষিত নয় বলেই ঠাকুর রামকৃষ্ণ তাঁকে সে পথ থেকে নিবৃত্ত করেন। তিনি বলেন, দেশের অগণিত নরনারীর কথা ভুলে স্বামীজির নির্বিকল্প সমাধির নিত্য প্রফুল্লতায় ধারাস্নান স্বার্থপরতার নামান্তর। অর্থাৎ ব্যক্তি-মুক্তি সমষ্টির মুক্তির চেয়ে ছোট বলেই ঠাকুর রামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথকে সে পথ থেকে তাঁকে নিবৃত্ত করান; নৈতিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে ব্যষ্টি-কল্যাণ যে সমষ্টি অপেক্ষা ন্যূন, এ তত্ত্বটি সুপ্রতিষ্ঠিত হল আর একবার। তুরীয় অধ্যাত্মলোকে যে তত্ত্ব সত্য নীতিশাস্ত্রের প্রচলিত মূল্য মানে তা সুপ্রতিষ্ঠিত। Altruism ছেড়ে কোন সুস্থ মানুষকেই Egoistic Hedonismএর পক্ষে ওকালতি করতে দেখা যায় নি। কেন না Altruism সমগ্র মানুষের বৃহত্তম কল্যাণকে আশ্রয় করে। এই সামগ্রিক কল্যাণবোধের সঙ্গে প্রসারিত অর্থে বৃহত্তম নীতিবোধটুকুও সম্প্রসারী (co-extensive)। অর্থাৎ আমাদের সমগ্র কল্যাণের ধারণাটুকু বৃহত্তম অর্থে এই নীতিবোধ থেকে আহৃত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ উপনিষদের 'ঋত' ধারণাটিকে উপস্থাপিত করা চলে। যে বিশ্বব্যাপী নীতির ধারণা বিশ্বের সমস্ত সৃষ্টিকে বিধৃত করে রেখেছে তাকে উপনিষদে 'ঋত' বলা হয়েছে। উপনিষদ বিশ্বাস করে যে এই 'ঋতের' অস্তিত্ব ব্যক্তি অনির্ভর ও বিশ্বের অস্তিত্বে অন্তর্লীন। কোথাও কেউ 'ঋতের' শুচিতাকে

বাধিত করলে 'ঋত' প্রত্যাঘাত ক'রে অপরাধীকে আত্মসচেতন করে দেয় ; অর্থাৎ বিশ্বের অলিখিত নৈতিক বিধানকে ভঙ্গ করলে সে বিধান দোষীর শাস্তি ব্যবস্থা করে। এখানে আমাদের বক্তব্য এই যে সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তি-নির্ভর যে মানুষের কল্যাণবোধ তাই-ই কালক্রমে ব্যক্তি-অনির্ভর স্বাধীন, স্বচ্ছ, নৈতিক পরিমণ্ডলরূপে স্বীকৃতি পেয়েছে। মানুষের নৈতিক মূল্যবোধের এই মহত্তম পরিকল্পনা সুন্দরকেও অন্তর্ভুক্ত করে রেখেছে। পরিশীলিত মানবতাবাদের বৃহত্তম ধারণা এই 'ঋত' ধারণার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীরূপে যুক্ত। তারই অঙ্গে সুন্দরের প্রতিষ্ঠা। অতএব নৈতিকমূল্য এবং সৌন্দর্যমূল্য এ দুয়ের মধ্যে বিভেদক রেখাটি টানা কঠিন হয়ে পড়ে। একমাত্র প্রয়োজনকে অবলম্বন করেই এই দুই ধরনের মূল্যবোধকে পৃথক করা চলে। আবার এই প্রয়োজন-বোধের স্বরূপ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে শিল্পের যে প্রয়োজন তার সঙ্গে নৈতিকের প্রয়োজনের একটা খুব মৌল পার্থক্য নেই। নৈতিক হবার জন্তে মানুষের মনে যে প্রেরণা ও মহৎ ক্ষুধার সঞ্চার হয় তা কিন্তু সুন্দরকে সৃষ্টি করার প্রয়াসী হলেও হয়। এককথায় বলা চলে যে শিল্প সৃষ্টি করা বা সৌন্দর্য সৃষ্টি করা, আর নীতিশাস্ত্রোচিত কোন মহৎ কর্ম করা এ দুয়ের মধ্যে কোন গুণগত পার্থক্য নেই। 'অপ্রয়োজনের প্রয়োজন' বা মহাদার্শনিক কাণ্টের 'Purposiveness without a purpose' এই শৈল্পিক প্রয়োজনকে যথাযথ ব্যাখ্যা করে না। যথাযথ সংজ্ঞা না দিয়ে এবং অর্থের বিশ্লেষণ না করেই আমরা আমাদের খুশিমত যে সব শব্দ সৌন্দর্য-দর্শনে ব্যবহার করেছি তা কিন্তু সমস্যার স্বচ্ছতা না এনে ক্রমেই তাকে জটিল এবং দুর্বোধ্য করে তুলেছে। যদি বলি মানুষের প্রেমের কল্পনায় প্রয়োজনটা 'এহ বাহ্য' তা হলে তো একেবারেই অনৃতভাষণ করা হবে। কেন-না সেক্ষেত্রে মানুষের প্রয়োজনটাই তার মূল্যমান এবং অন্তিম আদর্শকে নিরূপণ করে। আবার যদি বলি সুন্দরের ক্ষেত্রে, শিল্পের ক্ষেত্রে প্রয়োজনটা অপ্রাসঙ্গিক তা হলেও বোধ হয় ঠিক বলা হবে না। যেখানে প্রয়োজন নেই সেখানে অভাবও নেই ; যেখানে অভাব নেই সেখানে কর্মচাঞ্চল্যও নেই। শিল্প যে নিরন্তর সাধনা সেই সাধনাও তো কর্মসাধনার নামান্তর। সেই কর্মসাধনা মানুষের সমগ্র ব্যক্তিত্বকে আশ্রয় করে। অতএব শিল্প হল মানুষের সামগ্রিক ব্যক্তিত্বের প্রতিক্রিয়া। সুতরাং যা শিল্প পদবাচ্য তার মধ্যে নীতিও অনুস্যূত। শিল্পকে তাই নৈতিক হতে হবে। এ কথা আমার কথা নয়। এ কথা সেদিন বললেন মহামতি ক্রোচে

তাঁর সর্বশেষ গ্রন্থ 'My Philosophy'তে। মানুষের শৈল্পিক মূল্যবোধ অর্থাৎ সুন্দর সম্বন্ধে মানুষের যে ধারণা তার সঙ্গে তার শুভ ধারণার কোনো আত্যন্তিক বিরোধ নেই। রবীন্দ্রনাথ যাকে সুমিতিবোধ বললেন তাকে কিন্তু সৌন্দর্যবোধ বা কল্যাণবোধ এ দুয়ের মধ্যে উপস্থিত থাকতে হবে। 'শিব ও সুন্দর' ও দুয়ের পার্থক্য হল পরিবেশগত; অথবা বলা চলে যে মূল্যের নির্ণায়ক মানুষের মনই স্থান এবং কাল বিশেষে এই মূল্যের মূর্তি ও প্রকৃতি নির্ণয় করে। একজন যাকে সুন্দর বলে, শিল্পোৎকর্ষ দেখে মুগ্ধ হয়, অন্য জনের কাছে আবার তার এই সৌন্দর্যরূপ আবৃত হয়ে গিয়ে তার কল্যাণ-রূপটুকুই প্রতিভাত হয়। উদাহরণ দিই 'মালভিদা ফন্ মাইজেনবর্গ" সেক্সপীয়রের 'ওথেলো' নাটকের অভিনয় দেখে তার নাট্যোৎকর্ষের দ্বারা আকৃষ্ট না হয়ে তার কল্যাণ করার শক্তি দেখে অভিভূত হয়েছিলেন। তিনি এক পত্রে রঁমা রঁলাঁকে লিখলেন যে 'ওথেলো' নাটকের অভিনয় তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের সমস্যার সমাধান করে দিয়েছে। অতএব নাটকটি ভালো। এই ধরনের মূল্যায়ন তো হয়ে থাকে এবং এর সত্যতাকেও অস্বীকার করার কোন যৌক্তিকতা নেই। সার্ভেনতিসের লেখা 'Don Quixote De La Mancha' গ্রন্থটির কথা বলছি। Knight Errant এর বীরত্ব, যখন নিপীড়িত ও অসহায় মানুষকে রক্ষা করে তখন তার ঐশ্বর্য সীমাহীন হয়ে পড়ে। Europe-এ এই ধরনের বীরেরা উৎসর্গীকৃত প্রাণ; অবলা নারী, নিরীহ অসহায় মানুষের সহায়তা করাই তাদের ধর্ম। সে ধর্ম মানুষের শুভ বুদ্ধির কাছে চরম মর্যাদা পায়। সার্ভেনতিস যখন সেই নীতিকথার খেলনাগুলো পর পর সাজিয়ে অনবদ্য রূপ সৃষ্টি করেন তাঁর গ্রন্থটিতে তখন দেখি শিব ও সুন্দর একই মন্দিরে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। মানুষের কল্যাণবোধ এবং মানুষের শিল্পবোধের একীকরণ ঘটেছে। উপমা দিয়ে বলতে পারি, মানুষের কল্যাণরূপ তরণী সৌন্দর্যের পাল তুলে দিয়ে অসীমের দিকে যাত্রা করেছে Don Quixoteএর এই অলীক বীরত্ব কাহিনীতে।

মানুষের মনকে যদি 'Unity' বলা হয় তা হলে সে মনের যে প্রতিক্রিয়া তার মধ্যে সমগ্র মানসিকতার ছাপ পড়ে। মূল্যায়ন তা শুভ সম্পর্কিতই হোক বা সত্য সম্পর্কিতই হোক তা সামগ্রিকভাবে এই মানসিকতার লক্ষণাক্রান্ত। যে কাজকে কল্যাণকর বলি তার মধ্যে একধরনের পরিমিতি বোধ থাকে। এই পরিমিতি বোধের রূপটা কিন্তু পরিবেশ-ভেদে পাল্টায়। সেখানে প্রয়োজনটা

যে রূপে দেখা দেয় সেই ভাবেই ঐ বিশেষ পরিপ্রেক্ষিতে শুভের বা কল্যাণের রূপটুকু ধার্য হয়। একথা অনস্বীকার্য যে শুভ বা কল্যাণটুকু হল প্রয়োজনের আনুপাতিক। এই প্রয়োজনটা আবার ব্যক্তিকেন্দ্রিক। ব্যক্তিনির্ভর এই প্রয়োজনটুকু যদি শুভের বা কল্যাণের নিয়ামক হয় তা হলে Collingwood-এর ভাষায় একে Subjective বলা যেতে পারে। Collingwood এই Subjectivity বা ব্যক্তিনির্ভরতাকে এনেছেন মানুষের শিল্পমূল্যায়নের প্রসঙ্গে। তাঁর মতে এই Subjectivity বা জ্ঞাতা নির্ভরতা হল শিল্পের বা সুন্দরের স্বরূপ লক্ষণ। এই জ্ঞাতা-নির্ভরতা ছাড়া শিল্পমূল্যায়নের অন্য কোন মাপকাঠি নেই। শিল্প সম্বন্ধে যেটা সত্য, শুভ বা কল্যাণ সম্বন্ধে তা সমভাবেই প্রযোজ্য। প্রয়োজনের ধারণাটিকে আমাদের 'শুভ' এবং 'সৌন্দর্যের' বিভেদক (Differentia) হিসেবে ব্যবহার করা সমীচীন নয়। কেন না শিল্পীর মনেও শিল্পসৃষ্টির জন্য একটা অভাববোধ আছে, একটা 'মহৎ ক্ষুধার' আবেশ তাকে পীড়ন করে। তা হলে এতদুভয়ের মধ্যে যখনই কোনো শ্রেণীকরণের সীমারেখা টানা হবে তখন আমরা যে ভুল করব, তর্কশাস্ত্রের ভাষায় যে অবভাস ঘটবে তা হল, সঙ্কর বিভজনজনিত অবভাস (Fallacy of Cross division)।

জ্ঞাতা-নির্ভরতা বা Subjectivity যদি আমাদের সৌন্দর্যবোধের এবং কল্যাণবোধের নিয়ামক হয় অর্থাৎ সৌন্দর্য এবং শুভের পরিমাপকল্পে আমরা যদি জ্ঞাতা-নির্ভর মানদণ্ডের প্রয়োগ করি তা হলে উভয়ের মধ্যে যে গুণগত কোনো ভেদ থাকে না সে কথা বলাই বাহুল্য। এখন বিচার করে দেখা যাক যে সত্যমূল্যের মূল্যায়নে এই জ্ঞাতা-নির্ভরতা কতখানি সার্থক? আমরা বস্তুজগতে যা কিছু প্রত্যক্ষ করি তার যথাযথ বিবরণ দেওয়াকেই 'সত্য' বলে গ্রহণ করি অর্থাৎ অস্তিত্বের সঠিক বর্ণনই হল সত্য। সত্য বস্তুতে নেই, সত্য আছে আমাদের অবধারণে (judgement) ও আমাদের মননে। সুতরাং যাঁরা সত্যকে বস্তুগত বলে ভাবেন তাঁদের ধারণা ভ্রান্ত। প্রচলিত ধারণা এই যে, সত্যকে বস্তুগত করে তুলতে পারলে তবেই তা সর্বজনগ্রাহ্য হয়। সামান্য বিশ্লেষণেই এই ধরনের বিচারে ভ্রান্তি চোখে পড়ে। 'আমার সামনে একটি টেবিল আছে'—এই উক্তিটি সঠিক ভাবে বর্ণনামূলক হলেই উক্তিটিকে সত্য বলা হবে। এখানে প্রশ্ন উঠবে আমার সামনে যে টেবিলটি আমি দেখছি তা কী পুরোপুরি প্রত্যক্ষজাত না কল্পনার সাহায্যে আমি টেবিলটিকে মনে মনে তৈরী করে নিচ্ছি? এই তৈরী করে নেওয়া বা con-

struction কার্য আমাদের মনের ধর্ম ; মনে যখনই দেখে তখনই সে তৈরী করে। আমার সামনের টেবিলটাও সে তৈরী করেছে। আমি চোখ মেলে একটা বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে টেবিলের খানিকটা দেখি বাকিটা মনে মনে তৈরী করে নিয়ে টেবিলটিকে একটি পূর্ণাঙ্গ টেবিলের মূল্য দিই। তা হলে এ কথা বলতে পারি যে তার অস্তিত্বের সত্যতাটুকু (Reality) আমারই সৃষ্টি। সুতরাং জ্ঞানতত্ত্বে correspondenceবাদীদের মত গ্রহণ করলেও তার মধ্যে জ্ঞাতানির্ভরতা অনেকখানি স্থান জুড়ে থাকবে। যদি আমি টেবিলটিকে মনে মনে তৈরী ক'রে থাকি তা হলে সত্য বা Reality নিরূপণের ক্ষেত্রে জ্ঞাতানির্ভরতা বা Subjectivityকে বাদ দেবার উপায় নেই। Correspondence বাদীরা যে জ্ঞাতা-অনির্ভর বস্তুগত সত্যের কথা বলেন তা অলীক কল্পনামাত্র। Reality সৃষ্টির ব্যাপারে Subjectivity বা জ্ঞাতা-নির্ভরতার ভূমিকা অনস্বীকার্য। Correspondenceবাদীদেরও এই Subjectivityকে স্বীকার করতে হবে। কেন-না, দৃশ্যমান জগতের মধ্যে, আমাদের চারপাশের পরিবেশের মধ্যে এই জ্ঞাতার অবদান সবার অলক্ষ্যে রয়ে গেছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে সুন্দরের বেলায়, কল্যাণের বেলায় যে জ্ঞাতানির্ভরতা বা Subjectivity সুন্দর এবং কল্যাণের পূর্ণ রূপটুকু সংযোজনের সহায়তা করেছিল তা আবার Reality'র সত্যের বেলাতেও সমান ভাবে কর্মতৎপর।

এই আলোচনার আলোকের পরিপ্রেক্ষিতে বলা চলে যে Plato-র Republic, Ion ও Phaedrus গ্রন্থে কথিত অনুকৃতি তত্ত্ব সঠিকভাবে কাব্য বা শিল্পের চারিত্র্য নির্ধারণ করে নি। অবশ্য আমরা জানি যে গ্রীক দার্শনিক জ্ঞাতা-অনির্ভরতাকে (objectivity) সর্বোচ্চ মর্যাদা দিয়েছিলেন তাঁর দর্শনে। তাঁর দৃষ্টিকোণ থেকে হয়তো তত্ত্বগতভাবে তাঁর মত সমর্থনযোগ্য। কিন্তু আমাদের বিশ্লেষণে আমরা এই জ্ঞাতা-নির্ভরতাকেই সবচেয়ে বেশী মর্যাদা দিয়েছি। ফলে, Epistemologyএর correspondence তত্ত্ব অথবা নন্দনতত্ত্বের অনুকৃতিবাদ আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য হতে পারে। কেন-না যাকে অনুকরণ করছি তাও ত আমারই সৃষ্টি :

> 'আপন মনের মাধুরী মিশায়ে তোমারে করেছি রচনা
> তুমি আমারই গো তুমি আমারই···।

এ কথা শুধু কবির প্রেয়সী-কল্পনার বেলাতেই সত্য নয়, এ কথা সত্য হয়ে উঠেছে আমাদের সর্ববিধ মূল্যায়নের ব্যাপারে। প্রকৃতি বা দৃশ্যমান জগতের

রূপ বা রস যদি স্রষ্টার অবদান হয় তাহলে জ্ঞাতানির্ভরতা হ'ল একদিকে যেমন বস্তুজগৎ সৃষ্টির মন্ত্রগুপ্তি তেমনি আবার তা নিয়ন্ত্রণেরও নিয়ামক ; এক কথায় সত্য, শিব, সুন্দর, এই ত্রিবিধ মূল্যের সূতিকাগৃহ।

এই মূল্যায়ন প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলা দরকার। সেটি হ'ল শিল্পের সঙ্গে সুন্দরের যোগটুকুর কথা। শিল্প যখন শিল্প হয়ে ওঠে তা কী সব সময়েই সুন্দরের পরিপূরক হয়? অর্থাৎ প্রকৃতির মধ্যে যাকে সুন্দর দেখি তা-ই কী কেবল শিল্পের উপজীব্য? যাকে আমরা কুৎসিত বলি তার স্থান কী শিল্পে নেই? প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বা Empirical Evidence বলে যে কুৎসিত ও শিল্পের খাসদরবারে দরবারী। নোতর্‌দামের সেই কুঁজো লোকটা, রামায়ণের কুঁজি মন্থরা—এরাও শিল্পলোকে ভাস্বর চরিত্র। প্রাকৃত জীবনে এদের তো সুন্দর বলি না। অথচ শিল্পলোকে এদের সে মর্যাদা দিতে তো আমাদের বাধে নি। এটা কেমন করে হ'ল? তবে কী প্রাকৃত সুন্দর ও শিল্প সুন্দর এরা এক নয়? অর্থাৎ এই দুয়ের মূল্যায়নের মাপকাঠি কী বিভিন্ন? বলা যেতে পারে যে প্রকৃতি যাকে কুৎসিত করে গড়েছে অর্থাৎ আমাদের চোখে যাকে কুৎসিত মনে হয় তা কী প্রকৃতির কারিগরী-নৈপুণ্যের অভাবের জন্য? অর্থাৎ প্রকৃতি কী যা প্রকাশ করতে চেয়েছিল তা প্রকাশ করতে পারে নি? এ কথা এখানে মনে রাখতে হবে যে প্রকৃতির এই পারা না পারা এটা প্রতিভাত হচ্ছে দর্শকের চোখে। অর্থাৎ প্রকাশ বিফলতা প্রকৃতির ক্ষেত্রে না ঘটে থাকলেও আমরা তা প্রকৃতির উপর আরোপ করে তার সৃষ্টি বিশেষকে কুৎসিত দেখি। এটা আমাদের দেখার ধর্ম ; প্রকৃতির সৃষ্টির ধর্ম নয়। প্রকৃতিতে যাকে কুৎসিত দেখলেম তাকে যখন প্রাকৃতিক সংলগ্নতা থেকে অসংলগ্ন করে তুলে এনে আমার কবিতায় বা ছবির ক্যানভাসে বসাই তখন তাকে এক নতুন ধরনের সংলগ্নতা বা coherence দেবার চেষ্টা করি। যখন তা সার্থকভাবে দিতে পারি আমার কাব্যে বা ছবিতে তখন তা সুন্দর হয়ে ওঠে। তাই পণ্ডিতেরা বলেছেন যে শিল্পলোকে প্রাকৃতিক অসুন্দরেরও স্থান আছে ; Ugly is not a non-value but a disvalue. কুৎসিত যদি Non-valueও হ'ত কোনো একজন দর্শকের চোখে বা কোনো এক রসবত্তার মূল্যায়নে তাহলেও আর একজনার চোখে অন্য এক রসবেত্তার মূল্যায়নে তার value হবার পথে কোনো বাধা ছিল না। কেন-না, উপনিষদের সেই দ্রষ্টা পাখিটির কথা স্মরণ করুন। সে তো ভোক্তা পাখিটির দুঃখ এবং সুখ এ দুয়ের ব্যাপারেই সমান

ভাবে উদাসীন; ভোক্তা পাখির ক্রন্দনেও সে আবশ্যিকভাবে কাতর হয় না অথবা তার উল্লাসেও সে উল্লসিত হয় না কোনো বাঁধাধরা নিয়মে। তার নিয়ম তার নিজের তৈরী। ভোক্তা পাখির সুখেও সে আনন্দিত হতে পারে আবার দুঃখেও সে আনন্দিত হতে পারে। যখনই সে পুলকিত হবে তখনই সে আনন্দে শিল্পের জন্ম ঘটবে। শুধু শিল্প কেন সমগ্র সৃষ্টিই তো আনন্দ থেকে জন্ম নেয়। সত্য, শিব, সুন্দর—এদের জন্মও এই আনন্দেরই মৌল ভূমিতে—

"আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে—"
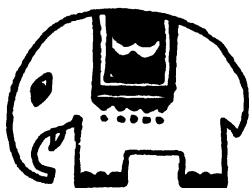
শিল্পের মর্মকথা •

জীবনের প্রাঙ্গণে সুন্দরের আবির্ভাব বারবারই ঘটেছে. তবু মানুষ আজও বুঝি তার পূর্ণ অর্থ খুঁজে পায়নি ; ক্ষণিকের একান্ত রূপলীলার মাঝে অরূপের সন্ধান চলেছে, চলেছে অনুসন্ধিৎসার অভিযান। জানি না সে অভিযান ব্যর্থ হবে কি সার্থক হবে। মানুষের অন্বেষণের শেষ নেই। তার চরম বিচার করবার দিন আজও আসেনি, কখনো আসবে কিনা তার উত্তরও দেবে ভবিষ্যত। বসন্ত বাতাস আন্দোলিত পলাশ পারুলের গতিচ্ছন্দ, মর্মর মুখরিত সায়াহ্নের রহস্যঘন নিঃসঙ্গ বনপথ, আমাদের মনে বিভিন্ন রসের সঞ্চার করে, একথা সত্য। বালার্ক-সম্ভবা প্রত্যুষের শিশু সূর্য তার আলোর আবেদনের মধ্যে যে সন্দেশ প্রচ্ছন্ন রাখে, তা আমাদের কাছে পরম বিস্ময়ের। এখানে ফুল ফোটা জ্যোৎস্না, ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘের নিরন্তর ভেসে যাওয়া, ওখানে বাতাসের বাঁশরীর সঙ্গে বন বেতসের সাবলীল নৃত্য ভঙ্গিমা রূপপূজারী মানুষের কাছে আবেদন জানায়। তাই মানুষ চায় তার ছন্দে ও সুরে, তার লেখায় ও রেখায়, তার বর্ণ-বিন্যাসে শাশ্বত করতে এই পলাতক সৌন্দর্যকে। সে ইলোরা ও অজন্তার বুকে আঁকে তার স্বাক্ষর, সে কালির আঁচড়ে কাগজের বুকে রচনা করে মানুষের শাশ্বত প্রণয় আর বিরহ বেদনার অমর কাহিনী। কবি কল্পনা উজ্জীবিত উজ্জয়িনী আজও বেঁচে আছে হাজারো মনের গহনে। সেখানে নারীরা আজও কালো কেশের মাঝে কুরুবকের চূড়া পরে, আজও জীবন সেখানে মন্দাক্রান্তা তালে চলে। যে যুগের জীবন নিঃশেষ হয়ে গেছে মহাকালের স্থূল হস্তাবলেপে তাকেই শিল্প শাশ্বত করেছে, অমর করেছে মানুষের স্মৃতির মণিকোঠায়।

এই শিল্প, সাহিত্য, সংগীত, এক কথায় যাকে আমরা আর্ট বলব তার সত্যিকারের মূল্য কতটুকু ? এই ধরনের মূল্য বিচারের প্রশ্ন ওঠে তখনই যখন আমরা প্লেতোর কথা পড়ি ; যখন তাঁর মত মনীষী আর্টকে "Copy of a copy" অর্থাৎ 'অনুকৃতির অনুকৃতি', নকলের নকল এই আখ্যা দিয়ে তাঁর আদর্শ 'রিপাব্লিক' থেকে নির্বাসিত করতে চান। তাঁর মতে শাশ্বত সত্য হ'ল 'Idea' এবং এই পরিদৃশ্যমান জগৎ, হাসি-গান-আলো-ভরা মায়াময়, মধুময় প্রকৃতি সেই আইডিয়ার ছায়ামাত্র। আর্ট আবার প্রকৃতিকে অনুকরণ করে। তাই আর্ট হল অনুকৃতির অনুকৃতি। প্লেতোর মতে 'Art is doubly removed

from Reality'.—আর্টের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে মহাসত্তার অবস্থান। তাই আর্টে আমরা সত্যের সন্ধান পাই না। আর্টের মধ্যে সত্যের প্রকাশ নেই। তাই আর্ট সত্যের বাহন নয়। আর্টের মূল্যবিচারের, এই কি শেষ কথা? মহাদার্শনিক প্লেতোর প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন ক'রে আমরা বলব যে আর্টের মূল্যবিচারের এই শেষ কথা নয়। আর্ট প্রকৃতিকে প্লেতোর অর্থে অনুকরণ করে কি-না সে বিষয়ও মতভেদের অসম্ভাব নেই। অবশ্য আর্টে প্রকৃতির অনুসরণ অনস্বীকার্য, এ অনুসরণ অন্ধ অনুসরণ নয়, এ হ'ল নূতন ক'রে প্রকৃতিকে সৃষ্টি করা। দার্শনিকেরা যাকে 'Mechanical imitation' বা যান্ত্রিক অনুকৃতি বলেছেন, এ তা নয়। স্রষ্টার সৃষ্টি যেখানে ব্যাহত হয়েছে জড় পদার্থের জড়ত্বের জন্য সেখানে শিল্প তাকে পূর্ণ করে তোলে। শিল্পীর শিল্প-সৃষ্টিতে বাস্তব নূতনতর মহিমায় সমৃদ্ধ হয়।

ঠিক এই ধরনের কথাই আমরা শুনি আরিস্ততলের মুখে; আবার দার্শনিক-শ্রেষ্ঠ হেগেলও শুনিয়েছেন ঠিক একই ধরনের কথা। দৃশমান জগতের বাইরে যে নিরালম্ব মহাসত্তার স্বেচ্ছাবৃত নির্বাসন ঘটেছে, তারই অপূর্ণ প্রকাশ আমরা প্রত্যক্ষ করি আমাদের পরিচিত জগতে। আর্ট হ'ল প্রকৃতির মাঝে এই আংশিক ব্যক্ত সত্যকে পরিপূর্ণ রূপদানের প্রয়াস। জড় পদার্থের অন্তর্নিহিত অবস্থাবৈগুণ্যে জড় জগতের মধ্যে সত্যকে আমরা তার পূর্ণ স্বরূপে পাই না। তাই প্রয়োজন হয় আর্টের; 'Art Supplements nature'. আর্ট অপূর্ণ প্রকৃতিকে পূর্ণতর করে। শিল্পীর কাছে, শিল্পরসিকের কাছে এই হ'ল আর্টের সত্যিকারের পরিচয়। মানুষের আত্মার স্বাক্ষর পড়ে সার্থক শিল্পে। তাই শিল্প বা আর্টের মর্মকথা হ'ল চিন্ময় আত্মার নিগূঢ় মর্মবাণী। প্রকৃতির অগীত সংগীত বিশুদ্ধ তান লয়ে গীত হয় শিল্পীর লেখা ও রেখার, সুর ও ধ্বনির অপূর্ব সমন্বয়ে। 'স্বয়ং প্রকাশ' 'Absolute ভাস্বর হয় শিল্পের বর্ণ আলিম্পনে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতে ইন্দ্রিয়াতীতের প্রতিষ্ঠা করে আর্ট। তাই হেগেল বলেছেন, 'Art is the sensuous presentation of the Absolute'. যিনি ইন্দ্রিয়ের অতীত সেই মহাসত্তাকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপদানের প্রয়াসই হ'ল আর্টের মূল কথা, শিল্পের পরমতত্ত্ব।

শিল্প প্রকাশ করেছে শিল্পীর অনুভবকে, তার অপরোক্ষ অনুভূতিকে। শিল্পী হ'ল বেদান্তের স্বস্থ সত্তা, অনির্ভর, অসীম, ক্ষয়হীন। এই চিন্ময় সত্তার প্রকাশ ঘটে শিল্পে। শিল্পী হ'ল মানুষের চিন্ময়ী শক্তির লীলারূপ। মানুষ

যেখানে বন্ধনমুক্ত সেখানে সে ভগবান, সে ব্রহ্ম। তাঁর লীলায় বিশ্বসংসার সৃষ্টি হয়। আর ভগবান যেখানে নররূপে মোহগ্রস্ত সেখানে তাঁর লীলায় ফোটে শিল্পীর সৃষ্টি কমল। জীবনের এবং জগতের ভোগের আমন্ত্রণে শিল্পী প্রত্যুত্তর দেয়—সেই কাজটুকুই হ'ল শিল্প। সে শিল্প হ'ল মোহমুগ্ধ ভগবানের চিন্ময় শক্তির আর এক প্রকাশ। এখানে আমরা বৈদান্তিক শঙ্করাচার্যের 'তত্ত্বমসি' তত্ত্বের আশ্রয় নিচ্ছি হেগেল এবং ক্রোচের নন্দতত্ত্বের একটা সমন্বয় ঘটাবার প্রত্যাশায়। এই দুই তত্ত্বের সুষ্ঠু সমন্বয় ঘটলে একদিকে শিল্পকে মহাসত্যের এবং মহাসত্তার প্রকাশের পটভূমি হিসেবে নেওয়া যায়, আবার তাকে শিল্পীর অপরোক্ষ-অনুভূতির প্রকাশকে শিল্প হিসেবে গ্রহণ করা চলে। গারগিয়ালো, ক্যালিগারো প্রমুখ ক্রোচের শিষ্যেরা, ভেস্তুরি এবং জার্মানীর ফর্মালিস্টের দল—এঁরা সবাই ক্রোচর প্রকাশ-সর্বস্ব শিল্পতত্ত্বের বিরোধিতা করেছেন। শিল্প কোন বস্তুকে প্রকাশ করবে, সে কথাটাও ভাবতে হবে, একথা এই সব সমালোচকেরা বলেছেন। এখানে যদি আমরা বৈদান্তিক মতবাদী হই, শঙ্কর বেদান্তে আস্থা স্থাপন ক'রে যদি একথা বলতে পারি যে আমিই সেই ব্রহ্ম, হেগেলের Absolute বা দার্শনিকের মহাসত্তা, তাহ'লে শিল্পবস্তু নিয়ে বিরোধের অবসান হয়। আমরা অন্য এক পথ দিয়ে ক্রোচীয় প্রত্যয়ে উপনীত হই। ক্রোচে বলেছেন শিল্পে প্রকাশটাই বড় কথা, শিল্পের বিষয়বস্তুটা গৌণ। যে কোন বিষয় নিয়ে বড় শিল্পকর্ম সৃষ্টি করা চলে।

আমরা এই তত্ত্বেই ফিরে আসি যদি বলি যে সব বস্তুই হ'ল 'Absolute' বা মহাসত্তার প্রকাশ। তা হ'লে বিষয়ে বিষয়ে, বস্তুতে বস্তুতে আর গুণগত কোনো ভেদ রইল না। যে কোন বিষয়ই শিল্পের উপজীব্য রূপে গৃহীত হ'তে পারে তবে সেটা শিল্পকর্ম হয়ে উঠবে শুধু প্রকাশের গুণে, শিল্পীর শিল্পকল্পনার প্রসাদে। এইবার আমরা শিল্পকে মুখ্যতঃ প্রকাশ হিসেবে গ্রহণ করেও শিল্পকর্মকে 'Absolute' বা মহাসত্তার প্রকাশ হিসেবে দেখতে পারি। এই ভাবে ক্রোচীয় ও হেগেলীয় নন্দনতাত্ত্বিক ধারণার সমন্বয় ক'রে একটা নতুন চিন্তাধারার সূত্রপাত করা যেতে পারে।

এখন আমরা এটুকু বলতে পারি যে, আর্ট শুধু কথা নিয়ে বা রঙ নিয়ে, সুর নিয়ে বা ঢঙ্ নিয়ে খেয়ালী মানুষের বিলাস নয়। আর্টের গোড়ার কথা হ'ল 'রিয়ালিটি' বা পরম সত্যকে প্রকাশ করা। তুলির বর্ণবিন্যাসে, কালির আঁচড়ে বা সুরের সার্থক সৃষ্টিতে শিল্পী যে ইন্দ্রলোকের প্রতিষ্ঠা করে, তা

'রিয়ালিটি'মুখী। আমি রিয়ালিটি অর্থে বাস্তবতা বোঝাতে চাইনি। দার্শনিকপ্রবর ব্রাডলির অর্থেই রিয়ালিটি শব্দের ব্যবহার করেছি। পরিদৃশ্যমান জগতের অন্তরালে যে মহাসত্তার 'অবাঙ্ মনসগোচর' অবস্থান তাঁর প্রকাশই হ'ল সত্যিকারের শিল্পীর শিল্প এষণা। আমাদের বাইরের জীবনে আমোদ-প্রমোদের প্রয়োজনে, বহিরঙ্গের তৃপ্তি সাধনে অথবা চিত্ত বিনোদনের উদ্দেশ্যে হয়তো আর্টকে আমরা ব্যবহার করি সাধারণ পণ্যের মতো, কিন্তু আমরা যেন ভুলে না যাই যে আর্টের এটা অপচয়ের দিক্, অপব্যবহারের দিক্। যাকে আমরা 'Art in industry' বা 'বাণিজ্যিক শিল্পকলা' বলি, সেখানে আর্টের প্রকৃত মর্যাদা পদে পদে ক্ষুণ্ণ হয়। আর্টের সত্যিকারের প্রয়োজন মানুষের প্রকৃতির ক্ষুধা মেটানো নয়। সেখানে আর্টের এই ধরনের অপব্যবহার লক্ষ্য করে হেগেল বলেছেন যে এ ক্ষেত্রে আর্ট বা চারুকলা তার স্বকীয়তা, তার স্বধর্মটুকু হারিয়ে ফেলে। আর্ট অপরের দাসত্ব করে। ("In this mode of employment art is indeed not independent, not free but servile.") এই ধরনের অপব্যবহারে আর্টিষ্টের সৃষ্টি-স্বাধীনতা ব্যাহত হয়; আর্টিষ্ট বা শিল্পী আনন্দলোকের চাবিকাঠিটি হারিয়ে ফেলেন। শিল্প-রসিকের আনন্দলোকে উত্তরণের স্বপ্ন নিষ্ফল হয়।

এই প্রসঙ্গে আর্টের ক্ষেত্রে অসুন্দরের (ugly) স্থান আছে কিনা সে সম্বন্ধে ছু' একটি কথা বলতে চাই। আমাদের স্থূল বুদ্ধিতে আর্টের ক্ষেত্রে অসুন্দরের প্রবেশ নিষিদ্ধ। কিন্তু শিল্প রসিকের কাছে, শিল্প সমালোচকের দৃষ্টিতে অসুন্দর অপাংক্তেয় নয়। আর্টের রাজ্যে কেবল সুন্দরেরই (beautiful) একচেটে অধিকার সাব্যস্ত হয়নি। সুন্দরের সঙ্গে আর্টের আত্মিক যোগের কথা আরিস্ততল স্বীকার করেন, না—"Aristotle's conception of fine art so far as it is devoloped is entirely detached from any theory of the beautiful—a separation which is characteristic of all ancient aesthetic critictsm.

বুচার আরিস্ততলের আর্ট সম্পর্কিত মতবাদের আলোচনা করিতে গিয়ে আরও বলেছেন—

"He makes beauty a regulative principle of art but he never says or implies that the manifestation of beautiful is the end of art."

আর্টের লক্ষ্য সুন্দরকে রূপদান করা নয়, সত্যকে প্রকাশ করা। সত্যের ব্যাপ্তি কেবলমাত্র সুন্দরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই, অসুন্দরের রাজ্যেও তার অবাধ প্রবেশ। তাই ক্রোচে প্রমুখ আধুনিক নন্দনতত্ত্ববিদেরা অসুন্দরের দাবীকে অসম্মান করার অন্যায় স্পর্ধা প্রকাশ করেন নি। দার্শনিকের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এই প্রশ্নের বিচার করতে বললে আমরাও অসুন্দরকে আর্টের রাজ্যে প্রবেশাধিকার না দিয়ে পারি না। কারণ সুন্দর এবং অসুন্দর, ভালো এবং মন্দ, সকল ক্ষেত্রেই আমরা একই মহাসত্তার প্রকাশ দেখতে পাই। যদিও মানুষের অভিজ্ঞতার জগৎ সেই ব্রহ্মরূপেই রূপময় তবুও আমরা সুন্দর অসুন্দরের ভেদ করি আমাদের শিক্ষা, দীক্ষা, রুচি ও দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে। কোন বস্তুই মূলতঃ সুন্দর বা আত্যন্তিক ভাবে অসুন্দর নয়। আমরা একথা জানি যে আজ যাকে সুন্দর দেখি কিছুকাল পরে সে-ই আবার অসুন্দর রূপে প্রতিভাত হয়। যৌবনের রঙীন আলোর রংবাহারে যাকে সুন্দর দেখেছিলাম সেই-ত' আবার বার্ধক্যের সায়াহ্নের ম্লান আলোয় অসুন্দর হয়ে দেখা দেয়। চাঁদের আলোয় সেদিন হয়তো মুগ্ধ হয়েছিলাম যেদিন সুস্থ দেহে নদীপথে বার হয়েছিলাম নর্মসখীর সাথে। আর আজ অসুস্থ শয্যায় চাঁদের আলোর প্রবেশ-পথ রুদ্ধ করে দিলাম নিজের হাতে। ভালো লাগে না এই ভাবালুতা কখন কখন! এতো জীবনের অতি পরিচিত অভিজ্ঞতা। এই ভালো লাগাটুকুই তো হ'ল সুন্দরের শেষ কথা। এক যুগে একটা বিশেষ রূপকে ভালো লাগলো, তাকে বললাম 'সুন্দর'। পরের যুগের মানুষের রুচি বদলাল। ভালো লাগল না তাদের আর সেই পুরনো রূপের কাঠামো। তারা তাদের আপন মনের মাধুরীটুকু মিশিয়ে সৃষ্টি করল না শিল্পের রূপবস্তুকে। তারা অসুন্দর অপাংক্তেয় হয়ে রইল সাধারণের আনন্দের ভোজে। আবার হয়তো কয়েকশো বছর পরে নতুন যুগের শিল্পী এসে তাদের মর্যাদা দিল। এমন তো কতবারই ঘটেছে ইতিহাসে। তাই বলছিলাম সুন্দর-অসুন্দরের তত্ত্ব হ'ল মানসিক; তাই এ তত্ত্ব আপেক্ষিক। সম্যক দৃষ্টির পটভূমিকায় সুন্দর অসুন্দর নেই। সে দৃষ্টি হ'ল বিশ্ববিধাতার দৃষ্টি—দার্শনিক এ দেখাকে বলেছেন 'Sub specie Aeternitatis দৃষ্টি; বিশ্ববিধাতা আপনাকে প্রকাশ করেছেন সৃষ্টির অণুতে পরমাণুতে। এই মহাসত্তার প্রকাশই যদি আর্টের উপজীব্য হয় তবে আর্টের ক্ষেত্রে সুন্দর এবং অসুন্দর উভয়ের দাবিই হবে স্বতঃস্বীকৃত। অবশ্য ক্রোচে অন্য যুক্তি দিয়ে অসুন্দরকে আর্টের রাজ্যে প্রবেশাধিকার দিয়েছেন।

তিনি বলেছেন, "But if the ugly were complete, that is without any element of beauty, it would for that very reason cease to be ugly......the disvalue would become non-value; activity would give place to passivity."

অর্থাৎ সহজ ভাষায় বলতে গেলে অবিমিশ্র অসুন্দর জগতে কখনই সম্ভব নয়। তাই আপতঃ অসুন্দরের মধ্যেও সুন্দরের স্পর্শ শিল্পরসিক খুঁজে পান। সুন্দরের অলক্ষ্য স্পর্শে অসুন্দরের মধ্যে রূপান্তর ঘটে, তা ধরা পড়ে শিল্পীর চোখে। তাই দেখি শিল্পে ও সাহিত্যে সমাজের নীচের তলায় অসুন্দর জীবনের কাহিনীও রসোত্তীর্ণ হয়েছে। এই যুগের মনোবিজ্ঞানী মানুষের রসবোধের মূল সূত্রটি অনুধাবন করেছেন সঠিক ভাবে। তাই দেখি এযুগের আর্ট ক্রমেই হচ্ছে গণতান্ত্রিক অর্থাৎ তা জীবনের সর্বস্তরের সর্ব মানুষের প্রতিনিধিত্ব করছে। 'গণতান্ত্রিক' কথাটি এখানে রাজনীতিগত অর্থে ব্যবহৃত হয়নি এর ব্যবহার পুরোপুরি নন্দনতত্ত্বগত। যা কিছু বীভৎস, কুৎসিত, অসুন্দর তা-ই পরিত্যাজ্য নয়। আর্টের রাজ্যে প্রবেশে তারও রীতিমত দাবী আছে। এ কথাটি ফরাসী কবি বোদেলের যেমন সুন্দরভাবে তাঁর কাব্যের মধ্য দিয়ে আমাদের বুঝিয়েছেন এমনটি বিরল। স্বর্গের সৌন্দর্য অনেক কবিই দেখেছেন, মর্ত্যের সৌন্দর্যের কথা শুনিয়েছেন আরো অনেকে কিন্তু নরকের সৌন্দর্য কয়জনই বা দেখেছেন এবং শিল্পের মাধ্যমে আর দশজনকে দেখিয়েছেন? অসুন্দরের সৌন্দর্য সত্তার রসপিপাসু পাঠকের কাছে বোদেলের অনাবৃত করেছেন কবি চিত্তের সহজ সৃষ্টিলীলায়। তাঁর কাব্য পড়ে আমরা বুঝতে পারি ক্রোচের উপরি-উদ্ধৃত উক্তির সার্থকতা।

তাই সার্থক শিল্পীর চোখে সুন্দর অসুন্দরের দ্বন্দ্ব নেই। বাস্তব অবাস্তবের প্রশ্নও সেখানে অবান্তর। যা ঘটে, যা প্রত্যক্ষ, আমাদের ইন্দ্রিয় দিয়ে আমরা যাকে পাই, তার চেয়েও সত্য হ'ল আমাদের শিল্পলোক।

শিল্প আনন্দময়, এই কারণে যে শিল্প হ'ল সৃষ্টি। সৃষ্টির মধ্যেই আনন্দের বীজ উপ্ত হয়। সেই জগৎ বস্তু জগৎ থেকে ভিন্ন। বাস্তবতার রূঢ়তা, বাস্তব কণ্টকের বেদনা, বাস্তব দারিদ্র্যের পীড়ন সেখানে নেই, কল্পলোকের রঙের উচ্ছ্বাসে তা চাপা পড়ে যায়; কাঁটা যখন শরীরকে স্পর্শ করে তখন তা বেদনাদায়ক। দূর থেকে দেখলে এই কাঁটার মধ্যে যে সৌন্দর্য নিহিত আছে

তাও আমাদের চোখে ধরা পড়ে। দূরত্বটুকুই হ'ল সুন্দরকে দেখার, সুন্দরকে সৃষ্টি করার প্রধানতম উপকরণ। কল্পনা এই দূরত্বটুকু সৃষ্টি করে। আর এই দূরত্বটুকুর জন্যই মানুষের বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা শিল্পরসিকের চোখে পরম রমণীয় হয়ে ওঠে। অর্থাৎ ছবি দেখার সঙ্গে, গান শোনার সঙ্গে আনন্দে সে যুক্ত হয়। এই আনন্দানুভূতির সঙ্গ ছাড়া শিল্পমূল্যের অনুভব সম্ভব নয়। জীবনে যাকে অসুন্দর বলি তা জীবনের সামগ্রিক গতি-প্রবাহের সঙ্গে অসঙ্গত বলেই তা অসুন্দর। ওদেশের দার্শনিক যাকে Gestalt বা বিশেষ বিষয়ের অন্তরশায়ী পরিকল্পিত রূপ বলে বর্ণন করেছেন সেই বাস্তবজীবনের Gestalt এর সঙ্গে যাকে আমরা কুৎসিৎ বলি তা অসঙ্গত বলেই তা কুৎসিত হয়ে ওঠে। যদি আমরা বস্তুজীবনের গেষ্টল্টটাকে আমাদের মনোমত করে পাল্টে দিতে পারতাম তা হলে বাস্তব জীবনে কুৎসিত বা অসুন্দর থাকত না। অতএব অসুন্দরের সমস্যা হল গেষ্টল্টের সমস্যা। বাস্তবজীবনেও তাই একই বস্তুকে সবাই অসুন্দর বলে না কেন-না আমাদের সবারই দেখার গেষ্টল্ট বিভিন্ন। আধুনিক মনস্তত্ত্বের এই গেষ্টল্টকে বোধ হয় মহাকবি কালিদাস 'রুচি' কথাটির দ্বারা বোঝাতে চেয়েছিলেন। অবশ্য আমরা বলব 'রুচি' এবং 'গেষ্টল্ট' পরস্পরের পরিপূরক। রুচি গেষ্টল্টকে তৈরী করে, আবার গেষ্টল্ট ও রুচিকে ধীরে ধীরে রচনা করে। এই গেষ্টল্ট রচনা সার্থক হলে, তা আনন্দ-যুক্ত হয়ে ওঠে এবং গেষ্টল্ট-সৃষ্টি মানেই আনন্দের সৃষ্টি। কবি কল্পনাই এই গেষ্টল্টের উৎসভূমি। তাই তো কল্পনার সঙ্গে আনন্দের একটা আত্যন্তিক যোগ নন্দনতত্ত্বে স্বীকৃত হয়েছে। তাই শুনি নারদ বাল্মীকিকে বলছেন—

"কবি তব মনোভূমি
রামের জনম স্থান অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো।"

নারদ কণ্ঠে ধ্বনিত কবিগুরুর এই কথা কয়টি শুধু কবির অনাবশ্যক উচ্ছ্বাসই নয়, এর পিছনে রয়েছে নন্দনতত্ত্বের বিরাট সত্যের ইঙ্গিত। রামায়ণের রামের সার্থক জন্ম হয়েছিল কবির মানসলোকে। বাল্মীকির রামই শাশ্বত; অক্ষয় জীবনের উত্তরাধিকার কবি তাঁর হাতে অর্পণ করেছেন। আমরা ঐতিহাসিক রামকে জানি না, আমরা চিনি মহাকবি বাল্মীকির কল্পনা-প্রসূত শ্রীরামচন্দ্রকে। বাস্তবের ক্ষণভঙ্গুরতাকে জয় করেছে শিল্পের শাশ্বত মহিমা। মহাকালের নির্দেশকে উপেক্ষা ক'রে আর্ট মৃত্যুকে লঙ্ঘন করেছে,—সেই নিত্যজয়ী অমৃতত্ব লাভের দুরূহ সাধনায়।

শিল্পে বাস্তবতা

রিয়্যালিটি অর্থাৎ বাস্তবতা বলতে আমরা বুঝি আমাদের চারপাশকে। আমাদের চতুর্দিকে যে জগৎ, যার সীমানা নির্দিষ্ট হয়েছে আমাদের ঐন্দ্রিয়জ জ্ঞানের মধ্য দিয়ে তাকেই আমরা বলি বাস্তব জগৎ। যাকে আমরা প্রত্যক্ষ করেছি, যাকে আমারই মত আরও দশজনে প্রত্যক্ষ করেছে বা যাকে আমিও প্রত্যক্ষ করতে পারি, তাকেও আমরা সাধারণ অর্থে 'বাস্তব' আখ্যা দিয়ে থাকি। শিল্পগত বাস্তব হ'ল ঘটনাধর্মী, যা ঘটেছে বাস্তব শিল্প তারই প্রতিরূপ। গলির মোড়ের ডাস্টবিন, মরা কুকুরের অনাদৃত শব, নোংরা গলির কদর্যতা, এসবই বাস্তব। আবার আকাশের চাঁদ, পাখীর গান, মলয়-হিল্লোল এরাও কম বাস্তব নয়। জীবনের পাতায় এদেরও স্বাক্ষর পড়ে, এরাও সহজ সত্যে অনস্বীকার্য। এদের কেউই আমাদের জীবন-ভোজে অপাংক্তেয় নয়। আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় এদের স্বচ্ছ অস্তিত্বকে অস্বীকার করতে পারি না। এখন প্রশ্ন ওঠে, মানুষের সৃষ্টিতে, তার সাহিত্যে, গানে শিল্পে এদের স্থান কোথায়? বাড়ীর পাশের নোংরা গলির-কাহিনী আর কোন এক গাঁয়ের ধারে ভরা গাঙের ওপরে ওঠা বৈশাখী পূর্ণিমার চাঁদের কথা কি একই কালিতে একই ভাষায় লিখিত হবে? শিল্পীর কাছে এদের আবেদন কি সমগ্রাহ্য? শিল্পের বিষয়বস্তু হিসেবে এদের মূল্য বিচার করলে এরা কি সমান মর্যাদা দাবী করতে পারে? আর এই বিপরীতমুখী জীবনধারার ইতিহাস সৃষ্টি কি আর্টের দরবারে পাশাপাশি বসবে? আধুনিক সাহিত্যে, চিত্রে, সংগীতে—আধুনিকই বা বলি কেন সর্বকালের আর্টে আমরা দেখেছি যে, বিষয়বস্তু নিয়ে কোন বাঁধা-ধরা নিয়ম চলে না। সেখানে 'শুঁড়ির দোকানের মদের আড্ডা', ইন্দ্রলোকের অবারিত ঐশ্বর্য এবং নরকের বীভৎসতা শিল্পীর প্রেরণাকে সমানভাবে উদ্দীপিত করেছে নব নব সৃষ্টির সার্থকতায়।

দান্তে, বোদেলের, মিল্টন এঁদের হাতে নারকীয় পরিবেশের সৌন্দর্যসম্পদ নির্বাধ প্রকাশ পেয়েছে কবি কল্পনার জাদুতে। ভারতীয় নন্দনতত্ত্ব শিল্পের গতি প্রকৃতির মূল সূত্রটি সঠিকভাবে অনুধাবন করেছিল বলেই সেখানে দেখি বীভৎসাদি আটটি রসকে স্বীকার করা হয়েছে। অবশ্য কেউ কেউ রস অষ্টকের উপরে 'শান্তকেও' রস হিসাবে স্বীকার করেছেন। বস্তু শিল্পকে প্রাণবান করে না, শিল্পকে প্রাণ দেয় শিল্পীর প্রতিভা, তার প্রকাশ চাতুর্য। সেখানে

সুন্দর, কুৎসিত, ভালো অথবা মন্দের প্রশ্ন নেই। আমরা 'ইয়াগো' এবং 'ইমোজেন'কে সমান মর্যাদা দিই, কারণ উভয়েই রসোত্তীর্ণ হয়েছে সেক্সপীয়রের কবি-প্রতিভার মোহন স্পর্শে। রবীন্দ্রনাথের উর্বশী আমাদের চোখে দেখা কোন অপ্সরার অনুগমন করেনি। কবির স্বয়ম্ভূকল্পলোকে নৃত্যপরা উর্বশীর নূপুর নিক্কন, যে 'শিমূলসজিনা' কবিকে ঋণে আবদ্ধ করেছে, তাদের চেয়ে কোন অংশেই অসত্য নয়। শিল্পের মৃত্যুহীনলোকে উভয়েই সত্য। ওদের রিয়ালিজম্ নির্দিষ্ট হয়েছে শিল্পীর সৃষ্টি-সার্থকতার গুণে, বাইরের জগতে স্থান-কালের সীমানায় আবদ্ধ হওয়ার জন্য নয়। আর্টের সবচেয়ে বড় গুণ বাস্তবধর্মী হওয়া একথা অবশ্যস্বীকার্য বলে আমরা মনে করি না। মিল্টনের বিরাট কল্পনার উদার সঞ্চরণ বাস্তবতাকে লঙ্ঘন করেছে বারে বারে তবু তাঁর "Paradise Lost" কাব্যগ্রন্থে রসের অভাব ঘটেনি কোথাও। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে সেক্সপীয়রের ফলস্টাফের দেখা সব সময়ে পাই না বলেই তাকে অস্বীকার করার স্পর্ধা প্রকাশ না করাই ভালো।

আধুনিক যুগের একদল সমালোচক ক্রমাগত রব তুলেছেন যে শিল্পকে বা আর্টকে বস্তুধর্মী করে তুলতে হবে। লিখতে হবে হাতুড়ি কাস্তে আর বস্তির গান। ওসব ফুল আর চাঁদ নিয়ে অনেক লেখা হয়েছে, আর নয়। ড্রয়িং রুমে বসে আর আর্ট করা চলবে না। কবিকে শিল্পীকে নেমে আসতে হবে ঐ নোংরা বস্তির পাশে; যেখানে বসে সর্বহারা মানুষদের গান লিখতে হবে, আঁকতে হবে তাঁদের ছবি। কিন্তু এঁরা ভুলে যান যে শিল্পী যা চোখ দিয়ে দেখেন তার সবটাই শিল্পলোকে প্রবেশের অধিকার পায় না। তিনি যা প্রাণ দিয়ে অনুভব করেন, সেটাই মহত্তর সত্য। তাই তাঁর প্রাণের অনুভূতি শিল্পে বড় হয়ে ওঠে, সেটাই শিল্প হয়ে ওঠে।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, যে সৈনিক গত যুদ্ধে বন্দুক হাতে রাশিয়ার মাটিতে দাঁড়িয়ে লড়েছিল নাৎসী অভিযানের বিরুদ্ধে, তাদের অনেকের চেয়েই রবীন্দ্রনাথ গভীর ভাবে উপলব্ধি করেছিলেন যুদ্ধটাকে তার নগ্ন বীভৎসতায়। তাই তিনি বাংলাদেশের এক নিভৃত নিকেতনে বসেও নিদারুণ বেদনা অনুভব করেছেন তাঁদের জন্য যাঁরা সমস্ত ক্ষয়ক্ষতি নীরবে স্বীকার করেছেন। কবির দরদী প্রাণের সঙ্গে সর্বদেশের দুঃখী মানুষের প্রাণের যোগ ছিল, তাই তিনি পরিপূর্ণ রূপে তাদের দুঃখ উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। শিল্পী মনের এ বেদনা ব্যক্তিগত স্বার্থ সম্পর্কের অনেক উর্ধ্বে। এ দুঃখ শিল্পী

মনের, যে মনের পরিধি বিশ্বব্যাপ্ত। জাপানীদের হাতে চীনের লাঞ্ছনা রবীন্দ্রনাথের মনকে ব্যথা দিয়েছিল। সে বেদনার মধ্য দিয়ে সত্যিকারের কাব্যসৃষ্টি হয়েছে। শুধু রবীন্দ্রনাথ কেন, যে সব শিল্পী বহুদূর থেকেও এই বর্বর অভিযানকে শিল্পী মন দিয়ে সাগ্রহে লক্ষ্য করেছেন, তাঁদের অশ্রুধোয়া তুলি এবং কলমের মুখে সার্থক শিল্প জন্মলাভ করেছে।

রবীন্দ্রনাথ কথার মালা সাজিয়ে আঁকলেন ছবি; অনন্ত পুণ্য বুদ্ধদেবের মন্দিরে চলেছে জাপানী সৈন্যের দল, রক্ত মাখা হাতে ভগবান বুদ্ধের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করবে বলে। অহিংসা ছিল যাঁর ধ্যান মন্ত্র, তাঁরই মন্দিরে হ'বে নারী আর শিশুঘাতীদের উৎসব। সে ছবি আজ সত্য হয়ে উঠেছে আমাদের কাছে। কারণ রবীন্দ্রনাথের শিল্পদৃষ্টি এই নারকীয় হিংসার কল্পনাসমগ্ররূপটুকু প্রত্যক্ষ করেছিল, তাই তিনি কাব্যে তাকে রূপ দিতে পেরেছিলেন এতো সহজে। এ কাহিনী বাস্তব কিনা এ প্রশ্ন আমাদের মনে একবারও জাগে না। শিল্পের অমরলোকে যারা স্থায়ী আসন লাভ করেছে তাদের সম্পর্কে বাস্তব-অবাস্তব প্রশ্নটাই অবান্তর। শিল্পলোক বাস্তবের নির্দেশের অপেক্ষা রাখে না। শিল্পীর সৃষ্টি মহত্তর প্রেরণায় বৃহত্তর সত্যের সন্ধান দেয়। বিশ্বের শিল্প দরবারে 'ফ্যান্‌টাসি' শ্রেণীর কাব্য ও চিত্রের অসদ্ভাব নেই। এরাই নিঃসংশয় করেছে যে আমাদের শিল্প শুধু ফোটোগ্রাফি নয়। কবি কীটস্ বলেছেন—

Beauty is truth, truth beauty
That is all
Ye know on earth and all ye need to know
—Ode on a Grecian Urn

সত্য এবং সুন্দরের সমীকরণ সম্ভব হয়েছে কবির ধ্যান-দৃষ্টিতে। কবির সত্য প্রাকৃত জনের সত্য নয়। সাধারণ অর্থে ট্রুথকে বুঝলে কবির প্রতি অবিচার করা হবে। দৈনন্দিন জীবনে যা ঘটে তার ফিরিস্তি দিলেই চরম সত্যের কথা বলা হয় না এবং তার মধ্যে সুন্দরের আবির্ভাবও ঘটে না। তা যদি হ'ত তা হ'লে ধোপার অথবা মুদির হিসেবের খাতায় সাহিত্যের আনাগোনা চলত পুরোপুরি ভাবে। আর্ট যদি বস্তুজীবনের প্রতিলিপি হত তা হলে ব্যঞ্জনার (suggestiveness) স্থান শিল্পে থাকত না। একবার দেখলেই, একবার শুনলেই বা একবার পড়লেই ফুরিয়ে যেত আর্টের আয়ু। রাগ-সংগীত বহুদিন আগেই লোপ পেয়ে যেত। শিল্পের ব্যঞ্জনাশক্তি শিল্পকে পুরাতন হতে দেয়

না। যখনই তাকাই 'ম্যাডোনা'র দিকে মন আনন্দে ভরে ওঠে। র‍্যাফেলের 'ম্যাডোনা', রবীন্দ্রনাথের 'শিশুতীর্থ' হ'ল শিল্পলোকের অমর সৃষ্টি। এরা বেঁচে আছে নব নব ভাব-ব্যঞ্জনার প্রসাদে। কীটস্ ট্রুথ বলতে correspondence with reality বা বস্তুজীবনের প্রতিলিপিকে বোঝাতে চান নি। শুধু যা প্রত্যক্ষ বা সহজ তার সঙ্গে অসঙ্গত না হলেই Beauty বা সৌন্দর্য সৃষ্টি সম্ভবপর হয় না।

বাস্তবের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চলা আর্টের ক্ষেত্রে অবান্তর। সমালোচক হয়ত বলবেন তবে এই ট্রুথের অর্থ কি? তার উত্তরে রবীন্দ্রনাথের কথায় আমরা বলব যে কাব্যে এই ট্রুথ রূপের ট্রুথ, তথ্যের নয়। অর্থাৎ শিল্প সৃষ্টি করতে গিয়ে বাস্তব জীবনের খুঁটিনাটি কোথায় ক্ষুণ্ণ হ'ল, তা দেখবার অবসর আর্টিস্টের নেই। তথ্যের ট্রুথ থেকে রূপের ট্রুথে নিরন্তর যাওয়াই হ'ল শিল্প-সৃষ্টির মূল কথা। কেমন করে এটা সম্ভব হয় সে কথা আমরা প্রাকৃত জন জানি না। এমন কি শিল্পীরাও সকল ক্ষেত্রে জানেন না। কোন্ পথে কেমন করে র‍্যাফেল ম্যাডোনার মত চিত্র-সম্পদ সৃষ্টি করলেন, কেমন করে 'পারসিফ্যালের' রচনা সম্ভব হ'ল, সে কথা কেউ বলতে পারেন না। শিল্পাচার্য নন্দলাল শিল্পশাস্ত্র থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন: এ যেন পাখীর এক গাছ থেকে আর এক গাছে উড়ে যাওয়া। বাতাসে পথের কোন চিহ্ন রইল না। 'যাওয়াটা' কেমন করে ঘটলো সেটা রইল অজ্ঞাত। কিন্তু তাই বলে যাওয়া ব্যাপারটার মূল্য কমল না। তথ্যের ট্রুথ থেকে রচনার ট্রুথে এই যাওয়াটাই হ'ল শিল্প-সৃষ্টি। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন:

"বিষয় বাছাই নিয়ে তার রিয়ালিজম্ নয়, তার রিয়ালিজম্ ফুটবে রচনার জাদুতে। ....আমার বলবার কথা এই যে লেখনীর জাদুতে কল্পনার পরশমণি স্পর্শে মদের আড্ডাও বাস্তব হয়ে উঠতে পারে? সুধাপান সভাও। কিন্তু সেটা হওয়া চাই।" (সাহিত্যের স্বরূপ)

এই হওয়াটাই হল শিল্পের ক্ষেত্রে সব চেয়ে বড় কথা। পশ্চিম দেশীয় নন্দনতত্ত্বে প্লেতোর নন্দনতাত্ত্বিক ধারণার স্থান অতি উচ্চে। প্লেতোর দর্শন সম্বন্ধে দার্শনিক প্রবর Whitehead বলেছিলেন—"The whole of European philosophy is a footnote to that of Plato."

প্লেতোর দার্শনিক মতের মূল্য সম্বন্ধে Whitehead অত্যুক্তি করেন নি বলেই আমাদের ধারণা। অতএব প্লেতোর নন্দনতাত্ত্বিক মত প্রণিধানযোগ্য।

তিনি কবিদের সম্বন্ধে তাঁর আদর্শ 'Republic' থেকে তাদের বহিষ্কারের যে নির্দেশ দিয়েছিলেন বলে বলা হয় তা Collingwood সাহেব গ্রহণ করেন নি। এ সম্বন্ধে পণ্ডিতে পণ্ডিতে মতভেদ রয়েছে। অতএব আমরা 'Republic' গ্রন্থের দশম অধ্যায় থেকে প্লেতোর মূল যুক্তি ও দীর্ঘ আলোচনা উদ্ধৃত ক'রে সত্যনির্ণয়ের জন্য যত্নবান হ'ব: "And there is another artist (Besides the workman who makes useful real things). I should like to know what you would say to him."

"Who is he?"

"One who is the maker of all works of all other workmen. This is he who makes not only vessels of every kind,........ Plants....and animals, himself and all other things—the Earth, the Heaven and the things which are in heaven all under the earth, he makes the Gods also. Do you not see that there is a way in which you could make them yourselves? —There are many ways in which the feat might be accomplished more quicker than that of turning a mirror round and round."

"Yes" he said, but that is an appearance only." Very good... the painter, as I conceive is just a creator of this sort. Is he not?"

—"Of course."

"But then I suppose he will say that what he creates is untrue. And there is a sense in which the painter creates a bed?"

Yes....But not a real bed.

And what of the manufacturer of the bed? Did you not say....that he does not make the idea which is according to our view is the essence of bed, but only a particular bed?

—Yes, I did.

Then if he does not make that which exists he cannot

make true existence but only semblance of existence, and if anyone were to say that. That the work of manufacturer of the bed, of any other workman, has real existence, he could hardly be supposed to be speaking the truth. No wonder then that his work is an indistinct expression of truth. Well then here are three beds, one existing in nature which is as I think that we may say is made by God—there is another which is the work of a carpentar? And the work of the painter is the third. Beds then are of three kinds and there are three artists who superintend? God, the manufacturer of the bed and the painter. Shall we then speak of Him as the natural author or maker of the bed?

"Yes" he said, in as much as by the natural power of creation. He is the author of this bed and all other things.

"And what shall we say of the carpentar? Is not he also the maker of the bed?"

—'yes'

But would you call the Painter a creator or maker?"

"Certainly not."

Yet if he is not the maker which is he in relation to the bed?

"I think," he said, we may fairly designate him as the imitator of that which the others make.

"Good, I said, then you call him who is third in the descent from nature an imitator, and the tragic poet an imitator and therefore like all other imitators he is thrice removed from the cause and from truth."

"That appers to be the case. Then about imitator we are agreed."

অতএব প্লেতোর মতে

(১) Ideaই সত্য (Essence) এবং Idea'র নিত্য সত্তা আছে।

(২) বিশেষ বস্তুর প্রকৃত বাস্তবতা বা নিত্যতা নেই, আছে সত্তাভাস (Semblance of existence)।

(৩) প্রত্যেক বিশেষ বস্তু একটি এবং একটি মাত্রই ঈশ্বরকৃত আদর্শ রূপে আছে। এই রূপকে বলা হয়েছে 'প্রাকৃতিক'; এই শিল্পের স্রষ্টা ঈশ্বর।

(৪) দ্বিতীয় শ্রেণীতে আছে কারুকর্মীদের নানান কর্ম। এই সব বস্তুর নিত্যতা নেই শুধু সত্তাভাস আছে।

(৫) তৃতীয় শ্রেণীতে রয়েছেন শিল্পীরা—অনুকারীর দল। যারা অন্যের গড়া বস্তুর অনুকরণে নির্মাণ করেন। ভাস্কর, চিত্রকর, মহাকাব্যকার, নাট্যকার সকলেই অনুকারী; সকলেই সৃষ্ট বস্তুর অনুকৃতি রচনা করেন।

(৬) অতএব শিল্পীরা সকলেই সত্য থেকে তিন ধাপ দূরে অবস্থান করেন।

ভোজদেব সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, তিনি ছিলেন সর্বশাস্ত্রপারঙ্গম, বিদগ্ধ জন এবং রসিক মানুষ। 'রসিক' শব্দটির অর্থ নিরূপণ করতে গিয়ে তিনি যে রুচি, বৈদগ্ধ্য ও পাণ্ডিত্য দেখিয়েছেন তাতে বলা যায় যে রসিক কথাটিকে তিনি কোন সময়েই সঙ্কীর্ণ অর্থে ব্যবহার করেন নি। ভোজের মতে রসিকতার তাৎপর্য অত্যন্ত গাম্ভীর্যময়। তাঁর 'শৃঙ্গার প্রকাশ' গ্রন্থে তিনি এই সম্বন্ধে অতি সূক্ষ্ম আলোচনা করেছেন। আমরা বলছিলাম রসিক শব্দটির কথা। রস সম্বন্ধে আলোচনা করার পূর্বে ভোজদেব 'রসিকাঃ' শব্দটি নিয়ে নানান চিন্তা করেছেন। তিনি বলেছেন সংসারের সকলকে আমরা রসিক বলি না, বলি মাত্র বিশেষ কয়েকজনকে। কেন?—তার উত্তর হ'ল এই যে সকলের চিত্তে রসের সঞ্চার ঘটে না; যার মধ্যে রসের অবস্থান ঘটে, সেই-ই রসিক। রসের উপস্থিতি ব্যক্তিকে করে সুরুচিসম্পন্ন ও সংস্কৃত। রসিক শব্দের অর্থ এই নয় যে, যিনি কাব্য-নাট্যের ও শিল্পকলার রস অন্তরে অনুভব করতে পারেন তিনিই রসিক। মানুষের রসিক সত্তাটি মনের কোন একটি বিশেষ অংশে নি· হিত বা লুকায়িত নয়। জীবনের প্রকাণ্ড বিস্তারের মধ্যে তার সকল দিকেই তা পরিব্যাপ্ত। সমাজ সকলের জন্য। কিন্তু যে 'সামাজিক' মনে কর যে সে আপন ব্যক্তিত্বে সমারূঢ়, সে আর পাঁচ জন থেকে স্বতন্ত্র; তার ব্যবহার ও আচরণ অপরকে আকর্ষণ করে না; অপরের সম্প্রীতির উদ্রেক করে না। লোকের শ্রদ্ধা, প্রীতি ও বিস্ময় আকর্ষণ যে করতে পারে সে-ই হচ্ছে প্রকৃত 'রসিক' পদবাচ্য।

ভোজের মতে রসিক শব্দের তাৎপর্য কাব্য-রসিক রূপে নয়, জীবন-রসিক

কল্পনা। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই যে অহং বোধটুকু রয়েছে সেটুকু না থাকলে তার রসোপলব্ধি সম্পূর্ণ হয় না ; তাকে 'রসিক' বলা চলে না। রসবোধ যার নেই, সে গ্রাম্য। সূক্ষ্মতম রুচির সংস্কৃতি, সৃষ্টি প্রতিভা এবং গ্রাহিকা শক্তি নির্ভর করে এই অহংবোধের ওপর। এই অস্মিতাবোধটুকু না থাকলে কলা রসিকের রসাস্বাদের নির্বাধ আনন্দটুকু পাওয়া হ'য়ে উঠে না।

কীট্‌সের Truth হলো রূপের Truth, দার্শনিকেরা যাকে Form এর Truth বলবেন······এই রূপ-সর্বস্ব তত্ত্বের প্রবক্তা দার্শনিক ক্লাইভ বেল শিল্পের স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বললেন যে শিল্প হল Significant form : "Significant form is an organic whole that is indefinable.

এই ব্যঞ্জনা-অনুস্যূত অনন্য রূপটুকুই শিল্পকর্মকে তার স্বধর্মে ঐশ্বর্যবান করে তোলে। শিল্পবস্তু-শিল্পরূপ (Art Content-Art Form) এ দুয়ের পার্থক্য ও বিভেদটুকু স্বীকার করেই Bell সাহেব তাঁর নন্দনতাত্ত্বিক মতাদর্শের অবতারণা করেছেন। যদি Bell সাহেবকে প্রশ্ন করা হয় যে শিল্প রূপ কিভাবে কোন পথে Significant বা অনন্য ব্যঞ্জনামণ্ডিত হয়ে উঠতে পারে—তার উত্তরে উনি বলবেন যে সেই শিল্পরূপই অনন্য ব্যঞ্জনামণ্ডিত যা নন্দনতাত্ত্বিক আবেগ ও অনুভূতি উদ্রেক করে। কথাটা খুব পরিষ্কার করে বোঝা গেল না। কেন-না পরবর্তী প্রশ্ন হবে এই নন্দনতাত্ত্বিক আবেগ ও অনুভূতির উদ্রেক করে কারা ? উত্তরে Bell সাহেব নিশ্চয়ই বলবেন যে significant form অর্থাৎ অনন্য ব্যঞ্জনামণ্ডিত রূপই এই ধরনের আবেগ অনুভূতির উৎস। অতএব Bell সাহেবের তর্কপদ্ধতি চক্রক দোষদুষ্ট। অবশ্য এ ছাড়া গত্যন্তর নেই। তাঁর ব্যাখ্যায় Aesthetic emotion বা নন্দনতাত্ত্বিক অনুভূতির স্বরূপ কি এই প্রশ্নের কোন সদুত্তর মেলে না ; মেলবার কথাও নয়। কেন-না শৈল্পিক আনন্দ-বিষাদ নিয়ে শিল্পানন্দ আস্বাদনের কোন সার্থক মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখা করা চলে না। করলে সে ব্যাখ্যা অপব্যাখ্যা হবে। এই ধরনের ব্যাখ্যা-প্রয়াসে এক ধরনের অনুপপত্তি ঘটবে। একে বলা হয়েছে naturalistic Fallacy বা প্রাকৃত অবভাস। অবশ্য Bell সাহেব তাঁর শিল্পের রূপ সর্বস্বতাকে সমর্থন করতে গিয়ে এক ধরনের স্বজ্ঞাবাদের আশ্রয় নিয়েছেন। শিল্পবস্তুর বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে এক ধরনের organic unity শিল্প রসিককে প্রত্যক্ষ করতে হবে এবং এই ঐক্যটুকুর প্রত্যক্ষীকরণের মধ্যেই শিল্পবিচারের মানদণ্ডটুকু প্রচ্ছন্ন হয়ে থাকে। শিল্পী বা শিল্পরসিক Intuition

বা প্রতিভানের সহায়তায় তাকে প্রত্যক্ষ করেন। শিল্প কর্মে সেই ঐক্যটুকু প্রতিষ্ঠা কতটুকু ঘটল তার বিচার ক'রে শিল্পকর্মের বিচার করা হয়। সুতরাং এ কথা আমরা নিঃসংশয়ে বলতে পারি যে Bell সাহেবের Formalism এ এক ধরনের Intuitionism বা প্রতিভানবাদের (স্বজ্ঞাবাদের) প্রবর্তন করা হয়েছে।

মানসলোকের আলোড়ন প্রকাশধর্মী। এই প্রকাশ করার ভঙ্গীই হ'ল কবির জাদু। শিল্পসৃষ্টির মধ্য দিয়ে যা ছিল একান্ত 'গোপন ধন' শিল্পী তাকে বিশ্বের ভোগের বস্তু করে তোলেন। শিল্পীর বিশিষ্ট সৃষ্টিভঙ্গী এক বিশেষরূপে বাস্তবকে দেখে। এ দেখা মনে আলোড়ন জাগায়; ভাব উদ্বেল হয়ে ওঠে। চোখে দেখা বাস্তব বিচিত্রতর সম্পদে পূর্ণ হয়ে ওঠে শিল্পীর মনোলোকে। সেখানে শিল্পের জন্ম হয়। তারপরে শিল্পী লেখায় অথবা রেখায়, ছন্দে অথবা সুরে, ক্যানভাসে কিংবা কাগজে তাকে ব্যক্ত করে। এই 'ব্যক্ত করা' শিল্প নয়। এ হ'ল কারিগরী। যখন অনুভূতির লোকে শিল্পী আপনার আনন্দ-বেদনাকে আত্ম-স্বতন্ত্ররূপে প্রত্যক্ষ করেছেন নূতনতর প্রকাশের মধ্য দিয়ে, তখনই শিল্পের জন্মলাভ ঘটেছে। একে দার্শনিকেরা বলেছেন, "Desubjectification of subjective feelings"—অর্থাৎ আত্ম-অনুভূতিকে আত্ম-স্বতন্ত্ররূপে প্রত্যক্ষ করা। শিল্প-সৃষ্টি হ'ল নৈর্ব্যক্তিক, শিল্পীকে ছাড়িয়ে উঠবে শিল্পের মহিমা। চরিত্রহীন শিল্পী হয়ত সৃষ্টি করবে ভগবান বুদ্ধের অনন্ত পুণ্যের অমর কাহিনী। শিল্পীর ব্যক্তিগত জীবন শিল্পকে স্পর্শ করে না। তাই টি. এস. এলিয়ট বলেছেন:

"The more perfect the artist, the more completely separate in him will be the man who suffers and the mind which creates."

এখানেও দেখি শিল্পীর বস্তুতন্ত্রী জীবনধারার সঙ্গে শিল্পের প্রাণের যোগ নেই। শিল্পের ভালোমন্দ শিল্পের বিষয়বস্তুর উপর নির্ভরশীল নয়। শিল্প বস্তুকে অতিক্রম ক'রে অনির্বচনীয় লোকের সন্ধান দেয়। হয়ত বাস্তব শিল্পের আড়ালে আত্মগোপন ক'রে দ্যুতিমান হয়ে ওঠে শিল্পী-মনের স্পর্শ পেয়ে। বাস্তবের রূপান্তর ঘটে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের বস্তু ও ঘটনাগুলি যেন রাতের তারা। আর দিনের আলো হ'ল শিল্পমননের প্রকাশ। এই 'প্রকাশে' ডুবে থাকে বস্তু, তার রূপ বদলায়। রবীন্দ্রনাথের কথাতেই বলি: "রাতের

সব তারাই আছে দিনের আলোর গভীরে।" 'বস্তু ও প্রকাশ' ইংরেজীতে যাকে বলে content এবং form, তাদের যথার্থ সম্পর্ক নির্দেশ বোধ হয় এর চেয়ে স্পষ্ট ভাষায় করা যায় না। সাধারণ মানুষ, আমাদের চারপাশে যারা আছে তাদের আমরা দেখেও দেখি না। তারাই শিল্পলোকে অপরূপ হয়ে দেখা দেয়। কল্পনার স্পর্শ পেয়ে দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ ঘটনা অসাধারণ হ'য়ে ওঠে। শিল্প সুন্দর হয় তখনই যখন শিল্পের ট্রুথ বহির্জগতকে ছেড়ে শিল্পীর প্রকাশ ভঙ্গীকে আশ্রয় করে, তথ্যকে ছেড়ে রূপকে আশ্রয় করে, প্রকাশভঙ্গী যখন রমণীয় হয়ে ওঠে শিল্পীর সহজ লীলায়।

যদি তর্কের খাতিরে আমরা কীট্‌সের ট্রুথকে রূপের ট্রুথ না বলে তথ্যের ট্রুথ বলি, তা হ'লে কুৎসিতকে (ugly) নিয়ে আমাদের বিড়ম্বনার অন্ত থাকে না। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে অসুন্দর বলে যাকে ঘৃণা করি, যার সান্নিধ্যে সমস্ত অন্তর বিদ্রোহী হয়ে ওঠে, ঠিক তারই প্রতিচ্ছবি শিল্পলোকে আমাদের আনন্দ দেবে কেমন ক'রে? যে কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত মানুষকে দেখে সমস্ত মন সংকুচিত হ'য়ে ওঠে, তাকেই যখন দেখি শিল্পীর চোখ দিয়ে তখন মন কেন সমবেদনায় করুণ হয়ে ওঠে? এ কারুণ্যের অর্থ কি? এর উৎস কোথায়? কেমন ক'রেই বা এর আবেদন সর্বত্রগামী হয়? আমাদের প্রাচীন রসশাস্ত্রে 'ভয়ানক ও বীভৎস'কে রস হিসাবে স্বীকার করা হয়েছে। নাট্যশাস্ত্রকার ভরত থেকে মহাকবি কালিদাস পর্যন্ত সকলেই বীভৎসকে রস হিসাবে স্বীকার করেছেন। ক্রোচে প্রমুখ আধুনিক নন্দনতত্ত্ববিদেরাও কুৎসিতকে স্থান দিয়েছেন শিল্পের সীমানার মধ্যে। কীট্‌সের চোখে সুন্দরই যদি একমাত্র সত্য হয়, তা হলে অসুন্দর মিথ্যা হয়ে যায় তর্কশাস্ত্রের সাধারণ নিয়ম অনুসারেই। কিন্তু অসুন্দর 'ত' অসত্য নয়। কুৎসিতও রূপ পেয়েছে হাজারো সার্থক শিল্পে। নোতারদামের 'হাঞ্চব্যাক' চিরদিনই মুগ্ধ করবে পাঠকদের। শিল্পলোকে দান্তের 'নরক' অমর হয়ে আছে। কবি কল্পনা-সৃষ্ট নারকীয় পরিবেশের বিরাট সৌন্দর্য-গাম্ভীর্য অতীন্দ্রিয়-লোকের সন্ধান দেয়; ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাস্তব সেখানে আত্মস্বীকৃতির দাবী জানাতে সংকোচ বোধ করে। সে নরক আমাদের কাছে চির-অন্ধকারাচ্ছন্ন; সেই অমানবীয়-লোকে স্বচ্ছ আঁধারের আবরণ ভেদ ক'রে আমরা স্যাটানের দেখা পাই। সেই সৌন্দর্য-লোকের দ্বার প্রান্তে বসে মুগ্ধ বিস্ময়ে বিজয়ী বিধাতার যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী স্যাটানের প্রতি সহানুভূতি জানাই, স্যাটানের ঐতিহাসিকতার বিচার আমরা করি না। কারণ

জানি যে আর্টের ক্ষেত্রে এ প্রশ্ন অবান্তর। রূপের ট্রুথ সেখানে সৌন্দর্যের কুহেলি সৃষ্টি করে মন ভোলায়। আর্টের ক্ষেত্রে সত্য তথ্যধর্মী হয় না, রূপধর্মী হয়। তাই আধুনিক সমালোচকেরা বাস্তব চেতনাকে অস্বীকার করেছেন বারে বারে। দার্শনিক প্রবর ডক্টর সুশীলকুমার মৈত্র ক্রোচের দার্শনিক মত ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন :

"Croce is unquestionably right in denying the consciousness of reality in art, according to him, being distinguished from logic by the absence of reality consciousness." (Studies in Philosophy and Religion). বাস্তব-সচেতনতা আর্টের ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক এই কথাই ক্রোচে জোর গলায় বলেছেন। একথা যুক্তিসহ। তিনি তথ্যের ট্রুথকে কোথাও স্বীকার করেন নি। তাঁর মতে আর্ট তখনই আর্ট পদবাচ্য হয় যখন শিল্পলোকে রূপের ট্রুথের অর্থাৎ প্রকাশভঙ্গীর রমণীয়তার অসদ্ভাব ঘটে না। ভাববাদী দার্শনিক ক্রোচের মতের সার্বভৌমতা অবশ্য সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। বার্নাড বেরেনসন্, ক্যালোগারো, গারগিয়োলো এবং আরো অনেকে ক্রোচের মতের পোষকতা করেননি বরং তাঁর মতের বিরোধিতাই করেছেন। নানান দিক থেকে ক্রোচের ভাববাদী নন্দনতাত্ত্বিক ধারণার উপর আক্রমণ চালানো হয়েছে। ক্রোচে বললেন শিল্পকর্মের ক্ষেত্রে ঘটনা হিসেবে ইন্দ্রিয়জ উপলব্ধি আসে অপরোক্ষ অনুভূতির পরে। এই ইন্দ্রিয়জ উপলব্ধি বাস্তবজীবনের ঘটনা উদ্ভূত। বাস্তব-অবাস্তবের ধারণা যেমন শিল্প পর্যায়ে অপাংক্তেয় ঠিক তেমনি ধারা ইন্দ্রিয় উপলব্ধির পর্যায়টি 'ইনটুইশন' পর্যায়ের ঘটনা। ক্রোচে কথিত এ তত্ত্বে অনেকেই বিশ্বাস করলেন না। শিল্পে ঘটনার, বস্তুবোধের কোন মর্যাদা থাকবে না একথা অনেকে মানলেন না। প্রকাশ-মাধ্যমের গৌণতাকে সকলে ক্রোচের মত অবহেলার দৃষ্টিতে দেখলেন না। তাঁরা বললেন, কাব্যের বা আর্টের বিষয়বস্তু কাব্য বা শিল্পকে মহত্তর মর্যাদা এবং মহনীয়তা দান করে। তাই ত' একদল আলঙ্কারিক মহাকাব্যের উপজীব্য বিষয়বস্তুর স্বরূপ নির্দেশ করেছেন। খণ্ডকাব্য এক ধরনের বিষয়-বস্তুর প্রবর্তনা করে। তা নিয়ে ত' আর মহাকাব্য লেখা চলে না। আবার মহাকাব্যের বিষয়বস্তু খণ্ড-কাব্যের ছোট আধারে ঠিক বাঁচে না। সে কথা ঠিক। কিন্তু খণ্ডকাব্য যে মহাকাব্যের মতই রসোত্তীর্ণ—এই রসই তাদের কাব্য জগতে প্রবেশের ছাড়পত্র। তাদের বিষয়বস্তুর দোহাই দিয়ে তারা কাব্য

শব্দবাচ্য হয় না। বস্তুজগতের সঙ্গে সত্যসাদৃশ্য (verisimilitude) শিল্পকে শিল্পের মর্যাদা দেয় না। শিল্পীর অনুভূতির সার্থক প্রকাশ শিল্প সৃষ্টি করে। বস্তুজীবন শিল্পীর কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করে—অনুভূতির সমুদ্রে আলোড়ন জাগে। সেই জাগ্রত অনুভূতির প্রকাশ ঘটে উপযুক্ত মাধ্যমকে আশ্রয় ক'রে। জীবনরূপের প্রয়োজন আছে শিল্পীর কাছে—সে তার অনুভূতিকে একমুখী করে। এই উদ্দীপ্ত অনুভূতির ধর্মই হ'ল আপনাকে প্রকাশ করা আর তাকেই আমরা শিল্পকর্ম বলি। বাস্তবের স্থান নেই এই শিল্পক্ষেত্রে। শিল্পীর চোখ দেখে এক বস্তুকে আর তার কল্পনা প্রকাশ করে আর এক রূপ। আধুনিক এবং প্রাচীন শিল্পকলার রূপ-বৈচিত্র্য এই তত্ত্বকে সমর্থন করছে। বাস্তবের প্রতিরূপই যদি শিল্প হয় তবে সে শিল্পের সার্থকতা কোথায়? বস্তুই 'ত' আছে। অভিজ্ঞতার জগৎ যেখানে প্রতিনিয়ত বিরাজিত সেখানে আবার শিল্পের আমদানী করা কেন? এর উত্তরে আমরা বলব যে শিল্প সৃষ্ট হয় বাস্তবের সৌন্দর্য-ক্ষুণ্ণতার জন্য। শিল্পীর দেখা রূপটি বস্তু জগতে অলভ্য। জীবনের স্থূলতা সে সূক্ষ্ম রূপকে রূপায়িত করতে পারে না। জীবনের মুখোমুখী দাঁড়িয়ে শিল্পীমনে সে রূপের আভাস জাগে শুধু; শিল্পী তাঁর সুনির্বাচিত মাধ্যমে সে রূপকে সত্য করে তোলে এক অনন্য প্রকাশ-ভঙ্গীতে। এই প্রকাশটুকুই শিল্পীর কৃতিত্ব—তাকেই আমরা শিল্পকর্ম বলছি।

দার্শনিক বললেন, Form-ই হ'ল আর্টের প্রাণ, আর কবি বললেন ট্রুথই হ'ল শিল্পের প্রাণ। তবে এ ট্রুথ তথ্যের নয় রূপের। Form এবং Content এই দুইয়ে মিলিয়ে আর্টের সৃষ্টি হয়, এ কথা হ'ল নরমপন্থীদের কথা। যাঁদের ধারণার বলিষ্ঠতা নেই, তাঁরাই একথা বলবেন। সত্যের চেয়ে অসত্যের বোঝাটাই এখানেই ভারী হয়ে ওঠে। কারণ আমরা যে শিল্পকে বাস্তবধর্মী বলব, অর্থাৎ যেখানে Content পাটরানী হয়ে বসেছে, সেখানে আর্টের অপমৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। কারণ প্রকাশই (intuition-expression) হ'ল আর্টের প্রাণ। মানুষের অন্তর্লোকবাসী চিন্ময় শক্তির উদ্বোধন হয় এই পথে। তাই যেখানে বস্তুর (Content) প্রাধান্য সেখানে আত্মা (Spirit) গৌণ পড়ে। তার প্রকাশ ব্যাহত হয়। ক্রোচে বলেছেন: **The aesthetic fact, therefore, is form and nothing but form. The poet or painter who lacks form, lacks everything because**

he lacks himself, the expression alone i. e. the form makes the poet."

অর্থাৎ রূপের ট্রুথ হ'ল শিল্পের প্রাণ। রূপরচনাভঙ্গী কবি ও শিল্পীকে যথার্থ কবি ও শিল্পী করে তোলে। আর্টের বিষয় বাছাই নিয়ে সত্যিকারের আর্টিস্টকে মোটেই ভাবতে হয় না। ভাঙা পাঁচিলের পরে ফোটা নাম-না-জানা ফুল আর সূর্য-সোহাগী সূর্যমুখীর শিল্পের কাছে সমান আদর। শিল্পী মনের রং লাগে বাইরের জগতে এবং তারই ফলে বাস্তবের রূপান্তর ঘটে কলাচারুতায়। শিল্পীর জগতে পাশাপাশি বাস করেন সম্রাটের প্রেয়সী মমতাজ আর 'ক্যামেলিয়া' কবিতায় 'সাঁওতালী' রমণী। বাইরের জগতে ব্যবহারিক জীবনে এদের ব্যবধানটা দুস্তর হলেও শিল্পের জগতে এঁরা প্রতিবেশী। জীবন থেকে শিল্পী যাঁদের গ্রহণ করেন তাদের তিনি প্রতিভার জারক রসে জারিত ক'রে অনায়াসে রসলোকে উত্তীর্ণ ক'রে দেন। রসলোকে এই উত্তরণের গুপ্ত মন্ত্রই হ'ল কবির প্রতিভা, শিল্পীর জাদু।

কবি প্রতিভার পরশপাথরে ছোঁয়া লেগে বাক্যের অচল বোঝা সচল হয়ে ওঠে। বাউলের মত উড়ে চলার 'ভাও' জানে কবির কবিতা। প্রাণ এবং গতি মেতে ওঠে অচলায়তনের নাড়ীতে নাড়ীতে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'সাহিত্যের মূল্য' প্রবন্ধে বলেছেন যে এই প্রাণ সঞ্চারিণী শক্তিই হ'ল শিল্পীর প্রতিভা। কবি-প্রতিভার স্পর্শ পুলকিত কাব্যের উদাহরণ দিয়েছেন তিনি :

'তোমার ঐ মাথার চূড়ায় যে রঙ আছে উজ্জলি
সে রঙ দিয়ে রাঙাও আমার বুকের কাঁচলি।'

এখানে আমরা জীবনের স্পর্শ পাই, এক অসংশয়ে গ্রহণ করা যেতে পারে। কবির কাব্যোক্তির মধ্যে উচ্ছ্বাস আছে, প্রাণ আছে, সর্বোপরি আছে প্রকাশের আন্তরিকতা বা Sincerity ; অতি সাধারণ কয়েকটি কথায় কবি অনির্বচনীয় ভাব প্রকাশ করেছেন অনন্ত কৌশলে। এই কৌশলই হ'ল কাব্যের প্রাণ, শিল্পীর সোনার কাঠি, রূপোর কাঠি, যার স্পর্শে প্রাণ পায় ঘুমন্ত পুরীর রাজকন্যা। এখানে কাব্য সত্য হয়ে উঠেছে রূপকে আশ্রয় ক'রে, তথ্যকে আশ্রয় করে নয়। শিল্পীর প্রকাশভঙ্গী যে রূপ (form) দিয়েছে তার সৃষ্টিকে, সেই রূপই তাকে আর্ট পদবাচ্য করেছে। শিল্পীর মানসলোকে সৃষ্টির যে অনির্বচনীয় লীলা নিয়ত চলেছে তারই দোলায় দোলায়িত হয়েছে রসজ্ঞ পাঠকের সমগ্র চেতনা। কলারসিকের কাছে আর্টিস্টের সৃষ্টি বাস্তব জীবনের

চেয়ে অনেক বড়। তাই ত অযোধ্যার চেয়েও বৃহত্তর মর্যাদার দাবী জানায় বাল্মীকির মানসলোক। কবির মানসলোকে জন্ম নিয়েছেন যুগ-যুগান্তরের মানুষের নিত্য-পূজিত শ্রীরামচন্দ্র। ইতিহাসের রামচন্দ্র আমাদের কাছে আজও অজ্ঞাত। তাঁর ইতিহাসে কালের স্থূল হস্তাবলেপ পতিত হয়েছে। দশরথ-পুত্র রামচন্দ্রের পরিচয় আজ কলারসিকের কাছে অবান্তর। আমাদের মত আরও হাজারো মানুষের অন্তরে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন বাল্মীকির মানসপুত্র শ্রীরামচন্দ্র। কেউ কোন দিন তাঁর সত্যতাকে অস্বীকার করেন নি, ভবিষ্যতেও করবেন না। প্রবাদ আছে যে রাম না জন্মাতেই রামায়ণ লেখা হয়েছিল। নন্দনতাত্ত্বিকের দৃষ্টি নিয়ে দেখলে আমরা এই প্রবাদটি থেকে নিগূঢ় সত্যের সন্ধান পেতে পারি। বাস্তব রামের যখন জন্মই হল না তখন যদি রামায়ণের মত মহাকাব্য রচিত হতে পারে তবে শিল্পের ক্ষেত্রে বাস্তব জীবনের প্রয়োজন কতটুকু তা সহজেই অনুমেয়। আমাদের দেশের আর একখানি মহাকাব্যের কথা বলি। মহাভারতের ঐতিহাসিকতায় পাশ্চাত্ত্যদেশের প্রায় সব প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্ এবং এদেশেরও কেউ কেউ সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।

অনেক দুরূহ গবেষণান্তে এঁরা এই কথাই আমাদের শোনালেন যে কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ কোনকালে হয় নি ; হয়েছিল কুরুপাঞ্চালের যুদ্ধ এবং সে যুদ্ধে পাণ্ডবেরা গৌণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। কুরুপাণ্ডব যুদ্ধের যে পাণ্ডবদের আমরা জানি যাঁরা বলে, বীর্যে, ক্ষমায়, মহত্ত্বে অনন্য তাঁরা ইতিহাসের মানুষ নন, তাঁরা কবির কল্পলোকের অধিবাসী। তাঁদের কাব্যরূপটাই কালক্রমে বাস্তব রূপ হয়ে উঠেছে। কেউ ত পাণ্ডবদের ঐতিহাসিকতায় সন্দেহ করেন না। আদর্শ পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের ঐতিহাসিকতাও গবেষণার বস্তু। ইতিহাসের ছাত্র নিঃসন্দেহে শ্রীকৃষ্ণের ঐতিহাসিকতা স্বীকার নাও করতে পারেন। এঁদের ঐতিহাসিকতা 'ত' এঁদের সত্য বলে গ্রহণ করার পথে কোন প্রতিবন্ধকতা করে নি। এঁরা যেখানে সত্য সেখানে বাস্তবের মালিন্য পৌঁছায় না—বস্তুর স্থূল অস্তিত্ব এঁদের কোনকালে না থাকলেও এঁরা সব অলীক হয়ে যান নি। শিল্প সৃষ্টির মধ্যে এমন একটি আবেদন, এমন একটা দেশকাল নিরপেক্ষ স্বাতন্ত্র্য থাকে যেটা বাস্তব অবাস্তবের খাঁচায় ঠিকমত ধরা যায় না। বস্তু জগতে অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে হয়ত সে অতি সাধারণ, যার হয়ত কোন মূল্যই চোখে পড়ে না, তাকেই যখন আবার শিল্পের রূপমধ্যে দেখি, 'শিল্পীর দেওয়া নোলক' পরে যখন সে আমাদের সামনে এসে দাঁড়ায় তখন তাকে গ্রহণ করি অনায়াসে

স্বচ্ছন্দে। তার সত্যিকারের বস্তুরূপের কুশ্রীতা, দৈন্ত বা মালিন্ত কিছুই আমাদের পক্ষে তার শিল্প রূপের রসোপলব্ধির পথে অন্তরায় হয় না। শাইলকের ব্যক্তি-চরিত্রের অতি সাধারণতা, তার চিত্তের দৈন্ত, তার অমিত লোভ কিছুই রসিকজনার কাছে তাকে অগ্রাহ্য করে তোলে নি। কেন না সে চরিত্র সার্থক স্থষ্টির দ্যুতিতে দ্যুতিমান। অবশ্য এই দ্যুতির স্বরূপ বিশ্লেষণ করা পণ্ডিত-জনারও অসাধ্য। শিল্পীরাও সঠিক বলেন নি এই দ্যুতি বস্তুটি কি? কী সে গোপন মন্ত্রটি যার উচ্চারণে বাস্তব জীবনের অসুন্দরও শিল্পের নাট্যমঞ্চে সুন্দর হয়ে দেখা দেয়। এর উত্তর আগে মেলে নি। বাস্তব জীবনে যাকে ঘৃণা করেছি, যাকে মানুষের মর্যাদা দেবার মত দাক্ষিণ্যটুকুও অবশিষ্ট রইল না, তাকেই যখন দেখি সাহিত্যে, সংগীতে, চিত্রে, তখন তাকে অস্বীকার করবার ক্ষীণ ইচ্ছাটুকুও মনে জাগে না। আর একটা উদাহরণ দিই পাখী হিসেবে কাকের কোন গৌরব নেই। আমরা তাকে অবহেলাই করি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের 'আকাশ প্রদীপে' বর্ণিত পাখীর ভোজে অনাহূত কাকের দল আমাদের মনকে পীড়া দেয় না। হঠাৎ দেখা এক মুহূর্তের দেখা ঘটনা শিল্পীর অঘটন ঘটন পটিয়সী কল্পনার জাদুতে অমর হয়ে ওঠে। অসুন্দর হয় সুন্দর, ক্ষণিক হয় শাশ্বত। তাই বলছিলাম শিল্পীর অন্তরের পরশমণি মহত্তর সত্য স্থষ্টির উৎস। কাব্য-সত্য বস্তু-সত্যের অনেক উর্ধে, বাস্তবের সীমানার বাইরে।

শিল্পে সার্বিকতা

আর্ট বলতে আমরা বুঝি আত্ম-অনুভূতিকে আত্মস্বতন্ত্ররূপে প্রত্যক্ষ করা। যে মন অনুভব করে রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দকে, সেই মনই করে শিল্পের রচনা। শিল্পসৃষ্টির পিছনে জেগে থাকে শিল্পীর বহু বিনিদ্র রাত্রির সাধনা, বহু অনলস দিনের প্রয়াস। সত্যিকারের শিল্পবোধ সহজাত। একে ঘষে মেজে উজ্জ্বল করা যায় সত্য কিন্তু যেখানে এর দৈন্য অনস্তিত্বের পর্যায়ে এসে ঠেকেছে সেখানে শিল্পের রসোপলব্ধি সম্ভব নয়। মূলতঃ শিল্পীর সাধনা হ'ল প্রকাশের অনন্ত প্রয়াস। তরুর জীবনে যেমন চলে ফুল ফোটাবার দুশ্চর তপস্যা, ঠিক তেমনি করেই শিল্পী-মন প্রকাশের পথ খোঁজে। হঠাৎ হাওয়ায় ভেসে আসা ধন শিল্পী মনে চমক লাগায়, অমনি ঘটে শিল্প-বোধের উদ্বোধন। যে মন উন্মুখ হয়ে আছে বন-বেতসের ক্ষীণতম নৃত্যচ্ছন্দে আত্ম-বিস্মরণের জন্য, উপলব্ধির পক্ষে তার প্রস্তুতির প্রয়োজন নেই বললেই চলে; তবে এটা সত্য তখন পর্যন্ত যতক্ষণ শিল্পানন্দের অনুভব চলে অন্তরলোকে। বাইরের জগতে তাকে রূপাশ্রয়ী করবার তাগিদ এলেই সাধনার কথা ওঠে; শিল্পী মননের অনলস প্রয়াসের কথা আমরা চিন্তা করি।

আঁধার রাতে সাগর সৈকতে ভেঙ্গে পড়া ঢেউয়ের মাথায় যখন ফসফরাসের দ্যুতিমান আলো ক্ষণিকের ঘর্ষণের উত্তেজনায় জ্বলে ওঠে তখন অনন্তকালের অবগুণ্ঠনের ফাঁকে ফাঁকে যে শুভ্র সৌন্দর্য লক্ষ্মীর বারে বারে আবির্ভাব ঘটে তাঁকে অকুণ্ঠ চিত্তে অভিবাদন জানায় মানুষের বিমুগ্ধ শিল্পী-মন। সে অন্তরশায়ী বিমুগ্ধতার উপলব্ধি ঘটে গ্যেটে বা রবীন্দ্রনাথের চিত্তলোকে আবার সাধারণ মানুষের অন্তরেও। মানুষের বিরহী চিত্ত কাঁদে, অশ্রু-ধৌত হৃদয় আকাশে দূর স্বর্গপুরীর সন্ধানও হয়ত মেলে, কিন্তু চিত্তের বহিরঙ্গন দ্বারের বাইরে এনে তাকে সবার সামনে মেলে ধরবার শক্তিটুকুই হ'ল শিল্পীর নিজস্ব সম্পদ। পরমের গীতি বহুবার ধ্বনিত হয়েছে সাধারণ মানুষের মনে কিন্তু আমি যদি তাকে মনোলোকের বাইরে এনে বিশ্বমানবের গোচর না করতে পারি তবে তা আমার একান্ত আপন বস্তু হয়ে রইল। কৃপণের অনুদার উপভোগ তার বিস্তৃতি ঘটালো না সারাদেশের ঘাটে ঘাটে। অশক্ত মনের বেড়া ডিঙিয়ে সে ধারার গতি হ'ল না সর্বত্রগামী; যে জল-রেখা সীমা বিস্তৃতির আনন্দ প্রাচুর্যে তটে তটে রচনা করতে পারত অগণ্য রসতীর্থ, সে রইল মনের অতলে ঘুমিয়ে।

যে নির্ঝরের মধ্যে ছিল প্লাবনের সম্ভাবনা, তার স্বপ্নভঙ্গ ঘটল না। অখ্যাত মূক মিল্টনের দল প্রকাশের অভাবে সমাজে স্বীকৃতি পেলো না। এদেরও হয়ত ছিল কল্পনার উদাত্ত সঞ্চরণ, ছিল সৌন্দর্যভোগের অপরিসীম তন্ময়তা।

উপলব্ধির দৃষ্টিকেন্দ্র থেকে বিচার করলে আমি যে অসীম আনন্দ লাভ করলাম সুন্দরের অনুধ্যানে, তাকেই চরম বলে স্বীকার করব। নাই বা হ'ল আমার নিগূঢ় অনুভূতির বাইরে প্রকাশ, নাই বা অন্তর লক্ষ্মীকে সকলের সামনে মেলে ধরলাম আত্মবিজ্ঞানের মোহে। বাইরে প্রকাশ করার শক্তি-বৈশিষ্ট্যকে অস্বীকার করছি না। তার প্রকৃতি ভিন্ন। শুধু বলছি প্রকাশ ক্ষমতাহীন শিল্পীও শিল্পী। যে শিল্পী কায়া দিলে না তার অনুভূতিকে, রূপ, পেল না যার শিল্প-অনুভূতি, তাকে আমরা একেবারে অস্বীকার করব না। কারণ বাইরে কাগজে কলমে বা ক্যানভাসের বুকে রূপ দেওয়া হ'ল আঙ্গিকের ব্যাপার। দার্শনিক ক্রোচে একে 'টেকনিক' বলেছেন। এই টেকনিকের সাহায্যে আত্ম-অনুভূতিকে বিশ্বের রসিকজনের দরবারে হাজির করা হয়, একথা অবশ্যই স্বীকার্য। এই প্রকাশ-শক্তিহীন শিল্পীর দল যে কাব্যনন্দের আস্বাদন করে তা কোন অংশে কম নয়। সুন্দরের সামনে নতজানু হয়ে এরা গোপনে যে অর্ঘ্য রচনা করে তার মূল্য অপরিসীম। রবীন্দ্রনাথ বুঝি এই ধরনের শিল্পী মনের আত্ম-কথাই ব্যক্ত করেছেন!

"সংগীত তরঙ্গধ্বনি উঠিবে গুঞ্জরি
সমস্ত জীবন ব্যাপি থর থর করি।
নাই বা বুঝিনু কিছু নাই বা চলিনু
ছন্দোবন্ধ পথে, সলজ্জ হৃদয়খানি
টানিয়া বাহিরে। শুধু ভুলে গিয়ে বাণী
কাঁপিব সংগীত ভরে, নক্ষত্রের প্রায়
শিহরি জ্বলিব শুধু কম্পিত শিখায়।...

(মানসসুন্দরী)

আবার মন যেখানে প্রকাশের সাধনা করেছে, শিখেছে কেমন করে ব্যক্তিগত আনন্দকে ছড়িয়ে দিতে হয় বিশ্বভুবনে সে-ই পেয়েছে আত্মপ্রকাশের বিমল আনন্দের আস্বাদ; তাকে আমরা প্রতিভা বলি। সেখানে আমার আর 'আমার' রইল না, সে হ'ল বিশ্বমানবের। সেখানে সম্ভব হ'ল বীটোফেনের "মুনলাইট সোনাটার" মত অপূর্ব সুর-সম্পদের সৃষ্টি। শিল্পীর মন কেন

ক্যামেরা। খোলা চোখ দিয়ে শুধু দেখা যায়। আরও দশজনকে দেখাতে হলে ক্যামেরার সাহায্য না নিলে চলে না। শিল্পীর প্রতিভা হ'ল এই ক্যামেরার ভিতরকার কলকব্জা। কেমন করে উল্টোপাল্টা রীতি পদ্ধতির মাধ্যমে সুন্দর ছবিখানি পাই তা আমরা জানি না। প্রতিভার জারকরসে জারিত হয়ে কেমন করে অতি পরিচয়ের মরচে ধরা বস্তু-জীবন স্বপ্নলোকের স্বর্ণাভায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে তা আমাদের অজ্ঞাত। হঠাৎ কখন আপন গোপন ঘরের আগল খুলে প্রতিভা এসে ছুঁয়ে গেল বস্তু জীবনের আবেদনকে, তা আমরা সঠিক বলতে পারি না, তবে তার গোপন অভিসারকে মানি। এই মানার মধ্যেই রয়ে গেল শিল্পলোকে প্রতিভার দ্বন্দ্বহীন স্বীকৃতি।

এবার বলি ইউনিভার্স্যালিটির কথা। এই শব্দটির প্রতিশব্দ হিসেবে গ্রহণ করেছি সর্বজন-অধিগম্যতা'কে। শিল্প হবে বিশ্বমানবের অধিগম্য, এ হ'ল অতি সাধারণ কথা। এর মধ্যে জটিলতা নেই। দেশ এবং কালের সীমা ছাড়িয়ে শিল্পের অবদান পৌছুবে সর্বত্র। এ দেশের কবি যে বিরহ মিলনের কাহিনী বলবে তার বুকের রঙে রাঙিয়ে তাকে অভিনন্দিত করবে ও দেশের মানুষ আনন্দ-অশ্রুর অর্ঘ্য দিয়ে। এই ইউনিভার্স্যালিটির ধারণা শিল্প ধারণার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে। শিল্প ধারণাকে বিশ্লেষণ করলে আমরা পাই এই ইউনিভার্স্যালিটির ধারণা। "শিল্প হল সর্বজন অধিগম্য" একে আমরা এনালিটিক জাজমেণ্ট বলতে পারি মহাদার্শনিক কাণ্টের ভাষায় (critique of Pure Reason দ্রষ্টব্য)। যদি শিল্পকে 'উদ্দেশ্য' বলি তবে 'সর্বজন-অধিগম্য' হবে তার 'বিধেয়' এবং এই বিধেয়ের ধারণা উদ্দেশ্যের মধ্যেই নিহিত আছে।

আমরা শিল্পকে ইউনিভার্স্যাল বলি এবং সহজেই স্বীকার করে নিই যে রসোত্তীর্ণ হয়েছে যে শিল্প তার আবেদন পৌছুবে সকল মানুষের মনের মণিকোঠায়। এ তত্ত্ব যদি এতই স্বচ্ছ তবে আর্টে ইউনিভার্স্যালিটির প্রশ্নে এত জটিলতা আসে কেন? সমস্যাটা যদি এতই সহজ হয় তবে রবীন্দ্রনাথের মত মহাকবির মুখে কেন শুনি এই কথা যে তাঁর কবিতা সর্বত্রগামী হয়নি। কেন তিনি তাঁর পরে যে কবি আসবেন, গাঁথবেন নতুন কথার মালা, আঁকবেন নতুন ধরনের ছবি, 'সে কবির বাণী লাগি' কান পেতে থাকেন? কেনই বা দরকার হয় একই বিষয়বস্তু নিয়ে ফিরে ফিরে গান গাওয়ার; যে কথা বলেছেন পূর্বসূরীরা সেই কথাই নূতন ছন্দে, নূতন শৈলীতে পরিবেশন করলেন এ যুগের

শিল্পী। তার জন্ত ত তিনি অপাংক্তেয় হয়ে থাকেন না। পুরাতন, বহু-কথিত বিষয়বস্তুর জন্ত তাঁর শিল্প অস্বীকৃতির অপমানে লাঞ্ছিত হয় না।

আবার নতুন কথা, নবতর সমস্যা নিয়ে শিল্প-রচনা ক'রেও শিল্পী স্বীকৃতির মর্যাদা পান না। এমনটা কেন হয়? কোথায় ঘটে রসাভাস? আমাদের বিচার করতে হবে কোথায় ত্রুটি ঘটলে রসের উৎস যায় শুকিয়ে। আবার শিল্প-রসোত্তীর্ণ হলেও তা কি সকলে বোঝে?' বর্ষার গান শুনে সকলের মনেই কি বর্ষা নামে? আধুনিক বাংলা কবিতা পড়ে বুদ্ধিজীবী সমস্ত বাঙালী পাঠকই তার রস গ্রহণ করতে পারে কি? এ কথা স্বীকার না ক'রে উপায় নেই যে সকল সমাজেই অন্ততঃ কয়েকজন থাকেন, যাঁরা না বোঝার আনন্দেও মেতে ওঠেন। এঁরাই হলেন আমাদের সমস্যার মূল। প্রশ্নটা এখানেই ওঠে যে শিল্পের সাফল্য কি তবে রসবেত্তার শিক্ষাদীক্ষা ও মনন-রীতির উপর নির্ভর করে?

একথা অস্বীকার করে লাভ নেই যে শিল্প জগতের অনেক মহারথীই আজ ক্লাসিক হয়ে গেছেন। উনবিংশ শতাব্দীর এমন অনেক খ্যাতনামা কবি আছেন যাঁদের কবিতা আজ আর আমাদের অনেককেই তেমন আনন্দ দিতে পারে না। সে যুগের এপিক আধুনিক পাঠকের মনে সাড়া জাগায় না অনেক সময়েই। আবার হয়ত কারুর বিচারে দুর্বোধ্যতার ধার-ঘেঁষা আধুনিক কবিতাগুলি অনবদ্য। আপনার মন হয়ত অনুভূতির সহজতাকে ছাড়িয়ে উঠে গেছে শুষ্ক বুদ্ধির অনুর্বর লোকে, তাই আপনার ভালো লাগে এই ধরনের কাব্যকে। আমার যা ভালো লাগে তাকে ইউনিভার্স্যাল বলা চলে না আপনার তা না ভালো লাগার জন্ম, আবার আপনার যা ভালো লাগে তাকে গ্রহণ করা চলে না ইউনিভার্স্যাল বলে কারণ আমি সেটা অনুমোদন করি না।

আপনি এবং আমি উভয়েই গোষ্ঠীপতি। আমাদের এই উভয় ধরনের অনুভূতির জগতে বহু লোকই আছেন যাঁদের অনায়াসে খুঁজে বার করা যায়। অতএব দেখা যাচ্ছে, অভিধানগত অর্থে কোন কাব্য বা শিল্পই ইউনিভার্স্যাল নয়। আপনি সেক্সপীয়র প'ড়ে যে আনন্দ পান, বাবু মুচিরাম গুড় হয়ত সে রসে বঞ্চিত। অবনীন্দ্রনাথের ছবি আমার বেশ ভালো লাগে; আবার রবীন্দ্রনাথের অনেক ছবিই বুঝি না। কবির ব্যঞ্জনাবহুল ছবির প্রদর্শনী দেখে ফরাসী দেশের লোকেরা খুশি হয়েছিল, অঙ্কনশিল্পী হিসেবে রবীন্দ্রনাথের খ্যাতি ছড়িয়ে

পড়েছিল দিগ্বিদিকে। আমাদের এই ভালো লাগা, এই খুশি হওয়া এটাই শিল্পীর চরম পুরস্কার। এই ভালো লাগা আবার নির্ভর করে রসবেত্তার রুচির ওপর।

মানুষের রুচি ভিন্নধর্মী। শিক্ষা, দীক্ষা ও পরিবেশ মানুষের রুচিকে গড়ে তোলে, তার মনোধর্মকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেয়; শিল্প আবার এই মনের কাছেই দরবার করে। তাই কোন শিল্পই সর্বজন-অধিগম্য হতে পারে না। শিল্প-সৌধের বিশেষ বিশেষ কারুকার্য বিশেষ বিশেষ মনে সাড়া তোলে। কেউ হয়ত সৌধের বিরাটত্বে মুগ্ধ হয়। কেউ হয়ত খুশি হয়ে ওঠে খিলানের ওপরের মিনে করা কারুকার্য দেখে। যে অর্থে আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুন ইউনি-ভার্সাল, সে অর্থে আর্ট ইউনিভার্স্যাল নয়। শিল্পবস্তুর আবেদন শিল্পবোদ্ধার রসবোধের ওপরে নির্ভরশীল, একথা আগেই বলেছি। একজন খাঁটি বৈষ্ণব যেভাবে তার সমস্ত সত্তা দিয়ে, সারা অন্তরকে উন্মুখ করে উপভোগ করেন কৃষ্ণ প্রেমলীলার একটি উপাখ্যানকে, ঠিক তেমনি করে সে কাব্য-কাহিনীর রস গ্রহণ করবার শক্তি সাধারণ পাঠকের নেই। ভক্ত বৈষ্ণবের কাছে বৈষ্ণব সাহিত্যের সাহিত্যাতীত একটা মূল্য আছে। তাঁর কাছে রাধাকৃষ্ণের প্রেম-লীলার কাহিনী রসমাধুর্যে অনুপম। আমরা সে রসে বঞ্চিত। উদাহরণ দিই:

পহিলহি রাগ নয়ন ভঙ্গ ভেল।
অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল॥
না সো রমণ, না হাম রমণী।
দুঁহু মন মনোভব পেশল জানি॥
এ সখি! যে সব প্রেম কাহিনী।
কানুধামে কহাব, কিছুরহ জানি॥
না খোজলুঁ দূতী, না খোজলুঁ আন
দুঁহু কেরি মিলনে মধ্যত পাঁচ বাণ।
অব মোই বিরাগ, তুহুঁ ভেলি দূতী॥
সুপুরুষ প্রেমক ঐছন রীতি॥ (শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত ২।৮।২২৭ পৃঃ)

অর্থাৎ কলহান্তরিতা রাধা দূতীক বললেন 'দূতি! কৃষ্ণকে ব'লো যে আমাদের মনে নয়নভঙ্গী দ্বারা সৃষ্ট পূর্বরাগ ক্রমেই সীমাহীন বিস্তৃতি লাভ করেছিল। যদিও পত্নীপতির বন্ধনে আমরা আবদ্ধ নই তবুও কন্দর্প আমাদের দুটি মনকে নিবিড় ঐক্যে এক করে দিয়েছিল। আমাদের মিলনের দূত ছিল

স্বয়ং পঞ্চবাণ মদন। আর আজ কৃষ্ণ বীতরাগ হওয়ায় তোমাকে দূতীরূপে মধ্যস্থতা করতে হচ্ছে। সুপুরুষের প্রেমের রীতি এমনই হয়।" এ কবিতার আবেদন আমাদের কাছে সাহিত্যমূল্য দাবী করে আর ভক্ত বৈষ্ণবের কাছে বিকায় ভক্তিমূল্যে। যিনি ভক্ত, যিনি মধুর রসের রসিক তাঁর কাছে এই কয়েক ছত্রের মূল্য ভক্তির দিক দিয়ে অপরিসীম। তাঁর দৃষ্টি দিয়ে রসবিচার করতে পারি না বলেই তাঁর অনুভূতির গভীরতা আমাদের কাছে অজ্ঞাত থেকে যায়। তাই বলছিলাম শিল্প-সুরের ধ্বনি বিভিন্ন মনে বিভিন্ন ধরনের প্রতিধ্বনি তোলে। কোথাও হয়ত আবার কোন সাড়াই জাগল না। রসবেত্তার আবেগ-প্রবণতা মননধর্ম ও রুচির ওপরে শিল্পের সাফল্য অনেকখানি নির্ভর করে, একথা আবার বলছি।

হয়ত কোন সমালোচক বলবেন যে, আর্টের ইউনিভার্স্যালিটিকে এইভাবে ব্যাখ্যা করলে আর্টের প্রকৃতিকে ক্ষুণ্ন করা হয়। কিন্তু এ ছাড়া পথ নেই। মানুষের অনুভূতি লোকে শিল্পের আবেদন গিয়ে পৌছায়। সে যে বুদ্ধির দ্বারে ভুলেও যায় না একথা আমি বলছি না। বুদ্ধিই বলুন আর অনুভূতিই বলুন, তা ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তি। এমন নিরালম্ব বা প্রত্যক্ (abstract) বুদ্ধি অথবা অনুভূতি নেই, যাকে আশ্রয় ক'রে শিল্প বাঁচতে পারে। তাই ব্যক্তি-বিশেষের মনে যে সাড়া জাগে, তারই ওপর শিল্পের সাফল্য নির্ভর না ক'রে পারে না ; যদি কেউ আপত্তি তোলেন এই ব'লে যে শিল্পের মূল্যকে সম্পূর্ণরূপে বোদ্ধার রসবোধের উপরে নির্ভরশীল করলে আর্টের বিষয়গত (objective) মূল্য অনেকখানি কমে যাবে। শুদ্ধ মাত্র সাবজেকটিভ বা ব্যক্তিনির্ভর হ'লে শিল্পের অপমৃত্যু ঘটবে। এই আপত্তির উত্তরে আমরা অধ্যাপক কলিংউডের কথায় বলব যে শিল্পমূল্য সব সময় নির্ণীত হয় ব্যক্তিবিশেষের দ্বারা [The Principles of Art দ্রষ্টব্য]। ব্যক্তি না থাকলে শিল্প থাকে না। আমি চোখ মেলেছি বলেই পুবে পশ্চিমে আলো জ্বলে উঠেছে। যাঁরা শিল্পে বা আর্টে এই 'Subjectivity'কে অস্বীকার করেন, তাঁদের ধারণা স্বতন্ত্র।

তা হ'লে আমরা দেখলাম যে আর্টের ক্ষেত্রে ইউনিভার্স্যালিটি কথাটির অর্থ বিশেষ ভাবে সীমাবদ্ধ। শিল্পের আবেদন সর্বশ্রেণীতে পৌছুতে পারে। বুর্জোয়া শিল্প বা প্রলেটারিয়েট শিল্প বলে কিছু নেই। কোন শিল্পের আবেদন অন্য শ্রেণী মানুষের কাছে পৌছায় না। অর্থাৎ এক শ্রেণীর সমস্ত মানুষই কোন বিশেষ শিল্পের রস গ্রহণ করতে পারবে একথা মোটেই যুক্তিসহ বলে মনে

হয় না। শিল্পীর সমসাময়িক কোন মানুষই হয়ত তাঁর শিল্পকে বুঝতে পারল না। তাই শিল্পীর জীবনে হয়ত এলো না কোন রসবেত্তার কাছ থেকে সানন্দ স্বীকৃতির অভিনন্দন। কিন্তু তারপরের যুগের এক রসজ্ঞ সমালোচক হয়ত খুঁজে বার করলেন এই অখ্যাত শিল্পীকে। এ 'ত' মানব ইতিহাসের অতি পরিচিত ঘটনা। হয়ত হাজার বছর আগে এক অখ্যাত শিল্পীর হাতে শিলাগাত্রে যে ছবি ফুটে উঠেছিল, তাকে মর্যাদা দিল এ যুগের মানুষ। তবে এ যুগের সবাই যে তাকে বুঝবে একথা আমি বলছি না। সকল শিল্প বা আর্ট সবার জন্য নয়। এখানে অধিকার ভেদ মানতেই হবে। রঁমা রঁলা ঠিক এই কথাই বলেছেন: "Art is not the Rendez-vous of all" (John Christopher Vol. III), শিল্পের ক্ষেত্রে অধিকারীর প্রবেশাধিকার আছে, সকলের তা নেই। যিনি সাধনা করেছেন শিল্প সৃষ্টির জন্য আর যিনি করেছেন রসোপলব্ধির সাধনা, তাঁরা দু'জনে একই কোটির মানুষ। পূর্ণ রসোপলব্ধির জন্য সাধন-মননের প্রয়োজন হয় ঠিক যেমনটি হয় সত্যিকারের শিল্প সৃষ্টি করতে হ'লে।

সেক্সপীয়রকে পুরোপুরি বুঝতে হ'লে তাঁর মননধর্মী এক অনন্যসাধারণ মানুষের দরকার। যাঁর জীবনে আছে সেক্সপীয়রের মত দুরূহ তপস্যা আর অন্তহীন রসবোধ তিনিই পান সেক্সপীয়রের মত রসলোকে সঞ্চরণের অবাধ অধিকার। সে লোকে সাধারণ মানুষের থাকবে শুধু খুঁড়িয়ে চলার অধিকারটুকু। আবার অনেকের পক্ষে হয়ত সে জগৎ হবে নিষিদ্ধ ভূমি, তাঁদের জীবনে রসের সাধনা নেই, সৃষ্টির তপস্যা নেই, তাই শিল্পলোকের অমৃত থেকে তাঁরা বঞ্চিত হলেন। আমাদের দেশের এ যুগের মানুষের কথাই বলি। আমরা আজও গ্রীক ভাস্কর্য দেখে মুগ্ধ হই। হোমারের কাব্য আজও আমাদের আনন্দ দেয়। ডান্টে, ভার্জিল আজও দীপক তানে আমদের মনে আগুন জ্বালায়; আবার তাদের মল্লার সুরে বর্ষা নামে। দেশ-কালের ব্যবধান শিল্পের আবেদনকে ক্ষুণ্ণ করতে পারে না। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, আর্টের আবেদনের 'ইউনিভার্স্যালিটি' স্থান ও কাল নিরপেক্ষ। কোন এক দেশের বা কোন এক কালের সমস্ত মানুষকে আনন্দ দিতে না পারলেও সত্যিকারের শিল্পসৃষ্টি রসবেত্তা মানুষকে চিরকালই আনন্দ দেবে তা সে যে কোন দেশের বা কালেরই হোক না কেন। এই অর্থেই আর্ট বা শিল্প ইউনিভার্স্যাল বা সার্বলৌকিক। এখানেই শিল্পীর এবং শিল্পের চরম সার্থকতা।

শিল্পে অধিকারভেদ

এ তত্ত্ব বিদগ্ধ মহলে সুপরিচিত যে শিল্পে সকলের সহজাত অধিকার নেই। অনেকের মতে সৃষ্টি সম্বন্ধে এ কথা সর্বসম্মত হলেও রসগ্রহণ ব্যাপারে এ তত্ত্ব পূর্ণ সত্যের দাবী করে না। রসগ্রহণ ব্যাপারে অধিকার জিনিসটা অনুশীলন সাপেক্ষ। চাষীর ছেলে বলেই তার জন্মগত অনধিকার রয়ে গেল শিল্পলোকে, আর উচ্চ বর্ণাশ্রমধর্ম আমি যেহেতু পালন করেছি অমনি শিল্পলোকে প্রবেশের ছাড়পত্র পেয়ে গেলাম অনায়াসে, এর কোনটাই বিচারসহ নয়। শিল্প-রস-সম্ভোগ হ'ল এক ধরনের ব্যক্তিগত সৃষ্টি, এ কথাটা গোড়াতেই মেনে নিচ্ছি। এখানে আমি দার্শনিক ক্রোচের অনুগামী। তবে সে সৃষ্টি মুগ্ধ করে শুধু আমাকে; আমার মত আরও দশজনকে, অজন্তা বা ইলোরার গুহাচিত্রের মত শিল্পকর্ম আরও হাজার জনকে হাজার বছর ধ'রে যা মুগ্ধ করে সে সৃষ্টির সঙ্গে এ সৃষ্টির পার্থক্য আছে। এ ভেদটা হ'ল প্রদীপশিখার সঙ্গে সূর্যের প্রভেদ। প্রদীপশিখা আমার মনে আলো জ্বালায়, তার দীপ্তি ক্ষণিকের, আর তিমিরান্তক গগনাধীশ্বর অসংখ্য মনকে আলোকিত করছে কত লক্ষ বৎসর ধরে। এ দু'য়ে যে পার্থক্য তা জাতিগত নয়, তা শুধু বর্ণগত। শিল্পী যে আঙ্গিকের সহায়তায় বিশ্বজনের মনের কাছে তার মনের কথাটি ধরে দেয়—সেই আঙ্গিকই তাকে সৃজনধর্মী শিল্পী করে তোলে। ক্রোচে এই আঙ্গিককে বলেছেন technique of externalization ; যা ছিল একান্ত গোপন তাকে বাইরের মহলে টেনে আনার কৌশল বা রীতি। এ রীতি আমাদের নাগালের বাইরে, জাতশিল্পীর খাস এলাকায়। শিল্পী অভিনবকে সৃজন করে, আর অগণিত মানুষ যুগে যুগে আবার সেই শিল্পকেই সৃষ্টি করে নিজেদের মনে মনে। সেখানেও সৃষ্টিলীলা চলল। তবে সেই লীলা অব্যক্ত। তার প্রকাশ পরিব্যাপ্ত হ'ল শুধু আমার মনে। আমার পাশের লোকটিও জানল না সেখানে কি আনন্দ বেদনার আলোড়ন চলেছে। যে অশ্রুর জোয়ার জাগল, যে আনন্দের বান ডাকল আমার মনোলোকে, তার স্থিতি ক্ষণিকের। সেই মাহেন্দ্র লগ্ন যখন পার হয়ে গেল, তখন আবার দৈনন্দিন জীবনের লাভক্ষতি-টানাটানির হিসাবনিকাশ শুরু হ'ল। সেই ক্ষণিকের আনন্দ-বেদনার নিগূঢ় মর্মকথা আর কানে কানে বলল না কেউ, বাইরে তার কোন ছবি রইল না। রবীন্দ্রনাথের কথায় বলি। তিনি লিখলেন কোন অনামিকার উদ্দেশ্যে :

'তোমার দুখানি কালো আঁখি 'পরে
শ্যাম আষাঢ়ের ছায়াখানি পড়ে।
ঘন কালো তব কুঞ্চিত কেশে যূথীর মালা
তোমার ললাটে নব বরষার বরণ ডালা।' [অবিনয়]

কবির সৃষ্টি এখানে চিত্রকল্প হয়েছে। অতল কালো দুটি চোখের 'পরে প্রেমের শ্যামল ছায়া নামে। যূথীর মালা-অলংকৃত ঘন কালো কুঞ্চিত কেশভারের অপরূপ সৌন্দর্য মেয়েটিকে মনের আরও কাছে টেনে আনে। কবি মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকে দেখেছেন। বারে বারে তার কাছে সবিনয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন, যদি ঘটে থাকে অনবধানতার অপরাধ। কবি তার নিরুপমাকে বলেছেন—'আখি যদি আজ করে অপরাধ করিও ক্ষমা'। আমাদের মনও ঠিক এই অনুরোধই জানিয়েছে বর্ষার মায়াঘেরা প্রত্যাসন্ন কত না সন্ধ্যায়। আমাদের আনন্দ আমাদের ব্যক্তিত্বকে অতিক্রম করতে পারে নি, ব্যক্তিসত্তার দুর্ভেদ্য প্রাচীরে বার বার মাথা কুটে মরেছে। অক্ষম মন তবু দশ জনকে তার খবর জানাতে পারে নি, আর কাউকে পারে নি সে আনন্দের ভাগ দিতে। সৃজনীশক্তি-সমৃদ্ধ কবিমানস আহরণ করেছে সেই বিচিত্র অভিজ্ঞতা টুকু ছন্দের পেয়ালায়, বিতরণ করেছে জনে জনে সেই স্বর্গীয় প্রেমের মধু। এখানেই কবির সঙ্গে আমাদের তফাৎ।

আর একটি উদাহরণ দিই। চৈনিক শিল্পীর সবুজ পাথরে গড়া 'অশ্বমূর্তি' সম্ভবতঃ সপ্তম অথবা অষ্টম শতাব্দীর শিল্প-নিদর্শন। এ মূর্তিটি রক্ষিত আছে ভিক্টোরিয়া এণ্ড এলবার্ট মিউজিয়ামে। এখানে ঘোড়া 'ঘোড়া' হয়নি, হয়েছে আর কিছু। প্রথম দর্শনে ঘোড়াটাকে সিংহ বলে মনে হয়। কোন এক বিশেষ মুহূর্তে অশ্বের শারীর-সংস্থান শিল্পীর চোখে এমন এক ভঙ্গী ও রেখায় ধরা দিল যার সঙ্গে অশ্বের স্বাভাবিক শারীর-সংস্থানের মিল রইল সামান্যই। শিল্পী সেই ক্ষণিকের অভিজ্ঞতাকে শাশ্বত করলেন আঙ্গিকের সহায়তায়। দেশে দেশে কালে কালে সে শিল্প গুণীর কাছে বরমাল্য পেলো। এ যুগের সমালোচক লিখলেন: "The carver of the chinese horse might without much trouble have made the horse more realistic; but he was not interested in the anatomy of the horse for the horse had suggested to him a certain pattern of carved masses and the twist of the neck, the curls of the mane,

the curves of the haunches and legs had to be distorted in the interest of this pattern. The result was not very much like a horse—in fact, this horse is often mistaken for a lion—but it is a very impressive work of art." *

এ শিল্প শিল্প হিসেবে মনে দাগ কাটে। এই হ'ল সমালোচকের রায়। আমরাও হয়ত অনেক সময় বস্তুবিশেষকে দেখেছি 'A certain pattern of carved masses'-এর রূপে। এ ত অতি সাধারণ অভিজ্ঞতার কথা। শিশুকে বসে থাকতে দেখেছি কোন বিশেষ মুহূর্তে এমন এক বিশিষ্ট ভঙ্গীতে, যে ভঙ্গী স্মরণ করিয়ে দেয় মনুষ্যেতর জীববিশেষের বিশিষ্ট ভঙ্গীর কথা। সে ক্ষণিক অভিজ্ঞতাকে যদি রূপ দিতে পারতাম তাহলে হয়ত মানব শিশুর প্রতিমূর্তি পেতাম না, কিন্তু তার জন্য সে সৃষ্টির শিল্পমূল্যের ব্যত্যয় ঘটত না। কিন্তু আমার পঙ্গু শিল্পীসত্তা বাইরে প্রকাশ করতে পারল না আমার নিজস্ব অভিজ্ঞতাকে। আকাশের বুকে মেঘের রঙ দিয়ে আঁকা কাঙ্গারুর ছবি আমি দেখেছি কোন এক সময়ে, কিন্তু তা আর কাউকে দেখাতে পারলাম না আমার সৃষ্টি প্রতিভা নেই ব'লে। আমার দেখাটা ঐ চীনা শিল্পীর দেখার চেয়ে সব সময়ে যে নিম্নমানের সে কথাটা আমি স্বীকার করি না। আমার ব্যক্তিগত অনুভূতি হয়ত শিল্পীর চেয়ে ছিল ব্যাপকতর এবং গভীরতর। কিন্তু তা রইল প্রকাশহীন, বিকলাঙ্গ আঙ্গিকের দরুণ। এই আঙ্গিককে ব্যাপকতর অর্থে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'রূপের টুথ'। তিনি লিখেছেন :

"My pictures are my versification in lines. If by chance they are entitled to claim recognition, it must be primarily for some rhythmic significance of form which is ultimate and not for any interpretation of an idea or representation of a fact."†

শিল্পের ধর্ম হ'ল এই সুষ্ঠু প্রকাশে। কি প্রকাশ করল, কেন প্রকাশ করল, সেটা বড় কথা নয়। যেখানে এই প্রকাশ নেই, সেখানে শিল্প-প্রতিভা কোন দাবী রাখে না। রবীন্দ্রনাথের কথাই বলি। তিনি তাঁর 'প্রতিনিধি'

---

* Herbert Read : The Meaning of Art, P. 26.

† Calcutta Municipal Gazette, Tagore Memorial Supplement, 1941.

কবিতাটিতে তাঁর হারানো প্রিয়াকে স্মরণের অর্ঘ্য দিয়েছেন। কবি বলেছেন যে তাঁর দয়িতা বেঁচে আছেন কবির জীবনে। কবি তাঁর অমর্ত্য প্রিয়ার প্রতিনিধিত্ব করেছেন মর্ত্যলোকে :

> "তোমার সে ভালো-লাগা মোর চোখে আঁকি
> আমার নয়নে তব দৃষ্টি গেছ রাখি।
> আজি আমি একা একা দেখি দু'জনের দেখা
> তুমি করিতেছ ভোগ মোর মনে থাকি—
> আমার তারায় তব মুগ্ধ দৃষ্টি আঁকি।"

এ ছন্দ অনবদ্য, এ প্রকাশ সুন্দর। এখানে মতান্তরের অবকাশ অল্প। কিন্তু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে অনুরূপ অভিজ্ঞতার দাবী হয়ত অনেকেই করতে পারেন। যদি সে সব অভিজ্ঞতার প্রকাশ সম্ভব হ'ত, তাহলে বোধ হয় তার শিল্পমূল্যও স্বীকৃত হ'ত রসিকজনের দরবারে। কিন্তু প্রকাশহীন যে কথা, তার সৌন্দর্য কেবলমাত্র একটি মনের জন্য। বহু মনের মজলিসে সে উপেক্ষিত। তাই বলছিলাম যে, সৃষ্টির ব্যাপারে জন্মগত অধিকারভেদকে মেনে নিই নিঃসন্দিগ্ধ চিত্তে। সেখানে ব্রাহ্মণের অধিকারে ব্রাহ্মণেতর জাতির হস্তক্ষেপের কোন অবকাশ নেই। সে জগতের জাতিভেদ প্রথা অচলায়তনের মহিমায় বিরাজিত।

এ হ'ল মূলের গভীরের কথা। সেখানে রহস্যাচ্ছন্ন আঁধার পাথার-তলে শিল্পী তার কল্পলতার শিশু চারাটিকে সযত্নে পালন করে। এ শিশু-বৃক্ষ মহীরুহ নয়। তবে বিপুল সম্ভাবনা সে আপনার জীবনে বহন করে। সে সম্ভাবনাকে ফলবতী করার জন্য তপস্যার প্রয়োজন—চাই অনলস প্রয়াস। এই আত্যন্তিক সাধনাই—'প্রভাতসংগীতের কবি'কে 'চিত্রার কবি' করে। অবনীন্দ্রনাথ শিল্পীর এই সাধনার কথা বলেছেন : "যোগসাধন করতে হয় শুনেছি চোখ বুঁজে, শ্বাস-প্রশ্বাস দমন করে ; কিন্তু শিল্পসাধনার প্রকার অন্য প্রকার—চোখ খুলেই রাখতে হয়, প্রাণকে জাগ্রত রাখতে হয়, মনকে পিঞ্জর খোলা পাখীর মত মুক্তি দিতে হয় কল্পলোকে ও বাস্তব জগতে সুখে বিচরণ করতে। প্রত্যেক শিল্পীকে স্বপ্ন-ধরার জাল নিজের মতো করে বুনে নিতে হয় প্রথমে। তারপর বসে থাকা—বিশ্বের চলাচলের পথের ধারে নিজের আসন নিজে বিছিয়ে। চুপটি করে নয় সজাগ হয়ে। এই সজাগ সাধনার গোড়ায় ভ্রান্তিকে

বরণ করতে হয়।* অবনীন্দ্রনাথ তাঁর যুক্তির স্বপক্ষে মিলেটের কথাগুলি উদ্ধৃত করে দিয়েছেন :

"Art is not a pleasure trip, it is a battle, mill that grinds."

এ কথা খাঁটি কথা। শিল্পীর সৃষ্টি লীলার বিলাস নয়। অনেক সাধনা, অনেক তপস্যার পরে তাঁর শিল্প রসোলোকে উত্তীর্ণ হয়। কোন একজন বিদেশী সঙ্গীত শিল্পীর কথা মনে পড়ছে। তাঁর বেহালা বাজাবার সহজ স্বচ্ছন্দ ভঙ্গীর প্রশংসা করা হলে তিনি বলেছিলেন :

"God alone knows with what difficulty I acquired this ease."

শিল্পীর এই সহজ প্রতিভাটুকু আয়ত্ত করতে হয় জীবনের অনেক সুখকে, অনেক স্বাচ্ছন্দ্যকে স্বেচ্ছায় ত্যাগ ক'রে। এ যেন সূর্যের আলো। খোলা চোখে সাদা আলো দেখায় বড় সুন্দর। কিন্তু এই নয়নাভিরাম শুভ্রতার আড়ালে আছে কত রঙ-বেরঙের আলোর আমন্ত্রণ, কত বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া তার খবর সাধারণ মানুষ রাখে না। শিল্পীর সৃষ্টির আলো স্বচ্ছতা পাবার আগে, শুভ্রতা লাভ করবার পূর্বে কেমন ছিল, কি করে তার মালিন্য ঘুচল সে খবর রসবোদ্ধা রাখে না। সে মনের পত্রপুটে রসটুকু গ্রহণ করেই খুশি হয়। যিনি আনন্দ বিতরণ করলেন সর্বজনের মনের ঘাটে ঘাটে, ঘটে ঘটে ভরে দিলেন আপন প্রসাদ তাঁর বেদনার খবর কেউ রাখে না। একথা আমরা ভুলে যাই :

অলৌকিক আনন্দের ভার
বিধাতা যাহারে দেয়, তার বক্ষে বেদনা অপার,
তার নিত্য জাগরণ। (ভাষা ও ছন্দ)

শিল্পীর মানস-সত্তা জীবনের কুশাঙ্কুরে ক্ষতবিক্ষত হয়। তাই কবি বলেন, "I fall upon the thorns of life, I bleed" আর সে রক্তধারায় আঁকা হয় রসলোকের কালজয়ী রেখাচিত্রগুলি। অন্তর্গূঢ় বেদনা সৃষ্টিকে সম্ভব করে। সে বেদনা সাধারণ মানুষের অতি তুচ্ছ না পাওয়ার দুঃখ থেকে স্বতন্ত্র। এ বেদনা অলৌকিক আনন্দের উৎসমুখ। বেদনাতুর কবিচিত্তের ক্ষতমুখ থেকে যে বেদনার রক্তক্ষরণ হয়, তা সুধারূপে বর্ষিত হয় বিশ্বচেতনার মর্মস্থলে। শিল্পস্রষ্টা যিনি, তাঁর গভীর উৎকণ্ঠা, গভীরতর উদ্বেগ-উদ্বেলতার কথা বলি রবীন্দ্রনাথের ভাষায় :

* "বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী"

যেদিন হিমাদ্রিশৃঙ্গে নামি আসে আসন্ন আষাঢ়,
মহানদ ব্রহ্মপুত্র অকস্মাৎ দুর্দাম দুর্বার
দুঃসহ অন্তরবেগে তীরতরু করিয়া উন্মূল
মাতিয়া খুঁজিয়া ফিরে আপনার কূল উপকূল
তট-অরণ্যের তলে তরঙ্গের ডম্বরু বাজায়ে
ক্ষিপ্ত ধূর্জটির প্রায়, সেই মত বনানীর ছায়ে
স্বচ্ছ শীর্ণ ক্ষিপ্রগতি স্রোতস্বতী তমসার তীরে
অপূর্ব উদ্বেগ ভরে সঙ্গীহীন ভ্রমিছেন ফিরে
মহর্ষি বাল্মীকি কবি। রক্তবেগ তরঙ্গিত বুকে
গম্ভীর জলদমন্দ্রে বারংবার আবর্তিয়া মুখে
নবছন্দ। (ভাষা ও ছন্দ)

এই স্বর্গীয় অশান্তি আছে বিশ্বের সমস্ত শ্রেষ্ঠ শিল্পসৃষ্টির মূলে। কবির সৃষ্টিতে একটা আকস্মিকতার সুর থাকে। শিল্প যেন হঠাৎ হাওয়ায় ভেসে আসা ধন। আপাতদৃষ্টিতে একে হঠাৎ পাওয়া বলে ভ্রম হয়। সুদীর্ঘ দিনের নিরলস অক্লান্ত কর্মময় দিনরাত্রির সুকঠোর ইতিহাস আত্মগোপন করে থাকে ঐ সৃষ্টির পিছনে। শিল্পী কলম বা তুলি ধরল আর অমনি লেখা বা আঁকা হয়ে গেল আন্তরিক শিল্প প্রতিভার গুণে, এ ছেলেমানুষের কথা। সৃষ্টির প্রেরণা (Inspiration) ভিক্ষুকের হাতে দেবতার দান নয়—এ হল অর্জন। অবনীন্দ্রনাথ বলছেন—Inspiration কি অমনি আসে। অর্জন করলেন না, শিল্প inspiration আপনি এল ভিক্ষুকের রাজত্বের স্বপ্নের মত, এ হবার যো নেই।'* শিল্পাচার্য নিজের কথার স্বপক্ষে মহাশিল্পী রোঁদার মত উদ্ধৃত করে দিয়েছেন :

"Inspiration ! Oh ! that is a romantic old idea void of all sense. Inspiration will, it is supposed, enable a boy of twenty to carve a statue straight out of the marble block in the delirium of his imagination ; it will drive him one night to make a master-piece straight off because it is generally at night that these things occur. I do not know why........ craftsmanship is everything ; craftsmanship shows

* বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী, পৃঃ ১২-তে উদ্ধৃত।

thoughtful work; all that does not sound as well as inspiration, it is less effective, it is nevertheless the whole basis of art!"

এই inspiration-এর ধর্ম হ'ল হঠাৎ রূপ দেওয়া। বহুদিন ধরে লোকচক্ষুর অন্তরালে পাথর খোদাই চলল। একটির পর একটি করে ফুল ফুটল পাথরে। তারপরে হঠাৎ একদিন গোলাপ বাগিচার খ্যাতি সৌরভ ছড়িয়ে পড়ল দিগ্‌দিগন্তরে। শিল্পের এই আকস্মিকতাকে বা তাৎক্ষণিকতাকে এ যুগের শিল্প-সমালোচক নাম দিয়েছেন 'Instantaniety'। হার্বার্ট রীড বলেছেন :

"Many theories have been invented to explain the workings of the mind in such a situation, but most of them err, in my opinion, by overlooking the instantaniety of the event."*

এই আকস্মিকতাকে শিল্পের ক্ষেত্রে অস্বীকার করা যায় না। হঠাৎ মন চমকে ওঠে, মুগ্ধ বিস্ময়ে অভাবনীয়কে দেখে নেয় দুটি নয়ন ভ'রে। শিল্প-সৃষ্টির মূলে যে আছে এই আকস্মিকতা, একথা রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেছেন তাঁর সাহিত্যিক জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে। সৃষ্টি হ'ল অকারণ সৃষ্টি। তার পিছনে লাভ-লোকসানের হিসাব নিকাশ নেই। গান হয় অকারণে গাওয়া। 'ভাষা ও ছন্দ' থেকে আবার বলি :

"বেদনায় অন্তর করিয়া বিদারিত
মুহূর্তে নিল যে জন্ম পরিপূর্ণ বাণীর সংগীত।"

পরিপূর্ণ বাণীর সংগীত জন্ম নেয় মুহূর্তের আকস্মিকতায় যেমন হঠাৎ শিশু দেখে প্রথম চোখ-মেলা আলো। শিল্পীর কল্পলোকের গভীরতা বিদীর্ণ ক'রে কবিতা ভূমিষ্ঠ হয় রসবোদ্ধার চিত্তলোকে। এই হ'ল কবিতার প্রকৃতি—শিল্পের স্বরূপ। এই শিল্পসৃষ্টির অধিকার হ'ল জাতশিল্পীর—যে শিল্পী ভগবানের আশীর্বাদই শুধু লাভ করেন নি, সে আশীর্বাদকে পূর্ণায়ত করেছেন আপনার ধ্যান, ধারণা ও সাধনা দিয়ে।

এবারে রস সম্ভোগের কথা বলি। সেখানেও অধিকার ভেদ আছে। এ 'ভ' অতি সাধারণ কথা যে পিকাসোর সব ছবি সাধারণ দর্শকের ভালো

* The Meaniug of Art, Page 29.

লাগে না। সে যুগের অফিস-ফেরৎ বাবু শিল্পী টমাসের এক গাদা রঙ-মাখানো ছবি সম্বলিত একখানি মাসিক বসুমতী পেলেই খুশী হতেন। আর আজকালকার মাসিক পত্রিকার পাঠকেরা সেই শ্রেণীর ছবির দিকে ফিরেও তাকান না। রবীন্দ্রনাথের শেষের দিকের কবিতা ভালো লাগে না এমন পাঠকের সংখ্যাই বেশী। শিল্প যত বুদ্ধিধর্মী হবে, তার আবেদন ততই কমে যাবে সাধারণ মানুষের কাছে, এ হ'ল অভিজ্ঞতালব্ধ কঠোর সত্য। আবার কবি বা শিল্পী যখন অনন্যপূর্ব, অসাধারণ অনুভূতি ব্যক্ত করেন তাঁর সৃষ্টিতে, তখনও সাধারণ মানুষ তাঁর নাগাল পায় না—দুর্বোধ্যতার, অস্পষ্টতার অভিযোগ আনে। এই ধরনের উৎকৃষ্ট শিল্পকে বুঝতে হলে রসবোধের উৎকর্ষ সাধন করতে হয়, আর সে উৎকর্ষ লাভ করা যায় অনুশীলনের ভিতর দিয়ে। মহাসৃষ্টি যেমন মহাবীর্যের অপেক্ষা রাখে, তেমনি মহৎ ভোগও অনন্যসাধারণ প্রতিভার সাধনার মুখাপেক্ষী। সেক্সপীয়রের সাহিত্যরস একেবারে পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করতে হলে সেক্সপীয়রের মতই অসাধারণ মণীষার প্রয়োজন হয়। কবির কল্পনার গতিবেগ, তার অনুভূতি, তার ভাবনা ও বেদনার কথা যদি রসিক মন অনুভূতির পথ দিয়ে উপলব্ধি না করে, যদি বুদ্ধি দিয়ে তার মর্মস্থলে প্রবেশ না করে, যদি কবির কল্পনা উদ্দীপ্ত-লোকে তার অবাধ বিচরণের শক্তি না থাকে তবে ত কবির সৃষ্টির আবেদন ব্যর্থ হয়ে যাবে তার কাছে। কবির বীণার তারে যে সুর সাধা হয়েছিল, ঠিক সেই সুরটি রসিক মনকে আয়ত্ত করতে হবে, তবেই কাব্য পাঠ হবে সার্থক, তবেই সত্য হবে ছবি দেখা। কবির কথা, শিল্পীর কথা সবাই বুঝবে না জাতি গোত্র নির্বিশেষে। এখানে ডিমোক্রেসি চলে না। এখানে অধিকারের সীমারেখা সুস্পষ্ট। যে কথা আমি কখনও শুনি নি, ভাবি নি বা জানি না, যার অভিজ্ঞতা আমার নেই সেকথা কবিকণ্ঠে যখন শুনি, তখন তার রস পুরোপুরি উপভোগ করতে পারি না। যে ছবি আমি কখনও দেখি নি, সে ছবির কথা যখন শিল্পী বলেন, তখন আমার ধারণা নীহারিকালোকের অস্পষ্টতায় রূপ খুঁজে ফেরে, সৌরমণ্ডলের সুনির্দিষ্ট রূপ তখনও তার আয়ত্তাতীত। উদাহরণ দিই :

'......সন্ধ্যাবেলা যবে
নদীতীরে অন্ধকার নামিত নীরবে
প্রেমনত নয়নের স্নিগ্ধচ্ছায়াময়
দীর্ঘ পল্লবের মত।' [বিদায়-অভিশাপ : রবীন্দ্রনাথ]

যদি আমার জীবনে প্রেমময়ী নারীর আবির্ভাব কখনও না ঘটে থাকে, যদি আমি প্রেমশান্ত নয়নের স্নিগ্ধ ছায়া কোন পরম লগ্নে প্রত্যক্ষ না করে থাকি তবে কবির চিত্রকল্প বর্ণনার মাধুর্য অন্ততঃ আমার কাছে ব্যর্থ হয়ে গেল। আমি সে মধুর রসে বঞ্চিত হলাম, যার মাধুর্য রসিকজনের মনে অনিন্দ্যসুন্দর প্রেমের বার্তা বহন করে আনবে। দেবযানী সম্বন্ধে কবির বর্ণনা-চাতুর্য আমার চোখে ধরা দিল না। সন্ধ্যায় শান্ত নদীতীরের প্রকৃত ছবিটি আবছা রয়ে গেল, আমার অভিজ্ঞতার দৈন্যের জন্য। যারা জীবনে নারীর প্রেম লাভ করেছে সেই ভাগ্যবানদের হাতে রইল কবির সৃষ্ট রস উপভোগ করবার দুর্লভ অধিকার। যারা তা পেল না, তারা এই কাব্যরস থেকেও অনেকটা বঞ্চিত হ'ল। এ তো গেল অনুভূতির দৈন্যের কথা। শিক্ষার দৈন্য আবার অনেক সময় শিল্পরসোপলব্ধির পথে অন্তরায় হয়। যার বর্ণ পরিচয় সবে ঘটেছে, সবে হাতে-খড়ি হয়েছে সে ত আর এজরা পাউণ্ডের বুদ্ধিদৃপ্ত, চোখ ঝলসানো কবিতার মর্মমূলে প্রবেশ করতে পারবে না। যেমন :

"Your mind and you are our sargasso sea,
London has swept about you this score years
And bright ships left you this or that in Fee!
Ideas, old gossip, oddments of all things,
Strange spars of knowledge and dimmed wares of Price,
Great minds have sought you—lacking someone else
You have been second always. Tragical ?"

এমনিধরা শিক্ষার তারতম্য, রুচির তারতম্য, মননধর্মের ভিন্নমুখীনতা একই ধরনের কাব্য বা শিল্পকে সর্বজনের কাছে গ্রহণযোগ্য করে না। যে শিল্প মহৎ, তার সত্যমূল্যের উপলব্ধি সম্ভব হয় শিক্ষার দ্বারা, সাধনার দ্বারা, অর্জনের দ্বারা। তাই বলছিলাম যে শিল্পের ক্ষেত্রে—তা সে সৃষ্টিই হোক্ আর সম্ভোগই হোক্, অধিকারভেদটাকে গোড়াতেই মেনে নেওয়া ভালো। এ সত্যকে না মানলে উদ্ভট কল্পনার সাহায্য নিয়ে অনেক বিচারবিহীন মন্তব্য করতে হয়—যেমন কথম কথন করেছিলেন টলস্টয়, রঁলা এবং আরও অনেকে।

টলস্টয় এবং তাঁর শিষ্য রঁলা বহুবার একথা বলেছেন যে, শিল্পকে সকলের কল্যাণসাধন করতে হবে। এমন শিল্পরচনা করতে হবে যার আবেদন সর্বশ্রেণীর সকল মানুষের কাছে গিয়ে পৌঁছুবে। শিল্পী রঁলা গুরুবাক্যের

প্রতিধ্বনি করেছিলেন সত্য, কিন্তু তিনি এ তত্ত্বে মনপ্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করতে পারেন নি। মানুষ র‍ঁলা টলস্টয়ের ধর্মে বিশ্বাসী; শিল্পী র‍ঁলা পরবর্তী যুগে সে বিশ্বাসের প্রতিবাদ জানিয়েছেন, যখনই সেই মানবহিতের ব্রতকে শিল্পের ঘাড়ে চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। 'জন ক্রিষ্টোফার' উপন্যাসে র‍ঁলার পরিণত শিল্পীমন শিল্পের সত্যধর্মকে জেনেছে। তাই তাঁর মানসপুত্র জন ক্রিষ্টোফারের মুখে আমরা এ কথা শুনি যে শিল্পের পাদপীঠ স্পর্শ করবার অধিকার সকলের নয়—সেখানে সকলের প্রবেশাধিকার নেই। ভারতীয় রসশাস্ত্রেও এই অধিকারভেদের কথা স্বীকার করা হয়েছে। এ অধিকার বর্ণগত বা বংশগত নয়, তা অর্জনসাপেক্ষ। ভক্ত কবীর এ অধিকার অর্জন করেছিলেন সমাজের নীচের তলায় বাস করেও। আর যাদের হাতে ছিল এই শিল্পলোকের জন্মগত উত্তরাধিকার, তাদের মধ্যে অনেকেই সে অধিকারকে হারিয়েছে সাধনার দীনতার জন্য। শিল্পীর জীবনে সবচেয়ে বড় কথা হ'ল অনলস সাধনা। সৃষ্টি করতে হলে বা শিল্প বুঝতে হলে কঠিন পরিশ্রমের এই পথ ছাড়া দ্বিতীয় পথ নেই। এই সুকঠোর পরিশ্রমই আমাদের এনে দেয় শিল্পলোকে প্রবেশের ছাড়পত্র। শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের ভাষায় বলি:

"শিল্পের অধিকার নিজেকে অর্জন করতে হয়। পুরুষানুক্রমে সঞ্চিত ধন যে আইনে আমাদের হয়, তেমন করে শিল্প আমাদের হয় না। কেন না শিল্প হ'ল 'নিয়তিকৃতনিয়মরহিতা'; বিধাতার নিয়মের মধ্যেও ধরা দিতে চায় না সে। নিজের নিয়মে সে নিজে চলে, শিল্পীকেও চালায়, দায়ভাগের দোহাই তো তার কাছে খাটবে না।"

মানুষের বস্তুজীবনে যেমন নিরাসক্তির অপরিমেয় মূল্য আছে, তার সুন্দরের জগতেও সে তেমনি সম্মানিত, সমাদৃত। ছিন্নকন্থা বিষয়ে-বিরাগী রাজপুত্র বন্দনীয় হলেন সারা বিশ্বজনার কেননা ভোগ-লালসার ক্লেদ পঙ্কিলতায় তাঁর শুভদৃষ্টি অসমাচ্ছন্ন, লোভ, ক্ষুদ্র-স্বার্থ-গণ্ডীর মধ্যে তাঁর মনুষ্যত্বের সীমাহীন বিস্তারকে আবদ্ধ করে নি। সেই নির্লোভ পুরুষ পরম নির্লিপ্ততায় আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করেন সর্বজীবনের মধ্যে। সেই প্রতিষ্ঠায় তাঁর মুক্তি, তাঁর পরিপূর্ণতা।

শিল্পবৈরাগ্যও এই অনাসক্তির দ্বারা চিহ্নিত। সুন্দরের সঙ্গে সৌন্দর্য-ধ্যানীর একাত্ম হওয়া উচিত নয়। তাদের স্বাঙ্গীকরণ শিল্পমৃত্যু ঘটায়। সুন্দরের চারপাশে একটা দূরত্বের বেড়া থাকে ; ভোগের বস্তু ও ভোক্তার দ্বৈত সত্তাকে অস্বীকার করলে শিল্পলোকে বিপর্যয় ঘটে। অতি নৈকট্য, একাত্মতা এরা রসোপভোগের প্রতিচারী। সৌন্দর্য রসাস্বাদনের মধ্যে লালসা নেই, জড়িয়ে ধরবার বাসনা নেই। যখন সেই আঁকড়ে ধরবার আদিম প্রবৃত্তিটা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে তখন আর আনন্দলোকে শিল্পরসিক উদ্ভাসিত চৈতন্য হয়ে ওঠেন না। সাধারণ মানুষের মত তাঁর সঞ্চয় প্রবৃত্তিটা যখন কাজ করে লোভীর লালাসিক্ত রসনায় তখন আর সুন্দরের স্বাদ মেলে না। আসক্ত চিত্তে সুন্দর চিরনির্বাসিত। শিল্পীগুরু অবনীন্দ্রনাথ বললেন* : "বিলাসীর দৃষ্টি স্বার্থের

---

* বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী। পৃঃ ৪০

Letters to George and Thomas Keats, 28th Dec. 1817

কীটসের কথাগুলি উদ্ধৃত ক'রে দিই : And at once it struck me what quality went to form a man of achievements especially in literature and which Shakespeare possessed so enormously I mean negative capability, that is when a man is capable of being in uncertainties, mysteries, doubts without any irritable reaching after fact and reason.

Woodhouseকে লিখিত অপর একখানি পত্রে কীটস্ বলেন : As to the poetic character itself it is not itself. The poetic character has no self. It is everything and nothing. It is constantly in for and feeling some other body. It has no character—it enjoys light and shade ; it lives in gusto, be it foul or fair, high or low, rich or poor, mean or elevated, it has as much delight in conceiving an Iago as an Imogen.

সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে থেকে সৃষ্টির যথার্থ শোভা, সৌন্দর্য ও রসের বিষয় মানুষকে বাস্তবিকই অন্ধ করে রাখে অনেকখানি, আর ভাবুকের দৃষ্টি কাজ-ভোলা ছেলেবেলার দৃষ্টি-সৃষ্টির অপরূপ রহস্যের খুব গভীর দিকটায় নিয়ে চলে মানুষকে। কাজেই ভাবুকের শোনা-দেখা-বলা-কওয়ার মধ্যে শিশুসুলভ এমনতরো সরলতা ও কল্পনার প্রসার থাকে। ভাবুক দৃষ্টি এত অপরূপ অসাধারণ ভাবে দেখে শোনে, দেখায় শোনায়, যে কাজের মানুষের দেখা শোনা ইত্যাদির সঙ্গে তুলনা করে দেখলে ভাবুকের চোখে দেখা ছবি কবিতা সমস্তই হেঁয়ালী বা ছেলেমান্‌ষির মতই লাগে।" শিল্পী কাজভোলানো স্বার্থগন্ধশূন্য দর্শনভঙ্গীর অধিকারী হবে, তবেই না শিল্প সৃষ্টি সম্ভব হবে। শুধু সৃষ্টি কেন শিল্প রসোপভোগও সম্ভব হয় না এই বৈরাগ্যটুকুর অভাবে। শিল্প রসিকের ব্যক্তিস্বার্থ বা সমাজস্বার্থ যখন শিল্পকর্মের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে তখন আর তার ভাগ্যে রসের আস্বাদন ঘটে না কেন না রসাস্বাদনের জন্য যে মানসিক দূরত্বটুকু অপরিহার্য তার সন্ধান মেলে না শিল্পরসিকের দৃষ্টিতে। অপরিচ্ছন্ন স্বার্থদৃষ্টি শিল্প রসোপভোগের অন্তরায়। আমরা শুনেছি যে নীলদর্পণ নাটকের অভিনয় দেখার সময় বিদ্যাসাগর মহাশয় নীলকর রো সাহেবের ভূমিকায় অর্ধেন্দুশেখরের অভিনয় নৈপুণ্যে স্থান-কাল-পাত্র বিস্মৃত হয়ে মঞ্চারূঢ় মুস্তাফী মহাশয়ের দিকে চটিজুতো ছুঁড়ে ছিলেন প্রেক্ষাগৃহের মধ্যেই। এটা অর্ধেন্দুবাবুর পক্ষে হয়ত গর্বের কথা কিন্তু এই ঘটনাটি ঈশ্বরচন্দ্রের অন্তরশায়ী শিল্পীমনের অপরিণতাবস্থা সূচিত করে। এ কথাই কী মনে হয় না যে শিল্পী বা শিল্প-রসিকের পক্ষে অপরিহার্য যে মানসিক দূরত্ব তার অভাব বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মধ্যে অন্ততঃ সাময়িকভাবে ঘটেছিল। উপনিষদে কথিত পাখী দুটির কথা স্মরণ করুন। যে পক্ষীটি দ্রষ্টা তার মানসিক দূরত্বটুকু অনাহত। তাই সে বস্তুজীবনের সুখ-দুঃখের যথার্থ মুল্যটুকু বিস্মৃত হয় না। আর যে ভোক্তা সে জীবনের সুখ-দুঃখের রসাস্বাদনে তন্ময়। মিথ্যা সুখ-দুঃখের ছলনাকে সে একান্ত সত্য বলে মনে করে; তার জীবন ইতিহাসে তাই অনেক অপপ্রয়াসের ধুন্দুমার। জীবনের যথার্থ মূল্যায়ন ঐ ভোক্তাপক্ষীর কর্ম নয় কেন না বিচারের জন্য প্রয়োজনীয় ঐ আপেক্ষিক দূরত্বটুকু তার অলভ্য। দ্রষ্টা পক্ষীর সে দূরত্বটুকু অনায়াসলভ্য। তাই সে দুঃখে এবং সুখে বিগত-স্পৃহ। শিল্পী এবং শিল্পরসিক হবেন ঐ উপনিষদ-কথিত দ্রষ্টা পাখীটির মত নিস্পৃহ, মানসিকদূরত্বসম্পন্ন। শিল্পী ভোগ করবেন বটে তবে সে ভোগের

মধ্যে সন্ন্যাসীর নির্লিপ্ততা থাকবে ; অতি নৈকট্যের অতি প্রত্যক্ষতা শিল্পায়নের প্রতিকূল। যথার্থ মানসিক দূরত্ব সম্পন্ন শিল্পীর সম্যক্‌দৃষ্টিটুকু থাকার ফলে তাঁর শিল্পকর্মে উদ্দেশ্য প্রাধান্য পায় না। শিল্প উদ্দেশ্য প্রণোদিত হলে তা হবে প্রায়োজনিক। আলঙ্কারিক রাজশেখর বর্ণিত এই চতুর্থ শ্রেণীর কবি বা শিল্পীর দল যে শিল্প সৃষ্টি করবে তা রসোত্তীর্ণ হবে না ; আর রসোত্তীর্ণ হলেও তা যে কালোত্তীর্ণ হবে না একথা অসংশয়ে বলা হয়। কোন উদ্দেশ্য বা কোন স্বার্থ যদি সিদ্ধ করতে হয় শিল্পীকে তার শিল্পকর্মের মাধ্যমে তবে সে স্বার্থ সিদ্ধি ঘটে শিল্পের অপমৃত্যু ঘটিয়ে। যেখানে শিল্পীর দৃষ্টি স্বার্থসমাচ্ছন্ন সেখানে যথাযোগ্য মানসিক দূরত্বটুকুর অভাব ঘটে। শিল্পী তার আচ্ছন্ন দৃষ্টি দিয়ে রূপের পরিপূর্ণ সত্তাটুকুকে ধরতে পারে না বোধির আলোয়। প্রয়োজনের আড়ালে হারিয়ে যায় শিল্পীর শিল্প রূপটুকু : তার পরিপূর্ণ প্রকাশ হয় না রসলিপ্সুর প্রত্যক্ষতায়। মনীষী টলস্টয়ের শিল্পদৃষ্টিকে একদিন এমনি করেই আচ্ছন্ন করেছিল নিখিল বিশ্বের কল্যাণ কামনা। তাঁর সমাজ চেতনা, তাঁর শিল্পবোধ, তাঁর শিল্পদৃষ্টিকে প্রচ্ছন্ন করেছিল। গোষ্ঠী স্বার্থবুদ্ধি শিল্পী টলষ্টয়কে পথভ্রষ্ট করেছিল। তাই দেখি তিনি তাঁর শিল্পদর্শনে মানুষের সামগ্রিক প্রয়োজনকে সারথী করে শিল্পের সার্বভৌম অধিকারকে খর্ব করলেন। মহাদার্শনিক কাণ্ট শিল্পের আন্তর প্রয়োজনটুকুকে স্বীকার করে বললেন যে এ প্রয়োজন হল অপ্রয়োজনের প্রয়োজন : অপ্রয়োজনের প্রয়োজন বৈরাগ্যের পরিপন্থী নয়।

কবি কীটস্‌ বললেন কবি মনের negative capability-র কথা। এলিয়ট বললেন[১] কবি মানসের দ্বৈত সত্তার কথা। কীটসের মতে কবি যে নানান্‌ ধর্মী বহু বিচিত্র পুরুষ এবং নারীর সৃষ্টি করেন, একই সঙ্গে শয়তান এবং খ্রীষ্টের গুণগান করেন, দুর্যোধন এবং গান্ধারীর আদর্শ ব্যাখ্যা কবি লেখনীতে অপূর্ব সুষমায় এক সঙ্গে আত্মপ্রকাশ করে তার কারণ কবির মধ্যে ঋণাত্মিকা শক্তির উপস্থিতি। নৈর্ব্যক্তিক দূরত্ব কবি ধর্মের নিত্য সহচর। এই দূরত্বটুকু ব্যতিরেকে কেমন ক'রে কবির পক্ষে সম্ভব হয় পাশাপাশি দুটি বিপরীত

১। এলিয়টের কথায় আবার বলি : The more perfect the artist, the more separte in him is the man who suffers and the mind which creates. [এলিয়েটের' 'Tradition and individual talent' দ্রষ্টব্য]

আদর্শাশ্রয়ী চরিত্রের চিত্রণ? গান্ধারী উদার মানবিক আদর্শ, মহত্তম ধর্মবোধের প্রতিমূর্তি, ধৃতরাষ্ট্র স্নেহান্ধ নীতিধর্মচ্যুত পিতা আর প্রায়োজনিক রাজধর্মের কূট-কলা কুশলী দুর্যোধন শাশ্বত ধর্মবোধের আত্যন্তিক মূল্যে অবিশ্বাসী। এই বিভিন্ন চরিত্রের স্ফুরণ ঘটল কেমন করে কবি কল্পনায় একই সঙ্গে, সে তত্ত্বটি অব্যাখ্যাত থেকে যায় যদি না আমরা কীটস্ কথিত এই ঋণাত্মিকা শক্তিতে (negative capability) বিশ্বাস করি। শিল্প কবি সত্তার রূপায়ণ নয়; শিল্প হল কবি অনুভূতির আত্মবিচ্যুতরূপ; এক একটি ভাবকে কবি আত্মবিচ্ছিন্ন রূপ দান করেন, আন্তর প্রত্যক্ষকে পরোক্ষরূপে প্রত্যক্ষ করেন। এই ধরনের প্রত্যক্ষীকরণ সম্ভব হয় কেন না শিল্প সর্ব সময়ে শিল্পরূপকে স্বতন্ত্র সত্তায় সত্তান্বিত করে। কবি সত্তার সঙ্গে তার অনুভূতির যোগ। শিল্পীর অন্তরশায়ী অনুভূতি তার ভাব-ভাবনার রঙে রঙীণ হয়ে বিচিত্র প্রকাশ পথে আপনাকে উৎসারিত করে। কখনো বা সে অনুভূতি নিষ্ঠুরতম রূপ নেয় আবার কখনো বা তা পরম কারুণিক মানব ধর্মকে আশ্রয় করে। তাদের রূপ, রঙ, রেখা বর্ণ বৈচিত্র্যে সমুজ্জ্বল। শিল্প-মানসের বৈরাগ্য কোথাও শিল্পভাবের সঙ্গে একাত্ম হয়ে ওঠার অবকাশ দেয় না শিল্পীকে। সে অবকাশ যদি কখনো কোন শিল্পীর ধ্যান-ধারণায় আসে তবে সেদিনই তাঁর শিল্প প্রচেষ্টার অবসান হবে; যদিই বা সৃষ্টি সম্ভব হয় তাঁর হাতে তবে সে শিল্প বৈচিত্র্য হারাবে। একদেশদর্শিতা তাঁর শিল্পে প্রত্যক্ষ গোচর হয়ে উঠবে। শিল্পী যদি ব্যক্তি জীবনে সাধু হন তবে তাঁর শিল্পেও শুধু সাধু চরিত্রের চিত্রণই ঘটবে। সে চিত্রে যা একান্ত ব্যক্তিগত, অবান্তর এবং অপ্রাসঙ্গিক তারাও ভীড় করে আসবে। শিল্প বস্তুর (content) বাছাই হবে না। আর যে প্রকাশ ঘটবে এই ধরণের আর্টে তাও হবে পঙ্গু, অসক্ত এবং অসম্পূর্ণ। কেন না যথাযোগ্য মানসিক দূরত্ব ব্যতীত শিল্পবস্তুর পূর্ণ রূপটুকু শিল্পী চক্ষে প্রতিভাত হয় না। যে অনুভূতি কবির অন্তরে প্রকাশ সাধনায় তন্ময় তার পরিপূর্ণ রূপটুকু কবির অজ্ঞাত। ধীরে ধীরে কবি সে অনুভূতিকে আপন মানসিক নৈকট্য থেকে থেকে মুক্ত করেন। কালক্রমে সে অনুভূতির নিবিড়তা কবিস্বার্থের দ্বারা আর প্রভাবাবিষ্ট না হয়ে আপন মাহাত্ম্যে আত্মপ্রকাশ করে শিল্পলোকের বিরাট পটভূমিতে। সে শিল্পলোক কবির মানস-সত্তায় বিধৃত। সেখানে শিল্পের জন্ম হয়। তারপরে ঘটে তার বহিরঙ্গীকরণ। শিল্প সৃষ্টির এই সমগ্র ধারাটুকু শিল্পী মানসের বৈরাগ্যের দ্বারা চিহ্নিত। মহাকাল এই বৈরাগ্যের

সহায়ক। কবির অনুভব কালের বিক্ষেপের ফলে সংযত হয়ে অতি নৈকট্যের হাত থেকে মুক্তি পায়। আর এই মুক্তি ঘটলে তবেই শিল্প জন্ম নেয়। তাই-'ত' কবি বললেন যে কাব্য হ'ল কবি-মানসের শান্তাবস্থায় তাঁর অনুভূতির উদ্বর্তন বা স্মরণটুকু। বহির্জগতের সংঘাতে যখন অনুভূতির আবর্ত মনের মধ্যে ঘুরপাক খেয়ে উঠল তখনই শিল্পসৃষ্টির প্রয়াস অনভিপ্রেত। কালের মধ্যবর্তিতার প্রয়োজন রয়েছে বস্তু-ঘটনা এবং শিল্প-ঘটনার মধ্যে। এই ব্যবধানটুকু শিল্পী মানসে যথাযোগ্য দূরত্বের সঞ্চার করে। এর ফলে শিল্প হয় রস-নিঃস্যন্দী।

এ ত' গেল শিল্পবস্তুর শিল্পে রূপায়ণের কথা। কবি-মানসিকতার সঙ্গে কাব্যবস্তুর একটা দূরত্ব থাকবে, এটাও অবিসংবাদিত সত্য। এলিয়ট এ সত্যকে স্বীকার ক'রে নিয়ে আরও একটু এগিয়ে গেলেন। কীট্‌সের অনুচারী হ'য়ে তিনি বললেন যে কবি-মানসের মধ্যে শিল্পীমন এবং সাধারণ মনের দ্বিসত্তা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নেই। যে মন সৃষ্টি করে এবং যে মন দুঃখ পায় তারা স্বতন্ত্র। এলিয়ট কবিমনের বৈরাগ্য তত্ত্বটুকুর দূরপ্রসার ঘটিয়েছেন। কবিমনের গেরুয়া রঙের ওপর কোন রঙই রঙ ফলায় না। সে আপন রঙে রঙীন, সে আপন স্বপ্নে বিভোর। প্রকৃতপক্ষে কবির ত' আর দুটো মন নেই আর সে মনের দ্বৈত সত্তাও নেই। একই মন দুঃখ পায় আবার সেই মনই সৃষ্টি করে। এলিয়ট এই কথাই বোঝাতে চেয়েছেন যে সৃষ্টিশীল কবিমানস আপন স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে তার দূরত্বটুকু বজায় রাখে। যখন মানুষটা দুঃখ পায় তখন তার রঙ ধরে না কবির মনে। বস্তুর ধর্ম, বাহ্যিক ধর্ম কবিমনে আরোপিত হয় না। কবি তাই অনায়াসে দুঃখ সহ্য করেন। নৈর্ব্যক্তিক অনাসক্তিতে সে দুঃখকে জয় করেন। গভীর দূরত্ব দিয়ে তাঁর আনন্দানুভূতিকে রক্ষা করেন। তাই যখন সে দুঃখ, সে আনন্দের প্রকাশ ঘটে কাব্যে এবং শিল্পে তখন দেখি তার রূপায়ণ এক অভূতপূর্ব নৈর্ব্যক্তিতায় ভাস্বর হ'য়ে উঠেছে। এই নৈর্ব্যক্তিকতা ভারতীয় সাধনাকে উজ্জীবিত রেখেছে তার জীবন সাধনার ক্ষেত্রেও। উপনিষদের "তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা' তত্ত্ব এই ব্যক্তি স্বার্থহীন নৈর্ব্যক্তিক আনন্দাস্বাদনের তত্ত্ব। যখনই আমরা নিরাসক্ত চিত্তে প্রকৃতির নিমন্ত্রণে যাই তখন তার সৌন্দর্যের অমরাবতী মুক্তদ্বার হয় আমাদের কাছে। জীবনের অমেয় ঐশ্বর্যলাভ তখনই সম্ভব হয় যখন আমরা বৈরাগীর নির্লিপ্ততায় জীবনকে গ্রহণ করি। পরম সুন্দরও সন্ন্যাসীকেই বরমাল্য দেন। সন্ন্যাস ব্রত-ধারী শিল্পীর ব্যক্তিজীবনে যে দুঃখ, বেদনা ও আনন্দ আছে তা

বিশেষকে অতিক্রম ক'রে নির্বিশেষরূপে বিশ্বমানসে প্রতিষ্ঠা পায়। কবির দুঃখ তার আনন্দ-বেদনা বিশ্বজনের সম্পদ হ'য়ে ওঠে। এমনটি ঘটেছিল মহাকবি রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে। পলায়নী মনোবৃত্তি সঞ্জাত জীবনদর্শন কবির নয়। একথা তিনি আমাদের শোনালেন :

বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি, সে আমার নয়,
অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ। [মুক্তি, নৈবেদ্য কাব্যগ্রন্থ]

বৈরাগ্যের ভেকধারী সংসার পলাতক মানুষদের দলে তিনি যে নন এটা যেমন উদাত্ত কণ্ঠে তিনি ঘোষণা করলেন তেমনি আবার গৃহী সন্ন্যাসীর নিরাসক্তির তত্ত্বটুকুও পরম নিষ্ঠার সঙ্গে আমাদের শোনালেন :

যবে শান্ত নিরাসক্ত গিয়েছি তোমার নিমন্ত্রণে
ইন্দ্রের অমরাবতী সুপ্রসন্ন সেই শুভক্ষণে
মুক্তদ্বার ; বুভুক্ষুর লালসারে করে সে বঞ্চিত ;
তাহার মাটির পাত্রে যে অমৃত রয়েছে সঞ্চিত
নহে তাহা দীন ভিক্ষু লালায়িত লোলুপের লাগি।
ইন্দ্রের ঐশ্বর্য নিয়ে হে ধরিত্রী, আছ তুমি জাগি
ত্যাগীরে প্রত্যাশা করি নির্লোভেরে সঁপিতে সম্মান,
দুর্গমের পথিকেরে আতিথ্য করিতে তব দান
বৈরাগ্যের শুভ্র সিংহাসনে। [জন্মদিন, সেঁজুতি কাব্যগ্রন্থ]

যে সব মানুষ আপনার স্বার্থবুদ্ধিকে অতিক্রম করে মহত্তর জীবনবোধের প্রেরণায় জীবন সাধনা ও শিল্প সাধনা করেছেন তাঁরা মৃত্যুঞ্জয়ী। মরণ সাগরপারে এই সব অমর মানুষের দল কবির নমস্য। সন্ন্যাসীকল্প এই সব মানুষেরা একদিকে যেমন কর্মলোকে তাঁদের অক্ষয় কীর্তিস্তম্ভ স্থাপনা করলেন অন্যদিকে আবার শিল্পলোকেও তাঁদের অক্ষয় স্বাক্ষর চিরভাস্বর হয়ে রইল। বিপর্যয় ঘটে তখনই যখন শিল্পী এই নিরাসক্তির মন্ত্রটুকু বিস্মৃত হয়। শিল্পীর মধ্যে স্বাধিকার প্রমত্ততা যখন প্রবল হয়ে ওঠে, তখন সে ব্যবহারিক জীবনের ভোগে বিভোর হয়, তখনই তার সৌন্দর্যানুভূতি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। সমগ্র জীবনের সঙ্গে তার যোগটুকু হারিয়ে যায়। মহাদার্শনিক প্লেতো বললেন[১] শিল্পী আত্মসুখপরায়ণ হ'লে আর বিশুদ্ধ সুন্দরের অনুভব ঘটে না তার জীবনে।

১। Phaedrus 408,

মানবাত্মা পঙ্কহীন হ'য়ে পড়ে এই স্বার্থবুদ্ধির তাগিদ মেটাতে গিয়ে। সে ভগবদ সঙ্গ থেকে বঞ্চিত হয়। স্বার্থবুদ্ধির ক্ষুদ্র প্রলোভনের মোহে পড়ে সে দেবলোকে দেবতার সামীপ্য আর লাভ করতে পারে না। বিশুদ্ধ সুন্দরের সঙ্গ-লাভ তার ভাগ্যে আর ঘটে ওঠে না। শিল্পী তার নির্লিপ্ততাটুকু বিসর্জন দিয়ে যখন আত্মসুখান্বেষণে প্রবৃত্ত হয় তখন আর শিল্পসৃষ্টি সম্ভব হয় না তার পক্ষে। তার ভিতরের শিল্পীর অপমৃত্যু ঘটে। পরম সুন্দর চকিত আলোকে দেখা দিলেও তার শিল্পকে স্পর্শধন্য করেন না। এই দুর্যোগের সময় শিল্পী আবার তাঁকে পাবার জন্য সাধনায় বসে। ঊর্ধ্বলোকে পরমসুন্দরের উদ্দেশ্যে আবার তার ধ্যানমন্ত্র উচ্চারিত হয়। তার চিত্তে আবার শুদ্ধ বৈরাগ্যের প্রতিষ্ঠা ঘটে কেননা শিল্পী জাগতিক সব কিছুকে অগ্রাহ্য ক'রে সেই পরমসুন্দরের সাধনায় তন্ময় হ'য়ে উঠে। এই জাগতিক বৈরাগ্য ও পরমসুন্দরের জন্য আবেগ তন্ময়তা —এরা সুন্দরের উপাসককে চিহ্নিত করে।[১]

কলারসিক যখন কবির কাব্যে পাঠ করেন যে বর্ষণক্লান্ত আকাশে রামধনু দেখলে তাঁর হৃদয় ময়ূরের মত নেচে ওঠে তখন প্রশ্রয়ের সঙ্গে কবির এই ছেলেমানুষিকে তিনি একপাশে সরিয়ে রাখেন না কেননা সে আনন্দের বার্তাটুকু কলারসিকও আত্মস্থ করেছেন। সে আনন্দ তখন আর কবির একার নয়। তা যে কলারসিকেরও। তা যে বিশ্বজনার। বিশ্বসংসারের সকল রসিকচিত্তে সে আনন্দের প্রতিষ্ঠা। আনন্দের প্রকারভেদ আছে, একথা স্বতঃসিদ্ধ। চা পান করে যে আনন্দ পাই, সে আনন্দ কাব্যানন্দ থেকে পৃথক এই পার্থক্যটুকু আসে শিল্পীর বৈরাগ্য থেকে। চায়ের পেয়ালায় যখন চুমুক দিই তখন তৃষ্ণার্ত অধরের সুগভীর আসক্তি থাকে তরল পানীয়ে কিন্তু রসপিপাসু যখন রসাস্বাদন করে তখন সে নিরাসক্ত। অন্যথায় সৌন্দর্য রসের আস্বাদন ঘটে না। কাব্য রসাস্বাদনের প্রথা স্বতন্ত্র। সেখানে এলিয়ট বর্ণিত স্রষ্টা মনটিকে নিয়ে যেতে হবে। অর্থাৎ যে মন দুঃখভারে ভারাক্রান্ত বা সুখে ঝলমল তাকে তার আবেগের আতিশয্যটুকু সর্বপ্রথমে পরিহার ক'রে সৃষ্টির সূতিকাগৃহে প্রবেশ করতে হয়। নিরাসক্তির দুর্ভেদ্য প্রাকারের মধ্যে শিল্প জন্ম নেবে। আনন্দ বেদনার অনুভূতি ঘটবে কবি মনে, কবিমানস তার দ্বারা অভিভূত হবে না। অভিভূত মানসপটে কাব্যলক্ষ্মীর আবির্ভাব ঘটে না।

১। ডাঃ কে. সি. পাণ্ডে প্রণীত Comparative Aesthetics, পৃঃ ৮২-৮৩ দ্রষ্টব্য।

তাই প্রয়োজন ঘটে কবি মনে প্রশান্ত নিরাসক্তির, এই অনাসক্তি শিল্পসৃজনের পক্ষে একান্ত প্রাসঙ্গিক। এই বৈরাগ্যটুকুকে একদিকে যেমন যথার্থ শিল্পী-মনের নিত্য সহচর বলে মানি অন্যদিকে আবার সুন্দরকেও 'সুন্দর' বলে মানি তখনই যখন সে দ্রষ্টার মনে প্রলোভনের উদ্রেক করে না। এই প্রলোভনের অনুদ্রেক পরমসুন্দরের ধর্ম। যে ধর্ম অখণ্ড সুন্দরে সত্য তাকেই আমরা প্রত্যক্ষ করি প্রতিদিবসের অন্তহীন খণ্ড সুন্দরের মধ্যে। আজন্মসুন্দরের সাধক রবীন্দ্রনাথ বললেন যে যথার্থ কলারসিকেরা "যে বিশিষ্টতাকে আর্টের সম্পদ বলে জানেন সে বিশিষ্টতা প্রলোভন নিরপেক্ষ উৎকর্ষ। তাকে দেখতে গেলে যেমন সাধনা, তাকে পেতে গেলেও তেমনি সাধনা চাই। এই জন্যেই তার মূল্য। নিরলঙ্কার হতে তার ভয় নেই। সরলতার অভাবকে, আড়ম্বরকে সে ইতর বলে ঘৃণা করে; সুললিত বলে নিজের পরিচয় দিতে সে লজ্জাবোধ করে, সুসংগত বলেই তার গৌরব।"[১] কবি এই বৈরাগ্যবিলাসী সুন্দরকে 'সুসংগত' বললেন। সংগতি তার আপন "অন্তর ও বাহিরের" মধ্যে, এ সংগতি দ্রষ্টার মানসিকতার সঙ্গে সৃষ্টির আন্তর ধর্মের ঐক্য। এই সংগতির মধ্যেই বিবাগী শিল্পী মনের ধ্যানের বস্তু পরম সুন্দরের আসন পাতা।

কবি রবীন্দ্রনাথ দুঃখ পেয়েছেন। তাঁর পত্নী বিয়োগ হয়েছে। সে দুঃখ, সে বেদনা একান্ত ব্যক্তিগত, নিদারুণ মর্মান্তিক। তার আবেদন তৃতীয় জনার সমবেদনার উদ্রেক করে কিন্তু এই দুঃখের মৃতকল্প নিক্রিয়তা তাঁর চিত্তকে তেমন গভীরভাবে স্পর্শ করে না। কিন্তু কবি যখন তাঁর ব্যক্তিগত মানস আবেষ্টনীর স্বার্থতপ্ত আবেগটুকুকে কাটিয়ে উঠে প্রশান্ত নির্লিপ্ততায় সেই দুঃখের কথাটুকু আমাদের শোনান, পরিবেশন করেন তাঁর বিরহ ব্যাকুল হৃদয়ের ভাব-অনুভাবকে, তখন আমরা পরম নিষ্ঠার সঙ্গে কবির সেই একান্ত ব্যক্তিগত কাহিনীটুকু শুনি, তাঁর আনন্দ বেদনায় উদ্বেল হ'য়ে উঠি। 'স্মরণ' কাব্যগ্রন্থখানি পড়তে ব'সে একবারও আমাদের মনে হয় না যে এ কাহিনীগুলি রবীন্দ্রনাথের একান্ত ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের কথা। তাঁর স্বর্গতা পত্নীর উদ্দেশে লিখিত এই কবিতাগুলি যে আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয়ের জন্য নয়, একথা আমাদের একবারও মনে হয় না। হৃদয়ের প্রত্যন্ত প্রদেশেও বেদনার ঢেউ এসে লাগে, এক পরম প্রশান্তিতে চিত্ত প্রসন্ন হয়ে ওঠে; সে বেদনায় আনন্দ আছে কেননা সে বেদনা ব্যক্তিনিরপেক্ষ। সে বেদনার বিস্ময়কর

১। যাত্রী, পৃঃ ১৭৫—১৭৬।

সৃজনীশক্তি। সে বেদনায় বাল্মীকির কণ্ঠে প্রথম ছন্দোচ্চারণ, সে বেদনায় নিত্যকালের কাব্যের প্রতিষ্ঠা। ব্যক্তির বেদনা যখন বিশ্বস্বার্থের পটভূমিতে বিচার্য হয় তখন তা' আনন্দের উৎস হয়ে ওঠে। তাই ত' কবির ব্যক্তিগত বেদনার কাহিনীগুলি গৌড়জন-চিত্তকে শিল্পানন্দময়, কাব্যানন্দময় ক'রে তোলে। দুঃখের মধ্যে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হ'লে আত্মস্বরূপ লুপ্ত হয়। এই আত্মবিলুপ্তির ফলে দুঃখের স্বরূপটুকুও অজ্ঞাত থেকে যায়। কবি আপনার দুঃখে আপনি দিশেহারা হ'য়ে পড়েন, যথাযোগ্য মানসিক দূরত্বটুকুর অভাবে এই বিপর্যয় ঘটে। সন্তান যেমন মাতৃজঠর থেকে বিচ্ছিন্ন না হ'লে তার মায়ের রূপটুকু সে দেখে না তেমনি কবি-মানস থেকে পরিপূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হয়ে তার স্বার্থের বাইরে এসে তবেই কবিচিত্তের আনন্দ বেদনা শিল্পযোগ্য হয়ে ওঠে। উদাহণ দিই : কোন প্রেমতৃষিতা নারীকে পুরুষের প্রেম নিবেদনের ব্যাপারটা একান্তভাবেই ব্যক্তিগত : কিন্তু যথাযোগ্য মানসিক দূরত্ব বা নিরাসক্তিটুকু যদি কবির আয়ত্ত হয় তবে সে প্রেমনিবেদনের কাহিনীও কাব্য হয়ে ওঠে। সপ্তদশ শতাব্দীর ইংরেজ কবি টমাস ক্যারুর কথা বলি। তিনি তাঁর এক বান্ধবীর কথা লিখেছেন যিনি কবির প্রেমপ্রার্থিনী হয়েছিলেন। কবি তাঁর অন্তরের নিরুত্তাপ বাসনাটুকু ব্যক্ত করেছেন ; সে বাসনায় সংরক্ষণ প্রবৃত্তি বা অধিকার বিস্তারের অপপ্রয়াস নাই। নৈর্ব্যক্তিক প্রেমের আনন্দে কবিমন আপনার অনুভূতিটুকু সে যুগের অপরিণত ভাষায় প্রকাশ করলেন। শিল্পীজনোচিত নিরাসক্তিটুকু থাকার ফলে একবারও মনে হয় না যে এ ভাষা এ যুগের নয়। এ প্রেমের কাহিনী তিনশো বছর আগেকার একজন কবির জীবনাবসানের সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে গেছে। একবারও মনে হয় না যে এ হ'ল ক্যারুর ব্যক্তিগত কাহিনী। এ যেন বিশ্বজনীন প্রেমিক তার প্রেমিকার কানে কানে প্রেম নিবেদন করছে। স্থান কাল সেই রসলোকে অতিক্রান্ত। চিরন্তন পুরুষ চিরন্তন নারীর কানে কানে আজও যেন বলছে :

"I 'le make your eyes morning Suns appear,
As mild, and fair ;
Your brow as crystal smooth, and clear,
And your dishevell'd hayr
Shall flow like a calm Region of the Ayr.

Rich Nature's store, (Which is the poets' treasure)
I'le spend to dress
Your beauties, if your mine of pleasure
In equal thankfulness
You but unlock, so we each other bless"[১]

পুরুষ নারীকে তার আপন মনের মাধুরী দিয়ে সাজায় নিভৃতে বসে। এ তাদের দুজনার জগৎ। এ জগতের হাসি কান্না, আনন্দ বেদনা দুটি প্রাণকে ঘিরে আবর্তিত হয়। তাদের চোখে যা পরম রমনীয় তা বাইরের লোকের চোখের স্পর্শ পেয়ে অশ্লীল হয়ে ওঠে। তাদের সুন্দর তৃতীয় জনার কাছে অসুন্দর হয়ে ওঠে। একথা অবিসংবাদিত। কিন্তু শিল্পের জগতে সেই দুজনার জগৎ বিশ্বজনের জগতে পরিণত হয়; দুইয়ের চোখে যা ছিল একান্ত আপনার ধন 'তা' যে কেমন করে বিশ্বজনার সম্পদ হ'য়ে ওঠে সে তত্ত্বটুকু অনির্বচনীয় হ'য়েই রইল। কবি যখন তাঁর প্রিয়তমাকে, তাঁর মানস প্রতিমাকে নানান আভরণে সাজান মহাকালের পথের ধারে বসে তখন কবি-প্রিয়ার মধ্যে নিত্যকালের মানবীটির সাক্ষাৎ পাই যাকে অনাদিকাল থেকে পুরুষ সাজিয়ে চলেছে তার মনের রঙ এবং রূপ দিয়ে। একথা একবারও মনে হয় না যে কবি-কথিত প্রেম-আখ্যান তাঁর নিজস্ব সম্পদ। কোথাও অশ্লীলতার আভাস থাকে না তাঁর আপন প্রেমলীলা কীর্তনে। তার কারণ যা ছিল একান্ত ব্যক্তিগত তা নৈর্ব্যক্তিক হয়ে উঠল প্রকাশ গুণে। কাব্যের প্রেমকথা শুধু ত' কবির নয়, তা যে সহৃদয় হৃদয় সংবাদী সমস্ত মানুষের। কবির বৈরাগ্যে তার আপন অনুভূতি ব্যক্তি-অনির্ভর হয়ে ওঠে। শিল্পীর বৈরাগ্য বিশেষকে নির্বিশেষ করে তোলে। সে অনুভব একান্ত ব্যক্তিগত হয়েও সার্বজনীনতার মর্যাদা পায়। রবীন্দ্রনাথ এই বৈরাগ্য তত্ত্বটুকুর ব্যাখ্যা করলেন[২]: "গীতায় আছে, কর্মের বিশুদ্ধ, মুক্তরূপ হচ্ছে তার নিষ্কাম রূপ। অর্থাৎ ত্যাগের দ্বারা নয়, বৈরাগ্যের দ্বারাই কর্মের বন্ধন চলে যায়। তেমনি ভোগেরও বিশুদ্ধ রূপ আছে; সেই রূপটি পেতে গেলে বৈরাগ্য চাই। বলতে হয় "মা গৃধঃ", লোভ করো না। সৌন্দর্যভোগ মনকে জাগাবে, এইটেই তার স্বধর্ম; তা না

১। Thomas carew's "To a Lady that desired I would love her" কবিতা।

২। যাত্রী পৃঃ ১১০ দ্রষ্টব্য।

করে মনকে যখন সে ভোলাতে বসে তখন সে আপনার জাত খোয়ায়। তখন সে হয়ে যায় নীচ। উচ্চ অঙ্গের আর্ট এই নীচতা থেকে বহু যত্নে আপনাকে বাঁচাতে চায়। লোভীর ভীড় বাড়াবার জন্ত সে অনেক সময় কঠোরকে দ্বারের কাছে বসিয়ে রাখে, এমন কি, অনেক সময় কিছু বিশ্রী, কিছু বেসুর তার রচনার সঙ্গে মিলিয়ে দেয়। কেননা তার সাহস আছে। সে জানে, যে বিশিষ্টতা আর্টের প্রাণ, তার সঙ্গে গায়ে পড়ে 'মিষ্টি মিশোল' করবার কোন দরকার নেই। উমার হৃদয় পাবার জন্ত শিবকে কন্দর্প হাজতে হয় নি।' নিষ্কাম ভোগ শিল্পীর এবং শিল্পীরসিকের। দ্রষ্টার নির্লোভ আবেগে যেমন স্থৈর্যের একান্ত প্রয়োজন তেমনি ভোক্তার মানসিকতায় দূরত্বজনিত প্রশান্তিটুকুরও প্রয়োজন রয়েছে। এই প্রশান্তিটুকু সহজলভ্য হয় যদি আমরা শিল্পবস্তুর অনাবশ্যক আবেগ বিরহিত রূপটুকু যথাযথ অবলোকন করি। এ সেই বৈরাগ্য-তত্ত্বেরই পুনরাবৃত্তি। শিল্পী যখন দুচোখ ভরে প্রকৃতির শোভা দেখেন সেখানেও নিস্পৃহ, নিরাসক্ত মনের লীলা। প্রকৃতির শোভায় ডুবে গিয়ে আত্মবিস্মৃত হ'লে সে ভিজে মনে রূপের আলো জলে না। ডুব দিয়ে উঠে আসার পরে বৈরাগ্যের পাবকে মন যখন আবার অগ্নিশুদ্ধ হয়ে ওঠে, তার চারপাশে নির্লিপ্ততার দূরত্বটুকু ঘনিয়ে নেয়, তখনই সুন্দরের যথার্থ অনুভব ঘটে শিল্পী মনে। সুন্দরকে শিল্পী তার স্বমহিমায় প্রত্যক্ষ করেন। এই প্রত্যক্ষ করার পরে আসে সৃষ্টির পালা। তাই 'ত' শিল্পীর বৈরাগ্য বা অনাসক্ত ভোগ যুগে যুগে সমালোচক ও দার্শনিকদের কাছে এতো মর্যাদা পেলো। দার্শনিক লাইব্‌নীজ কথিত শিল্প রস-ভোগের সর্বোত্তম পর্যায়ে ব্যক্তিরুচির যে সামান্তী-করণ ঘটে, তা সম্ভব হবে না যদি এই বৈরাগ্যটুকুর অসদ্ভাব ঘটে। ভারতীয় রসশাস্ত্রে যে সাধারণীকরণের কথা বলা হয়েছে তারও প্রাক্ অবস্থা এই বৈরাগ্য তত্ত্বটুকু এবং এটা হল রসোপভোগের মূল কথা। যার এই নির্লিপ্ত ভোগে অধিকার রইল তার চোখে সহজেই কুঁড়ি ফুল হ'য়ে ফুটে উঠল আর যার সে অধিকার রইল না, সে ফুল ফোটাতে পারল না। কুঁড়ির গায়ে অজস্র আঘাতেও একটি দলও মেলল না মুদিত কমল কলিকা। রসিক মানুষকে এই বৈরাগ্য তত্ত্বটুকু অনুধাবন করতে হবে পরম নিষ্ঠার সঙ্গে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ কেমন করে এই বৈরাগ্যের তত্ত্বটুকু বুঝেছিলেন সেই কথাটি বলে এই প্রবন্ধের শেষ করি :

"এমনি করে দৈবক্রমে বৈরাগীর তত্ত্বকথাটা বুঝে নিয়েছি। যারা বিষয়ী

তারা বিশ্বকে বাদ দিয়ে বিশেষকে খোঁজে। যারা বৈরাগী তারা পথে চলতে চলতেই বিশ্বের সঙ্গে মিলিয়ে বিশেষকে চিনে নেয়। উপরি পাওনা ছাড়া তাদের কোনো বাঁধা পাওনাই নেই। বিশ্ব-প্রকৃতি স্বয়ং যে এই লক্ষ্যহীন বৈরাগী—চলতে চলতেই তার যা কিছু পাওয়া।...বিশ্বের মধ্যে একটা দিক আছে সেটা তার স্থাবর বস্তুর অর্থাৎ বিষয়-সম্পত্তির দিক নয়; সেটা তার চলচিত্তের নিত্য-প্রকাশের দিক। সেখানে আলোছায়া সুর, সেখানে নৃত্য, গীত, বর্ণ, গন্ধ, সেখানে আভাস ইঙ্গিত, সেখানে বিশ্ববাউলের একতারার ঝংকার পথের বাঁকে বাঁকে বেজে বেজে ওঠে। সেখানে সেই বৈরাগীর উত্তরীয়ের গেরুয়া রঙ বাতাসে বাতাসে ঢেউ খেলিয়ে উড়ে যায়। মানুষের ভিতরকার বৈরাগীও আপন কাব্যে গানে ছবিতে তারও জবাব দিতে দিতে পথ চলে তেমনিতারাই, গানের নাচের রূপের রসের ভঙ্গীতে[১]। মানুষের মধ্যেকার শিল্পীটা হল বৈরাগী। তাই ত' শিল্পের আনন্দ রসে গেরুয়া রঙের ফেনা। সে রসে নেশা আছে, তবু তার মধ্যে আসক্তি নেই কোথাও।

---

১ যাত্রী, পৃঃ ১১৩—১১৪।

বহু কথিত র‍ঁলার বান্ধবীর কথা দিয়ে এই আলোচনার সূত্রপাত করি। এই ভদ্রমহিলা তাঁর ব্যক্তিগত আবেগ জীবনের সমস্যার সমাধান খুঁজে পেয়েছিলেন সেক্সপীয়রের ওথেলো নাটকের অভিনয় দেখে। নিষ্পাপ ডেসডিমোনার মর্মন্তুদ্ পরিণতি দুরন্ত আবেগপ্রবণ ওথেলোর প্রেমোন্মত্ততা ও তজ্জনিত অশান্তিময় পরিস্থিতি—এরা হয়ত কখন কখন ব্যবহারিক জীবনে সত্য হয়। এই দুঃখজনক জীবন-নাট্যের কুশীলবেরা হয়ত ওথেলো নাটকের সার্থক অভিনয় দেখে তাঁদের আপন আপন ব্যক্তিগত সমস্যার সমাধানও কখন কখন পেয়ে যান। সে সত্য সদাস্বীকৃত। তবে প্রশ্ন হ'ল এই যে নরনারী বিশেষের ব্যক্তিগত জীবনের সমস্যা সমাধানে পারগতাই কী 'ওথেলো' নাটকের শিল্পমূল্য নির্ণয় ক'রবে? আধুনিক শিল্পবিচার পদ্ধতিকে গ্রীসদেশের দার্শনিক চিন্তা আজও কী আচ্ছন্ন ক'রে রাখবে? ওথেলো নাটকে কুশীলবদের নাট্যকুশলতায়, নাটকের ঘটনা সংস্থানে, চরিত্রচিত্রণে এবং নাটকের রসঘন পরিণতিতে আমরা মুগ্ধ এবং বিস্মিত হ'বো, না আমরা অন্বেষণ করব কোথায় কোন্ মানুষের ব্যক্তিগত আবেগ-সমস্যার সমাধান করল এই নাটকের অভিনয়? নাটকের উৎকর্ষ অপকর্ষের বিচারটুকু কোন্ মানদণ্ডকে আশ্রয় ক'রবে? আমার রসতৃষ্ণা মিটলেই কী আমি তাকে সার্থক শিল্প বলব? অথবা শিল্প আমার জীবনধারণ করার কাজে লাগলেই তাকে শিল্প হিসেবে সানন্দ স্বীকৃতি দেব?

প্রয়োজনকে মোটামুটি দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। যে প্রয়োজন শিল্পীর আন্তর প্রয়োজন নয়, যার উৎস কোন ব্যবহারিক জীবনবোধ, তা হ'ল বাইরের প্রয়োজন। এই প্রয়োজনের সঙ্গে শিল্পের আত্যন্তিক স্বভাবের কোন যোগ নেই। যেমন ধরা যাক্ র‍ঁলা কথিত People's Theatreএর কথা। সেখানে যে নাটকের অভিনয় হবে তার মধ্যে মানুষের স্বার্থের সংঘাত দেখানো চলবে না। কেননা তা মানুষে মানুষে ঐক্য প্রতিষ্ঠার বিরোধী। এখানে নাটকের ঘটনা সংস্থানকে মানব কল্যাণের একটা বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে।[১] শিল্পের প্রকৃতি নির্ণীত হচ্ছে শিল্পের আন্তর প্রয়োজনে

১। দার্শনিক প্রবর হিউম ও তাঁর Treatise on Human Nature গ্রন্থে শিল্পে প্রয়োজনবাদকে স্বীকৃতি দিলেন। তিনি তাঁর 'সংশয়বাদ'কে নন্দনতত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত করেন নি, এটা লক্ষ্য করবার বিষয়।

নয়; বাইরের জগতে ঐক্য প্রতিষ্ঠার মহৎ প্রয়োজন সিদ্ধির তাগিদে। এই প্রয়োজনটুকু যত বড়, যত মহৎই হোক না কেন এটি শিল্পের প্রকৃতি-বিরোধী। এই প্রয়োজনটুকু শিল্পের 'স্বরাট' প্রকৃতিকে ক্ষুণ্ণ করছে। শিল্প আত্মস্বাতন্ত্র্য হারিয়ে পরতন্ত্র বশীভূত হয়ে পড়ছে। শিল্প চারিত্র্য বহির্জীবনের প্রয়োজনে ক্ষুণ্ণ এবং ব্যাহত হচ্ছে। সুন্দরের প্রতিষ্ঠা শিল্পে ঘটল কী না তার বিচার হচ্ছে শিল্পের ব্যবহারগত প্রয়োজনের নিরিখে। শীতকালের সকাল বেলার কাঁচা সোনা রোদ্দুরকে সুন্দর বলছি তার বর্ণ সুষমার জন্য নয়, তা শীত জড়তাকে দূর করে দিয়ে শরীরকে উত্তপ্ত করে দিচ্ছে ব'লে। এ হল প্রয়োজনবাদীদের মত। সুন্দরকে এরা ব্যবহারের তাঁবেদার ক'রে সৌন্দর্যের প্রকৃতিকে খর্ব করলেন।

যে প্রয়োজন শিল্পের অন্তরলোকের প্রয়োজন সেই প্রয়োজনেই যথার্থ শিল্পের উৎপত্তি ঘটে। একেই শিল্পী এবং কলারসিকেরা অপ্রয়োজনের প্রয়োজন বলেছেন। শিল্পীর প্রয়োজনে কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্য নেই। এই লক্ষ্য-অনির্দিষ্টতাই শিল্পীর প্রয়োজনকে ব্যবহারগত প্রয়োজন থেকে স্বতন্ত্র এবং পৃথক করেছে। শিল্পগত প্রয়োজনের কোন ধারণাও শিল্পী মানসে থাকে না। মহাদার্শনিক কান্টের মতে শিল্পের মূলে এই 'অপ্রয়োজনের প্রয়োজনে'র প্রেরণা থাকে বলেই শিল্পানন্দ সর্বত্রগামী হয়[১]। তার আবেদন হয় সার্বিক কোন চিন্তাসিদ্ধ ভাবের (Reflective idea) সহায়তা ব্যতিরেকেই। অর্থাৎ কান্টের মতে শিল্পের প্রয়োজনটুকুর কোন নির্দিষ্ট রূপ নেই। এই রূপহীন প্রয়োজনটুকু কোন নির্দিষ্ট ভাবকে আশ্রয় করে না বলেই আমাদের কল্পনা (Imagination) এবং বোধ (Understanding) রসাস্বাদনের ক্ষেত্রে যুক্ত হ'তে পারে। আমাদের সৌন্দর্যবোধের মূলে রয়েছে সুন্দর বস্তুর সঙ্গে আমাদের জ্ঞানবৃত্তির (Cognitive faculties) সুসংগতি। সুন্দর বস্তুকে সুন্দর বলি এই সমন্বয়ের এবং সংগতির জন্য। বহির্জগতের অথবা অন্তরলোকের কোন প্রয়োজন সিদ্ধ করে

১। "In an aesthetic judgement the beautiful object is perceived as exhibiting a purposiveness without purpose, that is to say, a purposiveness without the representation of an end, without a concept of its nature." (Knox প্রণীত The Aesthetic Theories of Kant, Hegel & Schopenhauer গ্রন্থের ৩৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য।)

বলেই তাকে আমরা সুন্দর বলি না। ভারতীয় নন্দনতত্ত্বের লীলা ধারণায় প্রয়োজন-অতিরিক্ত এই ব্যঞ্জনাটুকু রয়েছে। স্বয়ং বিধাতা যখন লীলা পরবশ হ'ন তখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিচিত্র সৃষ্টি সম্ভব হয়। বিধাতা যখন সৃষ্টিশীল হন তখন কোন প্রয়োজন তাঁর সৃষ্টিকর্মের প্রেরণা জোগায় না। সৃষ্টি হ'ল তাঁর লীলা। লীলা ধারণায় সর্ব-প্রয়োজন অস্বীকৃত। পাখী গান করে। তাকে লীলা বলব কী না সে সম্বন্ধে চিন্তার অবকাশ আছে। মিথুনকালে পুরুষ পাখীর-নৃত্য-গীত অনুষ্ঠিত হয় স্ত্রী পাখীকে আকৃষ্ট করার জন্য, এ কথা পক্ষীতত্ত্ববিদেরা বলেন। এ ক্ষেত্রে নৃত্য-গীতের পিছনে ব্যবহারগত প্রয়োজন রয়েছে। এই প্রয়োজন মেটাতে গিয়ে শিল্পসৃষ্টি কখনই সম্ভব হবে না। যদি কখনও এমন দেখা যায় যে শিল্প সৃষ্টি হয়েছে কোন প্রয়োজন মেটাতে গিয়ে, তখন বুঝতে হবে যে প্রয়োজন মেটাবার জন্য সৃষ্ট-কর্ম শিল্প হ'য়ে ওঠেনি; তা শিল্প হয়েছে শিল্পীর প্রকাশ গুণে। শিল্পী যদি সত্য সত্যই কোন উদ্দেশ্য প্রণোদিত হন, যে উদ্দেশ্য তাঁর শিল্পকর্মের জনক, তবে তা হ'ল রূপাভাব দূর করা অর্থাৎ রূপ সৃষ্টি করা। এই রূপ সৃষ্টির তাগিদ আসে ভিতর থেকে; ভাববাদী দার্শনিকেরা বলবেন যে শিল্পীর এষণা হ'ল ভাবকে (Idea) তার পূর্ণ মহিমায় প্রকাশ করা। ভাব যখন জড় বস্তুর মাধ্যমে আপনাকে প্রকাশ করে তখন জড় বস্তুর জড়তার জন্য তাদের পূর্ণাঙ্গ এবং সম্যক্ প্রকাশ সম্ভব হয় না। শিল্পী প্রকৃতিতে ভাবের এই অসম্পূর্ণ প্রকাশ প্রত্যক্ষ করেন। তিনি প্রয়াস পান শিল্প সৃষ্টির মাধ্যমে এই ভাবকে পূর্ণতর মহিমায় প্রকাশ করতে। একে আমরা আন্তর প্রয়োজন বা অপ্রয়োজনের প্রয়োজন বলেছি। শিল্পীগুরু অবনীন্দ্রনাথের শিল্প ধারণায় এই আন্তর প্রয়োজন স্বীকৃত। এই প্রয়োজনটুকু শিল্পের প্রকৃতির সঙ্গে অসঙ্গত নয়। এই প্রয়োজনের নির্বাধ স্বীকৃতি শিল্পের প্রকৃতিকে ক্ষুণ্ণ করে না। ভাববাদী দার্শনিকদের অনুসরণে অবনীন্দ্রনাথ বললেন যে শিল্পীর অন্তরে রূপাভাবই হ'ল একমাত্র প্রয়োজন যা নন্দনতত্ত্বে স্বীকৃত হ'তে পারে। এই প্রয়োজনটুক শিল্পীর জগতে নিত্য সত্য। এই প্রয়োজন কখন মেটে না। শিল্পী যখন রূপ সৃষ্টি করেন তখন এই প্রয়োজনের সাময়িক এবং আংশিক পূর্তি হয়। শিল্পীমনে আসে ক্ষণিকের তৃপ্তি এবং পূর্ণতার আনন্দ। এই তৃপ্তি, এই আনন্দ একান্তই ক্ষণিকের। এর পরেই আবার সেই অতৃপ্তি শিল্পী মানসকে আচ্ছন্ন করে। এই অতৃপ্তিকে স্বর্গীয় অতৃপ্তি বা Divine discontent বলা হয়েছে। শিল্পী আবার সৃষ্টিলীলায়

মেতে ওঠেন। এক রূপ থেকে আর এক রূপ সৃষ্টি হয়। কবি নিরন্তর রূপ থেকে রূপে যাওয়া আসা করেন। সকাল গড়িয়ে যায় দুপুরে, দুপুর সায়াহ্নের স্তিমিত আলোয় অবসিত হ'য়ে আসে; সন্ধ্যার নিঃশব্দ অভিসার নিশুতি নিশীথের দ্বার প্রান্তে এসে থেমে যায়; তবুও শিল্পীর রূপ সৃষ্টি-প্রয়াসের শেষ হয় না। তাঁর শিল্পী-মানস নিত্য অশান্ত; সে অশান্তি নতুন নতুর সৃষ্টির প্রত্যাশা সঞ্জাত। নব নব সৃষ্টির প্রেরণা আসে পূর্বতন সৃষ্টির অপূর্ণতা থেকে। তাঁর শিল্পের অপূর্ণতা তাঁর কাছে নিত্য প্রত্যক্ষ। দুঃখী মানুষই কেবল জানে দুঃখের দারুণতম বেদনা কোথায় রয়েছে? তেমনি ধারা শিল্পী জানেন তাঁর বহুবাঞ্ছিত শিল্পকর্মের কোথায় ত্রুটি রয়েছে, কোথায় রয়েছে অপূর্ণতা। তাই ত' রবীন্দ্রনাথের মত মহাকবিকেও আগামী যুগের কবিকে আহ্বান ক'রে দুঃখী মানুষের মর্মবেদনাটুকু উদ্ধার করার জন্য তাঁর কাছে আবেদন জানাতে হয়। নিজসৃষ্টিতে শিল্পী যখন এই অপূর্ণতাটুকু প্রত্যক্ষ করেন তখন তাঁর চোখে সেই নিত্য সত্য চিরন্তন রূপাভাবটুকু প্রকট হ'য়ে ওঠে। অবনীন্দ্রনাথ বললেন যে এই রূপাভাবটুই হ'ল সমস্ত শিল্পকর্মের জনক। যে মুহূর্তে শিল্পীর জাগ্রত চেতনায় এই রূপভাবটুকু অনুভূত হয় তখন তাঁর অন্তরে সৃষ্টির জ্বালা আগুন ধরায়। কবি স্বর্গীয় বেদনায় কাতর হন। কবি 'অপূর্ব উদ্বেগভরে' সৃষ্টি সম্ভাবনায় জাগ্রত হয়ে ওঠেন। 'ক্ষিপ্ত ধূর্জটির মত' তখন তাঁর মানসিক অবস্থা। সার্থক সৃষ্টিতে, 'রামায়ণের রচনায়' এই অশান্তির শেষ হয়। সার্থক সৃষ্টি শিল্পীমানসে যে আনন্দের সৃষ্টি করে তা "বিমল আনন্দ"; এই আনন্দ কোন প্রয়োজন সিদ্ধির আনন্দ নয়; এ আনন্দ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সুন্দর বস্তু দর্শনের আনন্দ নয়; সবুজ ঘাস, ফুলের সৌগন্ধ, বীণার সুর, এরা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আনন্দ দেয়; এই আনন্দকে দার্শনিক কাণ্টের অনুসরণে আমরা বিমল আনন্দ (Pure joy) বলব না। বর্ণ-সমন্বয়, ফুলের গঠন, সুরের সঙ্গতি এরা যে আনন্দ দেয় তা হ'ল বিমল আনন্দ। এ আনন্দ নন্দনতাত্ত্বিক; এ আনন্দই যথার্থ শিল্পকর্মজাত যে শিল্পকর্মে সুন্দরের নিত্য প্রতিষ্ঠা। দার্শনিক কাণ্টের এই বিমল আনন্দের তত্ত্বটুকু হাচিসন এবং লর্ড কেমেথের নন্দনতাত্ত্বিক ধারণাকে প্রভাবিত করেছিল। এঁদের 'স্বনির্ভর' (free) এবং 'পরনির্ভর' (Dependent) সুন্দরের ধারণা বহুল পরিমাণে কাণ্ট কথিত এই বিমল নন্দনতাত্ত্বিক আনন্দের তত্ত্ব থেকে গৃহীত। কাণ্ট কথিত এই 'বিমল আনন্দ' শুধুমাত্র ইন্দ্রিয়জাত আনন্দ নয়। নন্দনতাত্ত্বিক আনন্দ উপজাত হয় যখন বোধ (Understanding) এবং

কল্পনা (Imagination) সুন্দরের রসাস্বাদনে নিয়োজিত হয়। এই বিমল আনন্দই যদি সৌন্দর্য রসাস্বাদনের লক্ষ্য হয় তবে শিল্পকর্মকে কোন প্রয়োজনের অধীন করা অসঙ্গত হবে। তাই কাণ্ট বললেন, শিল্পের প্রয়োজন হ'ল 'Zweck Omassig Keit Ohne Zweck' অর্থাৎ "অপ্রয়োজনের প্রয়োজন"।

শিল্পী মানসে যে রূপাভাব থেকে শিল্পসৃষ্টি হয় তা শিল্পীমনের নিত্য সহচর। এই অভাববোধটুকু পূর্ণ করার চেষ্টা কখন কখন বাইরের জীবনের প্রয়োজনকে উপলক্ষ্য ক'রে প্রকট হয়। আমরা যদি তখন বাইরের জীবনের এই উপলক্ষ্যটাকেই শিল্পসৃষ্টির মূল বা উৎস বলে ভুল করি তা হ'লে বিচার ভ্রান্ত হবে[১]। কখন ধর্মভাবকে, কখন মানবপ্রেমকে, কখন জীবে দয়াকে উপলক্ষ্য ক'রে শিল্পীর শিল্প প্রেরণা উৎসারিত হ'য়ে ওঠে। দক্ষিণ ভারতের মন্দিরাভ্যন্তরের অপূর্ব শিল্পকর্ম, গুহাগাত্রের অঙ্কন এবং ভাস্কর্য শিল্পরূপ পেয়েছিল যে সব শিল্পীর হাতে তারা হয়ত ধর্মকে উপলক্ষ্য ক'রে এই সব শিল্পকর্মে আত্মনিয়োগ করেছিল। ধর্মোন্মাদনা বা ধর্মভাব শিল্পকর্ম হ'য়ে ওঠে। সুতরাং প্রকাশটাই হ'ল শিল্পকর্ম; উপলক্ষ্যটা নয়। এই শিল্পের উৎকর্ষ অপকর্ষ নির্ভর করে শিল্পীর ব্যক্তিত্ব বিচ্যুতির (Desubjectification) ওপর। শিল্প বৈরাগ্যের ওপর শিল্পকর্ম নির্ভরশীল। অর্থাৎ শিল্পীর অনুরাগ, তার ভালোলাগা, মন্দলাগা সবটাই যদি শিল্পকর্মে প্রতিফলিত হয় তা একান্তই একটি মানুষের রুচিকেন্দ্রিক হয়ে পড়বে। যে শিল্প-বৈরাগ্যের কথা বলেছি তার দ্বারা এই শিল্পকর্ম চিহ্নিত হবে। বৈরাগ্যের শুভ্র সিংহাসনে আর্টের প্রতিষ্ঠা নিত্যকালের; তাই জন্যই ত' তার আবেদন সার্বিক হয়। শিল্পী-মানসে এই বৈরাগ্যের অভাব ঘটলে শিল্প তার সার্বিক আবেদনে ঐশ্বর্যবান হ'য়ে উঠতে পারে না। তাই ত' অবনীন্দ্রনাথ বললেন যে শিল্পকে সার্বিক করতে হ'লে শিল্পীর ইণ্ডিভিডুয়ালিজম্‌কে সার্বজনীন রুচির হাতুড়ি দিয়ে ভাঙতে হবে।

১। "The true artist is indifferent to the materials and conditions imposed upon him. He accepts any condition so long as they can be used to express his will-to-form."

[Herbert Read প্রণীত The Meaning of Art গ্রন্থের ১৯১ পৃঃ দ্রষ্টব্য। শিল্পীর প্রকাশেচ্ছাটাই বড় কথা। কী উপলক্ষ্যে প্রকাশটা ঘটল সেটা বড় কথা নয়; এটাই হার্বার্ট রীড বললেন।]

শিল্পের এই নৈর্ব্যক্তীকরণ ঘটলে তবেই শিল্প জীবনের সাময়িক প্রয়োজনকে, যাকে আমরা 'উপলক্ষ্য' বলেছি তাকে অনায়াসে উত্তীর্ণ হয়ে যেতে পারে। উদাহরণ হিসেবে রবীন্দ্রনাথের 'মহুয়া' কাব্যগ্রন্থের কথা বলি। এই কাব্যগ্রন্থের অধিকাংশ কবিতাই সাময়িক প্রয়োজনে লিখিত। প্রীতি এবং স্নেহভাজনদের বিবাহ উৎসব উপলক্ষ্যে অনেকগুলি কবিতা কবি লিখেছিলেন। তাদের অনেকেই রসোত্তীর্ণ হয়েছে। যারা রসোত্তীর্ণ হ'ল তারা প্রয়োজন সাধন করেছে বলে রসোত্তীর্ণ হয়নি। প্রয়োজন সাধন ত' সকলেই করল, তবে মাত্র কয়েকটি কবিতা রসোত্তীর্ণ হ'ল, এ কেমন কথা? তা হ'লে বোঝা যাচ্ছে যে প্রয়োজন সিদ্ধ করেছে বলেই রসোত্তীর্ণ কবিতাগুলি রসোত্তীর্ণ হয় নি। তারা রসোত্তীর্ণ হয়েছে শিল্পীর সার্থক প্রকাশের প্রসাদগুণে। তারা কালোত্তীর্ণ হল শিল্পীর প্রকাশ মাহাত্ম্যে। শিল্প হল প্রকাশ। অবনীন্দ্রনাথ প্রমুখ শিল্পবিদ্ মনীষীরা বললেন যে ব্যবহারিক জীবনের, বাস্তব জীবনের কোন প্রয়োজন মেটানো শিল্পের কাজ নয়। যদি প্রয়োজন মেটানোর জন্যই কেউ শিল্প সৃষ্টি করার কাজে প্রয়াসী হন তা হলে প্রয়োজনটা বড় হ'য়ে উঠে শিল্পকে গ্রাস করবে; চারুকলা কারুকর্মে (crafts) পর্যবসিত হবে। তাই অবনীন্দ্র নাথের নন্দনতত্ত্বে শিল্পের প্রায়োজনিক চারিত্রটুকু উপেক্ষিত। আমরা বলব যে প্রয়োজন শিল্প-চেতনাকে উদ্বোধিত করতে পারে। তবে সে প্রয়োজন সিদ্ধির কোন সজ্ঞান নিশানা শিল্পীর শিল্পকর্মে থাকে না। ভ্যান্‌গগ যাঁদের দুঃখে উদ্বেলিতচিত্ত হয়ে "পট্যাটো ইটার্স" ছবিখানি আঁকলেন তাঁরা সর্বকালের দুঃখী মানুষ। গগের সমকালীন দুঃখী মানুষদের দুঃখ-দারিদ্র্য আনন্দ-বেদনার কোন চিহ্নই রইল না তাঁর সৃষ্টিতে। ঐতিহাসিক গগের সমকালীন মানুষদের সামাজিক এবং অর্থ নৈতিক ইতিহাস আবিষ্কার করবেন। সে কাজ শিল্পীর নয়। শিল্পরসিক সর্বকালের নিপীড়িত মানুষের দুঃখ প্রত্যক্ষ করবেন এই অনবদ্য চিত্রটিতে। এ চিত্র কোন হৃদয়বান মানুষকে সমাজ সেবাকর্মে উদ্বুদ্ধ করবে না। আর যদিও তা করে তা হলেও তা শিল্পীর অভিপ্রেত নয়। আমাদের তন্ত্রে শিল্পকর্মকে এক গাছ থেকে পাখীর আর এক গাছে উড়ে যাওয়ার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। শিল্পী আপন রচনা পথের কোন চিহ্নই রাখেন না যেমন পাখী আকাশে আপন গমন পথের কোন চিত্র রেখে যায় না। প্রয়োজনের তত্ত্বটুকু শিল্পকর্মের পক্ষে অনাবশ্যক, অতিরিক্ত। বুলগেরীয় ভাস্কর Daskalov 'কোরীয় ছেলেমেয়ে' (Korean children) শীর্ষক ভাস্কর্যকর্মে যে

ভয় বিহ্বল মেয়ে এবং মুষ্ট্যাহত দৃঢ় প্রতিজ্ঞ বালকের চিত্র এঁকেছেন তার ঐতিহাসিক মূল্য আমরা স্বীকার করি। আন্তর্জাতিক জনমত গঠনের জন্য এই ধরনের শিল্পকর্মের মূল্য সর্বজন স্বীকৃত। জাতীয়ভাবে উদ্বুদ্ধ কোরীয় নাগরিকদের দৃঢ় প্রতিজ্ঞার প্রতীক বুঝি এই বালক। সাম্রাজ্যবাদশোষিত দেশের অসহায়ত্বের প্রতীক বুঝি এই ভয়বিহ্বল মেয়েটি। এই সার্থক-শিল্পকর্মের রচনায় সময় শিল্পীর নির্জ্ঞান মনে তাঁর জাতীয় জীবনের সমগ্র দুঃখ-বেদনা-নৈরাশ্য এবং তা উত্তীর্ণ হবার দুর্নিবার প্রতিজ্ঞা যে কাজ করেছে, একথা অনস্বীকার্য। তবু শিল্পকর্মের মধ্যে এই 'মহৎ প্রয়োজনটুকুর' ব্যঞ্জনা কোথাও নেই; কোথাও তা 'শিল্পকর্ম'কে ব্যাহত করে নি। রুমানীয় ভাস্কর Kaznovski'র একটি শিল্পকর্মের উল্লেখ করি। তাঁর 'শ্রমবীর' (Heroes of Labour) শীর্ষক ভাস্কর্যকর্মে কোথাও শ্রমের ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তার ব্যঞ্জনা নেই। এই সার্থক শিল্পকর্মটিতে 'শ্রম' এক অনির্বচনীয় মর্যাদা লাভ করেছে কেননা যথার্থ শিল্পীর হাতে শিল্পবস্তু (Content) রসোত্তীর্ণ হয়েছে। এই সার্থক শিল্পসৃষ্টির জগতে প্রয়োজন নিত্য অতিক্রান্ত।

পরন্তু যাঁরা শিল্পকলাকে প্রয়োজনের দাসত্বেই শুধু আবদ্ধ ক'রে তার ওপর চরম মূল্য আরোপ করার চেষ্টা করলেন তাঁরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। এঁদের শিল্পকলা উত্তরকালের মানুষের কাছে শিল্পমূল্যে বিকোয় নি; ঐতিহাসিক এঁদের ব্যর্থ সৃষ্টিকে আবিষ্কার করেছেন; কলারসিক এই ব্যর্থতার জন্য এঁদের ভ্রান্ত শিল্পদর্শনকে দায়ী করেছেন। এমনি ধারা ব্যর্থ শিল্পীর দল হলেন রুশিয়ার 'Purpose' গোষ্ঠীর শিল্পীরা। এঁদের সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা ন্যস্ত হয়েছে Tamara Talbot Rice প্রণীত Russian Art শীর্ষক গ্রন্থে। 'Purpose' গোষ্ঠীর শিল্পীদের অভ্যুদয় হয়েছিল উনিশ শতকে এবং শিল্প ইতিহাসবেত্তা বলেন যে সমকালীন সমাজে সহৃদয় সামাজিকের মনে শিল্পবোধ এবং শিল্পপ্রীতির উন্মেষে এঁরা যথেষ্ট সহায়তা করে-ছিলেন। তবু উত্তরকালের সমালোচকদের বিচারে এঁরা নিন্দিত হলেন কেননা এঁরা শিল্পকে নীতিগত এবং ব্যবহারগত প্রয়োজনের অধীন করে ছিলেন। এই শিল্পীগোষ্ঠীর মধ্যে আমরা Nesterov, Vasnetzov, Vereschagin প্রভৃতির উল্লেখ করতে পারি; উঁচুদরের শিল্পীর শক্তি নিয়ে আবির্ভূত হয়েও Nesterov শিল্পলোকে অমর আসনের অধিকারী হলেন না কেননা তাঁর শিল্পে নীতি প্রচারের একটা উদগ্র প্রয়াস ছিল। নীতিবিদের

উন্নাসিকতা শিল্পীর শিল্পবোধকে ছাপিয়ে উঠে তার সৃষ্টির শিল্প মূল্যে ন্যূনতা ঘটালো। Vereschagin উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদ থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্যন্ত অজস্র সৃষ্টি করলেন; প্যারিসে তাঁর শিল্পশিক্ষা, ভারতবর্ষের শিল্পকলার সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়; কিছুই কাজে এল না। 'Purpose' গোষ্ঠীর শিল্পী হিসেবে তিনি শিল্পের ব্যবহারগত প্রয়োজনটা অস্বীকার না করে শিল্পকে যুদ্ধের প্রচারের কাছে লাগালেন। দেশের আপামর জনসাধারণ তাঁর শিল্পকর্মের দ্বারা অনুপ্রাণিত হ'ল; কিন্তু শিল্পকে প্রচারের কাছে ব্যবহার করার ফলে শিল্পের শাশ্বত মূল্যের হানি ঘটল। শিল্প তার স্বকীয় মূল্য হারিয়ে ফেলল। উত্তর যুগের মানুষের চোখে শিল্পীর প্রয়োজনটাই বড় হয়ে দেখা দিল। তাই এঁরা কলারসিকের অভিনন্দনধন্য হ'লেন না। এঁদের শিল্পে প্রকাশটা বড় হ'য়ে উঠল না, প্রচারটাই বড় হয়ে উঠল। তাই এঁদের শিল্পকর্মে 'সৃষ্টিকর্মের', অসদ্ভাব চোখে পড়ল। এঁরা 'অপূর্ববস্তু' নির্মাণ করতে পারলেন না; এঁরা যে আলো জ্বাললেন সে আলো 'অ-পূর্ব' নয়, শিল্পজগতের ইতিহাসে মানুষের কর্মচক্রের ইতিহাসে সে আলো বার বার জ্বলেছে এবং নিভেছে। তাই ত' ইতিহাস এঁদের শিল্পকর্মের মূল্যকে অস্বীকার করল। অবশ্য প্রয়োজনটা সব সময় যে শিল্পকর্মের হানি করে একথা বললে সত্যের অপলাপ করা হবে। প্রয়োজনটাকে অপ্রয়োজনের ভূমিকায় এবং অপ্রয়োজনকে আত্যন্তিক প্রয়োজনের ভূমিকায় দাঁড় করিয়ে দিতে পারে শিল্পীর প্রতিভা। সেই প্রতিভাটুকুর স্পর্শ পেলে প্রয়োজনের তাগিদে লেখা কবিতাও রসধন্য হয়ে ওঠে। তাই এ প্রসঙ্গে প্রতিভার কথাটাই হল বড় কথা। শিল্পী প্রতিভা আধার হলে প্রয়োজন-অপ্রয়োজনের প্রসঙ্গটা অবান্তর এবং অতিরিক্ত হয়ে পড়ে।

শিল্প ও আনন্দ

এ কথা সর্বজন স্বীকৃত যে শিল্প আনন্দ দেয়; তা তার বিষয়বস্তু যাই হোক্‌ না কেন। নিরপরাধা সীতার অগ্নিপরীক্ষা, শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক তাঁর নির্বাসন, শক্তিমদমত্ত দুঃশাসন কর্তৃক অসহায়া দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ, সপ্তমহারথী বেষ্টিত অভিমন্যুর হত্যা-কাহিনী, শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক নৃশংসভাবে জরাসন্ধ বধ, ওথেলো কর্তৃক ডেসডিমোনা হত্যা—এই সব অতি মর্মন্তুদ কাহিনী আমরা বার বার পড়ি, কল্পনায় চিত্রিত করি এই বেদনাময়-সংঘটনের দৃশ্যগুলি, অনুভব করার চেষ্টা করি অতি ব্যথিতের অনুভূতির তীব্রতায় ও গভীরতায়। আশ্চর্যের বিষয় এই যে আমরা সেই পাঠককে সহৃদয় সামাজিক বলি যে এই বিষাদময় ঘটনাগুলি থেকে রস আহরণ করে পুলকিত হয়। শিল্পবস্তু (content) যাই হোক্‌ না কেন তা থেকে রস আহরণ করাই হ'ল রসিকের কাজ—রসিকজনার বৃত্তি। গৌড়জন যে কাব্যকথার স্রোতে স্নান পান করে আনন্দ পান না তা শিল্পপদবাচ্য নয়। অতএব একথা বলা চলে যে শিল্পের স্বরূপ লক্ষণ হ'ল আনন্দ। শিল্প শিল্পীকে আনন্দ দেয়, আবার রসিকসুজনকে তৃপ্ত করে। বহুক্ষেত্রে হয়ত দেখা যাবে (যদি তা দেখা সম্ভব হত কোন দিনও) যে শিল্পরসিক শিল্পীর থেকেও বেশী আনন্দ পেয়েছেন। আনন্দের এই পরিমাণগত পরিমাপ করার যন্ত্র মনস্তত্ত্বের ল্যাবোরেটরিতে ব্যবহার করা কোন দিন যদি সম্ভব হয় তবে হয়ত দেখা যাবে যে কোন একজন পাঠক মহাকাব্য অপেক্ষা কোন এক ক্ষুদ্রতর কবির কাব্য পড়ে অনেক বেশী আনন্দ পেয়েছেন। এই তত্ত্বটা মহাকবি এবং ক্ষুদ্র কবির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। বহু রসজ্ঞ পাঠকের কল্পনায় যে সব চিত্রকল্পের উদ্ভব হয় কোন একটি বিশেষ কবির কাব্য পাঠ করে তা হয়ত' সেই কবির কল্পনায় কোন দিনও স্থান পায়নি, হয়ত তাঁর কাব্য-চিত্রণে তিনি রসিক সুজনের মত আলো ঝলমল বর্ণবাহারের ব্যবহার করেন নি, হয়ত কবির আঁকা অশ্রুসজল কাহিনীটি রসিকের মনে সৃষ্ট কাহিনীর মত অতটা লবণাক্ত নয়। এ কথা ত' সর্বজনবিদিত যে কবির নিরাসক্তি তাকে ব্যবহারগত জীবনের মালিন্য থেকে ঊর্ধ্বে রাখে। অর্থাৎ জীবনের এবং জগতের ঘটনাগুলির মধ্যে তাঁর সম্পর্কটুকু অপেক্ষাকৃত নিরাসক্ত। এই জীবন সম্বন্ধে আসক্তি যেখানে অল্প সেখানে বেদনার গভীরতাও স্বল্প হয়ে পড়ে। সন্তান বিয়োগে মায় ক্রন্দনে যে বুক ফাটা হাহাকার থাকে তা যখন কবির কাব্যে

বর্ণিত হয় তখন সেই হাহাকারটুকুকে সর্বজনবোধ্য করে তোলার জন্যে সেই 'হাহাকারের' একান্ত ব্যক্তিকেন্দ্রিকতাটুকুকে সম্ভবত নৈর্ব্যক্তিক ক'রে তুলে তাকে সর্বজনগ্রাহ্য ক'রে তোলা হয়। যা ছিল একান্ত ব্যক্তিগত তাকে Universal বা বিশ্বজনীন ক'রে তোলার জন্য মায়ের কান্নার রূপান্তর ঘটে। এই বিশ্বজনীন ক'রে তোলার মন্ত্রটুকু হ'ল প্রতিভার জাদু। এর ছোঁয়া লাগলে তবেই চরমতম দুঃখের কাহিনীও সবার কাছে আস্বাদন যোগ্য হয়ে ওঠে; রসিক তা থেকে আনন্দ পান, সে আনন্দ অপার এবং অন্তহীন।

শিল্পানন্দবাদীরা একথা বলেছেন যে, শিল্পানন্দ হল ব্রহ্মানন্দের সহোদর। অর্থাৎ ব্রহ্মপ্রাপ্তিতে মানুষ যে আনন্দ পায় সার্থক শিল্পসৃষ্টিতে অথবা সার্থক শিল্পকর্মের রসোপলব্ধিতে সহৃদয় সামাজিক মানুষ সেই ধরনের আনন্দই লাভ করেন। এ কথাটা খুব বুদ্ধিগ্রাহ্য নয়। ব্রহ্মের আস্বাদজনিত আনন্দ যে কি সে সম্বন্ধে আমাদের কোন বিধিবদ্ধ ধারণা নেই। কাজে কাজেই সেই আনন্দের সঙ্গে শিল্প থেকে আহৃত আনন্দের তুলনা করা বোধ হয় সমীচীন নয়। কেন না, উপমা এবং উপমেয় এতদুভয়ের গুণাবলীর মধ্যে ঐক্য থাকা দরকার। যেমন, যখন আমরা চাঁদের সঙ্গে রমণীর মুখের তুলনা করি তখন আমরা এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অবহিত থাকি যে রমণীর মুখ ও চাঁদের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান থাকলেও হয়ত' শোভার দিক থেকে, সৌন্দর্যের দিক থেকে উভয়ের মধ্যে একটা মিল রয়েছে। এই সাদৃশ্যটুকু অবলোকন ক'রে আমরা এতদুভয়ের মধ্যে তুলনা করে থাকি। অবশ্য এই ধরনের তুলনার বিশেষ কোন আন্বীক্ষিকী মূল্য নেই একথা তর্কশাস্ত্রবিশারদেরা স্বীকার করেছেন। সুতরাং আমরা যখন ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে শিল্পানন্দের তুলনা করি তখন চাঁদের সঙ্গে রমণীর মুখের তুলনা করতে গেলে আমরা যতটুকু সাদৃশ্যের কথা ভাবি অন্ততঃপক্ষে সেটুকু সাদৃশ্য-সম্বন্ধ এই শিল্পানন্দ এবং ব্রহ্মলাভের আনন্দের মধ্যে খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। কেন না আমরা ব্রহ্মানন্দ এবং শিল্পানন্দ এই উভয়ের স্বরূপের কোন কিছুই জানি না।

দার্শনিক স্পিনোজা বলেছেন: All determination is negation, অর্থাৎ নির্বিশেষকে যে ভাবেই বিশেষিত করি না কেন তার দ্বারা তার স্বভাবের হানি করা হয়। নির্বিশেষকে আমরা যে কোন বিশেষণ দিয়েই বিশেষিত করি না কেন তার দ্বারা আমরা নির্বিশেষের অনন্ত চরিত্রকে, তার সীমাহীন অনির্দেশ্য ব্যাপ্তিকে ক্ষুণ্ণ করি। অবশ্য ব্রহ্মানন্দ নির্বিশেষ এবং শিল্পানন্দ এক ধরনের

বিশেষের দ্বারা বিশেষিত। এই ধরনের স্বীকৃতি আমরা রসগঙ্গাধরে এবং সাহিত্যদর্পণে প্রত্যক্ষ করেছি। রসাস্বাদের সঙ্গে ব্রহ্মাস্বাদের পার্থক্য নির্দেশ করতে গিয়ে বলা হ'ল যে ব্রহ্মাস্বাদ নির্বিকল্প, বাহ্য ও আন্তর সমস্ত বিষয়ের সংসর্গবিরহিত ; কিন্তু শিল্পানন্দ সবিকল্প : আন্তর রতি প্রভৃতি স্থায়ী এবং বাহ্য বিভাদির দ্বারা সংস্পৃষ্ট। "যোঽয়ং ভোগো বিষয়—সংবাদাদ্ ব্রহ্মাস্বাদ-সবিধবর্তীত্যুচ্যতে"॥—রসগঙ্গাধর, ১ম আসন। 'তুঃ ব্রহ্মাস্বাদসহোদর'—সাহিত্যদর্পণ, ৩২। আবার যদি আমরা রম্যতা গুণের দ্বারা ব্রহ্মের স্বরূপ নির্ণয়ের চেষ্টা করি তাহলে রম্যতা বিরোধী যে গুণ বা দোষ তা ব্রহ্মের পক্ষে অগ্রাহ্য হয়ে যাবে। অতএব ব্রহ্ম সীমাবদ্ধ হয়ে পড়বে। সুতরাং শিল্পানন্দের প্রসাদগুণে যে রম্যতাটুকু সর্বাগ্রে গণ্য, সেই রম্যতা আমরা ব্রহ্মে আরোপ করতে পারি না। রসশাস্ত্রে আমরা এই প্রজ্ঞাশক্তিকে বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছি : রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বাহনন্দী ভবতি। ব্রহ্মকে রস স্বরূপ আখ্যা দিলে রস অতিরিক্ত যে গুণ, আনন্দ-বিরোধী যে স্বভাব মানুষের মধ্যে রয়েছে সেই স্বভাবকে ব্রহ্মের পক্ষে অগ্রহণীয় বা অগ্রাহ্য বলা হবে। কিন্তু ব্রহ্ম তো সর্বব্যাপী। যে ব্রহ্মসত্তা রসস্বরূপ সেই রস ত' আনন্দের ত্যাগে নেই। সেই রস যদি শুধুমাত্র আনন্দ দ্যোতনা করে তাহলে আনন্দ-বিরোধী প্রবৃত্তি বা অনুভূতি কোনটাই ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণের মধ্যে স্থান পাবে না। যিনি রসস্বরূপ তিনি তো নিরানন্দ হতে পারেন না। তা যদি না হয় তাহলে শিল্পের আনন্দের মধ্যে যে একটা গভীর মানবিক দুঃখ এবং বেদনাকে আমরা প্রত্যক্ষ করছি সেই সুগভীর মানবিক দুঃখের, দুঃখ-মানসিকতার স্থান তো ব্রহ্মে নেই। ইংরেজ কবি যখন বলেন : "I fall upon the thorns of life, I bleed"—তখন সেই পরম দুঃখ চেতনার কথা বলতে গিয়ে যেভাবে শ্রোতা বা পাঠকের আত্ম চৈতন্য উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে তার স্থান কি এই পরাসত্তা বা ব্রহ্মের মধ্যে থাকে না? যদি থাকে, তাহলে ব্রহ্ম রসস্বরূপ নন। তাঁর মধ্যে, তাঁর সত্তার মধ্যে সুখ এবং দুঃখ সমন্বিত।

অতএব দেখা যাচ্ছে, গভীর দুঃখের অনুভূতি ও মর্মবেদনার ব্যঞ্জনা শিল্পের উপজীব্য হ'লেও রসস্বরূপ ব্রহ্মের মধ্যে তার স্থান হওয়া শক্ত। অবশ্য আমাদের এই বক্তব্য তখনই সত্য হবে, যদি আমরা একথা মেনে নেই যে ব্রহ্ম হল রসস্বরূপ।

এই রস এবং আনন্দ সমার্থক। শাস্ত্রকার বলেন যে, আনন্দ থেকেই

সৃষ্টির উদ্ভব হয়েছে। আর এই আনন্দ থেকেই নাকি শিল্পীও তাঁর শিল্প সৃষ্টি করেন। যাকে Ecstasy বা Inspiration বলি তার মধ্যে অবশ্য আনন্দই আছে এ কথা বললে বোধ হয় ঠিক বলা হবে না। যদি বলা হয় Ecstasy বা Inspiration আনন্দকে কেন্দ্র ক'রে আবর্তিত হয় তাহলে আমরা বলব, তা মনস্তাত্বিক সত্য-বিরোধী। বিশ্বের প্রথম শ্লোক উচ্চারণ-কালে মহাকবি বাল্মীকির মনের যে বেদনাবিদ্ধ রূপের চিত্রটি পাই, যে অপার কারুণ্যের মানসচিত্রটুকু আমাদের কাছে উদঘাটিত হয়ে ওঠে, মহাকবির সেই আর্তি, প্রথম শ্লোক রচনাকালে তার করুণাময় অপার বেদনা—এর মধ্যে আপাতঃদৃষ্টিতে আনন্দের অবস্থান ঘটে না। সেদিন গভীর দুঃখ, গভীর অনুভূতি কবির হৃদয়ের তলদেশ পর্যন্ত স্পর্শ করেছিল; তবেই মহাকাব্যের সৃষ্টি সম্ভব হয়েছিল। অতএব বলা চলে যে দুঃখ থেকে দুঃখের গভীরতম অনুভূতি থেকেও সৃষ্টি সম্ভব। তা যদি হয়, তাহলে ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে শিল্পানন্দের রম্যতা গুণের মধ্য দিয়ে যে সাদৃশ্যটুকু আবিষ্কার করার চেষ্টা করেছিলাম তা ব্যর্থ হতে বাধ্য। কেন না শিল্পের উৎসভূমি যদি শুধুমাত্র আনন্দ না হয়, যদি গভীরতম দুঃখ থেকেও শিল্পের উদ্ভব সম্ভব হয়, তাহ'লে শিল্পানন্দ এবং ব্রহ্মানন্দ এতদুভয়ের সাদৃশ্য বা সাযুজ্য কল্পনা করা অসমীচীন। অবশ্য গভীরতম দুঃখ এবং গভীরতম বেদনার স্বাঙ্গীকরণ তত্ত্বকে গ্রহণ ক'রে নিলে এই বিরোধের নিরসন হ'বে। এখন আমরা মনস্তাত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে আনন্দ এবং শিল্পের সহজ সম্বন্ধটুকু বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা করতে পারি। মানুষের অভিজ্ঞতায় এই সত্যটি কালক্রমে উদঘাটিত হয়ে উঠেছে যে শিল্প সৃষ্টির ফলে অথবা সার্থক রূপকে অবলোকন করার কালে আমাদের মনে এক ধরনের সুখানুভূতি ঘটে। এই সুখানুভূতি হল আদিম মানুষের শিল্পানুভূতির ফলশ্রুতি। মনস্তাত্বিক অনুষঙ্গ হিসেবে এই সুখবোধ মানুষের শিল্পবোধের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গিয়েছিল সেই আদিম কাল থেকে। যারা ছিল সহোদর, কোন একটি সাধারণ কারণের কার্য মাত্র, তারা কালক্রমে উপায় এবং উপেয় রূপে গণ্য হল। হয়তো সার্থক রূপ সৃষ্টি (Significant form) ক'রলে আমরা যাকে শিল্প বলি তা সম্ভব হ'ত এবং এই সার্থক রূপ সৃষ্টির ফলেই এক ধরনের সুখানুভূতি শিল্পীর মধ্যে, শিল্পরসিকের মধ্যে জন্ম নেয়। শিল্প এবং এই সুখানুভূতি দিনরাত্রির মতই একই কারণের কার্য। সার্থক রূপসৃষ্টি হয় ত' এই উভয়ের কারক; যেমন আহ্নিকগতি দিনরাত্রির কারণ। কল্পনায় আমরা কাব্য, নাটক, সাহিত্যে রাত্রিকে দিনের জননী বলে আখ্যাত করেছি:

"দিনান্তের মুখ চুম্বি রাত্রি ধীরে কয়
আমি মৃত্যু তোর মাতা, নাহি মোরে ভয়।"

রাত্রিকে দিনের উৎসভূমি বলে কল্পনা করলে যে ভুল হয়, ঠিক সেই ধরনের ভ্রান্তি ঘটে যদি আমরা আনন্দকে শিল্পের উৎসভূমি বলে গণ্য করি। যে কথা বলছিলাম, আদিম মানুষের মননের ব্যাপারে শিল্প এবং শিল্পানুভূতি-রূপ দুটি কার্যকে আমরা যদি পৃথক ভাবে তাদের আদিম মানসিক পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করি তবে বলব যে তাদের উপায় এবং উপেয় রূপে কল্পনা করা একান্ত স্বাভাবিকই হয়েছিল। অনেকে আবার আনন্দকে শিল্পের স্বরূপ লক্ষণ বলবেন। কিন্তু আমরা বলব যে, শিল্পকৃতি এবং সুখানুভূতি—এদের পারম্পর্য আকস্মিক ঘটনা মাত্র। সুখানুভূতির সঙ্গে শিল্পানুভূতির কোন ঐকান্তিক যোগ বা সম্পর্ক ছিল না।

এই প্রসঙ্গে সবচেয়ে বড় কথা এই যে, সৃষ্টি কখনও পূর্ণতা থেকে উদ্ভূত হয় না। এক ধরনের অভাব—তা সে যে চরিত্রেরই হোক না কেন সেই অভাবকে বিরাজ ক'রতে হবে সকল সৃষ্টির মূলে। সৃষ্টিকে যদি পূর্ণতা বলি তা'হলে এক ধরনের অপূর্ণতাকে আমাদের কল্পনা করতে হয়। আনন্দ যদি পূর্ণতার অভিব্যক্তি হয় তা হলে তা শিল্প সৃষ্টির উৎসভূমি হতে পারে না। হেগেলীয় Absolute যখন সৃষ্টি থেকে বিচ্যুতি হন তখন তার যে রূপ পাই, সেই রূপের চেয়ে সমৃদ্ধতর রূপ আমরা দেখছি হেগেলীয় সেই Absoluteএর ধারণার মধ্যে—যা সৃষ্টির সঙ্গে আত্মিক সম্বন্ধ যুক্ত। হেগেল এই দ্বিতীয় Absoluteকে 'Richer Absolute' আখ্যা দিয়েছেন। তাহলে সৃষ্টির সঙ্গে সম্বন্ধ বিযুক্ত যে পরাসত্তা তার মধ্যে নিশ্চয়ই কোন অপূর্ণতা ছিল এবং তার মধ্যেকার অপূর্ণতা সৃষ্টির সঙ্গে সম্বন্ধ যুক্ত Absolute (Richer Absolute) এর মধ্যে নেই, হেগেল একথা স্বীকার করেছেন। তার চার খণ্ডে বিভক্ত Philosophy of fine arts গ্রন্থে যে শিল্পতত্ত্বের বিষয়গুলির অবতারণা করেছেন, তার মধ্যে এই সত্যটি প্রতিষ্ঠা পেয়েছে যে, সৃষ্টি বিমুক্ত পরাশক্তি বা Absolute সৃষ্টি সমৃদ্ধ পরাশক্তির চেয়ে দীনতর। অতএব বলা চলে যে সৃষ্টির উৎসভূমি, তথা শিল্পের উৎসভূমি হল আমাদের অপূর্ণতা বোধ। রবীন্দ্রনাথ এই অপূর্ণতাটুকু প্রত্যক্ষ করেছিলেন মহাকবি বাল্মীকির মধ্যে। তাঁর কথায় বলি :

কি মহৎ ক্ষুধার আবেশ পীড়ন করিছে তারে,
কি তাহার দুরন্ত প্রার্থনা!

সৃষ্টির পশ্চাদ্‌পটে এই মহৎ ক্ষুধা যখনই প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে, বেগবান হয়ে ওঠে তখনই মহতী সৃষ্টি সম্ভব হয়। আনন্দ সাগরে ভাসমান অবস্থায় নির্বিকল্প সমাধির পূর্ণতা আস্বাদ ক'রে কোন শিল্পীর পক্ষেই শিল্প সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। তাই বলছিলাম যে শিল্পানন্দ ও ব্রহ্মানন্দ—এ দুয়ের তুলনা শুধু অমূলকই নয়, সম্পূর্ণ রূপে ভিত্তিহীন এবং অযৌক্তিক। অবশ্য এই বিচারটুকু হ'ল Empirical অর্থাৎ সাধারণ অভিজ্ঞতা-সম্পৃক্ত বিচারবুদ্ধি-প্রসূত।

মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার ক'রে আমরা এ কথা বলতে পারি যে, সুখানুভূতি হ'ল শিল্পকৃতির অনুষঙ্গ মাত্র। যার মূলে ছিল কেবলমাত্র সদর্থক (Positive) মনস্তাত্ত্বিক অস্তিমাত্র তাকে আমরা কালক্রমে পরতাত্ত্বিক মূল্য আরোপ করেছি। সুখানুভূতির সঙ্গে শিল্পকর্মের যোগ, শিল্প সৃষ্টির যোগ ছিল একান্ত ভাবে মনস্তাত্ত্বিক। শিল্পের স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আমরা এই মনস্তাত্ত্বিক সত্যটিকে পরাতাত্ত্বিক মর্যাদায় ভূষিত করে শিল্পে আনন্দবাদ তত্ত্বের অবতারণা করেছি। কিন্তু শিল্প আত্যন্তিক ভাবে আনন্দযুক্তও নয়, আনন্দদান শিল্পের লক্ষ্যও নয়। আনন্দকে উপেয় বলে গ্রহণ করে যদি আমরা শিল্পকে উপায় বলে কল্পনা করি তাহলে তা ভ্রান্ত কল্পনার নিদর্শন হিসাবে গণ্য হবে। যা ছিল একান্ত ভাবে মনস্তাত্ত্বিক তাকে পরাতাত্ত্বিক মর্যাদা দিতে গিয়ে আমরা যে উপমাকে আশ্রয় করেছি তা সত্যের দিশারী হয় নি। পরন্ত ব্যক্তিগত সুখানুভূতিকে শিল্পের উৎসভূমি ব'লে প্রচার ক'রে আমরা শিল্পে যথেচ্ছারের সুযোগ করে দিয়েছি। আনন্দ যদি শিল্পের স্বরূপ লক্ষণ হয় তা হলে শিল্পের চরিত্র ক্ষুণ্ণ হয়। কেননা, শিল্পের সার্বভৌম ধর্ম এই তত্ত্বে ব্যাহত হয়; তাই আনন্দকে বা সুখানুভূতিকে শিল্পের স্বরূপ লক্ষণ বলা সমীচীন নয়। অথচ রসবাদীরা শিল্প এবং আনন্দকে সমার্থক বলে গ্রহণ করেছেন। এখানেই ভ্রান্তির অবকাশ রয়ে গেছে। শিল্প বলতে আমরা যদি শিল্প সৃষ্টির প্রকরণকে (Methodology) বুঝি তাহলে সেই পদ্ধতিকে শিল্পানন্দের সমার্থক বলা ভুল হবে। আর যদি আমরা শিল্প বলতে এই প্রক্রিয়ার ফলশ্রুতিকে বুঝি তাহলে তাকে আনন্দের সঙ্গে সমীকরণ করা বোধ হয় উচিত হবে না। অতএব শিল্প এবং আনন্দ এতদুভয়ের সমীকরণ তত্ত্ব আমাদের কাছে গ্রাহ্য বলে মনে হয় না। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে আনন্দবাদের বুদ্ধিগ্রাহ্যতা সম্বন্ধে গভীর সংশয় বোদ্ধা, পাঠক এবং সমালোচকের মনে উদিত হয়। এর নিরসন শিল্প-শাস্ত্রের উক্তি উদ্ধার করে করা সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন একনিষ্ঠ মনন ও

বিশ্লেষণ। আধুনিক Semantics-এর আলোকে এই দুরূহ প্রশ্নটির বিচার এবং সমাধান করার চেষ্টা করলে আমরা বোধ হয় সাধারণ ভ্রান্তি নিরসন করে সত্যলাভের পথে এগিয়ে যেতে পারব। অবশ্য একথা অনস্বীকার্য যে প্রাচীন আলংকারিকেরা ব্রহ্মানন্দ ও শিল্পানন্দের বিশ্লেষণে বহুক্ষেত্রেই বুৎপত্তি-গত অর্থ থেকে শুরু করেছিলেন। যেমন তাঁরা বললেন, রসের শেষ প্রমাণ তার আস্বাদনে। ব্রহ্ম আস্বাদন নিরপেক্ষ। ভট্টনায়ক বললেন যে ভাবকত্ব ব্যাপারের ফলে রস ভাবিত হয় এর তৎপরবর্তী ভোজকত্ব ব্যাপারের ফলে সেই ভাবিত রসের ভোগ হয়। তিনি রসের ভাবনা এবং রসের ভোগকে স্বতন্ত্র করে দেখেছিলেন। আচার্য অভিনবগুপ্ত বললেন যে ভোজকত্ব বা ভোগীকরণ ব্যাপারটাই অবাস্তর। রস ভাবিত হওয়া মানেই রস প্রতীত হওয়া। প্রতীতিহীন রসের অস্তিত্ব নেই। রসের প্রতীতিটুকু রসতত্ত্বের পক্ষে অপরিহার্য:

সর্বপক্ষেষু চ প্রতীতির পরিহার্য্যা রসস্য।
অপ্রতীতং হি পিশাচবদ ব্যবহার্য্যং—লোচনটীকা, ১।৪

ভোগ এই প্রতীতি থেকে স্বতন্ত্র কিছু নয়। ব্রহ্ম যদি আস্বাদন নিরপেক্ষ হয় আর রস যদি আস্বাদন আশ্রিত হয় তবে ব্রহ্মের জ্ঞাতানিরপেক্ষতা ও রসের আস্বাদন সাপেক্ষতা উভয়ের সমীকরণের পথে বড় বাধা। এই বাধাটির কথা ইঙ্গিতে হ্রস্ব ভাবে বলা হ'লেও আজ নতুন ক'রে এগুলিকে বিচার বিশ্লেষণ করতে হ'বে। সমীকরণ তত্ত্বকে, সাযুজ্যতত্ত্ব বা সামীপ্যতত্ত্বকে বুদ্ধির আলোয় আবার নতুন ক'রে উদ্ভাসিত ক'রে ব্রহ্মানন্দ এবং শিল্পানন্দের স্বরূপটুকু বুঝতে হবে।
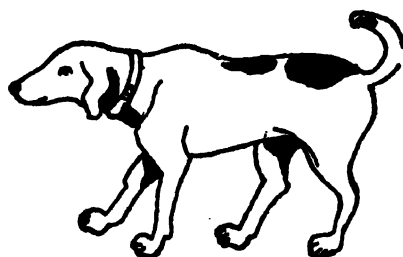
শিল্প ও কল্পনা

কল্পনা স্বজ্ঞাবাদ (প্রতিভানবাদ), কল্পনাবাদ, নির্মিতিবাদ প্রভৃতি তত্ত্বে কী প্রকরণে কাজ করে তা প্রণিধানযোগ্য। প্রতিভানবাদ কল্পনা প্রভৃতির বিধিকে স্বল্পভাব অনুসরণ করে এবং সেই বিধিটিকে অতিক্রম করে যায়। তাই নন্দনতত্ত্ববিদ ক্রোচে স্বজ্ঞার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বললেন যে প্রতিভান হ'ল যা ঘটছে এবং যা ঘটতে পারত এ দুয়ের মিশ্রত রূপকে দেখা অর্থাৎ প্রতিভানের কল্পনা হ'ল নিয়ন্ত্রিত কল্পনা, অবাধ কল্পনা নয়। কল্পনাবাদের এই কল্পনা প্রকৃতির নির্দেশ এবং নিয়ন্ত্রণকে পুরোপুরিভাবে উত্তীর্ণ হ'য়ে গেছে; কল্পনাবাদের কল্পনা হ'ল সীমাহীন নভে অবাধ বিচরণ। সেই কল্পনার ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ নেই, যা কিছু অসম্ভব তাও সম্ভাব্যতার সীমানায় ধরা দেয়। সংক্ষেপে বলা চলে, প্রতিভানবাদের যে কল্পনা সুনির্দিষ্ট ইন্দ্রিয়োপাত্তিক নিষেধের দ্বারা কিয়ৎপরিমাণে নিয়ন্ত্রিত সেই কল্পনাই অবাধ পক্ষ সঞ্চালনে শিল্পলোকের আকাশকে মুখরিত ক'রে তোলে। এর ফলে যে বস্তু, এবং যে রূপের সৃষ্টি হয় তার জোড়া বড় একটা মেলে না; তাই ত' শিল্পীর এই কল্পনাশ্রিত সৃষ্টিশক্তিকে প্রতিভা বলা হয়েছে। শাস্ত্রকারেরা এই প্রতিভার নামকরণ করলেন: 'অপূর্ববস্তুনির্মাণক্ষমাপ্রজ্ঞা'; একথা বলা চলে, শিল্পে যে রূপের উদ্ভব হয় সে রূপ নির্মিতির প্রসাদগুণে প্রসন্ন। নির্মিতিবাদীরা এই অপূর্ব বস্তুর নির্মাণক্রিয়াকে 'শিল্প' আখ্যা দিয়েছেন। এই শিল্পের অনুরূপ বা প্রতিরূপ আর কোথাও কেউ কখনও দেখে নি। এর নির্মিতি হ'ল অনন্য সাধারণ নির্মিতি। এই সৃষ্টি থেকে যে সৌন্দর্য-দ্যুতি বিচ্ছুরিত হয় তা অদৃষ্টপূর্ব। এই জ্যোতির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মহাকবি ওয়ার্ডস্বার্থ বললেন: 'The light that never was on sea or land'-জল স্থলে অন্তরীক্ষে কোথাও এই শিল্পসৃষ্টির তুল্য-মর্যাদাসম্পন্ন বস্তুর দেখা পাওয়া যায় না; তাই ত' শিল্প হ'ল 'অনন্যপরতন্ত্রা'। দার্শনিক বোসাংকের ভাষায় uniquely individual।

শিল্পের এই ঐকান্তিক বৈশিষ্ট্য জাত হয় শিল্পীর কল্পনা থেকে; সেই কল্পনা (একদল সমালোচকের মতে) জীবন ও জগতের দ্বারা একই ভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। একথা বা এই তত্ত্ব এ যুগে দার্শনিক ও মনস্তাত্ত্বিকেরা স্বীকার্য সত্য হিসেবে গ্রহণ করেননি। একদল পণ্ডিত রয়েছেন যাঁদের কাছে তথাকথিত প্রাকৃত বস্তু 'জগৎ' মানুষের মনন ও কল্পনার দ্বারা সৃষ্ট হয় অর্থাৎ যে যুগকে

আমি ভালবাসি, আমি যে সূর্যাস্তের দিকে অবাক হ'য়ে তাকিয়ে থাকি, যে সব ঊর্মিমালার গতিচ্ছন্দ আমাকে মুগ্ধ করে; এ সবই হ'ল আমার সৃষ্টি।

তাই ত' মহাকবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর একটি কবিতায় এই সত্যটিকে কাব্যসত্যের মর্যাদা দিয়ে বললেন যে মানুষের চোখ খোলার সঙ্গে সঙ্গেই আকাশে আলো ফুটে ওঠে। গোলাপের দিকে চেয়ে মানুষ তাকে সুন্দর বললে তবেই সে সুন্দর হয়ে ওঠে। এই যে 'আমি' তত্ত্ব, এ তত্ত্বও কল্পনা তত্ত্বের অনুসারী। আমার কল্পনায় যদি বিশ্বরূপ সৃষ্টি করে, পরিদৃশ্যমান জগতটা যদি আমার কল্পনার দ্বারা বিসৃষ্ট হয়ে থাকে তবে নির্মিতিবাদ, কল্পনাবাদ, প্রতিভানবাদ বা অনুকৃতিবাদ প্রমুখ যে তত্ত্বের কথাই বলি না কেন প্রান্তিক বিশ্লেষণে দেখা যাবে যে এদের সকলের মধ্যে কল্পনাই ক্রিয়াশীল। বস্তুজগতের সৃষ্টি যেভাবে হয়, যে প্রকরণে সেটা ঘটে তার সঙ্গে শিল্পজগতের সৃষ্টির মৌল প্রভেদটা খুব বেশী বড় হয়ে দেখা দেবে না। কেননা বহির্জগত এবং জীবন—এরাও ত' এক অর্থে কল্পনা থেকে উপজাত হয়; আর তা হয় বলেই বোধহয় ভোজদেবের মত মনীষী ও রসিক সমালোচক শিল্পসত্য ও জীবনসত্যকে সমার্থক বলেছিলেন। তা যদি হয় তবে শিল্প ও জীবনের মধ্যে বিভেদক বা Differentiaটুকুকে আবিষ্কারের দায়িত্ব শিল্পীর উপর ন্যস্ত হ'য়ে পড়ে। যদি শিল্প ও জীবনের ক্ষেত্রে কল্পনা একইভাবে কাজ করে থাকে তবে স্বভাবতঃ এ প্রশ্ন উঠবে যে জীবনকে কী কল্পনা বলা চলে? আপাতঃদৃষ্টিতে জীবন ও কল্পনাকে ভিন্ন প্রকোষ্ঠের বাসিন্দা ব'লে মনে হলেও প্রান্তিক বিশ্লেষণে দেখা যাবে যে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে বিশ্বাস ও কল্পনার মুখ্য ভূমিকা রয়েছে। Bechterev, Pavlov, Watson প্রমুখ ব্যবহারবাদী মনস্তাত্ত্বিকেরা মানুষের ব্যবহারের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে উদ্দীপক-প্রত্যুত্তর (Stimulus-Response) তত্ত্বের প্রয়োগ করেছেন। ওঁদের তত্ত্বে চিন্তা হ'ল এক ধরনের 'সুপ্ত দৈহিক ক্রিয়া'; উদাহরণ দিই: বসবার ঘরের টেবিলটা পূবমুখো না রেখে দক্ষিণমুখো রাখলে কেমন হয়? এই চিন্তাটা মনে আসার সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে টেবিলটাকে দক্ষিণমুখো বসিয়ে বুঝতে পারা গেল যে টেবিলটা জানলার পাটির উপর উপচে পড়বে ঐভাবে টেবিলটা বসালে। অমনি সে পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হ'ল; মনস্তাত্ত্বিক ব্যবহারবাদীরা অবশ্য চিন্তার প্রচ্ছন্ন কার্যরূপটিকে প্রকট করার জন্ত এই ধরনের উদাহরণ ব্যবহার করেছেন। আমরা বলব যে ব্যবহারবাদীরা প্রচ্ছন্ন

ব্যবহার তত্ত্বটুকুকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে কল্পনাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। জীবনে যত পরিকল্পনা আমরা রচনা করেছি তা সবই ত' কল্পনার গর্ভজাত। কখন কখন কল্পনায় রচিত পরিকল্পনা মিথ্যা হয়ে যায়। যখন কল্পনা বাস্তবতার সঙ্গে সম্ভাব্যতার সেতুটুকু রচনা ক'রে চলতে পারে না তখনই মনে হয় কল্পনা হ'ল অলীক কল্পনা। কল্পনার সঙ্গে অলীক কল্পনার পার্থক্য হ'ল, অলীক কল্পনা সাধ্যকে সিদ্ধ করতে পারে না। অলীক কল্পনা তার শক্তিকে অনেক-গুণ বাড়িয়ে বা কমিয়ে দেখে, প্রতিক্রিয়াশীল পরিবেশকে তার যথার্থ গুরুত্বটুকু দেয় না। তার ফলে সম্ভাব্যসত্যটুকু আর বাস্তবান্বিত হ'য়ে ওঠে না। যখন কল্পনা-কল্পিত পরিণতিটুকু বাস্তবের কাঠামোর মধ্যে সত্য হয়ে ওঠে তখন বলি পরিকল্পনা (কল্পনা) বাস্তবানুগ হয়েছে ; আর যখন তা হয় না তখন কল্পনাকে অলীক কল্পনা বলি। অলীক কল্পনার স্থান শিল্পেও নেই। যা অসঙ্গত তা যদি অলীক হয় (এই প্রসঙ্গে অলীক ও অসঙ্গত সমার্থক) তবে তা জীবনে যেমন অগ্রাহ্য, শিল্পেও তেমনি অপাংক্তেয়। এই সঙ্গতিই হ'ল শিল্পের প্রাণ ; এ সঙ্গতি হ'ল আত্ম-সঙ্গতি : Coherence in its different parts ; কল্পনা এই সঙ্গতিকে বয়ন করে ; এই সমন্বয়কে বিবর্তিত করে। জীবনের পরিসরে আমাদের কল্পনা একদিকে যেমন কল্পিত অবস্থা বা পরিণতির মধ্যে আত্মসঙ্গতিটুকুকে রক্ষা করবে ঠিক তেমনি করে তাকে জীবনের সঙ্গে, জগতের ঘটনা ও অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চলতে হ'বে। যেমন সৈন্যাধ্যক্ষ যখন তাঁর ঘরে টাঙানো যুদ্ধক্ষেত্রের প্রকাণ্ড ম্যাপটার ওপর 'পিন' সরিয়ে সরিয়ে কাল্পনিক সৈন্য পরিচালনা ক'রে যুদ্ধের বিভিন্ন ধরনের পরিণতি কল্পনায় দেখার চেষ্টা করেন, আমরাও তেমনি জীবনযুদ্ধে একই সমস্যার বিভিন্ন ধরনের সমাধান কল্পনা ক'রে আমাদের গ্রহণযোগ্য পথটুকু বেছে নিই। অতএব দেখা যাচ্ছে যে জীবনই বলি আর শিল্পই বলি, কল্পনাকে বাদ দিয়ে জীবন এবং শিল্প এরা উভয়েই পঙ্গু হ'য়ে পড়বে। কল্পনা হ'ল গতির উৎস ; আমাদের জীবনের চলমানতাটুকু হ'ল এই কল্পনারই দান। এই কল্পনাই জাপানী ছবির SEI DO বা প্রাণময়তাটুকু সৃষ্টি করেছে। জাপানী শিল্পীর আঁকা 'সমুদ্রের ঢেউ ভেঙ্গে পড়া' ছবির সামনে দাঁড়াতে ভয় করে ; মনে হয়, এই বুঝি সমুদ্রের ঢেউ আমার গায়ের ওপর ভেঙ্গে পড়বে। জলে জলময় হ'য়ে উঠব আমি। মনের এই ভীতি, ছবিতে এই গতির সম্ভাব্যতাটুকুর উৎসভূমি হ'ল কল্পনা।

এই কল্পনার উপযোগিতা শুধুমাত্র ব্যবহারিক জীবনে বা শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রেই

সীমাবদ্ধ নয়। শিল্প-রসিকের যে রসের জগৎ সেখানেও কল্পনারই একাধিপত্য। 'সহৃদয়-হৃদয়-সংবাদী' কল্পনার পক্ষীরাজে চড়েই শিল্পী-নির্দেশিত সুন্দরের জগৎ প্রবেশ করে ; তবে সে জগৎ হ'ল রসিকের আপন জগৎ, তার খাসকামরা। শিল্পীর জগৎ, তার সুখ-দুঃখের দোলায় দোলায়িত শিল্পলোক তার সঙ্গেই পরিপূর্ণ পরিণতি পেয়ে শেষ হ'য়ে যায়। সেই সম্যক্-রূপে সৃষ্ট জগতের ব্যঞ্জনাটুকুকে অবলম্বন ক'রে রসিকসুজন আপন আপন কল্পনায় আপন আপন অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে শিল্পীর রসলোকের অনুরূপ অথবা প্রতিরূপ গ'ড়ে তোলে ; সে জগৎ তার নিজস্ব জগৎ, একান্তভাবে আপনার আপন কল্পলোক। রসিক এই নিজস্ব জগতটুকু সৃষ্টি-কালে শিল্পীর অনুকরণ করে না ; আর তা করবেই বা কী ক'রে। শিল্পীর শিল্প-কথিত জীবনবোধের, তার অভিজ্ঞতার রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ এ সবই রসিকের আয়ত্তের বাইরে। তাই শিল্পীর শিল্পলোক রসিক মনকে উদ্দীপিত করলেও শিল্প-রসিকের জীবন-বোধকে, তার অভিজ্ঞতাকে রূপান্তরিত করতে পারে না ; শিল্পীর শিল্পকথাকে রসিক অনুধাবন করবে আপন সৃষ্টির মাধ্যমে ; উভয়ের সৃষ্ট জগতের মধ্যে হয়ত কোন সামীপ্য বা সাযুজ্যই রইল না। শিল্পীর অনুভূতি, তার অনুভবের জগৎ একান্তভাবে তার নিজস্ব ; তা একান্তই ব্যক্তিগত। রসিক সে জগতে প্রবেশাধিকার কখনই পায় না ; রসিকসুজন তার অনুভূতির অতলে অনায়াসে তলিয়ে গেলেও শিল্পীর অনুভূতির সমুদ্রে অবগাহন স্নান, তার পক্ষে অসম্ভব। রসিকজন যখন শিল্পীর অনুভবের জগতের মুখোমুখি হন তার শিল্পকর্মের সামনে দাঁড়িয়ে তখন তার উদ্দীপ্ত কল্পনা তার অনুভূতির জগতলোকে অনুরূপ অভিজ্ঞতাকে খুঁজে ফেরে ; অবশ্য তার এই অন্বেষণ আপনার অভিজ্ঞতার জগতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। উদাহরণ দিই : মহাকবি রবীন্দ্রনাথের মনে যখন নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ হ'ল, যখন তিনি কল্পনায় প্রত্যক্ষ করলেন যে তাঁর আপন অন্তরলোক সূর্যের কিরণ-সম্পাতে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠেছে, কবি উদ্ভাসিত-চৈতন্য হ'য়ে উঠেছেন, তখন তাঁর জাগ্রত চেতনার সেই অন্তহীন আত্মোপলব্ধি, তার অনুভব, সহৃদয় সামাজিকের মনে তার অন্তরলোকে কেমন করে ঘটবে? অনুরূপ অভিজ্ঞতা যার আছে, সেই শিল্প-রসিক বা সহৃদয় সামাজিক হয়ত' সেই আপন অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে কল্পনার রং তুলি দিয়ে কবি-কথিত উদ্ভাসিত-চৈতন্যের অলোক আর এক জাগ্রত চেতনার জগতকে সৃষ্টি করতে পারে।

কিন্তু কবি যে অনুভূতি-লোকের কথা বললেন, যে প্রদীপ্ত, জাগ্রত চেতনার ছবি আঁকলেন সে ছবি সবার কাছে দুর্জ্ঞেয় হয়ে রইল। কবি-কথা বা শিল্পীর রূপ-রং দিয়ে তৈরী জগৎ হ'ল 'অনন্তপরতন্ত্রা'। যে জগৎ কবি বা শিল্পীর পক্ষে সত্য ও সহজ, অন্যের চক্ষে, সেটা নিষিদ্ধ জগৎ। সে জগতে কোনদিনে কবি ব্যতীত অন্য কেউ প্রবেশ করতে পারবে না। হয়ত কবির পক্ষেও আর একবার সেই নিষিদ্ধলোকে প্রবেশ করা সম্ভব নাও হ'তে পারে। যেমন একই নদীতে দ্বিতীয়বার স্নান করা যায় না, ঠিক তেমনি ক'রে একই অভিজ্ঞতার অনুভূতির গহনে কল্পনার ঘোড়ায় সওয়ার হ'য়ে দ্বিতীয়বার স্নান-পান করা যায় না। কবি কল্পনার ভেলায় চড়ে যেই তাঁর সুন্দরের দ্বীপে গিয়ে পৌঁছুলেন, অমি চড়ায় লেগে তাঁর নাওটি ডুবে গেল। চকিত আলোয় দেখা সুন্দরের অনুভবটুকু তিনি লিখে রেখে গেলেন ভূর্জপত্রে, কাঠের গায়ে, শিলাগাত্রে; কাগজ, কলম, ক্যানভাস, প্রেক্ষাপট—এরা তাকে মূর্ত ক'রে রাখল রসিকজনার জন্য; তিনি এসে পড়লেন সেই লেখা, সেই রেখা; তিনি মগ্ন হ'লেন আপন অনুভূতির অতলে আপন অনুরূপ অভিজ্ঞতার তরণী বেয়ে; তাঁর কল্পনার পক্ষীরাজ তাঁকে নিয়ে চলল তাঁর আপন অভিজ্ঞতার কল্পলোকে। কবি যা বললেন, শিল্পী যে ছবি আঁকলেন তা রসিকের অন্তরে নতুন ক'রে আর এক রূপের জগৎ সৃষ্টি করল; সে জগতটুকু রসিকজনার কল্পনার পরিসরের মধ্যে বিধৃত; তার অনুভূতি, তার আনন্দ-বেদনা, এ সবই রসিক চিত্তের; কবি-চিত্তের অনুভূতি বা তার সুখ-দুঃখের কথা নয়। রসিকজন বুদ্ধি দিয়ে বোঝার চেষ্টা করলেও তার আপন অনুভূতির বিস্তারে কবির সুখ-দুঃখকে ধরা তাকে অনুভব করা একেবারেই অসম্ভব; এ অসম্ভাব্যতা মনস্তাত্ত্বিক বিধি অনুমোদিত। কবি-কথিত শিল্পীর শিল্প-কর্ম-ব্যঞ্জিত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুভূতি চিরকালই রসিকের নাগালের বাইরে থাকবে। অপরের অনুভূতির অনুভব একটা অকল্পনীয় ব্যাপার। কাব্যের বা শিল্পের সূক্ষ্ম অনুভূতির স্রষ্টা-নির্দিষ্ট ব্যঞ্জনা রসিক সুজন যে যথাযথ অনুভব করতে পারে না, সেই সত্যটুকু মনস্তত্ত্ব পাঠ ও অনুশীলনের প্রাথমিক ফলশ্রুতি। কবির সূক্ষ্ম অনুভবের কথা ছেড়ে দিয়ে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অতি সাধারণ আনন্দ-বেদনার কথাই বলি। আমার দাঁতের ব্যথা-বেদনার কথা আমি বললে, সেটি সংবাদ হিসাবে সবাই বুঝবে বুদ্ধিগত বোধগম্য ব্যাপার হিসাবে। কিন্তু কল্পনার পাখায় ভর ক'রে কেউ কী আমার ব্যথার জগতে অনুপ্রবেশ করতে পারবে? তা বোধ হয়

পারবে না। রসিক পাঠক বা শ্রোতা বড় জোর তার নিজের দন্তশূলের ব্যথার কথা স্মরণ ক'রে উপমান-যুক্তির সহায়তায় আমার দাঁতের বেদনাটুকু বুদ্ধি দিয়ে বোঝার চেষ্টা করবে ; আর যার কোন দিনও দাঁত ব্যথা করেনি, ছোটবেলায় ফুটবল খেলতে গিয়ে পায়ে চোট লেগে বেদনা হয়েছিল এবং আর কোন ব্যথা-বেদনার অভিজ্ঞতা তাঁর ছিল না, তেমন লোক কিন্তু আমার দাঁত-ব্যথাকে বোঝবার চেষ্টা করবেন ঐ পায়ের ব্যথাকে কল্পনায় দন্তস্থলে প্রতিষ্ঠা ক'রে। এ ছাড়া তার গত্যন্তর নেই। শিল্পশাস্ত্রীরা একে Empathy, Einfiihlung, সহর্মিতাবোধ প্রমুখ গালভরা নাম দিয়েছেন। কিন্তু ব্যাপারটা স্থূল বা সূক্ষ্ম কল্পনার পক্ষ-সঞ্চালন ছাড়া আর কিছুই নয়। আর এই পক্ষ-বিধূনন শুধুমাত্র রসিকের নিজস্ব অভিজ্ঞতার জগতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। অবশ্য আমরা এই প্রসঙ্গে মনে রাখব যে এই অভিজ্ঞতা বলতে আমরা সম্ভাব্য অভিজ্ঞতাকেও বুঝি এবং শুধু শিল্পে কেন আমাদের দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনে এবং জগতেও এই সম্ভাব্য অভিজ্ঞতাকে নির্দেশ করি। যখন লাইব্রেরী ঘরে রাখা বইয়ের সেলফটি সম্বন্ধে আলোচনা করি তখন আমার চোখে দেখা বা হাতে ছোঁওয়া সেলফটির কোন একটি অংশকে ত' সেলফ কথাটির দ্বারা নির্দেশ করি না ; আমি অভিজ্ঞতায় কোন সময়েই একসঙ্গে পুরো সেলফটিকে পাই নি এবং তা পাওয়া সম্ভবও নয়। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য যে জ্ঞান সেই ইন্দ্রিয়োপাত্তভিত্তিক জ্ঞানে আমি সেলফ্‌টির অংশবিশেষকেই জেনেছি ; অথচ সমগ্র সেলফ্‌টিকে বোঝাই সেলফ্‌ কথাটি ব্যবহার ক'রে। এটি সম্ভব হয়, কেন না আমি আমার যথার্থ লব্ধ অভিজ্ঞতাকে সম্ভাব্য অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত ক'রে, সমন্বিত ক'রে তবেই সেলফের প্রতিরূপকে কল্পনায় প্রত্যক্ষ করি। কাল্পনিক ছবিটি এ সম্ভাব্যতার সীমানার মধ্যে বিধৃত। সেলফের অদেখা অংশের সঙ্গে দেখা অংশের সঙ্গতি রক্ষা করে আমার কল্পনা। এই অদেখা অংশটি অনুমানভিত্তিক ; অতএব বলা চলে অদেখা অংশটির নির্মাণে কল্পনা সুনির্দিষ্ট পথে চলে ; জ্ঞানলব্ধ ইন্দ্রিয়োপাত্তের ওপর এই কল্পনা নির্ভরশীল। দার্শনিকপ্রবর ক্রোচের Intuition বা স্বজ্ঞা এই ধরনের কল্পনার সমগোত্রীয়। অতএব যখন আমরা বলি যে সেলফ্‌টিকে দেখছি তখন এই 'দেখাটুকু' ক্রোচীয় স্বজ্ঞার উদাহরণ হিসাবে গ্রাহ্য হ'তে পারে।

বাস্তব জীবন ও জগতের অভিজ্ঞতায় সকল বস্তুতেই এই কল্পনার প্রলেপ পড়ে, একথা বললে বোধহয় সত্যের অপলাপ করা হ'বে না। কল্পনার তুলি

একদিকে যেমন আমার ঘরের চেয়ারটাকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেয়, অভিজ্ঞতার অসম্পূর্ণ জগতটাকে পূর্ণ ক'রে তোলে, অন্যদিকে আবার তা শিল্পের জগতটাকেও রূপে, রঙে, রসে ভরিয়ে তোলে। রূপের জগতে, রসের তীর্থপথে কল্পনার লীলাটা অভাবিত পথে কাজ করে; আমাদের বাস্তব চেতনাটাকে কল্পনা সাময়িকভাবে আচ্ছন্ন ক'রে দেয়; অবশ্য বাস্তবতার বোধটুকু একেবারে লুপ্ত হ'য়ে যায় না কখনো। কল্পনা ও বাস্তবের বিভেদক রেখাটুকুকে আবিষ্কার করা সহজসাধ্য না হ'লেও একথা বোধ হয় বলা চলে যে নাট্যে দৃষ্ট ঘটনা-পরম্পরার পরিণতি বাস্তব জগতের সঙ্গে যে সম্পর্কশূন্য, দর্শক হিসেবে এ বোধটুকু আমাদের সব সময়ই থাকে। অভিজ্ঞতার বাস্তব জগতে এবং শিল্পের জগতে কল্পনার কারুকার্য থাকলেও অভিজ্ঞতার জগতে ঘটনা-পরম্পরার পরিণতিতে লাভ লোকসানের ব্যবহারিক বোধটুকু থাকে; শিল্পের জগতে সেই বোধটুকুর অভাব; তাই বোধহয় শিল্পকে প্রায়োজনিক বলা চলে না। তাই শিল্পের উদ্দেশ্যকে মহাদার্শনিক কাণ্ট বললেন: Purposiveness without a purpose—অপ্রয়োজনের প্রয়োজন হ'ল শিল্পের। এই ব্যবহারগত উপযোগিতা শিল্পের নেই বলেই আমরা নাট্যে দৃষ্ট হত্যাকাণ্ডের সাক্ষী হ'তে ভয় পাই না। রাস্তায় একটা লোককে খুন হ'তে দেখলে যেমন শ্রীমতী যেনোর্ভা সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেন ঠিক তেমনি করেই তিনি প্রেক্ষাগৃহেও সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেন ওথেলোর হাতে ডেস্‌ডিমোনাকে নিহত হ'তে দেখে: কিন্তু বিস্ময়ের কথা এই যে নাটকে বিয়োগান্ত দৃশ্য দেখে আমি আনন্দ পাই। আমার প্রকৃতির Sadistic পশুটা তৃপ্ত হয়। কবি বলেন: "Our sweetest songs are those that tell of saddest thoughts"—অপরের দুঃখের কথা শুনে আমরা আনন্দ পাই। বিয়োগান্ত নাটকের রসে ডুবে যেতে আমরা ভালোবসি। কিন্তু কেন? বোধহয় Abnormal Psychologyতে এর জবাব খুঁজে পাওয়া যাবে। তাই যাঁরা শিল্পী তাঁরা সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষ নন, এমন কথা বলা হ'য়েছে। 'Genius' এবং 'Insanity'র মধ্যেকার ব্যবধানটুকু গুণগত নয়—মাত্র পরিমাণগত। উন্মাদের উন্মাদনার মধ্যে 'method' বা সঙ্গতি হয়ত কেবলমাত্র বিকৃত মস্তিষ্কের মানুষেরই চোখে পড়ে; অন্য কারো চোখে ধরা পড়ে না; তাই চিরকালই সে বিকৃত মস্তিষ্ক মানুষ বলে সকলের করুণা লাভ করে। আর যিনি প্রতিভাবান তাঁকেও অনেকেই পাগল ব'লে ভাবলেও এমন কিছু সংখ্যক লোক থাকেন যাঁরা তাঁকে প্রতিভাধর শিল্পীরূপে

স্বাগত জানান : এঁরা হ'লেন রসিক সুজন বা Appreciator। এঁরা কবির কল্পনায় সঙ্গতি খুঁজে পান। তাই কবি আনন্দিত হন। শিল্পী সাধুবাদ লাভ করেন।

মহাদার্শনিক প্লেতো যখন Ion গ্রন্থে কবিদের Interpreter of divinity আখ্যা দিয়েছেন তখন এই কথাই বলতে চেয়েছেন যে কবিরা যে সত্য সৃষ্টি করেন, যে সঙ্গতির আভাস দেন তা জগতের ঘটনা-আশ্রয়ী সত্যের চেয়ে কোন অংশে ন্যূন নয়। অর্থাৎ কল্পনা-কাব্য সত্যকে সৃষ্টি করে। মহাকবি বাল্মীকিকে দেওয়া মহর্ষি নারদের সেই আশ্বাসবাণী :

'সেই সত্য যা রচিবে তুমি'—

তারই প্রতিধ্বনি বুঝি শুনি আর এক পরিপ্রেক্ষিতে মহাদার্শনিক প্লেতোর মুখে। প্লেতো উপরোক্ত Ion গ্রন্থে কবিদের সম্বন্ধে বললেন :

"These souls flying like bees from flower to flower and wandering over the gardens and meadows and the honey flowing fountains of the houses return to us laden with the sweetness of melody ; and arrayed as they are in flames of rapid imagination they speak of truth."

অতএব কল্পনা যে সত্যের সন্ধান দেয়, সেই মহৎ সত্যটিকে স্বীকার করলেন পাশ্চাত্য জগতের দার্শনিক সম্রাট মহামতি প্লেতো। এই প্লেতোর দর্শন সম্বন্ধেই আধুনিক দার্শনিকদের পুরোধা Alfred North Withead বলেছিলেন : The whole of European philosopy is a footnote to that of Plato ; উপরের উদ্ধৃতিতে প্লেতো যে কল্পনাশ্রয়ী সত্যের কথা বললেন সে সত্য আত্মসঙ্গতি বা coherenceকে আশ্রয় ক'রে উজ্জীবিত হয়ে ওঠে। মহাদার্শনিক আরিস্ততল যখন তাঁর Poetics গ্রন্থে mimesis বা অনুকৃতির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বললেন যে অনুকরণ যখন যা ঘটেছে (What has happened) তার গণ্ডী ছাড়িয়ে যা ঘটতে পারত (what may happen) তার স্তরে গিয়ে উত্তীর্ণ হয় তখন অনুকরণ ও কল্পনার ব্যবধান লুপ্ত হয়ে যায়। কল্পনা একদিকে যেমন শিল্পকে সৃষ্টি করে অন্যদিকে আবার তা শিল্প দেউলে প্রতিষ্ঠিত সুন্দরকেও রূপ দেয়। গ্রীক দার্শনিক প্লতাইনাস এই সত্যটুকুকে উপলব্ধি করেছিলেন। এযুগের অন্যতম নন্দনতাত্ত্বিক-প্রধান ক্রোচে এই সত্যটুকুকে উদ্ধার করে বললেন :

"It is only with Plotinus that the two divided territories are united and the beautiful and art are fused into a single concept....And that we reach an altogether new view : The beautiful and art are now both alike melted into a mystical passion and elevation of the spirit." (Aesthetic পৃঃ ১৬৬)

ক্রোচে এই কল্পনার কালজয়ী ভূমিকাটুকুকে স্বীকার করেছেন : absoluteness of imagination ক্রোচের নন্দনতত্ত্বে স্বীকৃত সত্য।

দ্বিতীয় স্তবক

দ্বিতীয় স্তবক

কাব্য ও কথা

শিল্পী শিল্পসৃষ্টির জন্য কোন না কোন উপাদান নিয়ে কাজ করেন। তার উপাদান হয় পাথর, না হয় রং আর না হয় কথা। কথা বলার যে শৈলী, যে আঙ্গিকে কবি কথা বলেন তা শিল্পতত্ত্বের এক অতি রহস্যময় সমস্যা। মানুষের দৈনন্দিন কাজকর্মের ক্ষেত্রে ভাষা একটি অতীব প্রয়োজনীয় হাতিয়ার। দৈনন্দিন জীবনের কাজকর্ম, বাস্তব অভিজ্ঞতার আদান-প্রদান ভাষার মাধ্যমেই সম্পাদিত হয়। শব্দের অর্থ ও তর্কশাস্ত্র সম্মত ব্যঞ্জনাটুকু থেকে ভাষাকে যদি পৃথক করে দেখা হয় তা হলে বলতে হয় যে ভাষা একদিকে যেমন বাতাসের মত লঘু এবং শূণ্য, অন্যদিকে আবার তার সারবত্তাও অনস্বীকার্য। ভাষা হল সঙ্গীতের মত স্পন্দমান, তার মতই পলায়নতৎপর। কবির কথার সঙ্গে চিত্রীর রং ও রেখাকে যদি তুলনা করা হয় তা হলে বোঝা যায় সে চিত্রীর শিল্প মাধ্যম কত বৃহৎ, কত দীর্ঘস্থায়ী। সমস্ত সাহিত্যকে বিশেষ করে কাব্যকে 'বর্ণসঙ্করশিল্প' বলা যেতে পারে। এক অর্থে সঙ্গীতের মতই কাব্যের আবেদন তার সুর, তার বিশেষ স্বর গ্রাম, তার নিজস্ব ধ্বনিবিন্যাসকে আশ্রয় ক'রে ভাষার মাধ্যমে আপনাকে প্রকাশ করে। কাব্যকে আমরা ভাব আদান-প্রদানের বাহন হিসেবে ভাবতে পারি, শুধু এই বাহনটি ছন্দৈশ্বর্যে মণ্ডিত, অন্যান্য ভাবের বাহনের থেকে তার এইটুকু তফাৎ। সঙ্গীতের মতই কাব্যের মৌল প্রকৃতি হল, তা ভাবের বাহন হলেও অতিমাত্রায় কল্পনাশ্রয়ী এবং তা সহজেই শ্রোতার চিত্ত বিগলিত করে।

কাব্যের এই দ্বিবিধ কার্যকারিতা লক্ষ্যণীয়। একদিকে কাব্য ধ্বনি সুষমার, ধ্বনি-কৌশলের আশ্রয়, অন্যদিকে আবার তা ভাব বিনিময়ের বাহন। সকল সাহিত্যকেই এই দ্বিবিধ লক্ষ্যাভিমুখে অগ্রসর হতে হয়। ভাষা একাধারে কাজের ভাষা, আবার তা সঙ্গীতেরও ভাষা; একদিকে যেমন তার সুর আছে, অন্যদিকে আবার তার তর্কশাস্ত্রসম্মত রূপও আছে। সেই জন্য সাহিত্যের দুটি রূপ পরস্পরকে তির্যক ভঙ্গীতে ছুঁয়ে চলে গেছে। তারা হল গদ্য ও পদ্য। আদর্শগতভাবে গদ্য হবে এক ধরনের বীজগণিত, এক বিশেষ ধরনের সঙ্কেত-বার্তা। যে ভাবটুকু বহন করা দরকার তার বাহন হওয়া ছাড়া

গন্থের অন্ত কোন কাজ নেই। গন্ত সেই কাজটুকু ঘ্যর্থহীন ভাষায় করবে। যা বলতে চাইছি গন্ত শুধু সেইটুকুর প্রতীক হবে, সেইটুকুকেই এমন ভাবে প্রকাশ করবে যেন সে সম্বন্ধে কারো কোন সন্দেহ না থাকে। বৈজ্ঞানিক সংগঠনেই গন্তের রূপের পূর্ণতম প্রকাশ। সে হিসাবে শিল্প-পদবাচ্য হওয়ার কোন অধিকার গন্তের নেই।

কিন্তু শব্দের দু'টি দিক আছে এবং এই দুটি দিক থাকার ফলেই গন্তকে শিল্প-বাহন হিসেবে গণ্য করা হয়। অবশ্য গন্ত খুব নির্ভরযোগ্য শিল্পবাহন নয়। খুঁতখুঁতে তর্কশাস্ত্রবিশারদ যতই শব্দকে নিখুঁতভাবে শুধুমাত্র অর্থবাহী করার চেষ্টা করুন না কেন, শব্দের মধ্যে আবেগের ব্যঞ্জনা থেকেই যায়; ভাষায় ছন্দ নিত্য-অনুস্যূত; বীজগণিতের সূত্রতেই এই ছন্দের সন্ধান মেলে। যে ভাষায় দার্শনিক শিল্পধর্মমূলক দর্শন আলোচনা করেন তার মধ্যেও সেই সহজ ছন্দটুকু, ধ্বনি-সুষমাটুকু আপনা থেকে ফুটে ওঠে। দার্শনিক দেকার্তের দর্শন আলোচনায় ফরাসী ভাষার ধ্বনি মাধুর্য সহজ ভাবেই ফুটে উঠেছে। বের্গসঁর দর্শনও এই ধ্বনি ঐশ্বর্যের জন্যই সুখপাঠ্য।

কথা কেবলমাত্র শুষ্ক শব্দ নয়। তার সঙ্গে আবেগের স্পর্শটুকু লেগে থাকে। যে পরিবেশের মধ্যে, যে শিক্ষকের কাছে ভাষা আমরা শিখি, তাদের কথা, তাদের স্মৃতি ঐ ভাষার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকে; বাল্যকালের কত মধুর স্মৃতি ঐ ভাষার সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে; যে সব পরিবেশে ঐ ভাষা ব্যবহার করেছি, তার স্মৃতিও অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত হয়ে গেছে ঐ ভাষার সঙ্গে। ভাষা সাধারণতঃ বীজগণিতের সূত্র হিসেবে গণ্য হয় না; অবশ্য বিশেষ বৈজ্ঞানিক গবেষণায় ভাষা এই ধরনের সাঙ্কেতিক ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে।

ভাষা সুস্পষ্ট অর্থবহ। এমন কথা নেই বললেই চলে যার প্রতি-অর্থ নেই। নিজের ঘর, মৃত্যু প্রভৃতি কথার অর্থ হয় আমাদের আকর্ষণ করে আর না হয় বিকর্ষণ করে। যে সব কথার সুস্পষ্ট অর্থ নেই বলে বলা হয় তার সঙ্গে একাধিক আনুষঙ্গিক ব্যাপারের যোগ ঘটে যাওয়ার ফলেই শব্দের নিজস্ব অর্থটুকু হারিয়ে গেছে।

শব্দের এই বিভিন্ন ভূমিকা থাকার ফলে গন্তসাহিত্যকে 'সঙ্করশিল্প বা Hybrid art বলা যেতে পারে। শব্দ কখন কখন তর্কশাস্ত্রসম্মত প্রতীকরূপে, কখন বা গভিময় ধ্বনিরূপে, আবার কখন বা আমাদের আবেগের উদ্দীপক হিসেবে কাজ করে। শব্দের বিন্তাসগত যে ধ্বনি-সাম্য তার অন্তরে সঙ্গীতের

যে সম্ভাবনা লুকিয়ে থাকে, তাকে যথাযথভাবে গদ্য ব্যবহার করে না; কাব্য সেটুকু ব্যবহার করে। অবশ্য কখন কখন ছন্দোময় বর্ণবহুল গদ্যের ঢঙে যে প্রবন্ধ লেখা হয় তার মধ্যে শব্দের উপযুক্ত প্রসাদ গুণ এসে যুক্ত হয়। ফ্লাটন ব্রুক বললেন যে গদ্যের বিশেষ গুণ হল সুবিচার অর্থাৎ বক্তব্য বিষয়ের সঙ্গে তাল রেখে গদ্যের ঢঙটুকু নির্ণীত হয়ে থাকে। গদ্যের বিস্তারটুকু নির্ণীত হয় ভাষায় দুটি ক্রিয়ার কথা মনে রাখে; এক দিকে ভাষা ভাবের বাহন; অন্য দিকে তা বস্তুর প্রতিচ্ছবি। গদ্য কী না করে? গদ্যে গল্প বলা যায়; দুরূহ বিষয়ের ব্যাখ্যা করা যায়; বিষয়গত জটিলতার সরলীকরণ ক'রে স্থান এবং ব্যক্তির বর্ণনা দেওয়া হয় গদ্যের মাধ্যমে; আবার কোন বিশেষ ব্যাপার নিয়ে তর্কবিতর্ক, কোন ব্যাপারে কাউকে বুঝিয়ে তাকে আপনার মতে নিয়ে আসা, এ সবই হল গদ্যের কাজ। মানুষের সমগ্র অভিজ্ঞতাকে গদ্য ব্যক্ত করে। অন্য দিকে পদ্য শুধুমাত্র শব্দের অর্থটুকু সম্বল করে কাজ করে না। শব্দের দ্যোতনা ও ব্যঞ্জনাও পদ্যের কাজে লাগে। গদ্য কাব্য থেকে সঙ্গীতের সুরটুকু কর্জ করে। এতো বিভিন্ন ধরনের ভাবের বাহন বলেই গদ্য শুধুমাত্র ভাষার কলাকৌশল মাত্র নয়। কল্পনায় যে সমন্বয় সাধন সম্ভব গদ্য সেই সমন্বয়টুকু সৃষ্টি করে। গদ্য সেই কল্পলোকের উৎস। তাই উপন্যাস গদ্যকে আশ্রয় করে আছে।

কাব্য এমন একটা শিল্প যেখানে ভাবের বাহন ভাষা পুরোভাগে এসে দাঁড়ায়; কাব্যের ভাষাকে কবি, তাঁর শ্রোতা অথবা পাঠক কেউ-ই ভুলে থাকতে পারেন না। সান্তায়ানা যথার্থই বলেছেন যে কবি হলেন মূলতঃ কথার স্বর্ণকার; কথার সোনা দিয়ে তিনি কাব্যের অলংকার গড়েন। শব্দের যে ইন্দ্রিয়জ আবেদন কবিকে আকর্ষণ করে কবি তাঁর পাঠককে সেই শব্দের আমন্ত্রণটুকু পাঠান। অনেকে মনে করেন, যে সব কবির মাতৃভাষা ইতালীয়, তাঁরা সত্যসত্যই ভাগ্যবান। এই ভাষায় স্বরবর্ণের এমন ছড়াছড়ি যে কথা বললেই এক ঝুড়ি স্বরবর্ণ ব্যবহার করতে হয়; এ ভাষায় কবিতা না লিখে উপায় থাকে না, অবশ্য এটি যদি তাঁর মাতৃভাষা হয়। সুইনবার্ণের মত কবিরা কখন কখন কেবলমাত্র শব্দ-লালিত্যের দ্বারা মুগ্ধ হয়ে এমন সব চরণ লিখেছেন যার বিশেষ কোন অর্থই হয় না। সেই সব চরণে শুধু রয়েছে পদ-লালিত্য; শুধু রয়েছে ধ্বনি-মাধুর্য।

আমরা এমন একটা কাব্য-কলার কল্পনা করতে পারি যে কাব্য-কলায় শুধু মাত্র স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনি পরস্পর যুক্ত হয়ে অর্থহীন ধ্বনি-সংগতি সৃষ্টি

করে। সে ধ্বনি-সংগতি প্রাচ্যদেশের ঝাড় লণ্ঠনের মত বর্ণবহুল ও ঝলমলে হবে। এমন কবি এবং কাব্য পাঠক রয়েছেন যাঁরা শব্দের বর্ণটুকুও প্রত্যক্ষ করতে পারেন যেমন করে আমরা জলের বাহার ও পাতার রং প্রত্যক্ষ করি। ইংরেজী ভাষায় অনভিজ্ঞ একজন বিদেশী একবার বলেছিলেন যে 'Celler door' কথাটি বড়ই মিষ্টি, এমন মিষ্টি কথা আমি জীবনে শুনিনি; এমন অনেক ইংরেজ কবি আছেন যাঁরা বুঝতে পারবেন যে ঐ বিদেশী ভদ্রলোকটি ঠিক কি বোঝাতে চেয়েছিলেন।

শব্দের কারুকার্য সম্পন্ন করাটাই কিন্তু কবির সবটুকু কাজ নয়। স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনির কুশলী সমন্বয় ঘটিয়ে কাব্যের সবটুকু ব্যঞ্জনা ফুটিয়ে তোলা যায় না। এই কুশলী সমন্বয় সাধনকর্মের মাধ্যমে যে আবেদনের সৃষ্টি করা যায় তা কাব্যের ইন্দ্রিয়জ আবেদনেরও সবটুকু নয়। আর এক দিক থেকে ভাষার সঙ্গে সঙ্গীতের সাদৃশ্য আছে। সঙ্গীতের বিভিন্ন স্বরগ্রামের (Tones) মতই ভাষারও বিভিন্ন শব্দাংশ রয়েছে। কিন্তু সেইটুকু সাদৃশ্য ছাড়াও গভীরতর সাদৃশ্য উভয়ের মধ্যে বিদ্যমান। বিভিন্ন স্বরগ্রামের সমন্বয় যেমন সঙ্গীত সৃষ্টি করে না ঠিক তেমনি বিভিন্ন শব্দাংশকে একত্র যোগ করলেই কাব্য জন্ম নেয় না। মানুষের ভাষার মধ্যে যতি আছে, ছন্দ আছে; ভাষার এই ছন্দটুকু এবং শব্দের ছোট ছোট খণ্ডাংশগুলি কবি তাঁর কাব্যসৃষ্টির কাছে লাগান।

কবিতার ছন্দই হল তার বিশেষ সম্মোহনী শক্তি। মানুষের কান এতো সহজে, এমন অনায়াসে কেমন করে ছন্দের আহ্বানে সাড়া দেয় তার রহস্য বোধহয় মানুষের জৈব প্রকৃতির অন্তরে লুকিয়ে আছে। ফুসফুসের আকুঞ্চন প্রসারণে, নিশ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণের মধ্যেও বোধ হয় এই রহস্যের লীলা। সঙ্গীতের ছন্দের লীলা অতি প্রত্যক্ষ; কাব্যে ছন্দ এক কল্পনা-রঙীন পরিবেশ সৃষ্টি করে; এই পরিবেশেই পাঠক কাব্যানন্দের আস্বাদন করে, কবি-কথিত কাব্য-লোকে পরস্পরের প্রতিবেশী হয়। কবির বক্তব্য পাঠক শোনেন। কবিতা হল কবির স্বপ্ন, কবি মানসের অনুভব মাত্র। কবির অভিজ্ঞতার ছোট বড় নানান আকারের ছবি তার কাব্যের মধ্যে প্রতিভাত হয়। কবি তাঁর কাব্যে সঙ্গীতের সুষমাটুকু মিলিয়ে দেন; হঠাৎ পাওয়া নানান শব্দালংকার কবি এই কাব্যের মধ্যে আমদানি করেন; কাব্য আপন স্বরূপে ঝলমল করে ওঠে।

ওয়াল্ট হুইটম্যানের কাব্যের দীর্ঘায়িত আলুথালু গতিচ্ছন্দ, পোপের কাব্যের দৃঢ়পিনদ্ধ চরণ, সুইনবার্নের কাব্যের দীর্ঘ ছত্র, মহাকবি মিল্টনের

অমিত্র ছন্দের সাবগ্রিক ছটায় গতি তাদের স্ব স্ব কাব্যের আবেদনটুকু নির্ণয় করে। কাব্যের মৌল গতিচ্ছন্দ কবির দেখা স্বপ্নের পূর্ণাঙ্গ চরিত্রটুকু সযত্নে চয়িত শব্দের মাধ্যমে আপনাদের প্রকাশ করে কিন্তু কবির স্বপ্ন বলতে আমরা কী বুঝি? এই প্রশ্নের উত্তরের মধ্যেই কবির সৃষ্টি এবং রসিকের রসানুভবের অনেকখানিই নিহিত রয়েছে। কবিতা শুধুমাত্র পত্যাংশের সমষ্টি মাত্র নয়; তার ছন্দ, তার মিল, তার শব্দ, তার অর্থ সবগুলিকে একত্র করলেও কাব্যের স্বরূপটুকু পাওয়া যায় না। কবিতা হল সামগ্রিক সমষ্টি; একটি সম্পূর্ণ দেহ-সৌষ্ঠব; কবিতার জন্ম হয় কবির অবচেতন মনোলোকের গভীরে; কাব্যের সত্তা হল স্বপ্নের সত্তা যাকে কবি পুঁথির পাতায় অমর করে রেখে যান।

আমরা সেই রাসায়নিক প্রক্রিয়ার কথা কিছুই জানি না, যে প্রক্রিয়ায় কবির স্মৃতি থেকে হাজার হাজার ছবি, কবি-মানসের সীমাহীন উদ্বেগ, তাঁর আনন্দ উদ্বেলতা একসঙ্গে যুক্ত হয়ে কবির কাব্য রূপটুকুর সৃষ্টি করে। আমরা যদি সেটুকু জানতে পারতাম তা হলে কবি-প্রতিভা ছাড়াও অন্যান্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে অলোক সামান্য প্রতিভার অধিকারী মানুষেরা কাজ করছেন তাঁদের কৃতি-রহস্যেরও অনেকখানি উদ্‌ঘাটিত হতো। কবি ওয়ার্ডস্বার্থ বললেন যে কাব্য হল শান্ত মনে জীবনের অতীত আবেগময় মুহূর্তগুলিকে স্মরণ পথে আনয়ন করা। তাঁর উক্তিতে কাব্যের ছন্দ মিলের অতিরিক্ত যে সামগ্রিক আবেদনটুকু রয়েছে তার কথাই বলা হয়েছে। কবিমনের কোন একটি বিশেষ অবস্থায় কবি আপনার মনের গহনে লুকিয়ে রাখা ছবির সঙ্গে আপনার অন্তর্দৃষ্টি ও ভাব ভাবনাকে সমন্বিত করে যে দিবাস্বপ্ন দেখেন তার নামই কবিতা। একটি চতুর্দশপদী কবিতাকে সাধারণ ভাবে গদ্যে হয়ত অনুবাদ করা যায়, তার অন্তর্নিহিত ভাবটিকেও না হয় ব্যক্ত করা যায়। এক্ষেত্রে আমরা সহজেই বুঝতে পারি যে পারিপার্শ্বিক চাপে আমাদের আনন্দের ভোজে পংক্তি ভোজন করার প্রবৃত্তিতে ভাঁটা পড়ে। যদিও এই আনন্দের আস্বাদনে আমাদের জন্মগত অধিকার কাব্যে যে অনুভূতির কথা বলা হয়, তার যে অনুরণন ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয় কাব্যের সবটুকু বিস্তার জুড়ে, তা কিন্তু কাব্যের জীবন নয়। তাই কবিতার ভাব তদ্‌বর্ণিত অনুভূতির কথা ভাবান্তরে বললেও তার মধ্যে মূল কবিতার রসটুকু মেলে না। পাঠকের চেতনায় যখন কবির স্বপ্নের প্রতিষ্ঠাটুকু ঘটে, যখন কবির সাবগ্রিক দৃষ্টিটুকু পাঠক আপন অন্তর্দৃষ্টির বলে আপনার করে নেয়, তখন কবিতার আবেদনটুকু অব্যাহত থাকে, অনন্তের মন্দিরে কাব্যের

জীবন্ত বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা তখনই সম্ভব হয় যখন কবির দেখা জগতের টুকরো ছবি, তার অভিজ্ঞতার খণ্ডাংশ, তার ব্যক্তিগত জীবনের দুঃখ, তার আনন্দানুভূতির ভূমা-রূপ আপনার সত্তায় সমন্বিত হয়ে যায়।

কবির কাব্যে যে অনাস্বাদ প্লেতোনিক সমগ্রতাটুকু পাই তাকেই আমরা কবির স্বপ্ন আখ্যা দিয়েছি। কবি এই স্বপ্নটুকুকে পাঠকের মনে সঞ্চার করে দেন। কাব্যের ছন্দ এই স্বপ্ন সঞ্চারে সহায়তা করে; কবিতার জাদু আছে; কবিতা পাঠককে সম্মোহিত করে।

কবিতার জাদু হল কবির ভাষার মনোহারিত্ব। তার সম্মোহন শক্তি পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করে দুর্বার ভাবে। আমরা কোন এক কবি কথিত মানসিক পরিবেশটুকুতে বিশেষভাবে অভ্যস্ত হয়ে পড়ি। আমাদের জীবনের গতিচ্ছন্দে কবিচিত্তের বহমানতা এসে ঢেউ তোলে। আমরা কবির সঙ্গীতে মুগ্ধ হই। তাই কাব্যের অন্তর্বর্তী বিভিন্ন উপাদানে কাব্যকে বিশ্লেষণ করলেও আমরা কবিতার স্বরূপটুকুকে কিছুতেই ধরতে পারি না। কবির জৈবিক স্বপ্নে আমরা মুহূর্তের জন্য অংশভাগী হয়ে পড়ি; এই স্বপ্নই কাব্যের হৃৎস্পন্দনের সঙ্গে মিশে যায়। যাঁরা কবি তাঁরা জানেন যে মনের বাহনে কাব্যের সূত্রপাত হয় অর্থহীন সুরের ঝংকারের মত। ইংরেজী সাহিত্যে এমন অনেক কবিতার কথা আমরা জানি যার সূত্রপাত কবি মনে হয়েছিল এক অস্পষ্ট সুরের ইঙ্গিত থেকে; সে সুরে কথা তখনো সংযোজিত হয় নি; কবি-কল্পনার অস্পষ্টতা ক্রমে কেটে গিয়ে সে সুর আকার পেলো, কথা পেলো, অর্থ পেলো। কাব্যরসিক জানেন সে শব্দের অন্তরালে, অর্থের পশ্চাতে যে সঙ্গীতের ধারা, যে ছন্দের প্রবাহ নিত্য বহমান তার জন্যই তিনি কাব্য ভালবাসেন। মার্ক টোয়েনের কাব্যে পাওয়া অতিনিকৃষ্ট ছন্দই হোক অথবা মিল্টনের কাব্যে পাওয়া সূক্ষ্ম উচ্চারণ-সমাকীর্ণ অমিত্রছন্দই হোক, যে কোন ধরনের ছন্দকে আশ্রয় ক'রে কাব্যকে থাকতে হবে। ছন্দই হ'ল সুরের প্রাণ। সুর নইলে কবিতার হৃদস্পন্দনের ছন্দ থেমে যায়। কবিতার ভাষায় যতই চাতুর্য থাকুক না কেন ছন্দের সম্মোহনটুকু না থাকলে কবিতা পাঠকের হৃদয়ে সুরের অনুরণনটুকু জাগায় না; সেই মুহূর্তের জন্ত কবির স্বপ্ন পাঠকের প্রাণস্বরূপ হয়ে ওঠে না!

ছন্দের গতি এবং যতি, এরাও কাব্যের আবেদনটুকুকে পুরোপুরি ব্যাপ্ত করতে পারে না। কথা যদি শুধু পদের, পদাংশের যোজনায় ছন্দ-সুরটুকু মাত্র হতো তা হলে তা পুরোপুরি শব্দ ও শব্দ-সমন্বয়কে কেন্দ্র করেই আবর্তিত

হতো। কোন একটি বিশেষ শব্দকে কেন্দ্র করে যে বিচিত্র সঙ্গীতের সৃষ্টি হয়, সে ভিন্ন ধর্মী বিচিত্রতর জটিল হার্মনির সৃষ্টি সম্ভব, তাদের কোনটিকেই আমরা কাব্যে খুঁজে পেতাম না। কেউ কেউ কাব্যকে বিশুদ্ধ সঙ্গীতের মর্যাদা দিতে চেয়েছেন, কিন্তু এই কাব্য-সঙ্গীত সঙ্গীতের চেয়ে খাঁটি হলেও তা সূক্ষ্মতর হবে। কাব্যে আমরা কথার ব্যবহার করি এবং এই কথা শুধু শব্দ নয়; আমরা তা বলি মনের ভাব প্রকাশের জন্য। কথার গুরুত্ব কখনই উপেক্ষা করা যাবে না। যদি কবি কথার এই প্রকাশ ক্ষমতাটুকুকে পুরোপুরি কাজে না লাগান তা হলে তিনি তাঁর কাব্যকলার অন্যতম মুখ্য উৎসের অপচয় করবেন বলেই আমাদের ধারণা।

কথার একটি তর্কশাস্ত্র সম্মত উৎস থাকে আর থাকে মনস্তত্ত্ব-সম্মত মৌল উপাদান। এই দ্বিবিধ বিষয়ের উপরে কবির শিল্পকলা অংশতঃ নির্ভরশীল। কবি কথার রসাশ্রয়তে বেশী মাত্রায় আগ্রহী। বৈজ্ঞানিক অবশ্য একে আমল দেন না। কবির কাজ হল সর্বোপরি কথার শক্তিটুকুকে নিয়ে; কথার সত্যাসত্য নিয়ে তিনি মাথা ঘামান না। কবি অভিজ্ঞতাকে প্রাণোজ্জ্বল করে পরিবেশন করেন, তা সে সংবেদনই হোক্, তার নিজের দলের বিশেষ ভাব-ভাবনাই হোক; তাকে প্রাণবান ক'রে, উজ্জ্বল ক'রে কবি আপন কাব্যে প্রতিষ্ঠিত করেন। তেমনি ধারা অপরের ভাব-ভাবনা, অপরের সংবেদনকেও কবি আপনার কল্পনার রঙে ঐশ্বর্যবান করে কাব্যে পরিবেশন করেন কখন কখন। বাইরের যে অতি প্রত্যক্ষ জগৎ কবিচিত্তের দ্বারে বার বার আঘাত হেনে কবির ইন্দ্রিয়চেতনাকে জাগ্রত করে, তাঁর আবেগকে উদ্দাম করে দেয়, তাঁর মনের ভাবসমুদ্রে তুফান তোলে, সেই প্রাকৃত জগতকে কবি আপন কাব্যে রমণীয় মর্যাদা দেন। কাব্য-পাঠকের মনে কবি একটি বিশেষ মানসিক অবস্থার সৃষ্টি করতে চান। কাব্যে কথিত রূপকল্প, কবির আবেগ ও চিন্তা প্রভৃতিকে কাব্যপাঠকের চিত্তে সঞ্চার করে দেওয়া কবির উদ্দেশ্য নয়। রাষ্ট্রের বহির্বিষয়ক সাঙ্কেতিক বার্তা বিনিময়ে ইংলণ্ডের পরিবর্তে × চিহ্ন ব্যবহার করা চলে। কিন্তু সেক্সপীয়র ইংলণ্ডের যে বর্ণনা দিয়েছেন তা শুধুমাত্র তর্কশাস্ত্রবিদের সংজ্ঞা নয়। সেক্সপীয়র বললেন: 'এ দেশ শক্তি-ঐশ্বর্যে পরম গম্ভীর। মঙ্গলের পীঠস্থান, স্বর্গীয় উদ্যান ইডেনের অন্যতম রূপ। একে দ্বিতীয় স্বর্গ বললেও অত্যুক্তি হয় না। 'ইংলণ্ড' এই শব্দটি নানান্ ভাব, স্মৃতি ও কল্পনার উদ্দীপক, শৈশবের কত স্মৃতি, ইংরেজ জাতির ইতিহাসের কত অতীত ঘটনা, কত না

রাজনীতি পাঠকের কল্পনায় ভীড় করে আসে। কবিতার কথাগুলি অঙ্কশাস্ত্রের সাঙ্কেতিক চিহ্নমাত্র নয়; তা হল আবেগের উদ্দীপক। তারা শুধু বস্তু বা বিষয়ের কথা বলে না; তারা বলে জাগ্রত মানবাত্মার কথা। কবি তাঁর উদ্দীপনাময়ী ভাষায়, তাঁর ছন্দের গতিতে, তাঁর কাব্যের অনবদ্য শব্দসুষমায় পাঠকের স্তিমিত কল্পনাশক্তিকে জাগ্রত করে তোলেন।

কবি এই যে পাঠকের কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করেন তাঁর বিশিষ্ট শৈলীতে কাব্যের কথাগুলিকে সাজিয়ে, তার ফলে পাঠক শিশুসুলভ কল্পনার আশ্রয়ে নতুন করে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। সেই অভিজ্ঞতা পুরোনো গতানুগতিকতাকে অস্বীকার ক'রে বিচিত্রতর ইন্দ্রিয়জ সংবেদনকে আশ্রয় ক'রে নতুন রূপ পরিগ্রহ করে। তিনি তাঁর কাব্যে অভিজ্ঞতায় পাওয়া সমস্ত খুঁটিনাটি শুদ্ধ এক একটা আস্ত সংবেদনকে চিত্রিত করেন। বাস্তবাগীশ প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের চোখে যে রং, যে গন্ধ, যে স্বাদ, যে স্পর্শ একেবারে রোজনামচার ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে তাকেই কবি এক এক করে বর্ণনা করেন। এই ধরনের কাব্যকলার প্রকৃষ্ট উদাহরণ আমরা পাই রূপার্ট ব্রুকের 'Great Love' কবিতায়। আমরা যৌবনে পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য থাকার সময়ে যে সব উত্তেজনাপূর্ণ সঙ্গীতময় মুহূর্তগুলো কাটাই, কবি তারই স্মারক বাণী আমাদের শুনিয়েছেন :

These I have loved :
White plates and cups, clean—gleaming
Ringed with blue lines, and feet heavy fairy dust.
West roofs, beneath the lamp-light ; the strong crest
of friendly bread ; and many tasting food ;
Rainbows ; and the blue bitter smoke of wood ;
And radiant raindrops crouching in cool flowers ;
And flowers themselves, that sway through sunny hours,
Dreaming of moths that drink them under the moon ;
Then, the cool kindness of sheets, that soon
Smooth away trouble ; and the rough male kisses
Of blankets ; grainy wood ; live hair that is
Shining and free ; blue massing clouds ; the keen
Unpassioned beauty of a great machine ;

The benison of hot water ; furs to touch ;
The good smell of old clothes ; and other such—
The comfortable smell of friendly fingers,
Hair's fragrance, and the musty reek that lingers about
dead leaves and last years ferns……Dear names
And thousand other throng to me ! Royal flames ;
Sweet water's dimpling laugh from tap or spring ;
Holes in the ground and voices that do sing ;
Voices in laughter, too, and body's pain
Soon turned to peace ; and the deep-panting train ;
Firm sands ; the little dulling edge of foam…that browns
and dwindles as the wave goes home ;
And washen stones, gay for an hour, the cold
Graveness of iron ; moist black earthen mould ;
Sleep ; and high places ; foot-prints in the dew,
And oaks ; and brown horse-chestnuts, glossy new ;
And new peeled sticks, and shining pools on grass ;
All these have been my loves.

কবি তাঁর কবিতায় যে অভিজ্ঞতার কথা বলেন সে অভিজ্ঞতায় শিশুর ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতার সজীবতা ; কাব্যের এই গুণটি সকল কাব্যেই বিশেষ ক'রে ইংরেজী কাব্য-সাহিত্যে অতি প্রত্যক্ষ। হোমারের কাব্যে এই ধরনের অভিজ্ঞতার উজ্জ্বল নিদর্শন পাওয়া যায় ; কীটস এবং মিণ্টনের কাব্যেও এই গুণের অসদ্ভাব নেই। মিণ্টনের কাব্যে মহত্তর মহিমার জটিলতা এই গুণটিকে ক্ষুণ্ণ করে নি। বস্তুর বর্ণোজ্জ্বল রূপটিকে কবি তাঁর সুষ্ঠু শব্দ নির্বাচন ও প্রয়োজনের মাধ্যমে আমাদের দেখান। কবি বস্তুটিকে বর্ণনা করেন তার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সত্তাটুকুর নির্দেশ দিয়ে ; সমুদ্রকে তিনি মদের মত অন্ধকার বলেন, এথেনের চোখকে কটা বলেন, প্রত্যূষকে বলেন যে তার না কী গোলাপের মত আঙুল। পশমের স্পর্শ, পুরোনো কাপড়ের গন্ধ, বন্ধুস্বভাবাপন্ন আঙুলের ছোঁয়া, গোলাপের ঘ্রাণ, কাঁটার হুল ফুটিয়ে দেওয়া—এই সব ভাষা ব্যবহার করে আপনার ইন্দ্রিয়জাত অভিজ্ঞতার কথা পাঠককে মনে পড়িয়ে দেন।

সাধারণতঃ আমাদের জগতের প্রতি যে প্রতিক্রিয়াটুকু হয়ে থাকে তা কবি আমাদের ভুলিয়ে দেন ; অনেকের মতে এইটুকুই হল কবির কাজ। আমাদের আদিম সংবেদনের রূপটিকে পুনরুদ্ধার করাই হ'ল কবিকৃতি। শিশু বাঁধাধরা ছকে চলতে এবং বলতে শেখার আগে তার চোখ বা কান যে বিশুদ্ধ রূপ দেখে ও শব্দ শোনে সেইটুকু রসিকজনকে দেখানো এবং শোনানোই হল কবি কুলের মুখ্য কর্তব্য। শিশু যখন ট্রেন গাড়ী দেখে তখন তার কানে কানে ইঞ্জিনের অদ্ভুত শব্দটাই বড় করে বাজে। তাই শিশু ট্রেনকে 'ছু ছু' নাম দিয়েছে। তেমনি ধারা কবিও এই পরিচিত পারিপার্শ্বিককে অনেক নতুন নতুন অভিধায় অভিহিত করেন কারণ কবির জটিলতাবর্জিত ইন্দ্রিয়-সংবেদনে পৃথিবীটা অন্য ভাবে ধরা দেয়।

এই ইন্দ্রিয়জ ছবিকে, সংবেদনকে মুখ্য বলে কবি বিশেষ গৌরব দেন, তাই কবি যে ভাষা ব্যবহার করেন তা একাধারে সরল ও আবেগ-সমৃদ্ধ। ইন্দ্রিয়ের কাছে তার আবেদন সর্বাগ্রগণ্য। সে কাব্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারে সাড়া জাগায় না তা আমাদের আবেগকেও উদ্বেল করে তুলতে পারে না। যে সব কথায় সহজেই ইন্দ্রিয় সক্রিয় হয় তাদের এমন অসংযত এবং যথেচ্ছ ব্যবহার নিত্য দিন ধরে হয়েছে যে কবি আর সহজে তাদের দিয়ে ঈপ্সিত ফল লাভ করতে পারেন না, তাই কবিকে নতুন বিষয়ের কথা, নতুন অনুষঙ্গের কথা চিন্তা করতে হয়। ঝলমলে কোন অনুষঙ্গের কথা কবি হয়ত অপ্রত্যাশিত ভাবে বললেন। তখনই চমক ভাঙে আমাদের, আমরা মনোযোগ দিই ; ষোড়শ শতাব্দীর একজন কবি পাত্রীকে বলেছেন : 'The modest water saw its God and blushed.'

এই বিস্ময়কর অনুষঙ্গের মধ্য দিয়ে আমরা অনেক বেশী সজাগ হয়ে দেখি কেমন করে জল মদে পরিণত হল।

উপমা এবং রূপকের উপর অনেক আলোচনা হয়েছে। আমাদের বক্তব্য হয়ত অনেক সহজ করে, সরল করে বলা যায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই। কবির বক্তব্য বিষয়ের সঙ্গে যে সব বস্তুর নিত্য যোগ তা থেকে বক্তব্য বিষয়টিকে মুক্ত করে নিয়ে উপমা এবং রূপকের সাহায্যে নতুন নতুন অনুষঙ্গের সঙ্গে তাকে যুক্ত করে দিলে আমাদের পক্ষে সে কাব্য থেকে যে তথ্যটুকু লাভ করা সহজ নয়, তা সজীব হয়ে ওঠে, প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে, এবং তা তীক্ষ্ণতা প্রাপ্ত হয়। রূপকের সাহায্যে শুধুমাত্র কাব্যের বিষয়বস্তুতে ইন্দ্রিয়জ সংবেদনের মর্যাদাটুকু আনে না ;

কাব্যের বিষয়বস্তুতে প্রাণের সঞ্চার করা হয় তাকে আমাদের আবেগ, আমাদের আশা, আকাঙ্ক্ষা, আমাদের ঐতিহ্য এবং আমাদের অনুভূতির সঙ্গে যুক্ত ক'রে। অন্যভাবেও বলা যায় যে আমাদের কোন কোন আবেগানুভূতিকে ইন্দ্রিয়জ অনুষঙ্গের সঙ্গে যুক্ত ক'রে তাকে হঠাৎ অতিমাত্রায় প্রাণবন্ত করে তোলা হয়।

"My love is like a red, red rose'"

অথবা 'Du bist wie eine Blume.'

অথবা আবার বলি রুপার্ট ব্রুকের একটি আশ্চর্য সুন্দর কবিতার কথা। "The dead' কবিতায় কবি বলেছিলেন সেই সব মৃত মানুষদের কথা যাঁরা জীবনকে ভালবেসে ছিলেন, যাঁরা সুন্দরকে ভালবেসে ছিলেন। কবি বলছেন নিত্য-সুন্দর ফুলের কথা, বহুমূল্য পোশাক-পরিচ্ছেদের এবং দয়িতের গণ্ডদেশের কথা যা একদিন অধুনা-মৃতদের পরম প্রিয় ছিল। তারপরে কবি কোন মন্তব্য না করেই বলেছেন:

"There are waters blown by changing winds to laughter,
And lit by the rich skies all day and after.
Frost with a gesture stays the waves that dance.
And wandering loveliness; he leaves a white
Unbroken glory, a gathered radiance,
A width, a shining place under the night."

দিনের বেলায় আমরা যে সব নৃত্যচপল উর্মিমালা প্রত্যক্ষ করেছি তারা হঠাৎ এসে প্রাণের জগৎটার প্রতিনিধিত্ব করে এবং মৃত মানুষের প্রতিনিধিত্ব করে রাত্তিরের শান্ত পরিবেশে দেখা স্তব্ধগতি জলরাশি।

এই উপমা এবং রূপকের ব্যবহার করেন কবি গতানুগতিক ছাঁচে ঢালা অভিজ্ঞতার প্রতিবাদ হিসেবে। আকাশের চাঁদ আর অর্থহীন শুভ্র চক্রাকার বস্তুমাত্র নয়; চাঁদ হল রাত্রির রাণী। সূর্য হল আপনার রথে চংক্রমণশীল যৌবন-লাঞ্ছিত দেবতা। সুন্দরকে বলা হয়েছে যে সে হল পরিদৃশ্যমান বিশ্বজগতের অন্তর্গত এই অন্ধকার দেশের প্রোজ্জ্বল আলোকবর্তিকা।

'The soul of Adonais like a star
Beacons from the abode where the eternal are'.

এ সত্য অনস্বীকার্য যে সকল ভাবাই রূপকাশ্রয়ী। অভিজ্ঞতার যেটুকু

পাওয়া যায়, নানান ভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তাকে ব্যঞ্জনাময় করাই হ'ল আলোচনার উদ্দেশ্য। যে সব কথা শোনামাত্র ইন্দ্রিয় তার অর্থ গ্রহণ করে সেই ধরনের কথা ব্যবহারের ফলে, আমাদের অভিজ্ঞতা এবং আবেগের নিগূঢ় যোগ সাধনের ফলে অথবা আমাদের আবেগ জীবনের সঙ্গে বিশেষ অভিজ্ঞতার অন্তর্গূঢ় সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা ঘটলে আমরা কবির কাব্যকে অতি সহজেই অনুধাবন করতে পারি, অর্থের উপলব্ধি সহজ হয়। এই কারণেই জোর করে বলা যায় না কোন একটি কবিতার সঠিক অর্থ কী। তার অনুবাদও সম্ভব নয়। পেয়ারা আস্বাদন করে তার স্বাদটুকুর যথাযথ বর্ণনা দেওয়া বা পিচ ফলের স্পর্শটুকু সঠিক নির্ণয় করা কবিতার অনুবাদ করার মতই দুরূহ কর্ম। যে সঙ্গীতের পরিবেশে কবি একটি বিশেষ বার্তাকে প্রতিষ্ঠা করেছেন, যে শব্দায়ন করেছেন কাব্যের ভাবটুকু প্রকাশের জন্য, যে সব রূপকের ব্যবহার করেছেন ভাবকে তীব্র করার জন্য, সে সবই অনুবাদ কর্মে হারিয়ে যায়। কাব্য হল শব্দে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা অথবা বলতে পারি প্রাণই শব্দের রূপে কাব্যে আবির্ভূত হয়। পার্থিব জগতটা কবির ভুবনে পরিণত হয়; সেই ভুবনটিই তাঁর কাব্যের উপজীব্য। বোদ্ধা যখন কাব্য পাঠ করেন তখন কবির চার পাশের পার্থিব জগৎটাকে দেখতে পান। কবি এইটুকু অনায়াসে সম্পন্ন করেন তাঁর সঙ্গীতময় এবং চিত্রময় ব্যঞ্জনার মধ্য দিয়ে।

শিল্পীর মতই কবি রঙ ও রূপের পূজারী। আমরা একটি কবিতা সংগ্রহ বা চয়ন করতে পারি যার বিষয়বস্তু গোলাপফুল। কিন্তু কবির মানসিকতায় শিশুসুলভ সতেজ ভাবটুকু থাকলেও কবি ত' আর শিশু নন। তাঁর অনুভূতির শূন্যতা অনিশ্চিত, মেজাজের জটিলতা শিশুর অভিজ্ঞতায় একেবারেই অলভ্য। তাঁর কবি-কৃতির কৌশলই হল তার খেয়ালখুশি, তার আবেগকে প্রাণবন্ত করা, করা, তাদের সত্য করে তোলা; এইটুকু না হলে কবি পাঠকের কাছে তাদের যথাযথরূপে হাজির করতে পারেন না। কবি যে পন্থায় তাঁর সংবেদনকে উজ্জ্বলতর করে তোলেন, সেই একই কৌশলে এই কাজটুকুও তিনি সমাধা করেন। কবিতাকে অনেক সময় অনুভূতির সঙ্গে একাত্ম করা হয়। পৃথিবীর অধিকাংশ গীতি-কবিতারই বিষয়বস্তু হল কবির একান্ত ব্যক্তিগত আবেগময় জীবন। কবিরা বার বার মানুষের জন্ম জীবন এবং যৌবনকে ঘিরে কাব্য রচনা করেছেন। কারণ কবিরাও মানুষ এবং মানুষের আবেগের প্রতি তাঁদের অভ্রান্ত আকর্ষণ। কবিরা যখন এই সব বিষয় নিয়ে কাব্য রচনা করেন তখন তাঁদের

সৃষ্টিতে প্রাণস্পন্দনটুকু প্রত্যক্ষ হয়, তাঁদের কাব্য স্মরণীয় হয়ে থাকে। এর কারণ তাঁদের বক্তব্যের বিষয়বস্তু সাধারণবোধ্য ও সর্বজনীন বলে নয়, তাঁদের প্রকাশটুকু অনন্যসাধারণ ব'লে; কাব্যে মানুষের কোন একটি অবিসংবাদিত রূপে গ্রাহ্য মানস অবস্থার কথা কবি বলেন মৃত্যুহীন ভাষায়:

Oh, never Say that I was false of heart.

When absence Seemed my flame to qualify.

As easy might I from myself depart

As From my soul which in thy breast doth lie.

হাজার হাজার নরনারী তাঁদের প্রেমাস্পদের জন্য অস্পষ্ট এক ধরনের সুতীব্র আবেগ অনুভব করেন বটে কিন্তু তাঁরা সকলেই সেক্সপীয়রের এই সনেটটিতে নিজেদের অনুভূতিকে খুঁজে পান; কবি সকলেরই আবেগের কথাটুকু অনন্য সাধারণ ভঙ্গীতে ব্যক্ত করেছেন। কবি-কথিত প্রেমের সজীবতা এবং প্রচ্ছন্ন বাস্তবতা তাঁদের আপন আপন অনুরাগ সম্বন্ধে সচেতন করে দেয়।

আবেগের ভুবনে কাব্য হল সর্বোত্তম প্রবক্তা; অন্য কিছুর মাধ্যমে আবেগকে এমন সুন্দর করে প্রকাশ করা যায় না। সাধারণ মানুষের চোখে বা তর্কশাস্ত্রবিদের কাছে যা একান্তই উপেক্ষণীয় তা-ই কবির মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু হতে পারে। জলের রাসায়নিক তত্ত্বে কবির কোন আকর্ষণ নেই; তিনি জলের উপরে রোদের ঝিকিমিকি, আলোর শুভ্র আভা দেখেন। পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব নিয়ে কবি মাথা ঘামান না। তিনি আলোর আশীর্বাদটুকু অন্তরে অন্তরে অনুভব করেন। মানুষের সঙ্গে, বস্তুর সঙ্গে কবির যে নিত্যযোগ এবং তদ্‌জাত যে আবেগ কবির মনে সঞ্চারিত হয় তা একমাত্র কবিরই অনুশীলনের বস্তু। বৈজ্ঞানিক অথবা সাধারণ মানুষ এ ব্যাপারে কোন আগ্রহ প্রকাশ করেন না। ইন্দ্রিয়ের দ্বারে যে কাব্যের কোন আবেদন নেই তা যেমন মৃত ঠিক তেমনি যে কবিতা আবেগের উদ্রেক ঘটায় না তাও তেমনি মৃত। আবেগের উদ্রেক নানানভাবে ঘটতে পারে। ব্লেক তাঁর দুর্জ্ঞেয়বাদের দ্বারা, ডোন তাঁর যৌন আবেদনের দ্বারা, দান্তে তাঁর ভগবদ্ প্রীতির সাহায্যে এবং শেলী তাঁর প্লেতোনিক ভাববাদের সহায়তায় আমাদের আবেগের প্রস্রবনকে বারবার মুক্ত করে দিয়েছেন। কবির মনে যে চিত্রকল্প এবং সঙ্গীতের সমারোহ শুরু হয়— তা হল কাব্য-সৃষ্টির প্রাথমিক অবস্থা; প্রবলভাবে বাঁচার জন্যই এই চিত্র ও সঙ্গীতের সমারোহ সম্ভব হয়; কবি এই প্রাচুর্যটুকু মনে মনে উপলব্ধি

করেন, তাঁর আবেগ-অনুভূতির অতলতা তিনি প্রকাশ করতে চান এবং অনেক সময়ে আপনার অজান্তে তিনি অপরের সঙ্গে এটুকু একত্রে উপভোগ করতে চান। 'What is art' গ্রন্থে ঋষি তলস্তয় নিষ্ঠাকে নন্দনতত্ত্বের গুণ হিসেবে খুব উচ্চে স্থান দিয়েছেন। কিন্তু বস্তুতঃ পক্ষে তলস্তয় নৈতিক নিষ্ঠাকে বুঝেছিলেন। নন্দনতত্ত্বের ভাষায়ও নিষ্ঠাকে গুণ বলে গণ্য করা যায়। কবিতার মধ্যে কবি আপনার উৎসাহ আবেগ বহুল পরিমাণে অনুস্যূত করে দেন এবং কাব্যের আঙ্গিকের মধ্যে এমন কৌশল থাকে যা পাঠকের মনে কবির উৎসাহ আবেগকে সঞ্চার করে দিতে পারে। বস্তু, ব্যক্তি অথবা ভাব কবির অনুভূতির উদ্রেক ঘটাতে পারে; কবি আবেগবিহ্বল হয়ে পড়তে পারেন যে কোন একটি উদ্দীপকের প্রতিক্রিয়ার ফলে। মানুষের মনোভাবের অস্তিত্বও তার পক্ষে মূল্যবান অভিজ্ঞতা। কবির আঙ্গিকের প্রসাদগুণে এই ভাবেরও 'হাত' গজাতে পারে; একথা বললেন মহাদার্শনিক হেগেল। কবি ওয়ার্ডস্বার্থের হৃদয় ডাফোডিলদের আনন্দে নৃত্য করে। কিন্তু ভাবও হৃদয়কে নৃত্যচ্ছন্দে স্পন্দমান করে তুলতে পারে। কবি ভগ্‌হান লিখেছেন :

'I saw Eternity of the other night
Like a great ring of pure and endless light.'

ইংলণ্ডে এক শ্রেণীর কবি রয়েছেন যাঁদের কাব্যে ভাব ফুলের মত, সুন্দর তরুণীর মত মনোরম মূর্তি পরিগ্রহ করেছে। লুক্রেটিয়স থেকে আর্লিংটন রবিন্সন পর্যন্ত কবিকুল এই শ্রেণীভুক্ত।

এমন ধারণা বহুদিন ধরে চলে আসছে যে দর্শন ও কাব্যের মধ্যে একটা বিরোধ আছে। চিন্তাবিদের বিশ্লেষণমুখীনতা ও কবির ইন্দ্রিয়জ আবেগ-প্রবণতার মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব রয়েছে।

আমরা প্লেতোর লেখার মধ্যে দেখেছি কীভাবে ভাব আবেগতপ্ত মূর্তিতে আবির্ভূত হতে পারে; এ ভাবকে কোন রূপক অথবা রূপকথার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করা যায়; কেবলমাত্র সূত্রাকারেই তা প্রকাশ-যোগ্য নয়। 'ফ্রিডাম' গ্রন্থে প্লেতো অমরতাকে নিয়ে যে রূপকথার সৃষ্টি করেছেন, যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রতিমার মাধ্যমে তাকে রূপ দিয়েছেন, বলেছেন যে আত্মার রথ ছুটে চলেছে স্বর্গকে বার-বার প্রদক্ষিণ ক'রে, তা প্রণিধানযোগ্য। লুক্রেটিয়াসের মতে জীবনের আবেগময় পরিণতি দেখিয়েও দেখানো যায় যে ধর্মকে ঘৃণা করেও স্বর্ণবর্ণোজ্জ্বল স্বাধীনতা এবং জীবন সম্বন্ধে বস্তুকেন্দ্রিক ধারণা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। কবি কল্পনা

নানাভাবে উদ্দীপ্ত হতে পারে—ছোটবড়, মহৎ অথবা ক্ষুদ্র যে কোন উদ্দীপকই এই কাজের জন্য যথেষ্ট। যদি কবির কল্পনার বিস্তার এবং গভীরতা থেকে থাকে তা হলে তিনি লুক্রেটিয়াসের মত সহজেই প্রকৃতির প্রাকৃত সৌন্দর্যকে মহাকাব্যের উপজীব্য ক'রে তুলতে পারেন; এই কাব্যে একদিকে যেমন বিষয়ের মাহাত্ম্য এবং মহিমা থাকবে অন্যদিকে তেমনি সেই কাব্যে সঙ্গীত এবং আবেগময় রূপকল্পেরও অসদ্ভাব হবে না। কবির স্বভাবজ কাব্য শক্তির ধর্ম হল ছন্দোময় চিত্রধর্মী, উদ্ভাবনী ক্রিয়া এবং এই বিশেষ প্রক্রিয়ার সঙ্গে বিযুক্ত অনুসন্ধানী মনের সন্ধান সচরাচর প্রযুক্ত হয় না। যখন এই দুটো ভিন্নধর্মী ক্রিয়া যুক্ত হয় তখন আমরা প্রবল আবেগমুখর The Divine Comedy অথবা On the nature of things অথবা Paradise Lost-এর মত মহাকাব্যের সন্ধান পাই। আমাদের যুগেও হয়তো এমন কাব্য রচিত হবে; এমন কবি হয়তো আবির্ভূত হবেন যাঁর লেখায়, বস্তু-জগতের সবটুকু জটিলতা এবং অদৃষ্টের লীলা কল্পনা-মুখর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপ পরিগ্রহ করবে এবং পাঠকের বুদ্ধি ও কল্পনাকে একই সঙ্গে উদ্দীপ্ত করে তুলবে। স্বধর্মে কোন বিষয়েই ও আপনাকে একান্তভাবে কাব্যে উপজীব্য বলে দাবী করতে পারে না। যা আছে তা হল কবি-প্রতিভা। এই প্রতিভা কখন একটি গোলাপ-কোরককে নিয়ে কাব্য রচনা করে আবার কখন তা সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে আপন কাব্যের উপজীব্য মনে করে। কবির কল্পনাগত অভিজ্ঞতার উপর এটি একান্তভাবে নির্ভরশীল।

গদ্যের শিল্পরীতি আমাদের অন্য আর এক জগতে নিয়ে যায়। অবশ্য গদ্য এবং পদ্যের মধ্যে এমন একটা ভূখণ্ড রয়েছে যেটা উভয়েরই এলাকা বলে বিবেচিত হতে পারে। গদ্যের যে প্রান্তিক রূপ, সেই রূপে আমরা দেখি ভাব ভাষাকে আশ্রয় ক'রে আপনাকে প্রকাশ করছে এবং কী প্রকাশ করছে গদ্যে সেটাই বড় কথা; কীভাবে প্রকাশ করছে সেটা বড় কথা নয়। গদ্য তার এই প্রান্তিকরূপে আপনার শিল্প-প্রকৃতিটুকু হারিয়ে ফেলে; সে শুধুমাত্র প্রকাশের বাহন হিসাবে পরিগণিত হয়। গদ্যকে এই রূপে আমরা সঙ্কেত চিহ্নের, সাঙ্কেতিক বার্তার অথবা কথার ব্যবহার কম করার সূত্র হিসাবে, তাদের বিজ্ঞান হিসাবে গণ্য করতে পারি।

গদ্যের যে সীমান্ত এসে কাব্যের সীমান্তের সঙ্গে মিলে গেছে ঠিক সেইখানে গদ্য এবং পদ্যের মধ্যে তফাৎ করা দুষ্কর। গদ্যের মধ্যেও বিশুদ্ধ ভাষাগত উপাদান ও বিশুদ্ধ সংগীত উপাদানের আবিষ্কার করা যে কোন লেখক অথবা

পাঠকের পক্ষে সহজসাধ্য। সংবেদনগত রীতিনৈপুণ্যে গদ্য স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের বিভিন্ন সমন্বয় ঘটিয়ে যে ধরনের সৌন্দর্য সৃষ্টি করে তা কাব্যের মত মনোহারী না হলেও, তা যে রমণীয়, একথা অনস্বীকার্য। গদ্যের ছন্দ হল বিমুক্ত ছন্দ, কাব্যের মিলের থেকে এর প্রকৃতি সূক্ষ্মতর। আপন স্বরূপে গদ্যকে শিথিল কাব্যরূপ বলা যেতে পারে। প্যাটারের মত লেখকের লেখা আমরা পড়ি তার সুন্দর শব্দবিন্যাসের জন্য; ডি. কুইন্সির রচনা পড়ি তাঁর চিত্রকল্প এবং গদ্য-ছন্দের উৎকর্ষের জন্য; রাস্কিন পড়ি তাঁর স্থানে স্থানে বর্ণোজ্জ্বল বর্ণনার জন্য। অনেকের মতে এইসব লেখা গদ্যরীতির উৎকৃষ্ট নিদর্শন নয়। কেন না এদের মধ্যে অর্থের প্রাঞ্জলতা নেই।

গদ্য বহুবিধ এবং এর অত্যদ্ভুত লক্ষণীয়তা নানাবিধ কার্য-সম্পাদনে সহায়তা করে। গদ্য এমন এক শিল্পের বাহন যে শিল্পে রীতিটুকু মুখ্য নয়। একটি দীর্ঘ প্রবন্ধে আমরা লেখকের ব্যক্তিগত জীবনের কাব্যিক প্রকাশটুকু দেখতে পাই। কবিতার মত অতোখানি সংবেদনশীল প্রকাশ না চাইলেও আমরা গদ্যসাহিত্যে লেখকের প্রজ্ঞার অনন্যসাধারণ প্রকাশটুকু দেখতে চাই। সেই অপরূপ প্রকাশভঙ্গী বক্তব্যের অধিক অর্থ বহন করে।

নন্দনতাত্ত্বিক আদর্শের নিদর্শন হিসাবে উপন্যাস বিশেষ আগ্রহান্বিত মনোযোগের দাবী রাখে এবং সৃষ্টিকর্মের নিদর্শন হিসাবে সমগ্র কল্পনা প্রক্রিয়ার প্রকৃতির উপরে বিশেষভাবে আলোকপাত করে। প্রাথমিক বিষয়-জ্ঞান থেকে আরম্ভ করে সকল অভিজ্ঞতাই হ'ল কল্পনাশ্রয়ী উপন্যাসমাত্র। আমরা বস্তুকে দেখি না, আপনার প্রকৃতি এবং স্বভাবের নিরন্তর উদ্দীপন থেকে আমরা বস্তুর রূপটুকুকে গড়ে নিই। রূপকঅর্থে বলছি না, যথার্থই টেবিল, চেয়ার, গাছপালা, বাড়িঘর, শাকসব্‌জি, রাজরাজড়া এরা সবাই আমাদের কল্পনাজাত। সংবেদন প্রবাহ থেকে আমরা যে ইন্দ্রিয়োপাত্ত পাই তা নিয়ে আমাদের চারপাশের স্থায়ী বস্তুজগৎটার নির্মাণ সম্ভব হয়। জগৎ সম্বন্ধে আমাদের যে ধারণা বিদ্যমান তা স্থপতির কল্পনার সঙ্গে তুলনীয়। অন্যলোক সম্বন্ধে আমরা যে ধারণা করি, আমাদের নিকটতম বান্ধব অথবা পরিচিত ব্যক্তিরও আমরা যে রূপ কল্পনা করি, তাদের সঙ্গে নিত্য আলাপ-আলোচনা ভাব আদান-প্রদানের মাধ্যমে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ইন্দ্রিয়োপাত্তকে সমন্বিত করে যে কল্পিত জগৎটুকু সৃষ্টি করি তা হ'ল আমাদের কল্পনার স্থাপত্য শক্তির নিদর্শন। আমাদের সমস্ত জ্ঞানইহল কল্পিত ছবি; একে অলিখিত কল্পনাও বলা চলে।

ঔপন্যাসিক ইচ্ছা করেই খুঁটিনাটি তথ্যাবলীকে পশ্চাদপটে স্থান দেন, ঘটনাবলীর মধ্যে পারম্পর্য প্রতিষ্ঠা করেন এবং কর্মপ্রেরণা, আবেগ ও অভিমতকে চরিত্রসত্তা দান করেন। ভগবানের চেয়েও অপেক্ষাকৃত অধিক নিশ্চিত ভিত্তির উপর উপন্যাসকার আপন উপন্যাসের জগৎটুকু সৃষ্টি করেন। আমাদের অর্ধপরিচিত প্রতিবেশীর চেয়েও স্পষ্টতর ও অবিসংবাদিত সত্তা নিয়ে আমাদের সামনে আবির্ভূত হয়েছেন টম জোনস্, ডেভিড কপারফিল্ড অথবা আনা কারেনিনা। এই সব চরিত্র যে শুধু বেঁচে আছে তাই নয়, এঁরা এঁদের নিজের জগতে বেঁচে আছেন। যুদ্ধ এবং বিপ্লবের পরিবর্তন সম্ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে আনা কারেনিনা যে সমাজে তাঁর অপরূপ ঐশ্বর্যবান অথচ তাৎপর্যহীন জীবন যাপন করেছিলেন তা অন্তর্হিত হয়েছে। কিন্তু এই জীবনের পদ্ধতি, আনুষঙ্গিক গ্রাম্য জীবনযাত্রা, এর শুভাশুভের ধারণা চিরকালের জন্য অমর হয়ে আছে। টলষ্টয় একটি নতুন সভ্য সমাজের সৃষ্টি করেছিলেন, তিনি কোন সমাজ ব্যবস্থার কথাচিত্র অঙ্কন করেন নি। কাল্পনিক উপন্যাসের মহত্তম আবেদন হল এই যে আমরা উপন্যাসবর্ণিত পাত্র-পাত্রীর ঐশ্বর্যের অংশভাগী হতে পারি অনায়াসে শুধুমাত্র কল্পনাকে আশ্রয় ক'রে। আমরা তাদের জয়লাভে বা বিপর্যয়ে সমান ভাবে অংশগ্রহণ করি একেবারে সত্যিকারের কোন মূল্য না দিয়ে। আমরা যে দেশে কোনদিনও যাইনি সেই দেশে এদের সঙ্গে বিচরণ করি; এদের সঙ্গে যে ভালবাসার আস্বাদন করি তা পূর্বে কোনদিনও আস্বাদন করার সৌভাগ্য আমাদের হয় নি। আমাদের পরিচিত জীবনাপেক্ষা বিস্তৃততর, বিচিত্রতর এই জীবনে অনুপ্রবেশ লাভ করে আমরা আমাদের পরিচিত জগতের জীবনধারাকে আরও সুন্দরভাবে, আরও গভীরভাবে উপলব্ধি করি এবং আরও ভালভাবে শিখি। ঔপন্যাসিকেরা জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে আমাদের যে কতখানি শিক্ষা দেন, তার সঠিক পরিমাণ নির্ণয় করা কঠিন; এঁদের কাছ থেকে আমরা আমাদের প্রতিবেশীদের সম্বন্ধে তাঁদের জীবনযাত্রার উপর তাঁদের বিষাদবিধুর চিন্তা-ভাবনার প্রভাব সম্বন্ধে অনেক জ্ঞান লাভ করি। এক অর্থে উপন্যাসকার হলেন আপনার যথার্থ দর্শনবেত্তা। অনেক পাত্র-পাত্রী নিয়ে যদি একটা গল্প লিখতে হয় তাহলে অদৃষ্ট সম্বন্ধে এবং প্রকৃতি-দর্শন সম্বন্ধে একটি ধারণা থাকা দরকার। ঔপন্যাসিকদের মধ্যে যাঁর সবচেয়ে কম দার্শনিক চেতনা আছে বলে মনে হয়, তাঁর উপন্যাসের ঘটনা-পারম্পর্যের পরিকল্পনায় পরিবেশ সৃষ্টিতে তিনি তাঁর আপন জগৎ সম্বন্ধে ধারণাটুকুকে রূপ দেন; যখন আমাদের সমকালীন

উপন্যাসকার হার্ডি, আনাতোল ফ্রাঁস অথবা টমাসম্যানকে আমরা দার্শনিক বলি, তাঁরা নিশ্চয়ই তাঁদের সমকালীন দর্শনশাস্ত্রীদের চেয়ে অনেক সমৃদ্ধতর অর্থে দার্শনিক। তাঁরা তাঁদের চিত্রিত-চরিত্রের মধ্য দিয়ে আপন আপন ব্যক্তি-সত্তার মধ্য দিয়ে অস্তিত্বের সম্যক মূল্যায়নটুকু করে দেন। তাঁরা তাঁদের জীবন মূল্যায়নটুকুর যাথার্থ্য সমগ্র মানব সমাজের অস্তিত্বের পঠভূমিকায় নির্ণীত করেন। তাঁরা শুধুমাত্র মূল্যায়নই করেন না, তাঁরা নতুন এক জগতের সৃষ্টি করেন। সমসাময়িক দর্শনচিন্তায় আমরা এমন একটি জগতের আবিষ্কার করতে নিশ্চয়ই পারব না, যে জগৎ উপন্যাসকারের সৃষ্ট জগৎ থেকে পূর্ণতর এবং ব্যাপকতর। কারণ উপন্যাসিকের মন অনন্তে সংলগ্ন এবং তাঁর দৃষ্টি ও কল্পনা কালের বিস্তারের গভীরে প্রবেশ করেছে।

সাহিত্যের বুৎপত্তিগত অর্থ করতে গিয়ে সমালোচক বললেন যে, সাহিত্যের ভেলাতে সাহিত্যিক এবং সাহিত্যরসিক একই সঙ্গে পাড়ি জমায়। সহিতত্ব হল সাহিত্যের মূলে। আমাদের নিবন্ধের ক্ষুদ্র পরিসরে এই সহিতত্ব কথাটির অর্থ মনস্তাত্ত্বিক এবং পরাতাত্ত্বিক ব্যাখ্যার পটভূমিতে আলোচনা করা হবে।

শিল্পী অর্থাৎ সাহিত্যিক সৃষ্টির কোনও এক দেব দুর্লভ মুহূর্তে অনুভূতির তথা আবেগের চিত্রটিকে ভাষার আরশিতে ধরে দিয়ে সহৃদয় সামাজিকের কাছে তা উপস্থিত করতে চান ; লেখা ছাপা হয় ; 'গৌড়জন যাহে আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি'। উদাহরণ দিই, ক্লাসিক উদাহরণ।

মৈথুনক্রিয়ারত ক্রৌঞ্চমিথুনের একটিকে ব্যাধ হনন করল। দস্যু রত্নাকর আবেগউচ্চকিত এক নিবিড় মুহূর্তে সেই বিয়োগান্ত নাটক দর্শন করলেন। তাঁর মনে যে কারুণ্যরস সঞ্চারিত হল তিনি তাকে সঞ্চারিত করে দিলেন সহৃদয় সামাজিকের মনে, এমন কথা বলা হয়। কি করে করলেন ? কেমন করে করলেন ? কবির মনের ভাব কেমন করে রসিকের মনে সঞ্চারিত হয় তার পর্যালোচনার অবকাশ আছে। সমালোচক এই তত্ত্বটিকে সত্যের মর্যাদা দিয়ে বসেন কোনও রকম বিচার বিশ্লেষণ না করেই। তাঁরা ধরে নেন যে পাঠক ত' সহজেই কবির কথা বুঝতে পারবেন। আমাদের প্রশ্ন হল : সত্যি সত্যিই পাঠক অনায়াসে কবি বা সাহিত্যিকের মনের অন্দরে প্রবেশ ক'রে তার আবেগ এবং অনুভূতির জগৎ সম্বন্ধে আপনার মনে সাক্ষাৎ প্রতীতি জন্মাতে পারে কি ?

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের 'মালিনী' নাটক থেকে 'মালিনীর' কয়েকটি কথা তুলে দিই :

> "রাজকন্যা আমি, দেখি নাই
> বাহির-সংসার—বসে আছি এক ঠাই
> জন্মাবধি চতুর্দিকে সুখের প্রাচীর
> আমারে কে করে দেয় ঘরের বাহির
> কে জানে গো। বন্ধ কেটে দাও মহারাজ !
> ওগো ছেড়ে দে মা—কন্যা আমি নহি আজ,
> নহি রাজসুতা—যে মোর অন্তরবাসী
> অগ্নিময়ী মহারাণী, সেই শুধু আমি।"

কবি এখন মালিনীতে রূপান্তরিতা ; মালিনীর ভূমিকায় মহাকবি যে অনুভূতির কথা বললেন সে কথা আমাদের কাছে দুর্বোধ্য। শুধু আমরা কেন মালিনীর মাতা রাজমহিষীর কাছেও এই আবেগ ও অনুভূতির স্বগতোক্তি একেবারেই হেঁয়ালিপূর্ণ। মালিনীর মাতা রাজমহিষী, তাঁর গর্ভে মালিনীর জন্ম। তিনিও তাঁর বালিকা কন্যার এই অন্তহীন অনুভূতিলোকের কোনও সন্ধানই রাখেন না ; হয়তো এই অনুভূতিলোকের দুর্বোধ্যতার ইঙ্গিত কবিগুরু দিতে চাইলেন তাঁর পাঠককে, তাই তিনি রাজমহিষীর মুখ দিয়ে বলালেন :

মহিষী॥ "শুনিলে তো মহারাজ ? একথা কাহার ?
শুনিয়া বুঝিতে নারি। এ কি বালিকার !
এই কি তোমার কন্যা ! আমি কি আপনি
ইহারে ধরেছি গর্ভে।"

রাজমহিষীর 'শুনিয়া বুঝিতে নারি' স্বীকৃতি সমস্ত পাঠকের। আধুনিক সেমাণ্টিক্‌সে এই শব্দের অর্থের অনির্দিষ্ট তত্ত্বটিকে প্রায় স্বীকৃত সত্যের মর্যাদায় এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। কবি যে অর্থে কথা বলেন সাহিত্যিক যে অর্থে শব্দ ব্যবহার করেন সে অর্থটুকু দুরধিগম্য।

আমরা যখন আমাদের সাধারণ ব্যথাবেদনার কথা বলি সেই ব্যথা বা বেদনার কথা, আমাদের যে সাধারণ সুখ বা আনন্দের কথা বলি সেই সুখ বা আনন্দের কথা, তা কি একান্ত প্রিয়জনেরাও বুঝতে পারেন ? সাহিত্যিকের উত্তুঙ্গ অনুভূতির কথা পাঠকের বোধগম্যতার বাইরে থাকে বলেই আমাদের বিশ্বাস। আরও উদাহরণ দিই (এই উদাহরণটি দিয়েছেন স্বয়ং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ। শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রাকালে কণ্বমুনির সেই উক্তি স্মরণ করুন। তিনি তপোবন তরুদের ডাক দিয়ে বললেন—

'ওগো সন্নিহিত তপোবন তরুগণ,
তোমাদের জল না করি দান
যে আগে জল না করিত পান,
সাধ ছিল যার সাজিতে তবু
স্নেহে পাতাটি না ছিঁড়িত কভু,
তোমাদের ফুল ফুটিত যবে
যে জন মাতিত মহোৎসবে,

পতিগৃহে সেই বালিকা যায়,
তোমরা সকলে দেহো বিদায় !'

জানি না তপোবনতরুউদ্দিষ্ট ঋষি কণ্ঠের বাণী এ যুগের কোনও পাঠকের বোধগম্য হবে কি না ? এ যুগের নগরবাসী মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির কথকথিত একাত্মতাটুকু অনুধাবন করতে পারবেন না বলেই মনে হয়; আর তা না পারলে শকুন্তলা কাব্যের আবেদন বহুলাংশেই এ যুগের পাঠকের কাছে ব্যর্থ হয়ে যাবে। কালিদাসের সমকালীন পাঠকেরাও কবিকথিত কথের সূক্ষ্ম বেদনাটুকুকে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন কিনা সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে। শকুন্তলা নাটকের পঞ্চম অঙ্কে শকুন্তলার প্রত্যাখ্যান দৃশ্যে আসুন ; সে অঙ্কের আরম্ভেই কবি রাজার প্রণয়রঙ্গভূমির যবনিকা ক্ষণকালের জন্য সরিয়ে দেখিয়েছেন।

রাজপ্রেয়সী হংসপদীকা নেপথ্যে সংগীতশালায় আপন মনে বসে গান করছেন :

'নবমধুলোভী ওগো মধুকর
চূতমঞ্জরী চুমি,
কমলনিবাসে যে প্রীতি পেয়েছো
কেমনে ভুলিলে তুমি।'

এই গানের অন্তরস্থিত ভাবটি হল এই দৃশ্যটির মর্মকথা। এই প্রত্যাখ্যানের বেদনা অধিকাংশ পাঠকপাঠিকার কাছেই অবোধ্য। অকৃতজ্ঞ, কৃতঘ্ন বললেও ভুল হয় না। রাজা দুষ্মন্তের অপরাধ এই যুগের পাঠকপাঠিকার কাছে ক্ষমার অযোগ্য নয়। প্রেমে প্রত্যাখ্যাত হলেই তা এ যুগে হৃদয়বিদারক বলে গণ্য হয় না ; এ যুগের মেয়েরা বা ছেলেরা প্রেমে প্রত্যাখ্যাত হলে দ্বিতীয়বার কেন বহুবারই প্রেমের রাজপথে বা চোরাগলিতে অনুপ্রবেশ করে থাকে। সেই প্রত্যাখ্যানকে সেই বিয়োগান্ত পরিস্থিতিকে Absolute বা স্বয়ম্ভর করে তুলে জীবনকে মরুভূমি করার কথা তারা ভাবতেই পারে না। অতএব কাব্যে যখন অনুভূতির, আবেগের কথা বলা হয় আর সে কথা না বললে কাব্য কাব্য হয়েই ওঠে না তখন আমরা বলব যে কবির অনুভূতির অনুকরণ পাঠকের পক্ষে দুঃসাধ্য। এক যুগের পরিবেশ অন্তযুগে অলভ্য ; একই কালে একই পরিবেশে বাস করে আবার দু'টি মানুষের মনোগত পরিবেশ বিভিন্ন হয়, এই সত্যটি এখন সর্বজনস্বীকৃত। মহাকবি কালিদাসও এই সত্যটিকে স্বীকার করেছেন ;

'ভিন্ন রুচির্হিলোকাঃ', ভিন্ন লোকের ভিন্ন রুচি। তাই আমরা কেউই এক জিনিষ দেখি না, এক জিনিষ বুঝি না, এক জিনিষ জানি না। অর্থাৎ অতি পরিচিত দেখার বস্তুটিকে আমরা সকলেই ভিন্ন ভাবে দেখি। আবার উদাহরণ দিই—আপনি আমি শিমূল সজনে গাছকে দেখেছি চর্মচক্ষে, শিমূল গাছে তুলো হয়, সজনে গাছ থেকে ডাঁটা পাই, বড়জোর সজনে গাছ শুঁয়োপোকার উপদ্রবের কথা মনে পড়িয়ে দেয়। আরও অনেক জ্ঞানবান গুণবান পাঠক আছেন, শিমূল সজনে হয়তো তাঁদের আরও কিছু স্মৃতিচারণে সাহায্য করতে পারে। কিন্তু যে শিমূল সজনে কবি রবীন্দ্রনাথকে ঋণে আবদ্ধ করে, কোন এক অনাদিকালের মায়ায় কবি মনকে আচ্ছন্ন করে সে শিমূল সজনের কথা আমরা জানি না। গাছের এই অলোক সামান্য শক্তি, এই অমৃতময় রূপ দেখেছেন রবীন্দ্রনাথ ; হয়তো বৃক্ষের আরও মহত্তর রূপ দেখেছিলেন বৈদিক ঋষিরা। সেই দেখা হল 'দর্শন করা', সীমার মধ্যে অসীমকে প্রত্যক্ষ করা। রবীন্দ্রনাথ গাছ দেখতে গিয়ে সেই দেখার কথা তাঁর একটা প্রবন্ধে বললেন : "এই গাছের রূপটি যে তাঁর আনন্দ রূপ, যে দেখা এখনও আমাদের দেখা হয় নি মানুষের মুখে সে তার অমৃতরূপ, দেখার এখনো অনেক বাকি—"আনন্দরূপ-মমৃতং" এই কথাটি যেদিন আমার এই দুই চক্ষু বলবে সেই দিনই তারা সার্থক হবে। সেই দিনই তাঁর সেই পরম সুন্দর প্রসন্ন মুখ, তাঁর 'দক্ষিনং মুখং', একেবারে আকাশে তাকিয়ে দেখতে পাব। তখনই সর্বত্র নমস্কারে আমাদের মাথা নত হয়ে পড়বে—তখন ওষধি বনস্পতির কাছেও আমাদের স্পর্ধা থাকবে না—তখন আমরা সত্য করেই বলতে পারব : 'যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ, যো ওষধিষু, যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ।'

অতএব চর্মচক্ষে দেখাটা দেখা নয়। মন দেখে, মন শোনে, সেই মনই হল রূপকার ; সেই মনই বক্তা আবার সেই মনই শ্রোতা ; সে মন রং লাগায়। সেই মনই আবার রং অবলোকন করে। অতএব একের দেখা একের শোনা চিরকালই অপরের কাছে অদৃশ্য এবং অশ্রুত থেকে যায়। এ কথা কাব্য কথা নয়, এ সত্য মনস্তত্ত্বসম্মত। সাহিত্যের যথাযথ সমালোচনা তখনই সম্ভব হবে যখন আমরা সাহিত্যিকের কল্পনা থেকে পাঠকের কল্পনায় সঞ্চালন (Communication)-কে সম্ভব বলে মনে করব। অর্থাৎ যখন সাহিত্যিকের দেখা সাহিত্যিকের শোনা পাঠকের 'দর্শনে' এবং 'শ্রবণে' রূপান্তরিত করতে পারব তখনই সাহিত্য সমালোচনার সামগ্রী হয়ে উঠবে। কবি ওয়ার্ডস্বার্থ Emotions

recollected in tranquility-র কথা বলেন, সেই আবেগ অনুভূতির নিবিড়তা যদি চিরকালের জন্য অন্যজনার জানার বাইরে থেকে যায় তা হলে কেমন করে কাব্যের এবং সাহিত্যের সমালোচনা সম্ভব হবে তা আমাদের বুদ্ধির অগম্য।

সমালোচনার অর্থই তো হল, সমালোচক বিচার করবেন, কবি তাঁর অনুভূতির কথা, তাঁর ভাবাবেগের কথা, তাঁর হৃদয় উদ্বেলতার কথা যথাযথ ভাবে পাঠককে জানাতে পেরেছেন কি না। এ কথা আমাদের মনে রাখতে হবে এই অনুভূতি বা আবেগের উদ্দীপন কবির জীবনদর্শন, কবির জীবনাদর্শ, কবির জীবনবাদ এ সবের দ্বারা অতি নির্দিষ্ট। অতএব কবির আবেগ অনুভূতির যথার্থ অনুধাবন করতে পারলেই আমরা মনে করি কবির আবেগ, মানসসত্তা তথা জীবনসত্তাকে অবলোকন করা হ'ল। কবির অনুভূতিলোক সাহিত্যিকের অনুভবের জগৎ চিরকালের জন্য পাঠকের নাগালের বাইরে থেকে যায় বলেই পাঠকের পক্ষে তার নিজের মনোমত একটি রসের জগৎ সৃষ্টি করে তাতে অবগাহন করা সম্ভব হলেও পাঠক কখনই সাহিত্যিকের সৃষ্ট জগতে প্রবেশ করতে পারেন না ; সে অনুপ্রবেশটুকু না ঘটলে সাহিত্যসমালোচনাও সম্ভব নয়। তাই আমাদের মতে কাব্য রসের অনুভব, সাহিত্যরসের আস্বাদন করা সম্ভব হলেও সাহিত্য বা সাহিত্যিকের সমালোচনা করা সম্ভব নয়। অতএব বলা চলে 'সাহিত্য সমালোচনা' কথাটি সোনার পাথর বাটি, যার মধ্যে চিন্তাগত স্ববিরোধিতা নিত্য সুপ্রতিষ্ঠিত।

সাহিত্য যদি জীবনের প্রতিচ্ছবি মাত্র হয় তবে সে ক্ষেত্রে কল্পনা অবান্তর ও গ্রহবাহ্য হয়ে পড়ে। "যদ্দিষ্টং তল্লিখিতং" তত্ত্বটি যদি পণ্ডিত সমাজে গ্রাহ্য হ'ত তাহলে শিল্প সাহিত্যের ক্ষেত্রে কল্পনার উপযোগিতা এবং মূল্যটুকু ন্যূনতম হয়ে থাকত ; কিন্তু সুখের বিষয় শিল্প ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে সেটি ঘটে নি। শিল্প ও সাহিত্য কল্পনাকে আশ্রয় করেই উজ্জীবিত হয়ে উঠেছে। কল্পনায় আমরা ঘোড়ার পিঠে পাখা জুড়ে দিয়ে পক্ষীরাজের সৃষ্টি করেছি। সে পক্ষীরাজ হ'ল এমন এক কল্পনার দান যার মূল শিকড় প্রোথিত রয়েছে জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্যে। এই কল্পনা বাস্তব অতিক্রান্ত নয় ; অভিজ্ঞতা নির্ভর এই কল্পনা পরিচিত জগৎটাকে অতিক্রম করলেও অভিজ্ঞতার বাইরে সে পুরোপুরি যেতে পারে নি। কোন কল্পনা পুরোপুরি অভিজ্ঞতার বাইরে যেতে পারে কিনা সন্দেহ। কোথাও না কোথাও অভিজ্ঞতার বন্ধন, অভিজ্ঞতার নিষেধ স্থূল ভাবে না হলেও সূক্ষ্মভাবে থেকে যায় কল্পলোকের মধ্যে যাকে আমরা উদ্দাম কবি কল্পনা বলি, মনস্তত্ত্বে যাকে Unbridled imagination বলা হয়েছে। সেই অবাধ কল্পনার উদাত্ত সঞ্চরণ আমরা পেয়েছি রূপকথায়, Fairy Tales এ, Absurd নাটকে, আধুনিক গল্পে এবং কবিতায়। যে সামাজিক বিধিনিষেধের দূরতম ছায়ানির্দেশ আমাদের কল্পনাকে এতদিন শিল্পসাহিত্যের ক্ষেত্রেও আংশিক রুদ্ধ করে রেখেছিল আধুনিক শিল্প ও সাহিত্যে তাকেও পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাবার লক্ষণ দেখতে পাই। আরিস্ততল কথিত Beginning, Middle and End theory আংশিক বিবর্জন সাহিত্য এবং শিল্পের কোন কোন মহলে আমরা লক্ষ্য করেছি। নাটক এবং কাব্য লিখতে হলে যে কবি-কল্পনার পূর্বাপর্য থাকতেই হবে এমন কথাটি, এমন তত্ত্বটি সমালোচক গ্রহণীয় বলে মনে করছে না। অতএব যে কবি কল্পনা একদিন উদ্দাম উৎসাহে বলাকায় পাথরের পাহাড়কে পাথুরে মেঘ করে দিতে চেয়েছিল সেই কবি কল্পনা আজ সর্বগ্রাসী হয়ে বিশ্ব সংসারটাকে সচল করে তুলেছে।

এখন প্রশ্ন হবে কল্পনার কাজটা কি হবে শিল্প ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে ? আমরা শিল্প প্রতিভাকে বলেছি এটা হ'ল সেই শক্তি যা অপূর্ব বস্তু নির্মাণকে সম্ভব করে। কবি কল্পনায় বলি 'The light that never was on sea or land'. অর্থাৎ ইতিপূর্বে পৃথিবীর বুকে যে আলো কখনও জ্বলেনি সেই

আলোর প্রজ্বলন এবং উদ্দীপন এ দু'টি শিল্পী এবং কবিকল্পনার কাজ। যা আছে তার সম্বন্ধে বিবৃতি দেওয়া তার বর্ণনা করা কবি-কল্পনার কাজ নয়। কবি-কল্পনা সৃষ্টি করে ; যেমন ক'রে বিশ্ববিধাতা সংসার সৃষ্টি করেছেন তেমনি করে কবি-কল্পনা সাহিত্য এবং শিল্পকে সৃষ্টি করে। সৃষ্টির অর্থ হ'ল সম্যক রূপে সৃষ্টি করা ; সম-সৃ-ঘঞ—ধাতুর এই সম্যক্ সৃষ্টি হ'ল কবি কল্পনার কাজ। শিল্প ও সাহিত্য হ'ল নতুনকে সৃষ্টি করা, নতুনের সম্ভাবনাকে উজ্জ্বল ক'রে তোলা। এ হ'ল কল্পনার কাজ। কল্পনা যা সৃষ্টি করবে তা হবে অপূর্ব অর্থাৎ পূর্বে এ কাজ কখনও সংগঠিত হয় নি। অতএব বলা চলে কল্পনার নব নব উন্মেষশালিনী প্রতিভার সহচরী যে শক্তি সাহিত্য এবং শিল্পের ক্ষেত্রে নতুন নতুন বিষয়ের উন্মেষ ও অবতারণা করে সেই শক্তি হ'ল সাহিত্য প্রতিভা।

কল্পনার স্বরূপ লক্ষণ হ'ল যে সে নব নব সৃষ্টির জননী হয়েও অন্য-লোককে, রসিক পাঠককে, সহৃদয় সামাজিককে আপনার সঙ্গে টেনে নেয়। সাহিত্যের বুৎপত্তিগত যে অর্থ সেই অর্থের সঙ্গে কল্পনার প্রকৃতির যোগ ওতঃ-প্রোত ভাবে জড়িত। যা কিছু কল্পিত হয়েছে, যা কিছু সুন্দরের দাবী রাখে তার রসাস্বাদন করবে গৌড়জন, গুণীজন, সহৃদয় হৃদয়-সংবাদী, দেশকাল অতিরিক্ত রসিকের দল। কল্পনায় আকাশে ফুল ফোটে, কল্পনায় অতিপরিচিত অবক্ষয়ী মানুষও অপরিচয়ের দুরত্বে দাঁড়িয়ে বিরাট পুরুষরূপে চিহ্নিত হয়ে থাকে। যে মানুষ অতি সাধারণ সুখ দুঃখে গড়া যাদের জীবন, সে মানুষ শুধু দিনযাপনের, শুধু প্রাণধারণের গ্লানি নিয়ে বাঁচার যন্ত্রণায় অর্ধমৃত হয়ে আছে সেই মানুষকে দেখি কবি কল্পনায় ভাস্বর হয়ে চিরায়ত রূপ পরিগ্রহ করতে, কবি-কল্পনায় সেই মানুষকে দেখি দেবতার শূণ্যস্থান পূরণ করতে ; দেখি সেই মানুষকে এযুগের খণ্ডকাব্যের অধিনায়ক রূপে সতীর্থ মানুষের প্রণাম গ্রহণ করতে :

"নমি তোমা নরদেব
কি গর্বে গৌরবে দাঁড়ায়েছ তুমি,
সর্বাঙ্গে প্রভাত রশ্মি
শিরে চূর্ণ মেঘ
পদে শষ্প ভূমি।"

যে কবি কল্পনায় একদিন পর্বত বৈশাখের মেঘরূপে প্রতিভাত হয়েছিল

সেই কবি-কল্পনাই মানুষের দেবায়ত চিরায়াত মূর্তির প্রতিষ্ঠা করল। এ হ'ল কবির কল্পনা, এ হ'ল সৃষ্টির সর্বোত্তম জগৎ।

এই কল্পনার জগৎ অর্থাৎ শিল্পলোক এবং বাস্তব জীবনের সঙ্গে কোথাও একটা যোগ রয়ে গেছে। কবি কল্পনায় যে পক্ষীরাজ আকাশে ওড়ে তার বস্তুরূপ রয়ে গেল আকাশে ওড়া পাখীতে এবং দিগন্ত সন্ধানী ঘোটকের বিদ্যুৎ গতিতে। সাহিত্যের সঙ্গে জীবনের যোগটুকু তাই কখনই বোদ্ধা সমালোচকের দৃষ্টিতে অধরা থাকে নি। সাহিত্য জীবনের সঙ্গে জীবনের যোগ ঘটিয়ে দেয় আর এই যোগটুকু না ঘটাতে পারলে সাহিত্য সৎ-সাহিত্য রূপে, শিল্প সত্যিকারের শিল্পরূপে কখনই গৃহীত হয় না। জীবন এবং শিল্পের পারস্পরিক সম্বন্ধটুকু আবিষ্কার করতে গিয়ে এদিকে ভারতীয় সংস্কৃতি ঋদ্ধিবান।

ভারতীয় সংস্কৃতির ঋদ্ধিবান পুরুষ ভোজদেব জীবন ও শিল্পকে সমার্থক বলে ঘোষণা করেছিলেন। তাঁর মতে উভয়েই সৃষ্টি, উভয়েই নিয়তিকৃত নিয়মরহিত। প্রকৃতির নিয়মে ফুল ফোটে, ফল ফলে। কিন্তু মনুষ্য জীবন প্রকৃতির বিধি অতিক্রান্ত। আধুনিক মনস্তত্ত্বে যে অভ্যাস (Habit) এবং সহজাত বৃত্তি (Instinct) এতদুভয়ের পারস্পরিক সম্বন্ধের আলোচনা চলেছে, তাতে ক'রে এই সত্যটিকে সহজেই গ্রহণ করা যায় যে মনুষ্য জীবন প্রকৃতির বিধি-বিধান অতিক্রান্ত। মানুষের জীবন যদি অভ্যাস-নিয়ন্ত্রিত হয় তবে তা প্রাকৃত বা প্রকৃতি নির্দিষ্ট জীবন ধারণা থেকে বিচ্যুত। আবার মনুষ্যজীবনকে যদি সহজাত প্রবৃত্তি বা Instinctএর অধীন বলে গণ্য করা হয় তবে তা হল আমাদের পূর্বাপূর্ব পুরুষদের পুরুষানুক্রমে প্রদত্ত অভ্যাসাবলীর দ্বারা অতি নির্দিষ্ট। উভয় ক্ষেত্রেই এ সত্য অনস্বীকার্য হয়ে পড়ে যে মানুষের জীবন প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণাধীন নয়। জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত আমরা আমাদের সৃষ্টি সুখের উল্লাসে রচনা করি। কেমন করে বসব, কেমন ক'রে কী পোষাক কখন পরব, কোন ধাঁচে বা অঙ্গ সজ্জা হবে এ সবই আমার সৃষ্ট। এই সৃষ্টির মূলে আছে কল্পনা। কল্পনা নতুন নতুন গেষ্টল্‌টের সৃষ্টি করে। সেই গেষ্টল্‌টের মধ্যে আমি, আপনি, অন্তর, জগৎ, বহির্জগৎ সবই বিধৃত। কবি-প্রিয়া যখন কবিকে বলেন :

> 'আমায় তুমি আপনি র'চে আপন কর।'

তখন কবি যেমন তাঁর প্রিয়তমের কুসুমপেলব ভাবমূর্তিটি রূপে রসে সমৃদ্ধ করে রচনা করেন, ঠিক তেমনি করেই তিনি আবার বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করেন। তাই কবি বলেন :

'আমি চোখ মেললুম আকাশে,
জ্বলে উঠল আলো পূবে পশ্চিমে ;
গোলাপের দিকে চেয়ে বললুম 'সুন্দর'
সুন্দর হ'ল সে।'

তা হ'লে প্রাকৃত জগৎ ত কবিই সৃষ্টি করলেন ; আপনি, আমি আমরা সবাই সেই কবিকৃতিটুকুর দাবী করতে পারি। আমরা সবাই প্রত্যূষে চোখ মেললেই আমাদের প্রত্যেকের চোখে এক একটি জগতের আলোর শতদল প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে। আমার জগতের সঙ্গে আপনার জগতের দুস্তর ব্যবধান। আপনার জগতের রূপ, রস. রং আমার জগৎ থেকে একেবারে স্বতন্ত্র। কারণ আপনার কল্পনার সঙ্গে আমার কল্পনার ব্যবধানটুকু যোজন বিস্তারি। আপনার কল্পনায় যে আলো লাল, সেই আলোই সবুজ হ'য়ে আমরা কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করে। আমার কল্পনা আমাকে চলার মন্ত্রে মাতাল করে তোলে। কবির কল্পনা প্রত্যক্ষ করল :

'পর্বত চাহিল হতে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ,
তরুশ্রেণী চাহে পাখা মেলি
মাটির বন্ধন ফেলি
ঐ শব্দ রেখা ধরে চকিতে হইতে দিশাহারা
আকাশের খুঁজিতে কিনারা।'

কবি-কল্পনায় সবুজ আলোর নিশানা, চলার ইঙ্গিত এই আলোয় : চরৈবেতি। আবার আপনার কল্পনায় এই আলো লাল হয়ে যখন দেখা দেয় তখন চলা, গতির ধারা স্তিমিত, স্তব্ধ হয়ে পড়ে।

'রক্ত আলোর মদে মাতাল ভোরে,
আজকে যে যা বলে বলুক তোরে।'

অনেকের ভোরই কবির মত রক্ত আলোর মদে মাতাল ; এ রক্ত-আভা 'লাল' নয়। 'লাল' হ'ল থেমে যাওয়ার নিশানা। আমরা সবাই থেমে থাকি ; চলার পথে লাল দেখে থেমে থাকতেই-অভ্যস্ত আমরা, কি জানি কি ক্ষতি হয়! পরিবর্তন কে বড় ভয় পাই আমরা। মার্কিন নব্যদার্শনিক এরিক হফার তাঁর 'Ordeal of change' গ্রন্থে এই থেমে থাকার প্রবণতার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বললেন যে চলা মানেই পরিবর্তনের নবীনতাকে বরণ করা। আমরা এই নতুন জীবনায়নকে বড় ভয় পাই ; তাই পুরাতনকে আঁকড়ে

থাকতে চাই। কিন্তু দার্শনিক হফার এই প্রসঙ্গে একটু ভ্রান্তিতে পড়ে গেলেন; Empirical Evidence হফার সাহেবের তত্ত্ব-দর্শনের পরিপন্থী। যদি আমরা পরিবর্তনকে এতোই ভয় করব, তা হ'লে পৃথিবী জুড়ে এতো নতুনের আমদানি হচ্ছে কী করে? পোশাকে-আশাকে, চলনে-বলনে, চিন্তায় ও কর্মে পরিবর্তনের বন্যা বয়ে চলেছে; কল্পনার কাজ চলেছে সবার অলক্ষ্যে। দেশের আখের-টিকলি শহরের 'গোলাবী গাওয়ারি'তে পরিণত হচ্ছে। পরিবর্তন সম্বন্ধে আমাদের শঙ্কা আছে মানি। কিন্তু এই শঙ্কাটাই শেষ কথা নয়। তাকে উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য আমাদের যে জীবন সাধনা, তা কল্পনার প্রসাদপুষ্ট। কল্পনা বিভ্রান্তিকর জীবন পরিবেশে সমাধানের পথ দেখায়। আমরা নতুন আশায় বুক বেঁধে নতুন করে জীবনকে সৃষ্টি করার কাজে লেগে পড়ি। যুদ্ধ বিধ্বস্ত লক্ষ লক্ষ জার্মান নাগরিকের কল্পনায় নতুন জার্মানী প্রথম গড়ে উঠে ছিল বলেই ক্রমে তাদের সর্বগ্রাসী শ্রম-অনুদানে সবার চোখে পরিদৃশ্যমান সুন্দর জার্মানী একটু একটু করে গড়ে উঠল। এ ব্যাপারে আমরা সবাই আর্কিমিডিস। প্রতিনিয়ত জীবনের বাধাকে জয় করে লাল আলোকে সবুজ আলোর নিশানায় রূপান্তরিত করার জন্য আমরা নিরন্তর চিন্তা করছি, কল্পনার আশ্রয় নিয়ে দৃশ্যমান পরিবেশটার ভাঙা গড়া করছি। যেই মনোমত সমাধান খুঁজে পাচ্ছি অমনি 'ইউরেকা' বলে আমার সমগ্র সত্তা উল্লসিত হয়ে উঠছে। আমি নতুন করে জীবনকে এবং আমার জগৎকে ঢেলে সাজাচ্ছি। এমনি করেই আমাদের প্রত্যেকের আলাদা আলাদা জগৎ সৃষ্টি হচ্ছে। দার্শনিক লাইবনিজের 'মনাড' (Monad) আমরা; আমরা সকলেই অপ্রবেশ্য, কেউ কারো মধ্যে প্রবেশ করতে পারি না; কারো সঙ্গে কেউ ভাবের আদান প্রদান করতে পারি না। আমাদের প্রত্যেক জগতই আমাদের আপন সৃষ্টি। আমাদের জীবন সেই জগতের মধ্যে বিধৃত। তা হলে একথাটা বলা চলে যে জীবন অর্থে জীবনচর্যাকে গ্রহণ করা যায়। সেই জীবনচর্যা কল্পনা অনুসারী। আদর্শ আবার এই-কল্পনাকে তার গঙ্গোত্রী বলে গ্রহণ করেছে। যা নেই তা হল আদর্শ; 'Is' এবং 'Ought'এর বিভেদটুকু মনে রেখে আমরা উপরের ঐ ধরনের উক্তিটি করলেম। যা আছে তা প্রকৃত; তা আদর্শ বলে গণ্য হতে পারে না। আদর্শ বাস্তবায়িত হয়ে প্রাকৃত সত্যে পরিণত হয় না; তা জীবন সত্য হয়ে উঠতে পারে। জীবনসত্য কল্পনা দৃষ্ট; প্রাকৃত সত্য কিন্তু তা নয়। তা কল্পনা নিরপেক্ষ। অথবা অনেকে হয়ত বলবেন যে প্রাকৃত সত্যও কল্পনা-

আশ্রয়ী। Law of gravitation বা মাধ্যাকর্ষণ বিধি প্রথম নিউটনের কল্পনায় সৃষ্টি হয়েছিল ; ঠিক এমনি করে আর্কিমিডিস তত্ত্ব, টলেমির বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব, কোপারনিকাসের তত্ত্ব, আইনষ্টাইনের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব এরা কেউ কেউ প্রাকৃত সত্য বলে স্বীকৃত ; কেউ বা প্রাকৃত সত্য বলে স্বীকৃতি পেয়েও তা হারিয়েছে ; টলেমির সূর্য-গ্রহ-প্রদক্ষিণ তত্ত্বের কথা বলছি। এটি এককালে প্রাকৃত সত্যের মর্যাদা পেয়েছিল ; মানুষের কল্পনায় (কেউ কেউ বলেন যুক্তি বুদ্ধির নিরিখে) এটি স্বীকৃতি পেলেও পরে সেই স্বীকৃতি প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে। এর জন্য মূলতঃ দায়ী কোপারনিকসের কল্পনায় প্রতিভাত আমাদের জ্ঞানের জগৎ, আমাদের আনন্দবেদনার জগৎ, আমাদের রূপ রসের জগৎ। অতএব এই সামগ্রিক জগতকে সৃষ্টি আখ্যা দিলে ভুল হবে না। এ জগৎ অনন্যপরতন্ত্রা।

সাহিত্য কি কল্পনার সৃষ্টি নয় ? কর্ণের চরিত্র—রবীন্দ্রনাথের কর্ণই বলুন, আর মহাভারতের কর্ণই বলুন, এরা ত' কল্পনারই সৃষ্টি। রবীন্দ্রনাথ যখন কল্পনা করেন যে মহাবীর কর্ণ মাতা কুন্তীকে বলছেন :

> 'মাতঃ যে পক্ষের পরাজয়,
> সে পক্ষ ত্যজিতে মোরে
> ক'রো না আহ্বান।'

তখন কর্ণ-চরিত্রের যে মহিমাদ্যুতি আমাদের মুগ্ধ করে তা এসেছে কবি-কল্পনা থেকে। শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রের ঐতিহাসিকতাটুকু সম্বন্ধে অনেক বাদবিসম্বাদ থাকলেও শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র আমাদের কাছে ধ্রুব সত্য। শ্রীকৃষ্ণ ভারতীয় অমর সাহিত্যধারার কেন্দ্রবিন্দু। গীতার শ্রীকৃষ্ণ কবি-কল্পনার অনন্য সৃষ্টি। কবি যা সৃষ্টি করেন তার সত্যতা অনস্বীকার্য :

> 'সেই সত্য যা রচিবে তুমি
> ঘটে যা তা সব সত্য নহে।'

কবির মনোভূমি হ'ল কবি-কল্পনার আশ্রয় স্থল। মহাকবি বাল্মীকিকে দেবর্ষি নারদ বললেন যে কবির মনোভূমি রামের জন্মস্থান অযোধ্যার থেকেও অনেক বেশী সত্য। কবি-কল্পনায় যে সৃষ্টি সম্ভব হয় তার সর্বাঙ্গে অলৌকিক আলো :

'The light that never was on sea or land'. এই অদৃষ্টপূর্ব আলোয় ভাস্বর হল সাহিত্য। শিল্প ও সাহিত্য হ'ল অপূর্ব বস্তু। এর জোড়া পূর্বে ছিল না। এ সৃষ্টি অপরের অনুকরণ নয়। জীবনকে এ সৃষ্টি অনুকরণ

করে না; প্রাকৃত সত্যকে ত' অনুকরণ করার প্রশ্নটাই অবান্তর। তাই ত এযুগের বিমূর্ত শিল্প নন্দনতত্ত্বের জগতে একটা মস্ত বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দিয়েছে। এই অপূর্ব বস্তু নির্মাণ করে কবি-কল্পনা; এই সৃজনশীল কল্পনাকে প্রতিভা বলা হয়েছে। প্রতিভা হ'ল অপূর্ব বস্তু নির্মাণক্ষম প্রজ্ঞা। কল্পনা সব সময়েই নতুনের পূজারী। তার সন্ধান হ'ল নতুনকে সৃষ্টি করার। প্রাচীনকে নির্মাণ করলে তা ত' অনুকৃতি হয়ে পড়বে। অনুকরণ কবি-কল্পনার চোখে অনাস্বাদ্য। অনুকরণে ঊর্ধ্বে ওঠার স্বাধীনতা নেই; স্ববশ্যতাটুকু না থাকলে কোন কল্পনাই সৃষ্টিধর্মী হয়ে উঠতে পারে না। তা শিল্প ও সাহিত্য সৃষ্টির অনুকূলে কাজ করতে পারে না। তাই রঁমা রঁল্যা বললেন যে সঙ্গীত রচনায় শিল্পীর স্বাধীনতাটুকু যদি না থাকে তবে সে সঙ্গীত হয় 'Sofa Music', তার প্রাণ প্রতিষ্ঠাটুকু ঘটে না। আধুনিক সেমান্টিকসের ভাষায় যাকে 'Referent' বলা হয়েছে তা রঁলার 'Sofa Music' সৃষ্টি করে; তা যথার্থ সঙ্গীত সৃষ্টি করে না; তা কালজয়ী সাহিত্যের জননীর মর্যাদা পায় না। সে মর্যাদাটুকু পেতে হ'লে সাহিত্যকে কবি-কল্পনাকে আশ্রয় ক'রে সর্ববন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে অতিরিক্তের রসরাজত্বে প্রবেশ করতে হবে। এই অতিরিক্তের রসরাজত্বকে সার্ত্র স্বীকার করেন নি। তিনি তাঁর 'সাহিত্য কী' শীর্ষক নিবন্ধে সাহিত্যকে উদ্দেশ্য-অন্বিত ব'লে ঘোষণা করলেন। সাহিত্য উদ্দেশ্য-অন্বিত হ'য়ে উঠলে তা হয়ত আর তেমন করে মুক্ত পক্ষ কল্পনাকে আশ্রয় করতে পারবে না। সেই নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য কল্পনার পক্ষ স্বাতন ক'রে দেবে। বিকল কল্পনা সৎ সাহিত্যের সৃষ্টি করতে পারবে না। কল্পনা যেখানে খুঁড়িয়ে চলে সাহিত্যও সেখানে পঙ্গু হ'য়ে পড়ে। তাই ত' রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'Personality' গ্রন্থে বললেন যে শিল্প ও সাহিত্য জন্ম নেয় যে কল্পলোকে তা হ'ল 'Region of Surplus', সেখানে শুধু দিনযাপনের, শুধু প্রাণধারণের গ্লানির কালিমা এসে শিল্পকে স্পর্শ করে না। একথাটা আমাদের মনে রাখা দরকার যে এই গ্লানির কালিমা বস্তুতঃপক্ষে জীবনকেও স্পর্শ করে না। জীবন হ'ল আনন্দময় অমৃত রূপের দ্বারা উদ্ভাসিত; 'আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি।' জীবনের পাদপীঠেই ত' জীবনদেবতার প্রতিষ্ঠা। তাই ত' বলছিলাম যে জীবনের আরশিতে এই কালিমার আঁচড়টুকু একেবারেই লাগে না। আর তা লাগে না বলেই জীবন এতো সুন্দর:

মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে।

তথা কথিত অসুন্দর, তথাকথিত দুঃখবেদনাও সাহিত্যে সুন্দর হয়ে ওঠে কারণ এরা জীবনের বৃহত্তর ধারণার মধ্যে সত্য হ'য়ে কখনই ওঠে না। আমরা সাহিত্যে এই যে বৃহত্তর জীবন-কল্পনা পাই সেই জীবনে দুঃখকে, বেদনাকে, হতাশাকে অমৃতময় বলে আস্বাদন করি। তাই ত' কবি বললেন :

"Our Sweetest songs are those
That tell of saddest thoughts".

সীতার বিরহে, যক্ষ প্রিয়ার বিরহে আমরা অশ্রুবিগলিত চোখে বারবার সে বিরহগাথা পাঠ করে আনন্দ পাই। আধুনিক মনস্তাত্ত্বিক হয়ত' অপরের দুঃখে আনন্দ পাওয়ার ব্যাপারটাকে 'Sadistic' বলে ব্যাখ্যাত করবেন। কিন্তু আমরা বলব যে দুঃখের সাত্ত্বিক রূপটি শিল্পে সৃষ্টি হয় বলেই তার আবেদন সর্বগ্রাহ্য ; এর সঙ্গে মানব-মনের কোন অস্বাভাবিক প্রবণতার যোগ বা সম্বন্ধ নেই। আর এই সাত্ত্বিক রূপ সৃষ্টি হ'ল জীবনধর্মকেন্দ্রিকও বটে। অতএব ভোজদেবের মতের পুনরাবৃত্তি করে বলা চলে যে জীবন ও শিল্প যেখানে যথাক্রমে যথার্থ জীবন ও যথার্থ শিল্প হয়ে উঠেছে, সেক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে ব্যবধানটা কেবলমাত্র নামাশ্রয়ী হয়ে উঠেছে। জীবন সাহিত্য-গন্ধী এবং সাহিত্য ও জীবনায়ন ধর্মে চৈতন্যময় হ'য়ে ওঠে।
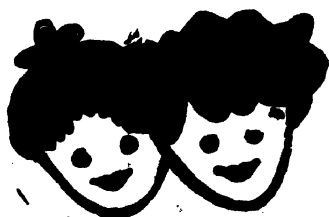
সাহিত্য ও সাহিত্য আলোচনা : নন্দনতাত্ত্বিক দৃষ্টিতে

সাহিত্য সমালোচনা করার প্রকৃতি পর্যালোচনা করাটা যে খুব সহজ কাজ নয়, তার প্রমাণ রয়েছে সাহিত্য সমালোচনার অতি বিস্তারে। ভরত মুনির কাল থেকে আরিস্ততল, এমনকি তারও আগে থেকে সাহিত্য ও নাট্যের গতি-প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা হয়েছে, সাহিত্যের মূল্যায়ন করার চেষ্টা হয়েছে। তারপর যতদিন গেছে আমরা দেখেছি সাহিত্যের ওপর আলোচনা বিস্তার লাভ করেছে অভাবনীয় পথে। কেউ বললেন, সাহিত্য হ'ল জীবন সমালোচনা, আবার কেউ বা নির্বিষয় সাহিত্যের অস্তিত্ব স্বীকার করলেন। নির্বিষয় সাহিত্যের সঙ্গে নিরর্থক সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন কেউ কেউ ; আমরা জানি, কাব্য থেকে অর্থকে বাদ দেওয়ার জন্য নিরর্থক পদ বসিয়ে কবিতা রচনা করলেন তাঁরা ; এই ধরনের চেষ্টা মূলতঃ করেছেন রাশিয়ার ফিউচারিষ্টরা। বিমূর্ত শিল্প বা সাহিত্য সৃষ্টির কথাও আমরা জানি। বিমূর্ত সাহিত্য শিল্প এক ধরনের Configuration-কে আশ্রয় ক'রে। এই Configuration জীবনের মাত্রা থেকে বিচ্যুত। বহির্জগতের গঠনটুকু (Structure of the external world) সাহিত্যের উপজীব্য হবে কিনা এই নিয়ে হাজার হাজার বছর ধরে আমরা আলোচনা করেছি। আধুনিক কালে একদল পণ্ডিত Conceptual thoughtকে সাহিত্যের উপজীব্য করতে চেয়েছেন। প্রাচীন ভারতবর্ষের অলঙ্কারবাদীরা বললেন, কাব্যে আমরা কোন কিছুই বলতে চাই নে ; শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কার প্রয়োগের দক্ষতা দেখাতে চাই। নীতিবাদীরা বললেন, কবির কাজ বিষয়ের সাক্ষাৎকার ঘটানো নয়, কবির আসল কাজ হল আনন্দস্রাবী পদসংঘটনা সৃষ্টি করা, স্টাইল সর্বস্ব ক্রিয়াকলাপ দেখানো। কুন্তক প্রভৃতি বক্রোক্তিবাদীরা বললেন, বক্রোক্তিই হ'ল কাব্যের জীবাত্মা। রসবাদীরা বললেন, বিশেষ স্থায়ী ভাবকে বিভাজনী-বিভাজ্য ভাবসংযোগে আস্বাদ্য করে তোলাই হল কবির কাজ। ধ্বনিবাদীরা ব্যঞ্জনার সাহায্যে বস্তু অলঙ্কার ও ভাবকে অভিব্যক্ত করাই কাব্যের স্বরূপ লক্ষণ বললেন। আবেগবাদীরা বললেন, সাহিত্যের কাজ হল বস্তু বা রূপ উপস্থাপনা করা নয়, বস্তু বা ভাবকে অবলম্বন করে শিল্পীর আপন ভাবাবেগকে প্রকাশ ক'রে রসিকের ভাবাবেগকে চরিতার্থ করাই হ'ল সাহিত্যের কাজ। আবার কল্পনাবাদীরা বললেন, রূপকল্প সৃষ্টি করেই

সাহিত্য পাঠকের কল্পনাবৃত্তিকে চরিতার্থ করবে ; সাহিত্য অন্যান্য শিল্পকলার মতই রূপকল্পনাশ্রয়ী ; সাহিত্য রূপকল্পের ভাষাতেই মূর্তি গড়ে।

এমনি ধারা সাহিত্যে লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য নিয়ে, সাহিত্যের ধর্ম এবং প্রকৃতি নিয়ে যদি হাজারো মতবাদ প্রচলিত থাকে তবে সাহিত্যে সমালোচনার ধারাও হবে অজস্র। সাহিত্যকে ঘিরে যে সমালোচনা গড়ে উঠবে, সেই সমালোচনাতে সাহিত্যের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য, সাহিত্যের বিষয়বস্তু, সাহিত্যের রূপকল্প, সাহিত্যের Gestalt বা Significant Form, এ সবের আলোচনাও করতে হবে। সাহিত্যের বিষয়বস্তু নিয়ে এতো বাদবিতণ্ডা হয়েছে যে, আমরা বিভ্রান্ত হয়ে কখন কখন নির্বিশেষে সাহিত্যের দিকে ঝুঁকেছি। শিল্পের অর্থ নিয়ে, কবিতার ব্যঞ্জনা নিয়ে এমন তুমুল বাদবিসম্বাদ লেগে গেছে যে আমরা শেষ পর্যন্ত Verbal music অর্থাৎ বাচনিক সঙ্গীতের পথ বেছে নিয়েছি। শিল্পতত্ত্ববিদ্ ধাওয়া তাঁর প্রখ্যাত গ্রন্থ "The Heritage of Symbolism'-এ লিখলেন যে শব্দার্থের দ্বারা সীমাবদ্ধ সবচেয়ে সুরেলা ও ভাবব্যঞ্জক কবিতা গীতিকাব্যের সম্মান কেড়ে নেওয়ার আশা করতে পারে না। অর্থহীন শব্দের সমাবেশ ক'রে যে সাহিত্য এবং কাব্য হবে না, ধাওয়া সেই আলোচনা প্রসঙ্গে উপরোক্ত মন্তব্য করেছিলেন। সাহিত্য সমালোচনায় শব্দ ও অর্থের সঙ্গতি এবং সম্মিলন ঘটানোর চেষ্টা এবং সেই প্রচেষ্টার নিরিখে সাহিত্যের মূল্যায়ন করার প্রয়াস হয়েছে। শব্দকে কি অর্থ থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় ? এই প্রশ্নের জবাব দিতে হলে মহাভারত লিখতে হয়। কেননা শব্দের যে সামাজিক অর্থের কথা আমরা চিন্তা করি, সে অর্থ সমাজগত, সে অর্থ যুগগত, সে অর্থ শ্রেণীগত এবং সে অর্থ পরিবেশগত ; এককথায় সে অর্থ সম্বন্ধে আমাদের ধারণা হ'ল অসদর্থক (negative)। শব্দার্থ হল একান্ত ব্যক্তিগত। উদাহরণ দিই—

'My heart leaps up

When I behold a rainbow in the sky'.—

এই যে হৃদয়ে উত্থান, এই উত্থান কি উল্লম্ফন ? কি পরিমাণে কোন উচ্চতায় হৃদয় উল্লম্ফনে উন্নীত হচ্ছে তা কে বলে দেবে ? কবির হৃদয় হয়তো গগনচুম্বী উল্লম্ফনে আত্মবিস্মৃত হয়েছিল, তার খবর কে রাখে ? আমরা কি প্রকৃতপক্ষে কাব্য বা সাহিত্যে ব্যবহৃত কোন শব্দে যথাযথ অর্থানুসন্ধান করতে পারি ? যারা বিমূর্ত শিল্পের বিরোধী, বাচনিক সঙ্গীতের বিরোধী, তাঁদের কাছে আমরা এই প্রশ্নটি রাখব যে সত্যি সত্যিই আমরা কি কখনও শব্দ ও অর্থের সম্মিলন

পুরোপুরি ঘটিয়ে অপরের বোধগম্য একটি বাচনিক পরিবেশের সৃষ্টি করতে পারি ?

মালার্মে শব্দ ও অর্থের বিরোধটিকে সত্য বলে প্রতিপাদিত করেছিলেন। কিন্তু তাঁর সমকালীন এবং পরবর্তী যুগের সাহিত্য সমালোচকেরা অনেক মালার্মের সূক্ষ্ম চিন্তাধারাকে অনুসরণ করতে পারেন নি। নাট্যতত্ত্ববিদ্ জন গ্যাসনার এই ধরনের একজন সমালোচক ; তিনি তাঁর 'Producing the play' নামক গ্রন্থের ভূমিকায় মালার্মের সমালোচনা প্রসঙ্গে এমন সব উক্তি করলেন যা কোনক্রমেই তর্কশাস্ত্রের ও মনস্তত্ত্বের স্বীকৃত তর্কবিধি ও মননবিধি ধারণার মধ্যে বিধৃত নয়। তিনি লিখলেন, 'Words are limited by their meaning'. তিনি আরও লিখলেন, 'All discussions of abstract beauty always overlook the fact that dramatic art is not abstract, that is stories and ideas are concrete.'

কোন সমালোচক যদি এমন কথা বলেন (যখন Semantics ও Science of language আপন আপন মর্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত) তখন আমরা তাঁর অজ্ঞতাকে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখে তাঁকে অবশ্য পাশ কাটিয়ে যাব। শব্দের যে কোন সুনির্দিষ্ট অর্থ নেই এই কথা আজ স্বীকৃত সত্য। সকলের বোধগম্য একটা অর্থ আছে, এমন একটা অবাস্তব অবস্থাকে স্বীকার করে নিয়ে আমরা শিল্প তথা সাহিত্যের communication-এর বাধাকে সুগম করতে চেয়েছি। প্রকৃতপক্ষে অর্থের communication বা সঞ্চালন সম্ভব নয়। কেননা, এই ধরনের একটা ব্যক্তি নিরপেক্ষ সুনির্দিষ্ট অর্থ কোন শব্দের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত হয়ে নেই ; একটা আবছা অর্থ শব্দের উপর প্রলম্বিত হ'য়ে আছে বলে আমরা মনে করি। প্রকৃত পক্ষে অর্থ শব্দের উপর অধ্যস্ত হয় এবং সেই অধ্যাসটুকু একান্তভাবে ব্যক্তিগত। রিচার্ড অগডেনের 'Referent' যে আছে তা আমরা স্বীকার করি কিন্তু সেই 'Referent'-এর প্রকৃতি কি, তা বোঝা সত্যি সত্যিই প্রায় অসম্ভব। আমি যখন টেবিল কথাটি ব্যবহার করি তখন এতদিন আমার দেখা টেবিলটির কথা বলি। এই টেবিল স্থান-কালাশ্রয়ী হলেও সেই টেবিল আমার মনোগত। স্থান-কালাশ্রয়ী এই টেবিল যখন আমার জানা, চোখ মেলে দেখার দ্বারা সম্বন্ধযুক্ত হ'য়ে ওঠে এবং তা বিশেষ অর্থবহ হয়ে আমার টেবিলে পরিণত হয়। সেই টেবিলের স্বরূপ আমি ছাড়া আর কেউ জানে না। যখন সাহিত্য বা কাব্যে অনুভূতির কথা বলা হয়,

বেদনার কথা বলা হয় তখন সেই অনুভূতির বা বেদনার communication পাঠকের মনে কেমন করে সম্ভব হবে? কবি যখন বলেন—

'I fall upon the thorns of life I bleed.'

তখন শব্দার্থ যুক্ত হয়ে যে বাচ্যার্থের সৃষ্টি করে সেই বেদনার কথাটা যদি পাঠক মনে যথাযথ রূপে অর্থবান হ'য়ে কবি যেভাবে বলতে চেয়েছিলেন, সেই ভাবে উপস্থিত না হয়, তাহলে পাঠক কবির কাব্যের জগৎ থেকে নির্বাসিত হবেন। তিনি thorn of life-এর উপর পড়বেন না, তিনি ধপাস করে পড়বেন অবোধ্যতার নীরেট ভূমিতে, কবিতার অপমৃত্যু ঘটবে।

সাহিত্যের উদ্দেশ্য কি, এই নিয়েও বাত-বিতণ্ডার অন্ত নেই। মহাদার্শনিক কাণ্ট অনেক ভেবে চিন্তে 'সোনার পাথর বাটি'র তত্ত্ব প্রচার করলেন; তাঁর কথায় বলি, শিল্পীর উদ্দেশ্য হল, 'purposiveness without a purpose.' লক্ষ্যহীন লক্ষ্য, উদ্দেশ্যবিহীন উদ্দেশ্য—'এই সব কথার কি কোন অর্থ আছে? আর যদি অর্থ থেকেও থাকে তবে সেই অর্থ কাণ্টের মনগড়া, একান্তভাবে তাঁর ব্যক্তিগত। মেরিলিন পন্টি তাঁর গ্রন্থ "The Phenomology of perception"-এ যে অভিমত ব্যক্ত করলেন, সেই মত আমাদের বক্তব্যের কাছাকাছি আসে। তিনি বললেন, প্রত্যেক ইন্দ্রিয়উদ্বেলতার সঙ্গে ভাবের ব্যঞ্জনা ও উত্তেজনা এসে যুক্ত হয়, অর্থাৎ শব্দের অর্থ মানুষের ব্যক্তিগত উত্তেজনা-প্রবণতা ও ব্যঞ্জনা-কল্পনার দ্বারা বিধৃত। তা হলে পন্টি মনে করলেন যে, ভাষা হল মানুষের ব্যক্তিগত ভাষা (Private language)। জাঁপল সার্ত্রে কিন্তু ভিন্ন মতাবলম্বী, তিনি ভাষাকে মনে করলেন ব্যক্তি অনির্ভর। ভাষার ব্যক্তি-অনির্ভর-চারিত্র-ধর্মকে স্বীকার করলে হয়তো objective criltcism-এর পক্ষে তা সহায়ক হয়ে উঠবে। কিন্তু সার্ত্রে যখন ভাষাকে Structure of the external world অথবা বাইরের জগতের আরশি-এই আখ্যা দিলেন, তখন প্রতিবাদের ঝড় উঠল। মানুষের ব্যক্তিগত অনুভূতির কথা, শব্দার্থ ব্যঞ্জনার কথা সার্ত্রে একেবারে অস্বীকার করলেন। তিনি শিল্প এবং সাহিত্যকে 'committed' আখ্যা দিতেও পশ্চাদ্পদ হলেন না। কিন্তু প্রতিপক্ষ বললেন যদি সাহিত্য committed হয় তা হলে শিল্পের সৃজনী-স্বাধীনতাটুকু চলে যায়। শিল্প আর 'নিয়তি-কৃত-নিয়ম-রহিত' থাকে না; শিল্প অনুকৃতি মাত্র হয়ে ওঠে, তাকে অনেকেই শিল্প বলতে রাজী হবেনা। অবশ্য আমরা জানি মহাদার্শনিক আরিস্ততল এক ধরনের অনুকৃতিবাদকে গ্রহণ

করেছিলেন, কিন্তু তাঁর অনুকৃতির ধারণা ছিল Selection এবং Rejection-এর দ্বারা অন্বিত।

আরিস্ততল এক বিশেষ ধরনের অনুকৃতির কথা বলতে গিয়ে 'aesthetic whole'—এর কথা বললেন। আদি-মধ্য-অন্ত তত্ত্বে বিশ্বাসী আরিস্ততল সাহিত্য শিল্পের সামগ্রিক ধারণাটুকুকে আমদানি করলেন। কবি এজরা পাউণ্ড সাহিত্যের মূল উপাদান সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে মেলোপৈইয়া, ফেনোপৈইয়া এবং লোগোপৈইয়া—সাহিত্যের এই ত্রিবিধ মূল উপাদানের কথা বললেন। মেলোপৈইয়া হল ধ্বনি মাধুর্য, ফেনোপৈইয়া হল মনের আরশিতে রূপের প্রতিফলন, আর লোগোপৈইয়া হল মননের পথে আবেগের উজ্জীবন। অর্থাৎ কবিতা পড়ে প্রথমেই শব্দ-মাধুর্য বা ধ্বনি-মাধুর্যের দ্বারা আমরা আকৃষ্ট হব। কালিদাসের মন্দাক্রান্তা-ছন্দ আমাদের চিত্ত-ভূমিকে দোলায়িত করবে। তারপরে কবি কথায় যে রূপটি বর্ণনা করা হয়েছে সেই রূপ আমাদের মনের পটে প্রতিভাত হবে। সব শেষে এই মনের পটভূমিতে রূপের মননের মধ্য দিয়ে আমাদের মনে আবেগের সঞ্চার হবে। এ সবটাই হয়তো ব্যক্তিগত ব্যাপার। যে সাহিত্য এই কাজটুকু করতে পারল, সেই সাহিত্যকে আমরা সৎ সাহিত্য বলি। এই সৎ সাহিত্যের অনুভব একান্ত ব্যক্তিগত। সেই অনুভবের প্রকাশ ঘটবে যে ভাষার মাধ্যমে, সেই ভাষাও তাই একান্তভাবে ব্যক্তিগত ভাষা হয়ে ওঠে। এই ব্যক্তিগত ভাষার মাধ্যমেই হয় পাঠকের মনে আবেগের উপস্থাপনার সূচনা। অতএব শিল্প বা সাহিত্যের সব ব্যাপারটাই হল মননের মাধ্যমে, বুদ্ধির মাধ্যমে অনুভবগত অভিজ্ঞতার উজ্জীবন তা না হলে সাহিত্য হয় না, শিল্প হয় না। সাহিত্যের সমালোচনায় আমরা এই উজ্জীবনটুকুকে বিচার করি। সেই বিচার বৈষয়িক হয় না ; হতে পারে, সেই বিচার একান্তভাবে ব্যক্তিকেন্দ্রিক বিচার। আমি কর্তাভজা হতে পাঠককে অনুরোধ করছি না, কিন্তু একথাই বলতে চেষ্টা করছি যে, বিশ্লেষণ করে সূক্ষ্ম নিক্তিতে বিচার করলে এই তত্ত্বটাই সত্য হয়ে উঠবে যে, সাহিত্য যখন একান্ত-ভাবে ব্যক্তিগত তখন সাহিত্য বিচারও একান্তভাবে Subjective বা ব্যক্তি-নির্ভর।

রসাত্মক বাক্য হল কাব্য। কেমন ক'রে বাক্যকে রসাভিষিক্ত করা যায় এ নিয়ে পণ্ডিতজনার মধ্যে বিরোধের অন্ত নেই। স্বভাবোক্তি কী কাব্য গোত্রীয়? কেউ কেউ বললেন যে স্বভাবোক্তি হ'ল সহজভাবে সাধারণ কথাটুকু বলা; সুতরাং তার মধ্যে কাব্য নেই[১]। তা যদি থাকত তবে কাব্যের প্রয়োজন ফুরিয়ে যেত' কেননা জীবনসত্যই ত' কাব্যসত্য হয়ে উঠতো। বাক্য ত কাব্য নয়? বাক্যের সঙ্গে রসের যোজনায় কাব্যের সৃষ্টি। এই রসটুকু বাক্যের অন্তরশায়ী নয়। নিঃসঙ্গ যে বাক্য, রস তার মধ্যে অনুস্যূত নয়। রসের অধিষ্ঠান ঘটে যখন বাক্য রসসম্পৃক্ত হয়ে ওঠে। কোন পথে রসের অধিষ্ঠান ঘটবে এই মৌলিক প্রশ্নের উত্তর হ'ল বক্রোক্তি। বক্রোক্তি বাক্যকে রসাত্মক করে। এই রসাত্মক বাক্যই কাব্যের উপজীব্য; কাব্যে যেখানে বক্রতার পথে রসের অধ্যাস ঘটল না সেখানে বাক্য কাব্য হয়ে উঠল না। জীবনের বস্তুভারে কাব্য নেই। বস্তুতন্ত্র যদি কাব্যতন্ত্রের আসন নিতো তবে কাব্যলোক সৃষ্টির কথাটুকু অবান্তর, অতিরিক্ত হয়ে পড়তো। ফটোগ্রাফিকে যদি আর্ট বলে স্বীকার না করি তা জীবনের হুবহু নকল ব'লে তা হ'লে স্বভাবোক্তিকেও কাব্য বলতে পারি না কেননা সে জীবনকে অতিক্রম করে না কোথাও। কিছুটা অতিরিক্তের রস-রাজত্ব থেকে আমদানী না করলে বাক্য কাব্য হয় না। তাই বোধ হয় স্বয়ং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বললেন:

১। পুরাতন বক্রোক্তিবাদীদের যুগ অতিক্রান্ত। আজ আর বক্রোক্তি অলঙ্কার আবশ্যিক কাব্য লক্ষণ বলে স্বীকৃত হয় না। অলঙ্কার হ'ল রস সৃষ্টির উপায়, উপেয় হ'ল রস। অলঙ্কার ব্যতিরেকেই রস সৃষ্টি সম্ভব হয়, এমন কথা আধুনিক সমালোচকেরা বলেন। আমরা মনে করি যে নিরলঙ্কার স্বভাবোক্তি কখনও কাব্য বলে স্বীকৃত হবে না। মানুষের মনোধর্মের গভীরে অলঙ্করণ প্রবণতা সুপ্রতিষ্ঠিত, একথা মনোবিজ্ঞানীরা বলেন। যেমনটি ঘটল তার সঠিক পুনরাবৃত্তি মানব কল্পনায় অকল্পনীয়। এ যুগে হয়ত' অলঙ্কারের বাহুল্য চলে গেছে, তার রং ফিকে হয়েছে, ভার হয়েছে লঘু তবু যখনই রসাত্মক বাক্যের দেখা পাই তখনই দেখি সে বাক্যের কোথাও না কোথাও একটুখানি বক্রতা তার চারুতা সম্পাদন করেছে। বক্রতার ধারণার বদল হয়েছে, বক্রতা বিলুপ্ত হয়নি। তাবৎের বক্রোক্তি হল কাব্যপ্রাণ।

'সহজ সুরে সহজ কথা শুনিয়ে দিতে তোরে
সাহস নাহি পাই।'

কবি মাত্রই এই দুঃসাহস প্রকাশ করবেন না। কেননা সহজ কথাটুকু শুনিয়ে দিলে তা আর কথার সংকীর্ণ পরিধিটুকু অতিক্রম ক'রে কাব্যের সীমাহীন বিস্তারে পক্ষ বিস্তার করার অবকাশ পায় না। স্বভাবোক্তির ব্যঞ্জনা নেই। চাঁদ উঠেছে, ফুল ফুটেছে এ হ'ল বস্তুসত্য; কাব্য সত্যের স্পর্শ নেই এদের দেহে মনে। কবির প্রকাশে কাব্যের প্রতিষ্ঠা। সে প্রকাশ নিত্য আশ্রয় করে বক্রতাকে। তাইত' কবি সহজ কথাকে ঘুরিয়ে বলেন, রসধন্য হ'য়ে ওঠে অতি সাধারণ কথাটুকু। আমাদের দেশের প্রাচীন আলঙ্কারিকেরা তাই বললেন যে বক্রোক্তিই হল কাব্যপ্রাণ। একটু ঘুরিয়ে না বললে মনে নেশার রং লাগে না, কাব্যানন্দের আস্বাদন করা কাব্যরসিকের পক্ষে সহজসাধ্য হয় না। অবশ্য একথা স্মরণীয় যে রসিকের রসবোধ যত উচ্চ গ্রামে বাঁধা থাকবে অলঙ্কারের প্রয়োজন ততই কম আসবে। আজকের অলঙ্করণ রীতি স্বভাবানুগামী। রসিকের মন অতি সহজেই রসের ধারাটুকু খুঁজে পায়। কবি মনের সহজ প্রকাশে রসিক কাব্যরস পান করে। কবি তাঁর বাগানের ফুলগুলিকে তোড়া করে না বাঁধলেও এ যুগের রসিক সমাজ সেই অগোছালো ইতস্ততঃ বিন্যস্ত ফুলগুলিতেও সুন্দরকে অধিষ্ঠিত দেখেন। প্রাচীন যুগের রীতি নীতি ছিল স্বতন্ত্র। সোজা কথা সহজ করে বললে প্রকাশের জাদুটুকু বুঝি লাগত না সে যুগের শিল্পে। তাই ত' অনুসূয়ার অনাবশ্যক বাক্‌বিস্তার। অভিজ্ঞান শকুন্তল নাটকের প্রথম অঙ্কে মহারাজ দুষ্মন্তের আকস্মিক আশ্রম প্রবেশে বিস্মিতা অনুসূয়া তাঁর পরিচয় ও আগমনের উদ্দেশ্য জানবার জন্য এই বক্রোক্তির আশ্রয় নিয়েছেন[১] :

"আর্যের মধুর বিশ্রম্ভালাপ আমাকে (এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা বিষয়ে) মন্ত্রণা দিতেছে যে, আর্য কোন রাজর্ষি বংশ অলংকৃত করিয়া থাকেন? কোন জনপদের অধিবাসিগণ মহাভাগের প্রবাসজনিত বিরহে পর্যুৎসুক হৃদয় হইয়া রহিয়াছে? কি নিমিত্তই বা আর্য এই নিরতিশয় সুকুমার আত্মাকে তপোবন-পরিভ্রমণ জনিত ক্লেশের ভাজন করিয়াছেন।"

অনুসূয়া যদি প্রশ্ন করতেন যে আর্য কোথা থেকে আগম করছেন, তাঁর উদ্দেশ্যই বা কি তা হলে এই নিরাভরণ কৌতূহল প্রাকৃতজনোচিত হতো।

১। শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য প্রণীত 'সাহিত্য মীমাংসা' গ্রন্থের ৮১ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

মহাকবি কালিদাস এই উক্তিতে বক্রতা সম্পাদন করেছেন এবং তারই ফলে এই সাধারণ প্রশ্নও সাহিত্য পদবাচ্য হয়ে উঠেছে। এই উক্তি কৌশল, এই বৈদগ্ধ্যভঙ্গী-ভনিতি হল বক্রোক্তি।

অবশ্য এই বক্রোক্তির ধারণা সব আলঙ্কারিকের কাছে এক নয়। আমরা আগেই বলেছি যে কারো কাছে বক্রোক্তি হ'ল কাব্যপ্রাণ, আবার কারো কাছে শুধু অলঙ্কার মাত্র। আলঙ্কারিকেরা কাকু বক্রোক্তি এবং শ্লেষ বক্রোক্তির কথা বল্লেন। এরা হল ভাব প্রকাশের অন্যতম রীতি। যাঁরা বক্রোক্তিকে কাব্যপ্রাণ বলে মনে করেন তাঁরা যথার্থ কাব্যের সর্ববিধ প্রকাশ ভঙ্গীকেই বক্রোক্তি বলবেন। ভামহ এদের দলে। "ভামহের সমস্ত গ্রন্থ পড়িলে এই ধারণা জন্মে যে তিনি বাক্যের ভঙ্গীতে ইঙ্গিতে অর্থ প্রকাশকেই কাব্যত্বের প্রযোজক বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহার মতে সমস্ত অলঙ্কারই বক্রোক্তির প্রকার মাত্র[১]।" যাঁরা বক্রোক্তিকে শব্দালঙ্কার হিসেবে গণ্য করেছেন তাঁদের চোখে বক্রোক্তি হ'ল দ্ব্যর্থবোধক উক্তি। আলঙ্কারিক দণ্ডী এঁদের পুরোভাগে। দণ্ডী হলেন আনুমানিক চতুর্থ-পঞ্চম খ্রীষ্টীয় শতকের লোক। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'কাব্যাদর্শ' আজও শ্রদ্ধার সঙ্গে পঠিত হয়। দণ্ডীর বক্রোক্তির উদাহরণ দিই। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের পাঠক-পাঠিকারা জানেন ঈশ্বরী-ঈশ্বরী-পাটনী সংবাদের কথা। পাটনীর কৌতূহল নিবৃত্তি করার জন্য ঈশ্বরীকে আপন ভর্তা দেবাদিদেব মহাদেবের গুণাতীত মহিমার কথা বিবৃত করতে হয়েছে আপন সত্য পরিচয়টুকুকে গোপন রেখে। তাঁর উক্তি "কোন গুণ নাহি তার কপালে আগুন" দ্ব্যর্থ বহন করে। পাটনী তার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বুঝল যে তার নায়ের যাত্রী এক অভাগার ঘরণী, রসিক সুজন বুঝল যে ঈশ্বরীর স্বামী আত্মভোলা মহেশ্বর; তিনি নির্গুণ, সর্বগুণাতীত। তাঁর তৃতীয় নেত্রের বহ্নিবলয় সদা প্রজ্বলন্ত। ঈশ্বরী যে অনৃত ভাষণের দায়ভাগী হলেন না তার সবটুকু কৃতিত্ব হ'ল বক্রোক্তির।

বামন এবং রুদ্রট দণ্ডীর মতই বক্রোক্তিকে শব্দালঙ্কার হিসেবে গণ্য করেছেন। রুদ্রটের মতে বক্রোক্তি একটি অলঙ্কার। এই অলঙ্কারে শব্দ শ্লেষের জন্য বা কাকুর জন্য বক্তা যে অর্থে শব্দ প্রয়োগ করেন শ্রোতা তার বিপরীত অর্থ গ্রহণ করতে পারে। যথা—

১। ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত প্রণীত কাব্য বিচার গ্রন্থের পৃঃ ৬০ দ্রষ্টব্য।

"অহো কেনেদৃশী বুদ্ধির্দারুণা তব নির্মিতা
ত্রিগুণা শ্রূয়তে বুদ্ধির্নতু দারুময়ী কচিৎ।"

এখানে দারুণা শব্দটি উভয়ার্থক। দারুণা শব্দটিকে নৃশংস এবং কাঠনির্মিত এই উভয় অর্থেই গ্রহণ করা যায়[১]। বক্তা এখানে 'কে' তোমার এমন দারুণ বুদ্ধি দিল? এই প্রশ্ন করলেন। শ্রোতা প্রশ্নের অর্থান্তর ঘটিয়ে উত্তর করলেন "বুদ্ধি ত্রিগুণই শোনা যায়, দারু নির্মিত বলিয়া শোনা যায় না।"[২] দণ্ডী প্রমুখ আলঙ্কারিকেরা শব্দালঙ্কার হিসেবে বক্রোক্তিকে গ্রহণ করলেও ভামহ যে বক্রোক্তিকে কাব্যপ্রাণ বলেছেন এর উল্লেখ আমরা আগেই করেছি। ভামহ হলেন দণ্ডীর পূর্বাচার্য[৩]। ভামহ বক্রোক্তিবাদের আদি প্রবক্তা। তিনি তাঁর 'কাব্যালঙ্কার' গ্রন্থে বললেন যে শব্দের এবং অর্থের আত্মগত যোগ যে কাব্যে দৃষ্ট হয় সেই কাব্যই যথার্থ কাব্য। এই আত্মিক যোগের ফলে যে নতুন অর্থ ও ব্যঞ্জনার সৃষ্টি হয় তা শব্দের এবং শব্দ-বিন্যাসের প্রাকৃতিক সীমাকে ছাড়িয়ে বহুদূর ব্যাপ্ত হয়। এই বিশিষ্ট প্রকাশ রীতিটুকুই কাব্য বৈশিষ্ট্যরূপে কবিকে অমরতা দান করে। যেখানে ব্যঞ্জনা নেই, সেখানে কাব্য অগোচর। ভামহ বললেন :[৪]

"সৈষা সর্বৈব বক্রোক্তিরনয়ার্থো বিভাব্যতে
গতোঽস্তমর্কো ভাতীন্দুর্যান্তি বাসায় পক্ষিণঃ ॥
ইত্যেবমাদিকং কাব্যং বার্তামেনাং প্রচক্ষতে ?"

সূর্য অস্ত গেছে, চাঁদ উঠেছে, পাখীরা উড়ছে, এই বর্ণনা কাব্যধর্মী নয়। বলবার ভঙ্গীতে বৈচিত্র্য নেই ব'লে ভামহ একে কাব্য আখ্যা দেন নি। তাঁর মতে কাব্য দোষগুলি এই বক্রতা বা কবির বিশিষ্ট কথনরীতিটুকুকে ম্লান করে। বামন বললেন 'রীতিরাত্মা কাব্যস্য'। রীতি হল পদরচনার বিশিষ্টভঙ্গী; বিশিষ্টা

১। ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ও ডক্টর সুশীল কুমার দে প্রণীত Histony of Sanskrit Literature গ্রন্থের ৫৮৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

২। ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের কাব্যবিচার গ্রন্থের ৬১ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

৩। পি ভি কানে দণ্ডীকে ভামহের পূর্বসূরী হিসেবে গণ্য করলেও প্রায় অধিকাংশ গবেষক এবং পণ্ডিতের এই ধারণা যে ভামহের আবির্ভাব হয়েছিল দণ্ডীর আগে।

৪। ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের 'কাব্যবিচার' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য'।

শব্দরচনা রীতি; অর্থাৎ কাব্যের আত্মা হল স্টাইল[১]। এই স্টাইল বলতে আমরা ক্রোচের মত Technique of Externalisation বা বহিরঙ্গীকরণ রীতিটুকু বুঝছি না, আমরা উপজ্ঞা (Intuition) এবং তার প্রকাশের (Expression) সমন্বয়কে বুঝছি। আমরা মনে করি এই বোধিগ্রাহ্যরূপ এবং তার প্রকাশ পরস্পর নিয়ামক। প্রকাশটুকু দেখে বোধির রূপটুকু বোঝা যায়। বোধিগ্রাহ্যরূপ বহিঃপ্রকাশকে পরিণতি দেয়। এরা এমনই অবিচ্ছেদ্য যে এযুগের আলঙ্কারিক ক্রোচে এদের সমার্থক বললেন।

বক্রোক্তি জীবিতকার কুন্তকাচার্য ভামহের অর্থেই বক্রোক্তিকে নিয়েছেন। কুন্তকাচার্য এসেছেন দণ্ডীর অনেক পরে। খ্রীষ্টীয় দশম শতকে তাঁর আবির্ভাব। তাঁর 'বক্রোক্তি-জীবিত' গ্রন্থ অলঙ্কার শাস্ত্রের অন্যতম উজ্জ্বল মণি। আচার্য কুন্তক তাঁর গ্রন্থে বললেন "পদসমুদয়াত্মক বাক্যের সহস্র প্রকারে বক্রতা সম্পাদন করা যাইতে পারে এবং সেই বক্রতার মধ্যেই সকল অলঙ্কারবর্গ নিঃশেষে অন্তর্ভুক্ত হইবে।" যেমন, মুখটি অতিশয় সুন্দর, এই বাক্যটিকে মুখটি চন্দ্রের মত সুন্দর, মুখটি যেন চন্দ্র, ইহা মুখ নহে, ইহা চন্দ্র, এই মুখটি চন্দ্র হইতেও অধিকতর সুন্দর, এইভাবে যথাক্রমে উপমা, উৎপ্রেক্ষা, অপহ্নুতি, ব্যতিরেক প্রভৃতি অলঙ্কারের মাধ্যমে প্রকাশ করা যাইতে পারে।[২] উদ্দেশ্য, একই মুখের সৌন্দর্য বর্ণনা, ভেদ কেবল বাক্যবিন্যাসে; অতএব এই বিন্যাসভেদ বা বক্রতাই যে অলঙ্কারের 'জীবাতু' তাহা স্পষ্টই বোঝা গেল এবং এই বক্রোক্তি লৌকিক বাক্যাবলীকে রসোত্তীর্ণ করে। একটি বিশেষ ঢঙে বাক্য এবং শব্দের বিন্যাসের ফলে ব্যঞ্জনার সৃষ্টি হয়। সে ব্যঞ্জনা গভীরতর অর্থবহ। ভামহ বলেছিলেন 'শব্দার্থৌ সহিতৌ কাব্যম্'—শব্দার্থের সাহিত্যের নাম কাব্য। এই নির্দেশনা কুন্তককে তাঁর শিল্পদর্শন লিখতে সহায়তা করেছে। কুন্তক বললেন "প্রতিভার দারিদ্র্যের জন্য যাঁহারা কেবল মাত্র শব্দ-ছটায় মাধুর্য সৃষ্টি করিতে চান তাঁহারা কাব্যের যথার্থ সম্পদ প্রকাশ করিতে পারেন না। আবার কেবলমাত্র অর্থের চাতুর্যের দ্বারাও শুষ্ক তর্কের গাঁথুনি বাঁধিলে কাব্যত্ব হয় না; প্রতিভার প্রতিভাসের দ্বারা প্রথমতঃ কবিচিত্তের মধ্যে বর্ণনার বস্তু বা অস্ফুট ভাবে যাহা মনের মধ্যে উদিত হয়, তাহাই বক্রবাক্যের দ্বারা যখন প্রকাশিত হয় তখন পালিশ করা উজ্জ্বল হীরকের মালার ন্যায় তাহা শোভা

১। অতুলচন্দ্র গুপ্ত প্রণীত কাব্য 'জিজ্ঞাসা' গ্রন্থের পৃঃ ৩ দ্রষ্টব্য।

২। শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য প্রণীত 'সাহিত্য-মীমাংসা' গ্রন্থের ৮২ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

পায় এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তির আনন্দ উৎপাদন করিয়া কাব্যত্ব পদবী লাভ করে।[১] কুন্তকের মতে একই সত্য প্রকাশ ভঙ্গীর বিভিন্নতায় বিভিন্ন শ্রেণীর কাব্য সৃষ্টি করে। এই প্রকাশরীতির ব্যঞ্জনাটুকু শব্দ এবং বাক্যগত অর্থকে অতিক্রম করে অনায়াসে। এই প্রকাশভঙ্গীটুকু কবির নিজস্ব কবিকৃতি। একই সত্য হাজারো মানুষের দৃষ্টির সম্মুখে নিত্য উদ্ভাসিত। তাকে দেখবার ভঙ্গীটুকু এবং তাকে দেখাবার রীতিটুকুই হ'ল কবির একান্ত আপনার ধন। এই ধনে ধনী হয়েছেন বলেই তিনি প্রাকৃত জন থেকে পৃথক। প্রাকৃত জনের চোখের উপর দিয়ে বর্ষা আসে। তবু তার চোখে সজল মেঘের স্নিগ্ধ ছায়ার মেদুরতা নামে না। সে দেখে প্রকৃতির আসন্ন বর্ষণ প্রত্যাশার অধীরতা, তার চোখে এই অধীরতা একান্তই প্রাকৃত। তার কবির চোখে সে অধীরতা অসীম ব্যঞ্জনা মণ্ডিত। কবি শোনেন ঝিল্লি মন্দ্রে সে অশান্তি নিত্য স্পন্দিত। কদম্বের বনে বনে কবি আসন্ন বর্ষণের আগমনী কান পেতে শোনেন। সেই দেখা, সেই শোনা কবির বিচিত্র প্রকাশ ভঙ্গীতে রসঘন মূর্তি লাভ করে। যে সদ্য, সহজ ছিল, অনাড়ম্বর স্বচ্ছতায় যে ছিল একান্ত বুদ্ধিগ্রাহ্য কবি তাকে হৃদয়গ্রাহ্য করে তুললেন। সত্য সুন্দরের রথে আবির্ভূত হ'ল। কবি তার সারথী। কবি কণ্ঠে আসন্ন বর্ষার বর্ষণ সম্ভাবনা অজস্র সংগীতের ধারাজলে মুক্তি পেলো :

"নীল অঞ্জন ঘন পুঞ্জচ্ছায়ায় সমবৃত অম্বর
হে গম্ভীর।
বন লক্ষ্মীর কম্পিত কায় চঞ্চল অন্তর।
ঝংকৃত তার ঝিল্লীর মঞ্জীর।
হে গম্ভীর।
বর্ষণগীত হ'ল মুখরিত মেঘমন্দ্রিত ছন্দে।
কদম্ব বন গভীর মগন আনন্দঘন গন্ধে,
নন্দিত তব উৎসব মন্দির
হে গম্ভীর॥"

(গীতবিতান)

এই চিত্রধর্মী কাব্যাংশের আবেদন সংগীতের দিক্‌প্রসারী অর্থবহ। প্রকৃতি আসন্ন বর্ষণ প্রত্যাশায় ব্যাকুল। তার পুলক চঞ্চলতা, তার ঝিল্লিস্বনন, তার উপর আকাশের মেঘমন্দ্র, তার উৎসব মন্দিরের আনন্দঘন পরিবেশ সব কিছুকে

১। ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের 'কাব্যবিচার' গ্রন্থের পৃঃ ৬৪ দ্রষ্টব্য।

অতিক্রম ক'রে আর এক অর্থ, আর এক ব্যঞ্জনা পাঠককে রসলোকের অন্তঃস্তলে নিয়ে যায়। রসাবেশে রসিক মন আপ্লুত হয়ে ওঠে। কবির কথকতার ঢংটুকু ভাষার, শব্দের সহজ বুদ্ধিগ্রাহ্য অর্থকে 'সহৃদয় হৃদয় সংবাদী' করে তুলেছে। কাব্যোক্তির বক্রতা সংগীতের নন্দনীয়তাটুকু এনে দিয়েছে। আগেই বলেছি যে এই বক্রোক্তির রূপভেদ ঘটেছে নানান কবির হাতে। আবার একই কবির বিভিন্ন সৃষ্টিতেও এই বক্রতার প্রকারভেদ লক্ষণীয়। গীতবিতানের অন্যান্য গানে, রবীন্দ্রনাথের হাজারো কবিতায় বক্রোক্তির অবতারণা। কবিগুরুর 'কল্পনা' কাব্যগ্রন্থের একটি কবিতার কথা বলি। সেখানেও কবি আসন্ন বর্ষার আগমনী গাইছেন. সেখানেও শব্দার্থের সাহিত্যে আর এক রসলোক সৃষ্টি করেছে। বর্ষা আসছে। কবিকণ্ঠে মেঘস্বরে ধ্বনিত হয়ে উঠল :

"ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে
জলসিঞ্চিত ক্ষিতি সৌরভ রভসে
ঘন গৌরবে নব যৌবনা বরষা
শ্যাম গম্ভীর সরসা।
গুরু গর্জনে নীপমঞ্জরী শিহরে,
শিখিদম্পতি কেকা কল্লোলে বিহরে
দিগ্বধূচিত হরষা
ঘন গৌরবে আসে উন্মদ বরষা ॥

একই কবির বক্রোক্তিতে যেমন অনন্ত রূপভেদ দেখি, তেমনি বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন কালের কবিকুলের বলবার ঢঙে অনন্ত রূপ বৈচিত্র্য। এই বৈচিত্র্যটুকু একদিকে যেমন কবি মানস নির্ভর অন্যদিকে আবার কবির বলবার ঢঙে তার কালও আপন স্বাক্ষর রেখে যায়। এ যুগ বৈশিষ্ট্য হল সরলীকরণ। এ যুগে কবির বলবার রীতিতে রং ফিকে হয়ে এসেছে, ঢং হয়েছে লঘুপদ সঞ্চারী। আজকের দিনের মানুষ, কাব্যে বলুন সাহিত্যে বলুন, আর অতিরিক্তের বোঝা বইতে রাজী নয়। তাই দেখি একালের কবির কাব্যে বক্রতার রূপ বদল হয়েছে। কবি সহজ সত্যকে যেমন অনায়াসে প্রত্যক্ষ করেছেন তেমনি অনায়াস ছন্দে তাকে রূপায়িত করেছেন। জীবনের অতিনির্দিষ্টতার কথা বললেন হাল্কা সহজ ভঙ্গীতে :

"ছকপাতা খেলা চলেছি খেলতে খেলতে।
হুকুম কোথায় চালের বাহিরে হেলতে।
ইতিহাসও সেই একই মুখস্থ
সুরে আওড়ানো নামতা
রাজার প্রজার নিজের গরজে
যে যেমন দেয় নাম, তা।"

(ছক—শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র)

জীবনের গতিপথ পূর্ব পরিকল্পিত। কোথাও কোন অদৃশ্য সিংহাসনে বিশ্ব-বিধাতা সমাসীন। তাঁর নির্দেশেই বুঝি ইতিহাসের নিরন্তর পুনরাবৃত্তি। জীবন ও জগৎ আপনার নির্দিষ্ট কক্ষপথে ঘূর্ণ্যমান। এ তত্ত্ব সুপরিচিত, বহু কথিত, অতিখ্যাত। তবু ও কবি কথায় পুনরাবৃত্তির বিরক্তিকর অধ্যাসটুকু অগোচর রইল। কারণ, কবির বলবার ঢঙে কবি সুলভ বক্রতা। এই বক্রোক্তি বিলিয়ে গেল রং ও রস ; রসিকের চিত্তে সুধাস্রাবী মধুভাণ্ডের স্থাপনা করল। গৌড়জন ধন্য হল এই রসধারায়। এই স্পর্শেই গদ্য পদ্য হয়ে ওঠে, জীবন হয় কাব্য। কাব্যপ্রাণ স্পন্দিত হয় ; ভাব ও ভাষার দ্বারা অবাধিত। তার স্ফূর্তি ঘটে কবির শব্দ চয়নের এবং শব্দ বিন্যাসের বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে—এই এই বক্রোক্তি বৈশিষ্ট্য কাব্যকে সমগ্রতা দান করে। এর মধ্যেই ভাব ও ভাষা একাত্ম হয়ে উঠে। সাহিত্যের রূপ হ'ল সমগ্রতার রূপ। ভাব ও ভাষার আত্মিক যোগ সাধনে যে সমগ্রতা তা-ই ত সাহিত্যের উপজীব্য। সাহিত্য ও কাব্যের এই সামগ্রিক সত্তার কথা গ্রীক দার্শনিক আরিস্ততলও আমাদের শুনিয়েছেন। এদেশে এবং ওদেশে তাঁর অনুপন্থীদের অসদ্ভাব নেই। এই সমগ্রতার মধ্যেই কাব্যের ব্যঙ্গার্থের ধারণাটুকু নিহিত। এই ব্যঙ্গার্থই 'ব্রহ্মাস্বাদ সহোদর' যে কাব্যানন্দ তার আস্বাদন ঘটায়। আবার এই ব্যঙ্গার্থের প্রতিষ্ঠা ঘটে কবি উক্তির সুচারু বক্রতায়। তাইত' আচার্য কুন্তক কাব্যোক্তির বক্রতার মধ্যে সকল কালের সকল শ্রেণীর কাব্যের প্রতিষ্ঠা প্রত্যক্ষ করলেন। বক্রোক্তি হল কাব্য প্রাণ। আচার্য ভামহ কথিত তত্ত্ব সকল কালের সকল কবির কাব্যে সুপ্রতিষ্ঠিত।

তৃতীয় স্তবক

ভরত ঃ নাট্যশাস্ত্র

নাটক, অভিনেতা ও দর্শক ঃ নন্দনতাত্ত্বিক বিচার

নাটক ও নাটকীয়তা ঃ বিংশ শতকের ইংরেজী ও জার্মাণ নাটক

রবীন্দ্রনাট্য ঃ রক্তকরবী
ডাকঘর

নাট্যকার বেট্রোলড্ ব্রেশটের নন্দনতত্ত্ব

তৃতীয় স্তবক

ভরত : নাট্যশাস্ত্র

কিছুদিন আগেও নন্দনতত্ত্ব সম্বন্ধে সুবিপুল অজ্ঞতা শুধু সাধারণের সম্পদই ছিল না, এর ভাগ নিয়েছিলেন পশ্চিমদেশের খ্যাতনামা প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত প্রবর মোক্ষমূলর এবং অধ্যাপক নাইটের মত পণ্ডিতরাও। যে দেশে ভরত, আনন্দবর্ধন, অভিনবগুপ্তের মত সমালোচনী প্রতিভা, সে দেশের সৌন্দর্যতত্ত্ব সম্বন্ধে যখন মোক্ষমূলর বলেন : "It is strange, neverthless that a people so fond of the highest abstraction as the Hindus should never have summarised their perception of the beautiful." অর্থাৎ এটা আশ্চর্যের কথা যে, যে হিন্দুজাতি সূক্ষ্মতম গবেষণার জন্ত প্রসিদ্ধ তাঁরা তাঁদের সৌন্দর্য বিষয়ক মত সূত্রাকারে প্রকাশ করে যান নি—তখন আমরা তাঁর অজ্ঞতাকে সস্নেহ ক্ষমা না করে পারি না। ভারতীয় রসশাস্ত্রের জনক ঋষি ভরতের কথা শোনবার সৌভাগ্য নিশ্চয়ই মোক্ষমূলরের হয়ে ছিল। নাট্যশাস্ত্রের দু' একটা অধ্যায় একটু মন দিয়ে পড়লেই পণ্ডিতপ্রবর ভারতীয় সৌন্দর্যতত্ত্ব সম্বন্ধে ভিন্ন ধরনের অভিমত পরিবেশন করে যেতেন রসিকজনের দরবারে, একথা আমরা বিশ্বাস করি। খ্রীষ্টের জন্মগ্রহণের দু'শো বছর আগে ভরত নাট্যশাস্ত্র রচনা করে ছিলেন বলে অনেকেই অনুমান করেন। আবার অনেকে তাঁকে খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর লোক ব'লে মনে করেন। ভরতের জীবনকাল সম্পর্কে আমরা কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি না। ভারতীয় মনীষীদের অদ্ভুত জীবনদর্শনই এর জন্ত দায়ী। স্রষ্টা সৃষ্টির অন্তরালে এমনভাবে আত্মগোপন করেন যে ভাবীকালে গবেষকদের কাছে তাঁদের কাল-নির্ণয় এক দুরূহ সমস্তা হয়ে ওঠে।

সাধারণতঃ শিল্প সমালোচনা আসে শিল্প-সৃষ্টির পরে। নাট্যশাস্ত্র রচনার পূর্বে পূর্ণাঙ্গ সংস্কৃত নাটকের সৃষ্টি সম্ভব হয়েছিল, একথা অনস্বীকার্য। কালিদাস-পূর্ব যুগের নাট্যকারদের মধ্যে ভাস ও অশ্বঘোষের নাটকের কথা জানতে পারি। ত্রিবান্দমে ভাসের তেরোটি নাটক আবিষ্কৃত হয়েছে। অধ্যাপক লুডারসের চেষ্টায় অশ্বঘোষের নাটকের যে অংশগুলি আজ সুধীজনের হাতে এসে পৌছেচে, সেগুলি নাট্যশাস্ত্রের রচনাকাল নির্ধারণে

আমাদের প্রভূত সাহায্য করেছে। অশ্বঘোষ ছিলেন কুষাণ সম্রাট কণিষ্কের সমসাময়িক। সম্রাট কণিষ্কের শাসনকাল খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দী। সুতরাং অশ্বঘোষের নাটকগুলিও ঐ সময়েই রচিত হয়েছিল। আবার অধ্যাপক কীথের অভিমতের পোষকতা করলে আমরা খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের পূর্বে নাট্যশাস্ত্রের রচনাকালকে পিছিয়ে নিয়ে যেতে পারি না। খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকই হবে আমাদের গবেষণার প্রত্যন্ত সীমা রেখা।

ভরত মুনি নাট্যবেদের আদি বক্তা। রসশাস্ত্র ও অলংকার শাস্ত্রের সমন্বয়ে যে কাব্যশাস্ত্র—তারও আদি গুরু মহামতি ভরত। নাট্যশাস্ত্রের ভরতমুনি রসতত্ত্বের আদি প্রবক্তা হলেও রসতত্ত্ব নিঃসন্দেহে ভরতের চেয়েও প্রাচীন। ভরতের মতে রসই নাট্যের প্রাণ। ভরত বলেছেন "রস ছাড়া কোন অর্থই প্রবর্তিত হয় না।" ভরতের এই রসের ব্যাখ্যায় কালক্রমে পরস্পর-বিরোধী সম্প্রদায় গড়ে উঠেছিল। ভট্টলোল্লট, ভট্টশঙ্কুক প্রমুখপণ্ডিতেরা ভরতের গ্রন্থে টীকা লিখতে গিয়ে নিজ নিজ ব্যাখ্যা উপস্থিত করেছিলেন। এঁদের মতে রস বলতে বোঝায় নাট্যরস। আলংকারিকেরা নাট্যরস স্বরূপেই কাব্যে রসকে গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু রসের Aesthetic গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারেন নি। আনন্দবর্ধন সর্বপ্রথম রসের সর্বাতিশয়ী মূল্যকে স্বীকার এবং ব্যঞ্জনা বা ধ্বনিতত্ত্বের সঙ্গে রসতত্ত্বের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন; তাঁর মতে ভরত কথিত রস কেবলমাত্র নাট্যের প্রাণ নয়, দৃশ্য ও শ্রব্য উভয়বিধ কবিকর্মেরই সারার্থ। নাট্যে প্রযোজ্য ও নাট্যতত্ত্বের আলোচ্য রস এইভাবে কাব্যে প্রযুক্ত ও কাব্যতত্ত্বে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।

আনন্দবর্ধনের পর কাব্যে রসের গুরুত্ব স্বীকৃত হলেও ধ্বনিবাদ বা রসের ব্যঙ্গত্ব ব্যাপক স্বীকৃতি লাভ করতে পারে নি। ধ্বনিবাদ ও ধ্বনিবাদের ভিত্তিতে ব্যাখ্যাত রসবাদও অস্বীকৃত হয়েছিল। ধ্বনিভিত্তিক রসবাদে যা প্রাসংগিক তা প্রদর্শন এবং নাট্যরস ও কাব্যরসের সাযুজ্য প্রমাণের জন্যই সম্ভবত অভিনবগুপ্ত ভরতের নাট্যশাস্ত্রের টীকা "অভিনব ভারতী" রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন।

ভরত রস সম্পর্কে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন—'বিভাব, অনুভাব, ব্যভিচারীর সংযোগে রস নিষ্পত্তি হয়।' এই 'নিষ্পত্তির' অর্থ বোঝাতে তিনি যাড়বাদী রসনিষ্পত্তির দৃষ্টান্ত দিয়েছেন: যেমন নানা ব্যঞ্জন ঔষধি ও দ্রব্য সংযোগে রসনিষ্পত্তি হয়, সেই রকম নানা ভাবের উপগমে

রসনিষ্পত্তি হয়। যেমন গুড় ইত্যাদি দ্রব্য, ব্যঞ্জন এবং ঔষধির সমন্বয়ে ষাড়বাদী রস উৎপন্ন হয়, সেই রকম নানা ভাবের দ্বারা উপগত হলেও স্থায়ী ভাব রসত্ব লাভ করে। ভরতের এই দৃষ্টান্ত লৌকিক রস'নষ্পত্তির দৃষ্টান্ত।

ভারতীয় রসবাদের উদ্গাতা ভরত প্রচারিত নাট্যরসকেই পরবর্তী যুগের পণ্ডিতেরা কাব্যরস বলে স্বীকার করে নিয়েছেন। একাদশ শতকে অভিনবগুপ্তের মত মনীষী ও তাঁর অভিনবভারতী ভাষ্যে কাব্যরস ও নাট্যরসের অভিন্নতা প্রচার করে গেলেন। তবে এ বিষয়েও বিরুদ্ধ মতবাদের অভাব নেই। এখানে বির্তকের অবকাশ যথেষ্ট থাকলেও আমরা আচার্য ভরতকে অনুসরণ করে নাট্যরস ও কাব্যরসকে সমার্থক বলেই গ্রহণ করব। ভরতের মতে রসই নাট্যের প্রাণ। তিনি রসকে বীজের সঙ্গে তুলনা করেছেন :

"যথা বীজাদ্ ভবেদ্ বৃক্ষো বৃক্ষাৎ পুষ্পং ফলং তথা।
তথা মূলং রসাঃ সর্বে তেভ্যো ভাবা ব্যবস্থিতাঃ॥"
(নাট্যশাস্ত্র, ষষ্ঠ অধ্যায়)

যেমন ক্ষুদ্র বীজ অঙ্কুর, কাণ্ড শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট বৃহৎ বনস্পতিতে পরিণত হয়, ক্রমে যেমন তা মনোহর পুষ্পপল্লবে বিভূষিত হয়ে ওঠে এবং তার চরম পরিণতি যেমন বিচিত্র ফল সম্ভারে, তেমনি কবির অন্তর্গূঢ় রসবীজ আপন প্রাণশক্তির উল্লাসবশে শব্দ, অর্থ, অলংকাররূপে আপনাকে অঙ্কুরিত, কুসুমিত, মঞ্জরিত করে তোলে, সর্বশেষে পরিণত হয় সহৃদয়ের রসচর্বণায়।[১] নাটকের অভিনয় দেখে সহৃদয় সামাজিকের মনে যে আনন্দের সৃষ্টি হয় তাকেই রস নামে অভিহিত করা হয়েছে। বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারী ভাবের সংযোগে এই রসের উদ্ভব হয়। উদাহরণ স্বরূপ আমরা শৃংগার রসের কথা বলছি। এই রসের সৃষ্টিকল্পে আমাদের প্রয়োজন নায়ক নায়িকার কায়িক উপস্থিতি; আরো প্রয়োজন গন্ধভারে আমন্থর মলয় হিল্লোল ও জ্যোৎস্না পুলকিত পরিবেশ। এদেরই ভরতমুনি 'বিভাব' বলেছেন। মিলন দৃশ্যে প্রেমিক যুগলের ভ্রুভঙ্গ, অপাঙ্গে চেয়ে থাকা এদের বলা হয়েছে 'অনুভাব' এবং ভালোবাসার অনুষঙ্গ যে উদ্বেগ, উত্তেজনা এদের বলা হয়েছে 'ব্যভিচারী' ভাব। এই তিনটি ভাবের সমন্বয়ই হল রসের জনক। সাত্ত্বিক ভাব রস-সৃজনের সহায়ক না হ'লেও এটি হচ্ছে অন্তঃশীলা ভাবের দ্যোতক। সাত্ত্বিক ভাব স্বতঃস্ফূর্ত; ভরত স্তম্ভ প্রভৃতি আটটি সাত্ত্বিক ভাব, রতি প্রমুখ আটটি স্থায়ী ভাব ও বির্বেদ, গ্লানি প্রমুখ

১। শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য প্রণীত 'সাহিত্য মীমাংসা' গ্রন্থের পৃঃ ৮৭ দ্রষ্টব্য।

তেত্রিশটি ব্যভিচারী ভাবের উল্লেখ করেছেন। সহৃদয় সামাজিক অভিনয়ের মাধ্যমে অভিনীত বিষয়বস্তুর সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করে। দর্শক বিস্মৃত হয় স্থান কাল ও পাত্রের ব্যবধান। তার মনে এক অপূর্ব ভাবাবেশ সঞ্জাত হয়। ভরতমুনি একেই রস আখ্যা দিয়েছেন :

'নহি রসাদ্ ঋতে কশ্চিদ্ অর্থঃ প্রবর্ত্ততে
তত্র বিভানুভাব-ব্যভিচারি-সংযোগাদ্ রস-নিষ্পত্তিঃ।'
নাট্যশাস্ত্র, ৬।৩৪॥

অর্থাৎ রস ব্যতীত কোন বিষয়ের প্রবর্তনা হয় না। সেই নাট্য বিষয়ে ভাব, বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারী ভাবের সংযোগে রস নিষ্পত্তি হয়। এখানেও মতবিরোধের অভাব নেই। "সংযোগ ও নিষ্পত্তি" এই কথা দু'টিকে কেন্দ্র করে পণ্ডিতরা বহু গবেষণাই করেছেন। তাঁর মতে ভিন্নধর্মী গাছগাছড়া ও দ্রব্যের সংমিশ্রণে যেমন উৎকৃষ্ট পানীয়ের সৃষ্টি হয়, ঠিক তেমনি করেই বিভিন্ন ভাবের সমন্বয়ে রসের উৎপত্তি ঘটে। ভাবই হ'ল রসের ভিত্তিভূমি। বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারী ভাবের দ্বারা 'উপগত' হয়ে স্থায়ী ভাব রসলোকের সৃষ্টি করে সহৃদয় সামাজিকের মনে। এই তত্ত্বটি নাট্যশাস্ত্রকারের ঢের পরবর্তীকালে তাঁরই অনুসরণে সাহিত্যাচার্য বিশ্বনাথ কবিরাজ তাঁর 'সাহিত্য দর্পণ' গ্রন্থে ব্যাখ্যাত করেছেন :

"বিভানেনানুভাবেন ব্যক্তঃ সঞ্চারিণা তথা।
রসতামেতি রত্যাদিঃ স্থায়ী ভাবঃ সচেতসাম্॥"

রত্যাদি স্থায়ী ভাব যদি বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারী ভাব দ্বারা ব্যক্ত হয় তবে তা সহৃদয় ব্যক্তির কাছে রস হয়ে দাঁড়ায়। পাঠক বা দর্শকের এই রসলোকে উত্তরণই হল কাব্যানন্দের আস্বাদন।

নাট্যশাস্ত্রকার নাট্যশাস্ত্রের ষষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায়ে রসবাদের আলোচনা করেছেন। তাঁর আগেও আমাদের দেশে রসবাদের আলোচনার যে অসদ্ভাব ছিল না সে কথা আমরা নাট্যশাস্ত্র থেকেই জানতে পারি। ভরত নিজেই কোন অজ্ঞাতনামা গ্রন্থকারের রসতত্ত্ব সম্পর্কিত গ্রন্থ থেকে আর্যা ও অনুষ্টুভ ছন্দে রচিত উদ্ধৃতি নিজের গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করেছেন। তাই রাজশেখর ভরতকে 'রূপক' অর্থাৎ নাট্যরসের উদ্গাতা বলে স্বীকার করলেও নন্দিকেশ্বরকেই কাব্যরসের জনক বলে প্রচার করেছেন। রসবাদের উদ্গাতা প্রকৃতপক্ষে কে ছিলেন সে কথা ঐতিহাসিকের গবেষণার বিষয়। তবে ভরত মুনির হাতে সর্বপ্রথম

রসবাদ স্বস্বরূপ পরিগ্রহ করে, একথা অস্বীকার করা যায় না। পরবর্তী যুগের পণ্ডিতদের লেখায় আমরা ভরতের উল্লেখ বার বার পাই। প্রথিতযশা রসবাদী আনন্দবর্ধন ভরতকেই রসবাদের উদ্গাতা বলে স্বীকার করেছেন। ভট্ট লোল্লট, শঙ্কুক, ভট্টনায়ক এবং আরো অনেকে ভরতের রসবাদকে কেন্দ্র করেই নিজ নিজ মতবাদ গড়ে তুলেছেন। নাট্যশাস্ত্রে ভরত আটটি রসের উল্লেখ করেছেন। মুনিগণের প্রশ্নের উত্তরে মহামতি ভরত বলেন :

"শৃঙ্গার-হাস্য-করুণ রৌদ্র বীর ভয়ানকাঃ
বীভৎসাদ্ভুত সংজ্ঞৌ চেত্যষ্টৌ নাট্যে রসাঃ স্মৃতাঃ।"[১]

অর্থাৎ শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস ও অদ্ভুত নামক আটটি রস নাট্যশাস্ত্রে পণ্ডিতগণ স্মরণ ক'রে থাকেন। এই রস অষ্টকের উৎপত্তি হ'ল ভাব অষ্টককে কেন্দ্র ক'রে। আটটি স্থায়ী ভাবকে অবলম্বন ক'রে শৃঙ্গার প্রমুখ রসের উৎপত্তি। স্থায়ী ভাবগুলি হ'ল রতি, হাস, শোক, ক্রোধ, উৎসাহ, ভয়, জুগুপ্সা ও বিস্ময়। নাট্যশাস্ত্রোক্ত রসের সঠিক সংখ্যা নিয়েও বিবাদের অন্ত নেই। শান্ত রসকে ভরত স্বীকার করেন কি না সে সম্বন্ধেও গবেষণা ও বাদানুবাদের শেষ আজো হয় নি। শান্তরসের স্বীকৃতির জন্য নাট্যশাস্ত্রের ভাষ্যকার অভিনবগুপ্তের উদ্যম প্রশংসনীয়। পরবর্তী যুগে শান্তরসকে ভরতের রস পরিকল্পনায় যোগ্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য তিনি নাট্যশাস্ত্রের বিভিন্ন পাঠ গ্রহণ করলেন। ভাষ্যকারের হাতে নাট্যশাস্ত্রের শ্লোকগুলির সামান্য পরিবর্তন হ'ল এখানে ওখানে। রসের পর্যায়ে শান্ত স্থান গ্রহণ করল এবং স্থায়ীভাব হিসেবে গৃহীত হ'ল 'শম' অথবা নির্বেদ। অভিনবগুপ্তের মত আনন্দবর্ধনও শান্তকে রস হিসেবে স্বীকার করেছেন বটে তবে তিনি 'শম' অথবা 'নির্বেদ'কে শান্তের স্থায়ীভাব হিসেবে গ্রহণ করেন নি। তাঁর মতে 'তৃষ্ণাক্ষয় সুখ' অর্থাৎ সমস্ত কামনা নিবৃত্তিজনিত সে আনন্দ বা সুখ, সেই সুখই হ'ল শান্তরসের স্থায়ী ভাব। বস্তুতঃ ভরতের মতে শৃঙ্গার, রৌদ্র, বীর এবং বীভৎস রসই মুখ্যরস ও অন্যান্য রসগুলি গৌণ। গৌণ রসগুলি মুখ্যরস থেকে জাত হয়। ডক্টর ভি রাঘবনকে অনুসরণ ক'রে শান্তরস সম্বন্ধে একথা বলা চলে যে ভরত তাঁর নাট্যশাস্ত্রে নয়টি রসের উল্লেখ করেন নি। ভরতের রসপরিকল্পনায় শান্তরসের স্থান ছিল না। পরবর্তী যুগের নাট্যশাস্ত্রে আমরা যে শান্তরসের উল্লেখ পাই তা ভাষ্যকারদের যোজনা মাত্র।

১। শ্রীমনোমোহন ঘোষ কৃত 'প্রাচীন ভারতের নাট্যকলা' পৃঃ ২৩ দ্রষ্টব্য।

এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য, ভরতের নাট্যশাস্ত্র অভিনয়িক বা নাট্য সম্বন্ধীয় আলোচনা গ্রন্থ। তাই নাট্যশাস্ত্রের সমস্ত আলোচনাই অভিনয়কে কেন্দ্র ক'রে গড়ে উঠেছে। ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাসে সর্বপ্রথমে নাট্যকলার উপরে বিশ্লেষণী আলোচনার সার্থক বোধন হ'ল 'নাট্যশাস্ত্রে'। কাব্যকলার যেটুকু নাট্যকলার আওতায় পড়ে, সেটুকুর আলোচনাও আমরা এখানে পাই। ভরতের নাট্যরস সম্পর্কিত তত্ত্বগুলি ভরতোত্তর যুগের কাব্যাদর্শ নির্ণয়ে প্রভূত সাহায্য করেছে এ কথা আমরা আগেই বলেছি। সার্থক নাট্যরস সৃষ্টির জন্ম ভরত নাট্য-শাস্ত্রের ষষ্ঠদশ অধ্যায়ে কাব্যশাস্ত্রের অলংকার, দোষ, গুণ এবং লক্ষণ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন নিপুণভাবে। ভরত-পরবর্তীযুগের আলংকারিকেরা কাব্যলক্ষণ ও কাব্যাদর্শ বিচার করতে গিয়ে ভরত প্রদর্শিত পথেই বিচরণ করেছেন, বারে বারে স্মরণ করেছেন এই লোকোত্তর প্রতিভাকে। একথা সর্বজনস্বীকৃত যে ভারতীয় আলংকারিকেরা ভরতের কাছে অশেষ ঋণী। ভারতীয় নাট্যকলার উপরে প্রথম পূর্ণাঙ্গ আলোচনা ভরতের লোকজয়ী প্রতিভার সার্থক সৃষ্টি। ভরতের নাট্যশাস্ত্র নাট্যবেদ নামে অভিহিত হয়েছে কলা রসিকের কাছে। একে বলা হয়েছে পঞ্চম বেদ; ভারতীয়েরা সে যুগে কী গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে নাট্যকে এবং কাব্যকে গ্রহণ করেছিল তার পরিচয় আমরা পাই এই 'পঞ্চমবেদ' আখ্যাটি থেকে। মহাভারতের মতই 'নাট্যবেদ'ও ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতিকে ধারণ ক'রে রেখেছে। নাট্যশাস্ত্র 'সার্বজনিক' এবং 'সার্বজাগতিক'। মানবসমাজের যাবতীয় জ্ঞান, বিদ্যা ও শিল্পকলার প্রয়োজন হয় নাট্য বা কাব্য রচনায়। অখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু কল্পনীয়, তাকেই কাব্য বা নাটকের বিষয়ীভূত করা চলে। তাই দু'হাজার বছরের দুস্তর ব্যবধান অতিক্রম ক'রে আজো আমাদের কানে ঋষি ভরতের বেদমন্ত্র ধ্বনিত হয়:

> ন তজ্জ্ঞানং, ন তচ্ছিল্পং, ন সা বিদ্যা,
> ন সা কলা,
> নাসৌ যোগো, ন তৎ কর্ম নাট্যেঽস্মিন্
> যন্ন দৃশ্যতে।" —নাট্যশাস্ত্র ১।১১৭॥

এমন জ্ঞান নেই, এমন শিল্প নেই, এমন বিদ্যা নেই, এমন কলা নেই, এমন যোগ বা কৌশল নেই, এমন কর্ম নেই যা নাট্যে দেখা যায় না। নাট্য মানুষের ধর্ম, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত হয়ে রয়েছে স্মরণাতীত কাল থেকে। এ যুগের মানুষের জীবন থেকেও ভুরি ভুরি নজীর দেওয়া যায় নাটকের সঙ্গে তাদের সমগ্র ব্যক্তিজীবনের নিগূঢ় সম্বন্ধটির।

এমন কী মানুষের নৈতিক জীবনের উপরও নাটকের প্রভাব দূর প্রসারী। আমরা বার বার বলেছি ঋষি রঁলার কথা। তিনি এক বান্ধবীর কথা বলেছেন যিনি সেক্সপীয়রের 'ওথেলো' নাটকের অভিনয় দেখে আপন ব্যক্তিগত নৈতিক সমস্যার সমাধান করেন। নাট্যশাস্ত্রকার ভরতের যুগেও তেমন মানুষের অসদ্ভাব ছিল না। তাই নাট্যশাস্ত্রকার বলেছেন যে সর্ব বিষয়ে উপদেশ দেওয়াও নাট্যের অন্যতম উদ্দেশ্য (সর্বোপদেশজননং নাট্যং খলু ভবিষ্যতি)। তিনি আরো বললেন :

ধর্মো ধর্মপ্রবৃত্তানাং কামঃ কামোপসেবিনাম্।
নিগ্রহো দুর্বিনীতানাং বিনীতনাং দমক্রিয়া ॥
ক্লীবানাং ধার্ষ্ট্যকরণমুৎসাহঃ শূরমানিনাম্।
অবুধানাং বিবোধশ্চ বৈদুষ্যং বিদুষামপি ॥
ঈশ্বরাণাং বিলাসশ্চ স্থৈর্যং দুঃখার্দিতস্য চ।
অর্থোপজীবিনামর্থো ধৃতিরুদ্বিগ্নচেতসাম্ ॥
... ...
দুঃখার্তানাং শ্রমার্তানাং শোকার্তানাং তপস্বিনাম্।
বিশ্রামজননং লোকে নাট্যমেতদ্ ভবিষ্যতি ॥[১]

নাট্য ধর্মচারীদের (শেখাবে) ধর্ম, কামোপসেবীদের (শেখাবে) কামভোগ, দুর্বিনীতদের (করবে) নিগ্রহ, বিনীতদের (বাড়াবে) দমক্রিয়া (ইন্দ্রিয় সংযম), ক্লীবদের করবে সাহসী, বীরদের উৎসাহ বাড়াবে, নির্বোধদের বুদ্ধি দেবে, বিদ্বানদের বিদ্যা বাড়াবে, বড়লোকদের বিলাসের পদ্ধতি শেখাবে, দুঃখগ্রস্ত লোকদের দেবে স্থৈর্য, অর্থার্জনকারীদের দেবে অর্থ (লাভের সংকেত), উদ্বিগ্নচিত্ত লোকদের দেবে স্থিরতা।

এরূপ সংসারে হতভাগ্য দুঃখী, শোকার্ত, শ্রমক্লান্ত লোকদের বিশ্রামদান করবে এই নাট্য। এইভাবে নাটকের যে স্থান নির্দেশ করেছেন মহামুনি ভরত তা অত্যন্ত উচ্চে। মানুষের সর্ববিধ কল্যাণ সাধনে নাটকের অনলস প্রয়াস। তাই বুঝি নাট্যশাস্ত্রের শ্লোকগুচ্ছ বেদমন্ত্রের সম্মাননা লাভ করেছে ভারতবর্ষীয় মানুষের কাছে। নাট্যবেদে মানুষের সর্ববিধ কল্যাণ করবার দায়িত্বটুকু নাট্যের উপর অর্পণ করেছেন নাট্যশাস্ত্রকার ভরত। শুধু ক্ষণিক আনন্দ দানই নাটকের কাজ নয়। নাটকের কাজ হ'ল মানুষের জীবনে পূর্ণ কল্যাণের প্রতিষ্ঠা। এই মহৎ তত্ত্বের উত্তরাধিকার আমাদের দিয়েছেন আচার্য ভরত।

১। শ্রীমনোমোহন ঘোষ প্রণীত 'প্রাচীন ভারতের নাট্যকলা' শীর্ষক গ্রন্থের ২২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

নাটক, অভিনেতা দর্শক : নন্দনতাত্ত্বিক বিচার

আমরা সাধারণতঃ সার্থক নাটক-অভিনয় শেষে অভিনেতাকে অভিনন্দিত করি। তাঁরাও নাটকেরা যবনিকা পড়লে মঞ্চরূঢ় হ'য়ে সকলের অভিবাদন গ্রহণ করেন সানন্দে, গর্বের সঙ্গে। প্রাকৃতজনের বিচারে, রসিকজনের বিচারে এ অভিনন্দন তাঁদের প্রাপ্য, এ সম্মান তাঁদের অর্জিত সম্মান। এ ক্ষেত্রে রসিকজন ও প্রাকৃতজনের বিচারে ভেদ নেই। নন্দনতাত্ত্বিক বোধ সম্পন্ন সমালোচকের চোখে ব্যাপারটা অন্যভাবে ধরা পড়ে। তাঁর তির্যক দৃষ্টিতে এই সহজ ব্যাপারটা একটু অন্যরকম দেখায়। সেই তির্যক দর্শনভঙ্গির ফলশ্রুতি একটু বিশদভাবে বর্ণন করার প্রয়াস এই নিবন্ধের উপজীব্য। নাটক, অভিনেতা ও দর্শক এই ত্রয়ী পরিকল্পনার মূল্যায়ন নাট্যরসকে ঘনপিনদ্ধ কায়ায় আমাদের সামনে উপস্থিত করবে। এই বিশ্বাসেই এই প্রবন্ধের সূচনা। নাট্যকার নাটকের পরিসরে যে রসের সূচন করেন তার সন্নিধি ঘটে দর্শকের মনে অভিনেতার মাধ্যমে। দর্শকের মনোলোকে যে রসের জগৎ সৃষ্টি হয় তা অবশ্য নাট্যকারসৃষ্ট রসলোকের সামীপ্য লাভ করে হয়ত কিন্তু তারা কখনই একীভূত হ'তে পারে না।

নাটক দেখে আমরা খুশী হই, হাসি, আবার কখন বা কাঁদি। এই যে অনুভূতি বা আবেগের উদ্দীপন ঘটে আমাদের মনে, তার মুখ্য উপলক্ষ্য হ'ল মঞ্চে আরূঢ় অভিনেতা ও তাঁর অভিনয়। অভিনেতাকে সত্য এবং বাস্তব বলে ভাবা, অভিনীত দৃশ্যাবলীর বাস্তবতা সম্বন্ধে কৃতনিশ্চয় হওয়া। সাধারণ দর্শকের মত রসিকজনও এগুলির শরীক হন। উদাহরণ দিই : নাট্যাচার্য শিশির কুমার রামের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। সীতার পাতাল প্রবেশের পরে যে করুণ দৃশ্যের অবতারণা হ'ল রঙ্গমঞ্চে তার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছেন অভিনেতা শিশির কুমার। তাঁর অনবদ্য অভিনয়, 'সীতা সীতা' ক'রে তাঁর সেই উদাত্ত বিলাপ এক অনবদ্য নাট্যরসে রসিকজনকে আপ্লুত ক'রে তুলত। নাট্যাচার্য-সৃষ্ট মঞ্চের জগৎ কিন্তু রামায়ণের জগৎ থেকে স্বতন্ত্র। বাল্মীকি বর্ণিত জগৎ, কল্পলোকে তার অধিষ্ঠান। তাঁর দেখা আমরা কেউ পাই নি। তাই নাট্যাচার্য ব্যঞ্জিত রামায়ণ আর বাল্মীকি সৃষ্ট রামায়ণ তারা এক নয়। নাট্যাচার্যের রামায়ণী কথা হ'ল অভিনয় আশ্রয়ী। সেই অভিনয়ের প্রেক্ষাপট হ'ল নাটক-কথিত ঘটনা সন্নিবেশ। এই ঘটনাগুলি নাট্য-প্রবাহের গতিকে সূচিত করে বোদ্ধা

দর্শকের কাছে। নাট্যকার যে বিশেষ পারম্পর্যে ঘটনা সন্নিবেশ করেছেন তার একটি বিশেষ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থাকে। দর্শকের মনের স্থায়ী ভাবকে উদ্দীপিত ক'রে, বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারী ভাবের সংযোগে দর্শকের মনে রসনিষ্পত্তি হয়। অভিনেতার মনে ও রসের প্রস্রবণ উৎসারিত হয় কী না সে প্রশ্নটা এক্ষেত্রে উল্লেখ্য। আমাদের মতে অভিনেতার মনে এই রসের উজ্জীবন ঘটে না। তিনি মিথ্যার বেসাতি করেন। এই মিথ্যাকে ক্ষণিকের জন্যও সত্য করে তোলার জন্য তিনি যে কলাকৌশল প্রয়োগ করেন তা হ'ল তাঁর নাট্যরীতি। গ্রীক নাটকের chorus অথবা প্রাচীন সংস্কৃত নাটকের সূত্রধার—এঁদের ভূমিকা বিশ্লেষণ করলে আমরা অভিনেতার যথাযোগ্য ভূমিকাটুকু সম্বন্ধে সচেতন হ'য়ে উঠব। প্রাচীন গ্রীক নাটকে Thespion বা অভিনতার আবির্ভাব ঘটল রঙ্গমঞ্চে খ্রীষ্টপূর্ব ৫৩৪ সালে। তার আগে chorusই ছিল গ্রীক নাটকের মধ্যমণি। অভিনেতার অভ্যুদয় তখনও হয় নি গ্রীক রঙ্গমঞ্চে। chorus বা সূত্রধার বলে চলেছেন :

"The King sits in Dunfernline town
Drinking the blue-red wine;
O where will I get a skealy skipper
To sail this new ship O' mine'."

যখনি রাজার উক্তিটুকু রাজকীয় গাম্ভীর্যে অপর একজন বললেন রঙ্গমঞ্চ থেকে সূত্রধার নীরব হ'য়ে গেলেন ক্ষণিকের জন্য। তখনি আধুনিক নাটকের বীজ উপ্ত হয়ে তা কালক্রমে আজকের মহীরুহে পরিণত হ'ল। নাট্যরস ঘনীভূত হ'য়ে 'নতুন জন্ম' নিল অভিনেতার অভিনয়ে; chorus ধীরে ধীরে আত্মগোপন ক'রে চলল; এই আত্মগোপনের পালা আজো চলছে। অভিনয়-রীতিতে এই যে পরিবর্তন ঘটল, এ পরিবর্তন বৈপ্লবিক। নাট্য সমালোচক আর্নট এই রীতি পরিবর্তনকে ব্যাখ্যাও করলেন এই ভাবে :

"Once the initial step of separating actor from chorus had been taken, the rest followed easily. The introduction of a single actor made dramatic action possible and the addition of a second, ascribed to Aeschylus, increased it. Sophocles added a third, in which he was followed by Aeschylus in his latter plays and except perhaps for one dubious case, the

Oedipus at Colonus of Sophocles, this number was never exceeded. Although the number of actors was limited there was no such limit to the number of parts they could play.[১]

একই অভিনেতাকে একাধিক ভূমিকায় অভিনয় করতে হ'ত প্রাচীন গ্রীক নাটকে ; অবশ্য এই রীতির উপযোগিতা আজও একেবারে শেষ হয়ে যায় নি। আধুনিক নাটকেও 'Double role' বা তারও বেশী ভূমিকায় একই অভিনেতাকে দেখা যায়। অতএব বলা চলে সার্থক অভিনয়ের জন্য অভিনীত চরিত্রের সঙ্গে অভিনেতার একাত্মীকরণ তত্ত্বটুকু গ্রাহ্য নয়। প্রাচীন গ্রীক নাটকে অভিনেতার ভূমিকা সম্বন্ধে আর্নট মন্তব্য করলেন : The actor's role was at first subordinate to that of the chorus. His function was that of interlocator. In the Suppliant women of Aeschylus, not, as was once thought, the earliest complete play we have, but certainly modelled on early patterns, there are two actors, but they hardly address each other at all—the story is told by the interchanges between actor and chorus. In time the actor's importance increased.

অর্থাৎ ঐতিহাসিক সত্যের পুনরাবৃত্তি ক'রে বলা চলে যে কালক্রমে অভিনেতার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হ'য়ে উঠল আধুনিক নাটকের বিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে। অবশ্য ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচারে অভিনেতা যে গুরুত্ব এবং প্রাধান্য পেয়েছেন সেই গুরুত্বটুকু তার প্রাপ্য নয় নন্দনতাত্ত্বিক বিচারের মাপকাঠিতে। অভিনেতা ভাব-সঞ্চালনের উপায় বা পন্থা মাত্র। তাঁর প্রযুক্ত নাট্যরীতির তিনি ধারক ও বাহক। শুধু রীতিই বা বলি কেন অভিনয়ে উপস্থাপিত বিভিন্ন চরিত্র চিত্রণে অভিনেতার ভূমিকা বহুরূপীর ভূমিকা থেকে কোনক্রমেই স্বতন্ত্র নয়। প্রাচীন গ্রীক নাটকে যখন মুখোস প'রে অভিনয় রীতির প্রচলন ছিল, তখনই একই অভিনেতা একাধিক ভূমিকায় অভিনয় করার সময় মুখোস বদলের সঙ্গে সঙ্গে চরিত্র বদলও ক'রে নিতেন। মুহূর্তের মধ্যে বস্তু-চরিত্রের মৌল কাঠামোর বদল হয় না। বাইরের ছদ্মরূপ দ্রুত বদল করা চলে। অভিনেতা যখন অভিনীত চরিত্রের রূপ পরিগ্রহ করেন

১। Peter D. Arnott প্রণীত An Introduction to the Greek Theatre পৃঃ ২০ দ্রষ্টব্য।

তখন সেটি হয় তাঁর ছদ্মরূপ। এই ছদ্মরূপই নাট্যপ্রবাহকে সচল ক'রে রাখে। এই রূপের সঙ্গে অভিনেতার একীভূত হওয়ার প্রশ্নটাই অজ্ঞতাপ্রসূত। আর্নট বললেন গ্রীক নাটকে অভিনেতার ভূমিকা প্রসঙ্গে :

"The actor changed his character with his mask.
Which could be done quickly ; it was thus possible
For one actor to take several parts without delay
Or loss of dramatic continuity." (Greek Theatre পৃঃ ৫০)

অতএব ক্রোচের ভাষায় অনুবর্তন ক'রে বলা চলে যে অভিনেতার অভিনয় রীতি হ'ল Technique of externatisation , তিনি মুহূর্তের মধ্যে তাঁর অভিনয় আঙ্গিকের মাধ্যমে আপনাকে অদিপিউস ক'রে তুললেন মঞ্চের উপরে ; কিছুক্ষণ পরেই তার ভূমিকা বদল হ'ল এবং তার সঙ্গে তার মুখোস এবং সাজপোষাক ও ; নবনব রীতি-আশ্রয়ী অভিনেতার অভিনয়ের সবটুকুই এই রীতি বা আঙ্গিক। সেই রীতির মাধ্যমে তিনি মঞ্চে অনুষ্ঠিত ঘটনাবলীর সঙ্গে যুক্ত হন কখন তাঁর নিয়ন্তা হিসাবে আবার কখন বা নিয়ন্ত্রিত হিসাবে ; মঞ্চে প্রদর্শিত ঘটনা পারম্পর্যের নিষ্ঠুর চক্রতলে তিনি কখন বা পিষ্ট হন। প্রথম ক্ষেত্রে দর্শকের মনে ধীরোদাত্ত নায়কের চিত্রটি অঙ্কিত হয় ; বীর রসে আবার কখন বা রৌদ্ররসে দর্শকমন আপ্লুত হ'য়ে ওঠে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে দর্শকের মনে করুণরসের সঞ্চার হয় ; সমবেদনায় তাঁর মন ভরপূর হয়ে ওঠে। আরিস্ততলের ট্র্যাজিক হিরোর দেখা পাই। টমান হার্ডির Mayor of Casterbridge এর মেয়রকে দেখে আমরা এই ধরনের সমবেদনাবোধ করেছি। নাটক যখন আমরা পড়ি তখন তার যে আবেদন. তার থেকে আবেদনটি তীব্রতর হয় যদি আমরা নাটকের অভিনয় দেখি ? এটি কেন হয় ? এর উত্তর খুঁজতে হ'লে আমরা অভিনেতার ভূমিকা সম্বন্ধে সচেতন হ'য়ে উঠি।

যে দর্শক অত্যন্ত স্পর্শকাতর ও সচেতন, যার কল্পনা অতি তুচ্ছ নিশানা দেখে উদ্দাম হ'য়ে ছুটতে আরম্ভ করে, তার পক্ষে নাটক না দেখাই ভালো। মঞ্চে নাটকের অভিনয় দেখার তাঁর প্রয়োজন নেই। বরং নাটক দেখলে তাঁর কল্পনা মঞ্চ-উপস্থাপিত ঘটনা সংস্থাপনের দ্বারা কিয়ৎ পরিমাণে আবদ্ধ হয়ে তার প্রসারকে ক্ষুণ্ণ করতে পারে। উদাহরণ দিই—আমরা মঞ্চে নানান্ ধরণের প্রেক্ষাপট ও দৃশ্যপট ব্যবহার ক'রে সংস্কৃতিবান সহৃদয় সামাজিকের রসোপলব্ধিকে নানাভাবে ব্যাহত করে এসেছি অনেক দিন ধরে। তাই

আধুনিক নাট্যদর্শনে এই ধরনের প্রেক্ষাপট ও দৃশ্যপটের ভূমিকা সঙ্কুচিত হ'য়ে এসেছে। দর্শকের দৃষ্টিকে তথা কল্পনাকে যেমন প্রেক্ষাপট ও দৃশ্যপট ক্ষুণ্ণ ও সঙ্কুচিত করতে পারে, ঠিক তেমনি ক'রে অভিনেতার অভিনয়ও সময়ে সময়ে তাকে ক্ষুণ্ণ করে, পীড়িত করে। যে ক্ষেত্রে অভিনেতা দর্শকের মনে রসের প্রস্রবণকে উৎসারিত ক'রে দিতে সহায়ক হয়, সেক্ষেত্রে অভিনেতা হাততালি পায়, তাকে আমরা সাধুবাদ দিই। এখন প্রশ্ন করা যেতে পারে যে অভিনেতা কেমন ক'রে, কোন অর্থে দর্শকের মনে রসের উজ্জীবনে সহায়ক হয়? অভিনীত চরিত্রের ব্যবহার সম্বন্ধে কী অভিনেতার সাক্ষাৎ জ্ঞান ও সাক্ষাৎ জ্ঞানের প্রতীতি থাকা প্রয়োজন? অভিনেতার সাক্ষাৎ জ্ঞান না থাকলেও বোধ হয় চলে; কিন্তু দর্শকের পক্ষে এই সাক্ষাৎ জ্ঞানটুকু অপরিহার্য। মনে করা যাক্ একজন বন্ধ্যা সন্তানহীন অভিনেত্রী সদ্য পুত্রহারা জননীর ভূমিকায় অভিনয় করছেন। প্রেক্ষাগৃহে উপস্থিত মায়েরা কেঁদে আকুল হয়ে উঠেছেন তাঁর অভিনয় দেখে। অভিনেত্রী দৃশ্যপট পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সাজঘরে প্রত্যাবর্তন ক'রে সহকর্মীদের সঙ্গে রঙ্গরসিকতায় মেতে উঠলেন; হয়ত বা একটা সিগারেটই ধরিয়ে বসলেন। প্রেক্ষাগৃহে দর্শক মায়েরা তখনো আঁচল দিয়ে হয়ত চোখের জল মুছছেন। শুধু তাই নয়, আরিস্ততলীয় ক্যাথারসিস্ তত্ত্ব দিয়ে সমস্ত করুণ ব্যাপারটার ব্যাখ্যা করলে মঞ্চে এই দৃশ্য সংস্থাপনার ক্ষণটুকু আমাদের ব্যবহারিক জীবনেও যে বহুলাংশে প্রভাব বিস্তার করবে, এই সত্যটুকুকে স্বীকার করতে হয়। এই প্রসঙ্গে আমরা মালভিদা ফন্‌মাইসেনবার্গের রঁমা রঁলাকে লেখা পত্রটির কথা স্মরণ করতে পারি। তিনি রঁলাকে লিখেছিলেন যে ওথেলো নাটকের অভিনয় দেখে তিনি তাঁর আবেগগত জীবনের সমস্যার সমাধান খুঁজে পেয়েছেন। যে সব অভিনেতা তাঁদের অভিনয় আঙ্গিকের সুষ্ঠু প্রয়োগ করে এক ধরনের নাট্য-আশ্রয়ী ঘটনার gestalt মঞ্চের উপর গড়ে তুলেছিলেন তার মধ্যেই ছিল মালভিদার ব্যক্তিগত জীবনের সমস্যা সমাধানের ইঙ্গিত। সেই সমাধানটুকু খুঁজে দেওয়ার দায়িত্ব এবং কৃতিত্ব অভিনেতার ছিল না; সে কৃতিত্বটুকু সম্পূর্ণরূপে মালভিদার। মালভিদা আপন কল্পনায় যে রোমান্টিক জগৎ সৃষ্টি করেছিলেন তার উপাদান তিনি আহরণ করেছিলেন আপনার অভিজ্ঞতা থেকে, আপন জীবনের পত্রপুট থেকে। আপনার মনের মাধুরী মিশিয়ে তিনি যে রূপের জগৎ সৃষ্টি করলেন, সেই রূপের উৎস থেকেই তিনি তাঁর আবেগগত জীবনের সমস্যার সমাধানটুকু উদ্ধার

করলেন। মালভিকা আপন রোমান্টিক প্রেমবিরহের জগতটুকু সৃষ্টি করেছিলেন বলেই তিনি সমাধানটুকু খুঁজে পেয়েছিলেন সেই আপনসৃষ্ট রসের জগৎ থেকে। এখানে মালভিকা হ'লেন স্বয়ং স্রষ্টা। দর্শকের মনে রসের সঞ্চার ব্যাপারে অভিনেতা উপায় মাত্র। মঞ্চসজ্জা, বহিরঙ্গের উপকরণ, দর্শকের মানস প্রস্তুতি ও প্রবণতা—এরা যেমন দর্শক মনে রসের উদ্বারণে সহায় হয়, ঠিক তেমনি করে সহায় হয় অভিনেতা ও তাঁর অভিনয়।

পূর্বেই বলেছি অভিনেতা মিথ্যার বেসাতি করেন। যে অনুভব তাঁর নেই, তিনি সেই অনুভূতির আলেখ্য রচনা করেন। আগের দেওয়া বন্ধ্যা অভিনেত্রীটির উদাহরণে আবার ফিরে আসা যাক্। যে মেয়ে 'মা' হল না সে আর সন্তান হারানোর বেদনা অনুভব করে কী করে? অভিনয় আঙ্গিকের মাধ্যমে সে একটা 'এ্যাবস্ট্রাক্ট' বেদনার ছবিকে মঞ্চে সত্য করে তুলেছে কোন্ মন্ত্রবলে, এটি আমাদের ভেবে দেখা দরকার। সহৃদয় সামাজিক যে বেদনা বোধ করছেন, সে বেদনা অভিনেতার নেই, অথচ তিনি অপরকে বেদনাটুকু অনুভব করানো ব্যাপারে প্রধান উপায়। দর্শকমনে সন্তানহারা মায়ের বেদনাটুকু অসীম কারুণ্যে সত্য হয়ে ওঠে দর্শকের কল্পনার প্রসাদ গুণে। দর্শকের কল্পনাকে উজ্জীবিত করে তোলে অভিনেতার অভিনয় নৈপুণ্যে। সেই অভিনয় নৈপুণ্যই হ'ল দর্শকমনে সৃষ্টিকর্ম উজ্জীবনের Stimulus, রক্তবর্ণ বস্ত্রখণ্ড যেমন প্রমত্ত বলীবর্দের পক্ষে উদ্দীপক মাত্র। তেমিধারা অভিনেতার অভিনয়ও দর্শকের মনে রসের প্রস্রবণের উদ্দীপক। লালকাপড়ের দায়িত্ব কতটুকু থাকে প্রমত্ত ষণ্ডের সংহার লীলায় তার গাণিতিক হার নির্ণয় অত্যন্ত দুরূহ কর্ম। ঠিক ঐ ভাবেই সহৃদয় হৃদয় সংবাদীর সৃষ্টিকর্মে অভিনেতার অবদানটুকুর অকিঞ্চিৎকর পরিমাণটুকু নির্ণয় সাপেক্ষ। একমাত্র পুত্রকে পিতা হত্যা করছেন, আপন পুত্রকে চিনতে না পেরে, এই দৃশটুকু সোহরাব রোস্তাম নাট্য আখ্যানের climax; এই দৃশ্যে ও রোস্তাম সোহরাব—প্রবুদ্ধ মহাযোদ্ধা ও তরুণ উদীয়মান বীরের ভূমিকা নিয়েছেন। তাঁদের সাজ-পোষাক, ঢাল-তলোয়ার, যোদ্ধবেশ, সর্বোপরি তাঁদের অস্ত্রচালনার কৌশল, বীরত্ব-ব্যঞ্জক পদক্ষেপ ও ও গতি—এরা যুক্ত হয়ে পিতাকে পুত্র হত্যায় উদ্বুদ্ধ করেছে—আর এই সমগ্র দৃশ্যটি দর্শকের মনে করুণ রসের প্রস্রবণকে উৎসারিত ক'রে দিয়েছে। নাটকের পরিণতি সোহরাবের মৃত্যু, এই করুণ ঘটনাটি একটি ব্যঞ্জনাময় সংকেত। এই সংকেতটি দেখার সঙ্গে সঙ্গেই 'দর্শক মনে' অভিনীত ঘটনা পারম্পর্যের climax-

টুকু দেখা দেয়। 'দর্শকমনে' কথাটি ইচ্ছা করেই ব্যবহার করলেম কেননা নাটকের climax অনেক সময়েই অমনোযোগী দর্শকের মনে কোন রেখাপাত করে না। ওথেলো যখন নিদ্রাগতা ডেসডিমোনাকে হত্যা করতে অগ্রসর হচ্ছেন—তাঁর সেই ভীষণ-সুন্দর 'সলিলকি'—"Put out the light and then put out the light"—হয়ত আপনার পাশের দর্শককে একেবারেই প্রভাবিত করতে পারে নি। তিনি হয়ত ঠিক সেই মুহূর্তে হাই তুলতে তুলতে ঘড়িতে সময়টা দেখছেন, নাটক শেষ হ'তে তখনো কত দেরী? তাই বলছি, প্রতিটি মনোযোগী দর্শকের মনে নাটকটি অভিনীত হয়; দর্শকমনে আর এক রীতিতে, আর এক ঢঙে ঘটনাগুলি সন্নিবিষ্ট হয়। ঘটনাবলী যেভাবে সংস্থাপন ক'রে নাট্যকার রসিকজনকে আনন্দ দিতে চেয়েছিলেন, তার বহু বিচ্যুতি ঘটে মঞ্চে ঘটনাবলীর সংস্থাপনায়, অভিনেতার সাজসজ্জা, মঞ্চসজ্জা ও অভিনয় আঙ্গিকের প্রসাদে দর্শক যখন তাকে গ্রহণ করেন তখন আবার তিনি মঞ্চে অধিষ্ঠিত ঘটনাপ্রবাহকে, অনুভূতির তরঙ্গকে 'আপন' করে নিয়ে আর একভাবে তাকে আস্বাদন করেন। সুতরাং দর্শক আপন নাট্যজগৎ সৃষ্টি করেন, একথা বললে অত্যুক্তি হয় না। সে জগতের সঙ্গে মঞ্চের জগতের কোন মিল নেই; মঞ্চটা সংকেত মাত্র। নাট্যকার কথিত 'জীবন্ত জগৎ' মঞ্চের মধ্য দিয়ে অভিনেতার অভিনয় ও আনুষঙ্গিক সংঘটনকে আশ্রয় ক'রে দর্শকের মনে আর এক 'জীবন্ত জগতের' সৃষ্টি করে। এই দুই জীবন্ত জগতেও কোন মিল নেই। মনে করা যাক্ রামের রাজ্য অভিষেক দৃশ্য মঞ্চে দেখানো হচ্ছে। বাল্মীকি রামায়ণের রামের রাজ্য অভিষেকের কল্পনা সেই কাল ও দেশের দ্বারা নির্দিষ্ট। তা কল্পনার বস্তু। মঞ্চে তার যে অক্ষম পরিকল্পনা করা হ'ল তার সঙ্গে রামের রাজ্য অভিষেকের (যদি তা বাস্তবে কোনদিন হয়েও থাকে) কোন সাদৃশ্যই থাকতে পারে না। আবার এ যুগের কোন একজন দর্শক হয়ত প্রেক্ষাগৃহে ব'সে সেই রাজ্য অভিষেক দৃশ্যটি দেখছেন; তিনি হয়ত রাণী এলিজাবেথের রাজ্য-অভিষেক উৎসবে যোগ দিয়েছিলেন—তাঁর সেই রাজ-ঐশ্বর্য দেখার সুযোগ হয়েছিল। তিনি তখন আপনার মনে সেই নতুন ঐশ্বর্যময় রাজসভা থেকে কিছু কিছু ঐশ্বর্য চয়ন ক'রে রামের অভিষেক ক্রিয়াটুকু সম্পন্ন করবেন আপন মনের কল্পনাসমৃদ্ধ রাজসভায়। অবশ্য একথা এখানে বলে রাখা ভালো যে সাংকেতিক নাটকে, এ্যাবসার্ড নাটকে দর্শকের কল্পনা সবচেয়ে বেশী প্রাধান্য পায়। সাধারণ তথাকথিত বাস্তবধর্মী নাটকে দর্শকের কল্পনা

খুঁটিনাটি বিষয়ের ভারে ভারাক্রান্ত হ'য়ে পড়ে। অবশ্য সত্যিকারের সহৃদয় সামাজিক এইসব ছোটখাটো বাধা অতিক্রম ক'রে কল্পনার ঘোড়ায় চড়ে সাত সমুদ্দুর তেরো নদী পার হ'য়ে যান অনায়াসে। তিনিই আমাদের রসশাস্ত্রে কথিত রসিক সুজন, সহৃদয় হৃদয় সংবাদী।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে, নাটকে প্রধান ভূমিকা নাট্যকারের নয়; তা হ'ল দর্শকের। রবীন্দ্রনাথ বললেন :

"একাকী গায়কের নহে 'ত' গান, গাহিতে হ'বে দুইজনে,
একজন গাবে খুলিয়া গলা, আরেকজন গাবে মনে।"

নাটকে যিনি মনে মনে নাট্যরচনা করছেন তিনিই প্রধান। যিনি অভিনয় করছেন তিনি রেলের লেবেল ক্রসিং-এর সিগনালারের ভূমিকাধারী। তিনি নানান আঙ্গিকে সংকেত করছেন; আর প্রেক্ষাগৃহ ভর্তি দর্শকদের অধিকাংশই সেই সংকেতে সাড়া দিচ্ছেন। প্রেক্ষাগৃহে যদি হাজার দর্শক বসে রামায়ণে বর্ণিত রামের রাজ্য অভিষেক দৃশ্যটি দেখেন, তবে একথা অনস্বীকার্য যে তাঁরা সবাই একই দৃশ্য থেকে রসসম্ভোগ করছেন না। মঞ্চে অনুষ্ঠিত দৃশ্যটি সংকেতমাত্র। হাজার মনে সেই সংকেত হাজার ছবির সৃষ্টি করেছে— রঙে ও রেখায়, ঐশ্বর্যে ও ঋদ্ধিতে; এরা প্রত্যেকে প্রত্যেকের থেকে ভিন্ন ও স্বতন্ত্র। তাই সব দর্শকের রসসম্ভোগ একই কোটির হয় না। প্রত্যেকের রসসম্ভোগ হ'ল ভিন্ন কোটির।

নাটক ও নাটকীয়তা:
বিংশ শতকের ইংরেজী ও জার্মান নাটক

আমরা সাধারণভাবে 'নাটুকেপনা' কথাটিকে নিকৃষ্ট অর্থে গ্রহণ করি। জীবনের সঙ্গে সহজ যোগটুকু, জীবনের সঙ্গে সাযুজ্য এবং সামীপ্যটুকু হারিয়ে ফেললে, আমরা মানুষের ব্যবহারে এই 'নাটুকেপনা' লক্ষ্য করি। অর্থাৎ কেউ যদি বয়োজ্যেষ্ঠদের সঙ্গে সঙ্গে বয়োকনিষ্ঠদের সঙ্গেও 'আজ্ঞে, আপনি' করে কথা বলেন একটা করুণ বিনয়ের ভঙ্গি করে তবে তাকে 'নাটুকেপনা' আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। অথবা কেউ যদি ঘরে স্ত্রী-পুত্র কন্যার সঙ্গে মাইকেলী অমিত্র-ছন্দে 'কী কহিলি বাসন্তী' ঢঙে কথাবার্তা বলেন, তবে তাকেও 'নাটুকেপনা' বলা যেতে পারে। এককথায় অস্বাভাবিক বা অতি স্বাভাবিক আলোচনা অনেক সময়ে নাটুকেপনা বলে নিন্দিত হয়। আলোচনার সূত্রপাতে আমরা এই কথাটি বলতে চাই যে জীবন নাটক নয়। অবশ্য পরম সংস্কৃতিবান ভোজদেব বলেছিলেন যে শিল্প ও জীবন সমার্থক। জীবন রসের সঙ্গে শিল্প রসের কোন পার্থক্য নেই। ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যে তথা জৈন সাহিত্যে যেভাবে চতুঃষষ্ঠি ও দ্বিসপ্ততি কলার কথা বলা হয়েছে, তার ফলে জীবন ও শিল্পের নৈকট্য নিশ্চয়ই সুপ্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে। অবশ্য জীবন এবং কলাকে সমার্থক বলে গ্রহণ করতে অনেকেই ইতস্ততঃ করবেন। রামায়ণ, মহাভারত, ভর্তৃহরির বাক্যপদীয়, ক্ষেমেন্দ্রের কলাবিলাস প্রমুখ গ্রন্থে বিভিন্ন কলার যথাযথ বর্ণনা পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত প্রাচীন জৈন সাহিত্যের সমবায়াঙ্গ, নায়াধামকহ, বাজপ্রণীয়, ঔপপাতিক, নন্দীসূত্র প্রমুখ আগম গ্রন্থে আমরা বিভিন্ন কলার বর্ণনা ও ব্যাখ্যা পাই। এতদ্ব্যতীত কল্পসূত্র সুবোধিকা টীকা, কল্পসূত্র সন্দেহ বিষোষৌধিটীকা, কল্পসূত্রার্থ প্রবোধিনী-টীকা, জম্বুদ্বীপ প্রজ্ঞপ্তি টীকাও আবশ্যক নিযুক্তি-টীকায় এই সব কলার ব্যাখ্যা ও বর্ণনা পাওয়া যায়। পুরুষদের জন্য বাহাত্তরটি কলা ও মেয়েদের জন্য চৌষট্টিটি কলার নির্দেশ আছে এই জৈন শিল্প শাস্ত্রে। জীবন ও শিল্পের এক ধরনের সমীকরণকে প্রাচীন শিল্পশাস্ত্রীদের কেউ কেউ সমীচীন বলে মনে করেছেন।

কিন্তু এই ধরনের সিদ্ধান্ত বোধহয় যুক্তিসঙ্গত নয়। শিল্প বিভিন্ন রসের যোগান দেয় জীবনের বিভিন্ন সময়ে। হাস্যরসের কথাই ধরা যাক্। জীবনের অসঙ্গতিই হ'ল হাস্যরসের উপজীব্য। অসঙ্গতি জীবন নয়। আবার অসঙ্গতি

শিল্পও নয়। রবীন্দ্রনাথের কথায় সুমিতিবোধই হ'ল শিল্প। তবে হাস্যরসের মধ্যে সঙ্গতির স্থান কোথায়? অসঙ্গতি হাস্যরসের প্রাণ হলেও, পরিবেশিত শিল্পরসের মধ্যে সঙ্গতি থাকা খুবই দরকার। জীবনের দু'টি ঘটনা পারম্পর্যের বা ভাব পারম্পর্যের মধ্যে অসঙ্গতি থাকলে তবেই তা 'কমিক' হয়ে ওঠে। কিন্তু বুদ্ধির বা আবেগ অনুভূতির কাছে তাকে উপস্থিত করার সময় তাকে সুসঙ্গতির সাজপোষাক পরিয়ে হাজির করতে হয়। সেটা হল আর্টের Form এর দিক, রূপের দিক। আর যে অসঙ্গতিকে আশ্রয় করে হাস্যরস উৎসারিত হয়ে উঠে, তা হল জীবনের অসঙ্গতি, জীবন সত্যের অসঙ্গতি। এটা হল Content-এর দিক। অবশ্য রূপের ট্রুথটাই যে শিল্পের এবং সত্যের সবটুকু সেকথা কবি কীটস্ বলেছেন। এই রূপের কথাটাই হল নাটকের উপজীব্য। অবশ্য নাট্য-সত্যকে বোঝার জন্য বোধ হয় জীবন সত্যের প্রয়োজন হয়। জীবন সত্যের পটভূমিকায় স্থাপিত করে তবেই আমরা নাট্যসত্যকে স্বরূপে বোঝার চেষ্টা করি। নাট্যরসের উপভোগের সঙ্গে সঙ্গে আমরা নাট্য-সত্যকে স্বীকার করে নিই। জীবনের সঙ্গে কোথায় যে গরমিল হল সেটাও কিন্তু আমাদের অবচেতন মনে ধরা পড়ে। হয়ত সজ্ঞানে জ্ঞানাত্মিকা প্রক্রিয়ার সাহায্যে আমরা জীবন সত্য ও নাট্য-সত্যের মধ্যেকার বিভেদের চুলচেরা বিচার করতে বসি না। কিন্তু আমাদের নির্জ্ঞান মন, আমাদের অবচেতন মন সেই প্রভেদটুকু সম্বন্ধে সব সময়েই সচেতন থাকে। জীবনসত্যের মধ্যে দ্রষ্টাকে ক্রিয়াশীল করে তোলার জন্য একটা আহ্বান আছে। সেই আহ্বানে সাড়া না দিলে মনে হয় কর্তব্যচ্যুতি ঘটেছে। এটা অনেক দার্শনিকের চোখে Categorical impreativeএর মত। কোন কিছু আমার করা উচিত, এটুকু জানতে পারলে আমি তা না করে থাকতে পারি না; অন্ততঃ তা করতে না পারলে মনে মনে অশান্তি ভোগ করি। একেই আমি বলব জীবন সত্যের চ্যালেঞ্জ। এটি জীবনে আছে; শিল্পে নেই। বাড়ীর সামনের রাস্তায় মানুষ খুন হচ্ছে দেখলে, আমি চুপ করে বসে সেই হত্যাদৃশ্য উপভোগ করি না। হয় নিজে ছুটে যাই আততায়ীর হাত থেকে মুমূর্ষু ব্যক্তিটিকে বাঁচাবার জন্য; না হয় পুলিশে খবর দিই অথবা লোকটির প্রাণরক্ষায় জন্য অন্য কিছু করি। কিন্তু রঙ্গমঞ্চে ওথেলোর হাত থেকে ডেসডিমনাকে বাঁচাবার জন্য কোন চেষ্টাই করি না। রঙ্গমঞ্চের সত্য আমাকে উদ্বোধিত করে, আমাকে কাঁদায়, হাসায়। কিন্তু সবক্ষেত্রে Stimulus বা উদ্দীপকের যে ভূমিকা, সে ভূমিকা নাট্যসত্যের নয়।

তখুনি তখুনি আমাকে কোন কাজে উদ্বুদ্ধ করে না নাট্যসত্য। শান্ত সমাহিত হয়ে (একে মনস্তাত্ত্বিক পরিভাষায় Psychical distance বলা হয়েছে) আমরা নাট্যসত্যকে উপলব্ধি করি। জীবন সত্যের সঙ্গে তার যোগ এবং বিয়োগ, দুটোই হয়ত বুদ্ধি দিয়ে বুঝি। কিন্তু ডেসডিমোনাকে বাঁচানোর জন্ত আমি রঙ্গমঞ্চের দিকে ছুটে যাই না। মনে মনে অস্পষ্টভাবে জানি নাট্যসত্য জীবনসত্য নয়। জীবনের কোন একটা খণ্ড সত্যকে নাটক ফলবান করে তোলে। এই ফলবানতাই নাটকীয়ত্ব। মেঘনাদ যেখানে সাধারণ জীবন সত্যে আপনাকে সত্য করে তুলেছিল তার কথা আমরা জানি না। শ্রীরামচন্দ্রের জীবনে কি ঘটেছিল তা আমাদের অজ্ঞাত; কিন্তু শ্রীরামচন্দ্রের সবটুকুই শিল্প সত্য, সবটুকু নাট্যসত্য। মেঘনাদের জীবন সত্য (যদি তা থেকে থাকে) শ্রীরামচন্দ্রের মতই অপরিজ্ঞাত; তাদের নাট্য সত্যই হ'ল রবীন্দ্রনাথের ভাষায় রূপের ট্রুথ। তাকে অস্বীকার করা যায় না। আর তাকে অস্বীকার করলে শ্রীরামচন্দ্র ও মেঘনাদের অস্তিত্বকে অস্বীকার করা হবে। ঠিক এই কারণেই আদি কবি বাল্মীকিকে নারদ মুনি বললেন; 'সেই সত্য যা রচিবে তুমি'। বোধ হয় এই অর্থেই ভোজদেব জীবন সত্য ও কাব্য সত্যকে সমার্থক বলেছিলেন। কিন্তু একটি বিশেষ পরিপ্রেক্ষিতে এই কথা সত্য হয়ে উঠলেও এটি সার্বিক সত্য নয়। অর্থাৎ নিরঙ্কুশভাবে বলা চলে না যে জীবন সত্য ও নাট্য সত্য একই। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো, ভরতমুনি প্রমুখ শিল্পশাস্ত্রীরা নাট্যরস ও কাব্যরসকে সমার্থক বলেছেন। অর্থাৎ শিল্পরস বলতে তাঁরা নাট্যরসকে যেমন বুঝেছেন, তেমনি কাব্যরসকেও বুঝেছেন।

প্রেক্ষাগৃহে বসে আমি যখন রঙ্গমঞ্চে উপস্থাপিত নাট্য সত্যের অনুধাবন করছি, তখন সেই নাট্য সত্যকে অনির্বচনীয় বলে বুঝেছি। অবশ্য এ বোঝাটা অবচেতন মনের প্রক্ষেপ। আমি মেঘনাদপ্রেয়সী প্রমীলার তেজোদৃপ্ত ভাষণে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছি। কিন্তু মনে মনে জানি যে সবটাই মিথ্যা। আবার ঐ একই সঙ্গে লক্ষ্মণের হাতে মেঘনাদের মৃত্যুতে প্রমীলার দুঃখে অশ্রু বিসর্জন করছি। অথচ লক্ষ্মণকে মেঘনাদ বধ থেকে বিরত করার জন্ত কোন কিছুই করছি না। নাটকের নাটকীয়ত্বের দিকে তাঁর দুর্বার পরিণামের দিকে, তাঁর গতিপথের দিকে উৎসুক আগ্রহে তাকিয়ে থাকি। 'কর্মহীন' একটা আবেগ প্রবাহের মধ্যে নিজেকে স্বেচ্ছায় বন্দী করে রাখি। নাটকের নাটকীয়ত্ব আমাকে সেই ভাবের কারাগারে শৃংখলিত করে রাখে। কর্মের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণের অবাধ

অধিকার দর্শকের নেই। নাট্যলোকে কর্মের অধিকার শুধু কুশীলবের। দর্শকের নিস্পৃহ, কর্মহীন ভূমিকা নাট্যলোকের স্বধর্মের দ্বারা চিহ্নিত। জীবনের সঙ্গে নাটকের অনেক প্রভেদ। জীবন প্রতিনিয়ত যুদ্ধের আহ্বান জানায়। নাটকে সেই আহ্বান নেই। উপনিষদের দ্রষ্টা পাখী ভোক্তা পাখীর জন্য চোখের জল ফেলে না। সে জগতে অনুভূতি নেই। নাট্য জগতে দর্শক চোখের জল ফেলে, হাসে, কাঁদে। কিন্তু দ্রষ্টা পাখীর মত সে জানে যে নাট্যজগৎ সত্য নয়, যে অর্থে জীবন সত্য সেই অর্থে।

তথাকথিত দার্শনিক মিথ্যাত্ব নিয়ে বেসাতি করে বলেই নাট্যসত্য পরিবেশিত হয় বহুক্ষেত্রেই ব্যবসায়িক ভিত্তিতে। কী করে কেমন করে দর্শক মানুষকে আকর্ষণ করা যায় নাট্যলোকের মিথ্যার জগতে, সেটা নাট্য প্রয়োজক এবং নাট্যকারদের একটা বড় ভাবনার কথা। তাই আকর্ষণীয় বিজ্ঞাপন শিল্প পাশাপাশি বিবর্ধিত হতে লাগল ক্রমবর্ধমান নাট্যশিল্পের সঙ্গে। নাট্য আন্দোলন ব্যবসায়িক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে পড়ল।

এই শতকের ইংরেজী নাটকের চরিত্র ধর্মের উপর টীকা লিখতে বসে প্রথমেই এই অসংশয়িত সত্যটি অতি ভাস্বর হয়ে পড়ে যে গ্রেট ব্রিটেনে রঙ্গমঞ্চ ব্যবসায়ভিত্তিক হয়ে পড়ল এই শতাব্দীতেই ; এর ফলশ্রুতি হলো ইংলণ্ডের দিকে দিকে Repertory Play houseএর প্রতিষ্ঠা। এটি হল একটি সামগ্রিক প্রচেষ্টার অঙ্গ বিশেষ ; এই প্রচেষ্টার পিছনে যাঁদের প্রেরণা কাজ করলো তাঁদের মধ্যে Annie Hornimanএর নাম সর্বাগ্রে স্মরণীয়। ডাবলিন এর Abbey থিয়েটার (১৯০৩) এবং ম্যানচেষ্টারের Gaiety থিয়েটারে হর্ণিম্যানের প্রতিভার স্বাক্ষর রয়েছে। তাঁর একক প্রচেষ্টায় অবশ্য ব্রিটিশ রঙ্গমঞ্চের সম্যক উন্নতি সম্ভব হয় নি। আরও যাঁরা ব্রিটিশ রঙ্গমঞ্চকে পূর্ণতর শিল্পে শিল্পায়িত করার জন্য প্রাণ ঢালা পরিশ্রম করলেন, ব্রিটিশ নাট্য দর্শনকে সমৃদ্ধ করার জন্য প্রয়াসী হলেন তাঁদের মধ্যে Nugent Monck, Sir Barry Jacksonও রয়েছেন। এই শতাব্দীর ইংরেজদের নাট্য প্রচেষ্টাকে একধরনের জীবন দর্শন প্রভাবিত করেছিল ; তা হ'ল নাট্যের কুশীলবেরা যে ধরনের চরিত্র কে রঙ্গমঞ্চে রূপায়িত করেছিল তাদের মধ্যে নাটক নির্দেশিত সম্বন্ধটুকু অর্থাৎ নাট্যে যে সব চরিত্র উপস্থিত হ'ল তাদের চারিত্র্য ধর্ম যে তাদের পারস্পরিক সম্বন্ধটুকুর মধ্যে বিধৃত হয়ে আছে এই সত্যটুকুকে ইংরেজ নাট্যকারেরা স্বীকার করলেন। মানুষের পরিচয় তার একক, পৃথক ও বিচ্ছিন্ন অস্তিত্বে নয়

বিচ্ছিন্নতা এ যুগের অভিশাপ। এ যুগেই বা বলি কেন, বিচ্ছিন্নতা হ'ল সর্বকালের সামাজিক সত্য এবং মানুষের আত্মবিকাশের ও আত্মসম্প্রসারণের পক্ষে সবচেয়ে বড় বাধা। Existentialist (অস্তিবাদী) দর্শনে যে বিচ্ছিন্নতার কথা বেশ জোরের সঙ্গে বলা হল, যে বিচ্ছিন্নতার বিরুদ্ধে নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ বার বার জেহাদ ঘোষণা করলেন, সেই বিচ্ছিন্নতার বিপরীতগামী হ'ল এই শতকের ব্রিটিশ নাট্য আন্দোলন, তাই তাদের নাট্য-দর্শনে তার ইঙ্গিত সুস্পষ্ট।

ব্রিটিশ নাট্যদর্শনের এই বিশেষত্বটুকু বহুদিনের বহু মানুষের অনলস প্রয়াসের একান্ত ফলশ্রুতি। জার্মান দার্শনিক হেগেল প্রসঙ্গান্তরে বলেছিলেন 'Man is not a moral Melchizedek ; he must live move and have his being in a society.' মানুষের জীবনদর্শনে হেগেল কথিত এই মৌল সত্যটি ব্রিটিশ নাট্যদর্শনে অনুস্যুত হয়ে গিয়েছিল সবার অলক্ষ্যে। Relation বা সম্বন্ধ সম্পর্কে ব্রাডলির সাংকেতিক ভাষায় হিংটিংছটের পূর্ণ উল্লেখ না করেও একথা বলা চলে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধে ব্যক্তি চারিত্র্যকে নির্দিষ্ট রূপ দেয়। ব্রিটিশ নাটকে এই পরম সত্যটিকে আশ্রয় করে বিভিন্ন চরিত্রের সত্যধর্মটুকু উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। নাটকীয় চরিত্রগুলি পারস্পরিক সংঘাত ও সহ-অবস্থানকে আশ্রয় করে দোসর জনার মিলন বিরহের পরিপূর্ণতাই পরস্পরকে পরিপূর্ণ করে তোলে আর সেই পরিপূর্ণতাই তাদের চরিত্র সত্তার অঙ্গ। উদাহরণস্বরূপ জন মেসফিল্ড এর "The Tragedy of Nan" (১৯০৮) নাটকটির কথা বলি। Nanএর জীবনের tragedy করুণ রসের প্রস্রবণকে উৎসারিত করে দিয়েছে দর্শকের মনে। যে দুঃখ, যে বেদনা, যে হতাশা Nanএর চরিত্রকে ঘিরে রয়েছে তাদের সৃষ্টির আদিতে রয়েছে Nanএর সঙ্গে তার পিতৃদেবের জন্মসূত্রে আত্মীয়তার বন্ধনটুকুতে। Nanএর পিতা হলেন এক দাগী চোর ; ভেড়া চুরির অপরাধে তার ফাঁসি হয়েছিল। এই দাগী চোরের সঙ্গে Nan এর যে অচ্ছেদ্য পিতাপুত্রীর সম্বন্ধের বন্ধন সেই বন্ধনই Nanএর চরিত্র ঐশ্বর্যের উৎসারকে ব্যাহত করল। Nanএর জীবন-সাধনা তার পিতৃদেবের সঙ্গে তার রক্তের সম্বন্ধটুকুর বাইরে যেতে পারল না। তার চরিত্রের মূল্যায়ন হ'ল একটি সম্পর্ককে কেন্দ্র করে। যে সম্পর্ক হল পিতা পুত্রীর সম্পর্ক এবং সেই সম্বন্ধই Nanকে অন্তেবাসী করে রাখল। এই অন্তেবাসী চণ্ডালিকার দুঃখের বোঝা বেড়েই চলল। আবার সেই সম্বন্ধে সম্পর্কের নির্দেশনা। ইন্দ্রিয়পরায়ণ আত্মসর্বস্ব Dick Gurvil নাম-এর জীবনে

এলো ; Nan তাকে ভালোবাসল। Gurvil এর ভালোবাসায় Nan এর চরিত্রের একটি দিক অবারিত হল দর্শকের চোখে ; খুল্লতাত Pargelter দুর্বল চরিত্র এবং তাঁর পত্নী Mrs. Pargelter কঠোর চরিত্র, দয়ামায়াহীন রমণী। এঁদের দুজনের সৌহার্দ্য এবং সৌহার্দ্যের অভাবের অভিঘাতে Nan এর চরিত্রের নতুন নতুন দিকদর্শন ঘটেছে সাধারণ দর্শকের চোখে। ফাঁসি কাঠে নিহত পিতৃদেব, অপদার্থ পুরুষ প্রণয়ী, দুর্বল চরিত্র খুল্লতাত, স্নেহহীন খুল্লতাত পত্নী এরা সকলে Nan এর চরিত্রকে বিয়োগান্ত পরিণতি দান করেছে। সে পরিণতি হলো Severn Bore এর জলে Nan এর সলিল সমাধি।

প্রসঙ্গত জার্মান ভাষায় লিখিত আর একটি নাটকের কথা বলি ; Franz Kafkaর 'The Trial' নাটকটি যে সব চরিত্রের অবতারণা করেছে তাদের মাধ্যম হ'ল Joshephk ; সুদর্শন, সদালাপী মার্জিত রুচি মধ্যবিত্ত সমাজের কৃষ্টিবান পুরুষ। জীবনের কাছ থেকে আনন্দের উপচার গ্রহণ করতে এবং প্রতিদানে সমাজকে বৃহত্তর আনন্দের সন্ধান দিতে Joshephk ছিলেন সদা-উন্মুখ। তারপর নাটকের ঘটনা-স্রোতের ঘাত-প্রতিঘাত যে সব চরিত্রের দ্বারা উদ্বোধিত হল তারা হলেন পুলিশের Inspector এবং তার পার্শ্বচরেরা, Frau Groubech, Fraulein, Purstner, Elssa ব্যাঙ্কের সহকারী Joshephk এর খুল্লতাত তার বান্ধব, Joshephk এর আইনজীবি Dr Hold, লাস্যময়ী তরুণী Leni, শিল্পী Titorelli এদের সবার চারিত্র্য শক্তি ; অন্ধ লোভ, ঈর্ষা, অলস নিষ্ক্রিয়তা ও গতানুগতিকতার স্রোতে সব ভাসিয়ে দিয়ে আলস্য ভরা উপভোগ প্রবণতা K চরিত্রকে এরা মর্মান্তিক পরিণতি দিয়েছিল। এই সব বিভিন্নধর্মী চরিত্রের অভিঘাতের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল অচলায়তন সমাজের অচলতা। যে সমাজ ন্যায় অন্যায়ের বিচারকে উপেক্ষা করে ভালো-মন্দের জ্ঞানটুকুকে বিসর্জন দিয়ে অলস আয়াসে গা ঢেলে দেয়, তার প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির মানবতায় যে পরিচয় ঘটে তার সাক্ষ্য আছে 'The Trial' নাটকটির সর্বাঙ্গে। নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ যে অচলায়তনকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন, যে অচলায়তনকে দেখেছিলেন Frank Kafka, মনস্বী পাঠক যতই নাটকটির গভীরে প্রবেশ করবে ততই তার মনে এক ধরনের প্রতিবাদ এবং বিদ্রোহ পুঞ্জীভূত হয়ে উঠবে ; সামাজিক অবস্থার চাপে Joshephk চূড়ান্ত ভাবে যে সমাজব্যবস্থার কাছে আত্মসমর্পণ করল পাঠকের সমগ্র সত্তা জুড়ে

তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সোচ্চার হয়ে উঠল। Joshephk তাঁর পরিচিত এবং আধা পরিচিত এবং অপরিচিত মানুষদের চারিত্র্য অভিঘাতে এবং অলস নিষ্করুণ সমাজের অব্যবস্থাপনার দৌরাত্ম্যে মর্মান্তিক বিয়োগান্ত পরিণতিতে উপস্থিত হ'ল। Joshephk জীবনাহুতি দিয়ে শান্ত ভাবে তার প্রতিবাদটুকু জানালেন। কিন্তু পাঠকের মনে তা সরব প্রতিবাদে বিস্ফোরকের মত ফেটে পড়ল। এই শতকের ব্রিটিশ নাটকের মধ্যেও আমরা Kafka কথিত অদৃশ্য সামাজিক শক্তির লীলা প্রত্যক্ষ করেছি। নাটকীয় চরিত্রের আবর্তন লক্ষ্য করা গেছে একদিকে যেমন অন্যান্য পাত্রপাত্রীদের চারিত্র্য অভিঘাতের মধ্য দিয়ে তেমনি আবার সামাজিক বিধিব্যবস্থাও নাটককে গতিশীল করেছে; নাটকের চরিত্রগুলিকে নির্দিষ্ট পথে চালিত ক'রে তাদের একটি সুনির্দিষ্টতা দিয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ আমরা Galsworthyএর কথা বলতে পারি। তাঁর নাটকগুলির মধ্যে Strife, Justices, The Pigeon, The Eldest Son, The Fugitive এবং The Mob সমধিক প্রসিদ্ধিলাভ করেছে। Strife নাটকটিতে, আমরা নাটকীয় চরিত্রে বীর্যবত্তা অথবা দুর্বলতার চেয়ে আমরা প্রত্যক্ষ করেছি বিবদমান দু'টি তত্ত্বের বিরোধ। পুঁজিবাদী সমাজ দর্শনের সঙ্গে পুঁজিবাদী বিরুদ্ধমতবাদিতার সংগ্রাম। কোম্পানীর প্রধান Antony সাহেবের বিরাট ব্যক্তিত্বের ছায়া পড়েছিল কোম্পানীর সমগ্র কর্ম নৈপুণ্যে। সেই দূর বিস্তৃত অশুভ প্রভাবের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়ালেন শ্রমিকনেতা Roberts; ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে শ্রমতান্ত্রিক মানুষের জেহাদ ঘোষণায় সমাজের সব তলাতেই বিপ্লব শুরু হয়। সেই বিপ্লবের পরিণতি নাটকীয় চরিত্রগুলিকে এক বিশেষ ধরনের পরিণতি দিয়েছে এবং পরিণতি হল যুযুধান সামাজিক শক্তির দেওয়া এক ধরনের সুনির্দিষ্টতা। এর হাত থেকে নাটকের কোন চরিত্রের রেহাই নেই। ব্যক্তিগত চরিত্রের বীর্যবত্তা এই সুনির্দিষ্ট সামাজিক পরিণতিকে কোথাও একটুও ব্যাহত করতে পারে না। Galsworthy-র অন্যান্য নাটকেও আমরা এই সামাজিক শক্তির একচ্ছত্র প্রতাপ লক্ষ্য করেছি। 'Justice' নাটকে, 'The Mob' নাটকে সেই একই তত্ত্বের পুনরাবৃত্তি। কোথাও মানুষের অসামাজিক জীবনযাপন প্রবণতা, কোথাও তার নৈতিক শিথিলতা কোথাও বা সমাজের স্ত্রীলোকের উপভোগ্য স্বাধীনতার তত্ত্বটুকু নাটকের প্রধান উপজীব্য হয়ে উঠেছে। এখানে আমরা এ কথা না বলে পারি না যে Galsworthy ও সমসাময়িক বৃটিশ নাট্যকারদের

নাট্য দর্শনে এথেনীয় ও এলিজাবেথীয় ঐতিহ্যবাহকতা ও গতানুগতিকতা থেকে মুক্ত হতে পারে নি। শুধুমাত্র অর্থনৈতিক এবং বস্তুতান্ত্রিক সমাজ-বাদীদের ধ্যানধারণাও বিশ্বাস কোন বিয়োগান্ত নাটকের মর্মস্পর্শী পরিণতিটুকু দান করতে পারে না। তার জন্ত প্রয়োজন নাট্যকারের এক দিগন্ত থেকে অন্ত দিগন্ত স্পর্শী সুবিরাট দৃষ্টিভঙ্গি ও তার ভাবানুষঙ্গ। নাট্যকারের এই ধরনের পরাদার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীর স্বচ্ছতায় জীবনের দৈনন্দিন সুখ দুঃখ উত্তীর্ণ এক দার্শনিক দৃষ্টি মহাবলয়ে আব্রহ্মস্তম্ভবিলম্বিত মানুষের সমগ্র জীবনবোধটুকু প্রতিফলিত হয়। সমালোচক এই 'সম্যক্‌দর্শন' করার ভঙ্গিটুকুর নাম দিয়েছেন Metaphysical Vision—এই দার্শনিক দৃষ্টি হল সার্থক নাট্যকারের অন্তর্দৃষ্টি। ক্রোচীয় পরিভাষায় একেই আমরা স্বজ্ঞা বা intuition এর সঙ্গে তুলনা করতে পারি। এর মধ্যে এমন এক ধরনের সমগ্রতা বিধৃত যার সন্ধান বস্তুতান্ত্রিক এবং সমাজতান্ত্রিক দর্শনের ক্ষুদ্র পরিসরে অলভ্য। এই সমগ্রতা নাট্য শিল্পীর জীবনায়নেও আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। সার্থক অভিনেতা, গুণী নাট্যকার, এঁরা কিন্তু আপন আপন জীবনবেদেও এই সমগ্রতাটুকুর প্রতিষ্ঠা করেন। বৌদ্ধদর্শনে যে সম্যক দৃষ্টি, উপনিষদে যে ভূমাবন্দনার কথা আমরা পাই, তার প্রয়োগ ব্যতিক্রম যেমন নাট্যবেদে নেই, তেমনি আবার তা নাট্যবেদীয় জীবনবেদেও নেই। জার্মান রঙ্গমঞ্চের জনক কনরাড একহফের কথাই বলি। একহফ তাঁর শ্রেণীর সঙ্গে, তাঁর সম্প্রদায়ের সঙ্গে, তার সমাজের সঙ্গে, একাত্ম হয়ে বেঁচেছিলেন। তাঁর শিল্পচেষ্টার কেন্দ্রবিন্দু ছিল এই বৃহত্তর সমাজ। তাঁর বিশ্বাস ছিল বৃহত্তর মানবাত্মা এই বৃহত্তর সমাজকে অবলম্বন করে থাকে। তাইত কবি গ্যয়েটে এক মরণোত্তর প্রশস্তি গেয়ে লিখলেন !

"তোমরা শোন
তোমাদের জন্ত তিনি শিল্পকলায় সৃষ্টি করে ছিলেন ;
তোমাদের শ্রেণীকে করেছিলেন মহত্তর
তোমাদের নাটকের তিনি ছিলেন দৈববাণী
তোমাদের প্রথার তিনি ছিলেন প্রতিভূ।"

দার্শনিক লেসিংগ তাঁর প্রখ্যাত গ্রন্থ 'হামবুর্গিশে ড্রামাটার্গি' গ্রন্থটি লিখলেন একহফের অভিনয় থেকে প্রেরণা পেয়ে। নাট্যবেদ এবং জীবনবেদ যে দার্শনিক প্রত্যয়ের গভীরে একাত্ম হয়ে গেছে সে কথা লেসিংগ ঘোষণা করলেন, যেমনটি

করেছিলেন ভারতীয় রসশাস্ত্রী ভোজদেব। আধুনিক ব্রিটিশ রঙ্গমঞ্চে যে ধারা বহমান, তা একদিকে যেমন জার্মানীর নাট্যভাবনার সঙ্গে সঙ্গতি রেখেছে, অন্যদিকে আবার তা ভারতীয় ভাবেরও বিরোধী নয়। সর্বগ ভাব-ভাবনা বিশ্বজনীন হয়ে উঠেছে নানাদেশের রঙ্গমঞ্চকে আশ্রয় করে। কোন বিশেষ ভাব কোন দেশ বিশেষের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নেই।

ডাকঘর নাটকের রঙ্গমঞ্চে রাজার আবির্ভাব ঘটল মৃত্যুর ছায়াশীতল পরিপ্রেক্ষিতে। সে রাজা হলেন সকল রাজার রাজা, ষড়ৈশ্বর্যশালী ভগবান। রক্তকরবীর রাজা কিন্তু 'ভগ অস্ত্যর্থে মতুপ্' এই অর্থে অর্থবান নয়। সে কথা পরে বলছি।

রক্তকরবীর আখ্যানভাগ একটি তত্ত্বসমাবৃত কাহিনী। আমাদের জগতে এ নাটকের প্রতিদিন অভিনয় হচ্ছে। যেখানেই জীবন, জীবন থেকে বিযুক্ত হয়ে পড়ছে, আপনার ক্ষুদ্র গণ্ডী রচনা করে, যেই সে পৃথক, স্বতন্ত্র হতে চাইছে, তখনই সে সার্বিক জীবনধারার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। সে নিজেকে অনন্ত এবং স্বতন্ত্র জ্ঞান করছে। তার দাসদাসী, তার লোক লস্কর, সর্দার উজীর আমীর ওমরাহ, এরা সবাই তাকে ঘিরে ধরে তার চলমানতাকে স্তব্ধ করে দিচ্ছে। সেই বিচ্ছিন্ন প্রাণ রাজা সেজে মুকুট পরছে, ধ্বজাদণ্ড আকাশে তুলে তার অনন্যসাধারণতার কথা ঘোষণা করছে। আপন দম্ভের প্রতীকরূপে আপনার কীর্তিধ্বজা উড়িয়ে দিয়ে আপনাকে স্বতন্ত্র করে রাখতে চাইছে অন্য পাঁচজনের থেকে। সেই বিচ্ছিন্নতার মধ্যে তার লোভ, তার মদগর্ব, এ সবই তৃপ্ত হয়। তার সঞ্চয় প্রবৃত্তিটা ক্রমেই বেড়ে উঠতে থাকে। ধন যত জমা হয়, ততই সে ধনের প্রাকার বেষ্টনে আবদ্ধ হয়ে বৃহত্তর সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। জনসাধারণ তার কাছে "The Other" বা ভিন্নধর্মী বলে প্রতিভাত হয়। এই বিচ্ছিন্নতা তাকে প্রতিদ্বন্দ্বী করে তোলে। এই অপর বা 'Other'ই হল বিশ্বব্যাপী প্রাণস্রোত ; এই প্রাণেই যৌবনের প্রতিষ্ঠা, সৌন্দর্যের প্রতিষ্ঠা আর এই প্রাণই হল কৈশোরকের প্রতিষ্ঠাভূমি। রক্তকরবীর রাজা হ'ল এই 'ছিন্নপ্রাণ'। মহাপ্রাণ অর্থাৎ অবিচ্ছিন্ন প্রাণস্রোতেই হল অমৃত সুরের ছেদহীন প্রবাহ। এই প্রবাহে নন্দিনী, রঞ্জন, কিশোর ও বিশু পাগলার নিত্য অবগাহন। এরা সবাই এই প্রাণ প্রবাহের এক একটি বিশিষ্ট রূপ। কেউ এসেছে সুন্দরের ধ্বজা উড়িয়ে, কেউ যৌবনের কেউ কৈশোরের আবার কেউ বা আত্মভোলা উদাসীন সন্ন্যাস-বৈরাগ্যের ; সেই বৈরাগ্যেই মানুষের যথার্থ মুক্তি। এই বৈরাগ্যই যৌবনের জয়টীকা ; তাই এই বৈরাগ্যে এতো সৌন্দর্য, এতো প্রাণ, এতো মাধুর্য।

রাজা জীবনের বিচ্ছিন্ন রূপ। সমাহৃত ঐশ্বর্য, সোনার পাহাড় এই রূপকে

সৃষ্টি করে। বিচ্ছিন্ন প্রাকৃতিক জীবনের রূপ ঐশ্বর্যের বেড়াজালের আড়ালে আত্মগোপন ক'রে 'ভয়ংকর' হয়ে ওঠে। সহজ জীবনের প্রতিভূ হল নন্দিনী, রঞ্জন কিশোর আর বিশু পাগল ; এরা জীবনের এই বিচ্ছিন্ন রূপটুকু দেখতে চায়। রাজা দেখা দিতে ভয় পায়। রাজা মনে করে অন্যে তাকে দেখে ভয় পাবে। রাজা জানে যে তার বিচ্ছিন্নতাই তাকে ভয়ংকর করে তুলেছে। তাই তো অধ্যাপক নন্দিনীকে বলে : 'আমাদের রাজা যেমন ভয়ংকর, আমিও তেমনি ভয়ংকর পণ্ডিত'। রাজা যেমন সার্বিক প্রাণস্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন বলেই ভয়ংকর, ঠিক তেমনি অধ্যাপক যখন জীবনের যোগটুকু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, শুধু পাণ্ডিত্যের মধ্যে বদ্ধ হয়ে পড়ে, তখন তার পাণ্ডিত্যটুকুও 'ভয়ংকর' হয়ে ওঠে।

ব্রাট্রাণ্ড রাসেল মানবচিত্তের দুটি প্রবৃত্তির কথা প্রণিধানযোগ্য বলে উল্লেখ করেছেন। এরা হলো 'Possessive instinct' এবং 'Creative instinct' অর্থাৎ মানুষের সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি আর সৃষ্টির এষণা। রক্তকরবীর রাজা মানুষের এই সঞ্চয় প্রবৃত্তিটাকে মূর্তি দিয়েছে। তিনি নিজের সম্বন্ধে নন্দিনীকে বলছেন : "নিজেকে গুপ্ত রেখে বিশ্বের" বড়ো বড়ো মালখানার মোটা মোটা জিনিস চুরি করতে বসেছি! কিন্তু যে দান বিধাতার হাতের মুঠির মধ্যে ঢাকা সেখানে তোমার চাঁপার কলির মতো আঙুলটি যতটুকু পৌঁছায় আমার সমস্ত দেহের জোর তার কাছ দিয়ে যায় না। বিধাতার সেই বদ্ধ মুঠো আমাকে খুলতেই হবে। ...নন্দিনী, তুমি কি জান, বিধাতা তোমাকেও রূপের মায়ার আড়ালে অপরূপ করে রেখেছেন। তার মধ্যে থেকে ছিনিয়ে তোমাকে আমার মুঠোর ভিতর পেতে চাচ্ছি। রাজা সব কিছুকেই বিচ্ছিন্ন করে ভয়ের সামগ্রী করে তুলেছে ; ঠিক তেমনি করে সর্দার, মোড়ল, গোকুলা এরা সবাই সঞ্চয়ের ছায়ার আড়ালে আপনাদের স্বরূপটুকু হারিয়ে ফেলে ভয়ংকর হয়ে উঠেছে। তাইতো নন্দিনীর কাছে এরা কেউই গ্রহণযোগ্য নয়।

এই নাটকের রাজার আত্মবিচ্ছিন্নতা বা Self-alienation অস্তিবাদী দর্শনশাস্ত্রীদের কাছে একটি সুপরিজ্ঞাত তত্ত্ব। রবীন্দ্রনাথ মূলত কবি। তাঁর চোখে এই তত্ত্ব সত্যরূপে প্রতিভাত হয়েছে। তাই তো নাটকের মুখবন্ধে নাট্য পরিচয়ে বলা হল : এই নাটকটি সত্যমূলক অর্থাৎ কবির জ্ঞান বিশ্বাস মতে এটি সম্পূর্ণ সত্য। Alienation বা বিচ্ছিন্নতাই মানুষকে নিরেট নিরবকাশের গর্তের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখে। এটি অধিকাংশ মানুষের জীবনেই ঘটে।

আমরা অনেকেই আমাদের সঞ্চয়ের গর্তের মধ্যে রাজা হয়ে বসে আছি সেখানেই আমাদের জীবনের ট্রাজেডি। সেই ট্রাজেডির করুণ সুর অধ্যাপক -নন্দিনী সংবাদে অধ্যাপকের কণ্ঠে বেজে ওঠে: আমরা নিজেই নিরবকাশ গর্তের পতঙ্গ, ঘন কাজের মধ্যে সেঁধিয়ে আছি; তুমি ফাঁকা সময়ের আকাশে সন্ধ্যা তারাটি তোমাকে দেখে আমাদের ডানা চঞ্চল হয়ে ওঠে। নন্দিনী কিন্তু অধ্যাপককে সমগ্র জীবনধারার সঙ্গে যুক্ত করে দেখে; তাই সে অধ্যাপককে 'ভয়ঙ্কর' বলে জানে না। রবীন্দ্রনাথ আলোচ্য নাটকটিতে যে সার্বিক যোগের কথা বললেন তা দার্শনিক Spinoza কথিত Viewing things Sub Specie aeternitatis' বা বৌদ্ধদর্শনের 'সম্যগ্ দৃষ্টির' সঙ্গে তুলনীয়। সবটাকে দেখা অর্থাৎ সবটুকুকে একসঙ্গে ধরতে চেষ্টা করা; এটাই হল এই ধরণের 'সম্যগ দৃষ্টির' স্বরূপ লক্ষণ। দার্শনিক ক্রোচে যেমন তাঁর প্রতিভান বা 'intuition' ধারণার মধ্যে 'actual' এবং 'Possible'কে সমন্বিত করলেন অর্থাৎ বাস্তব এবং সম্ভাব্যকে ধরতে চাইলেন আপনার অভিজ্ঞতার বিস্তারের মধ্যে, ঠিক সেইভাবেই রবীন্দ্রনাথ এই বিশ্বযোগের মধ্যে সবটুকুকে বিধৃত দেখলেন। যারা এই যোগ থেকে বিচ্ছিন্ন তাদের কথা বলতে গিয়ে অধ্যাপক বলছেন, 'সব জিনিষকে টুকরো করে আনাই এদের পদ্ধতি'। এ পদ্ধতি কিন্তু নন্দিনীর নয়। নন্দিনী হল সেই অবিচ্ছিন্ন প্রাণপ্রবাহের স্ফুলিঙ্গ। তার যোগ সকলের সঙ্গে; তার যোগটুকু কর্ণের কবচকুণ্ডলের মতই সহজাত; সে যোগটুকু নিত্য হয়ে ওঠে ভালোবাসার মধ্য দিয়ে। সেই ভালোবাসার রং রাঙা। তাইতো নন্দিনী রক্তরাঙা রক্তকরবীর মালা বুকে পরে; হাতে পরে। নন্দিনী এবং রঞ্জন এরা কিন্তু মূলত অভিন্ন আত্মা; যেমন অভিন্নাত্মা রাধা এবং কৃষ্ণ। প্রান্তিক বিশ্লেষণে যেমন রাধা এবং কৃষ্ণের একাত্মতা গ্রহণীয় ঠিক তেমনি রঞ্জন ও নন্দিনীও একাত্ম এবং অভিন্ন। তাদের মৌলিক উপাদানের কোনও ভেদ নেই। নাটকের প্রয়োজনে, রসসৃষ্টির প্রয়োজনে একই তত্ত্বের দুটি রূপ সৃষ্টি করা হয়েছে। তারা হল রঞ্জন ও নন্দিনী। এককে দুই রূপে কল্পনা ক'রে তাদের মৌলিক একাত্মতাটুকুকে ভালবাসার সেতু দিয়ে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস করেছেন নাট্যকার। ভালবাসার মন্ত্রে তিনি সেই অবিচ্ছিন্ন প্রাণপ্রবাহের ছিন্নসূত্রগুলির গ্রন্থিবন্ধন করতে চেয়েছেন। তাইত নন্দিনীর কণ্ঠে অবিচ্ছিন্ন প্রাণপ্রবাহের কথা সুর হয়ে গান হয়ে ঝরে পড়ে ভালবাসার ধারাপতনে:

"ভালোবাসি ভালোবাসি
এই সুরে কাছে দূরে জলে-স্থলে বাজায় বাঁশি।
আকাশে কার বুকের মাঝে
ব্যথা বাজে,
দিগন্তে কার কালো আঁখি আঁখির জলে যায় গো ভাসি।

নন্দিনী ভালোবাসার সুতোয় বিচ্ছিন্ন জীবন দ্বীপগুলোর গ্রন্থিবন্ধন করতে চায়। তাইত' তার 'অকারণ' ছুটে বেড়ানো। চন্দ্রা তাকে বোঝে না, বোঝে না নন্দিনী কেন তার সুন্দরপানা মুখখানা দেখিয়ে অকারণে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। চন্দ্রার মত অনেকেই তাকে বোঝে না। তার ব্যথাটা যে কোথায় বাজে তা বোঝবার'শক্তি এদের নেই। সে দুঃখের তত্ত্বটা বোঝে বিশু পাগলা। কিন্তু নন্দিনী প্রসঙ্গে ফগুলালকে সে বলছে: "বলছি শোন্ কাছের পাওনাকে নিয়ে বাসনার যে দুঃখ তাই পশুর, দূরের পাওনাকে নিয়ে আকাঙ্ক্ষার যে দুঃখ তাই মানুষের। আমার সেই দুঃখের দূরের আলোটি নন্দিনীর মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে।" নন্দিনী মানুষের সেই দূরের পাওনার প্রতীক: সেটুকু পাওয়ার জন্য বিরামহীন সংগ্রামের প্রতিনিধিত্ব করছে নন্দিনী। এই সাময়িক বিচ্ছিন্নতা ঘুচিয়ে দিয়ে আত্যন্তিক অবিচ্ছিন্নতাটুকুকে প্রতিষ্ঠিত করার সাধনাই হল নন্দিনীর জীবনচর্যা। এই সার্বিক প্রাণ প্রৈতির ধারণা রবীন্দ্র দর্শন ও কাব্যের ভিত্তিভূমি। উপনিষদের মানসপুত্র রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের 'ঈশাবস্য' মন্ত্রে দীক্ষিত। জগত ও সৃষ্টি যদি ঈশ্বর পরিব্যাপ্ত হয় তবে এক অবিচ্ছিন্ন নিরাবয়ব প্রাণধারার কল্পনা করা সহজ হয়ে ওঠে। অন্ততঃ রবীন্দ্রনাথের মননে তা সহজেই ঘটেছে।

যে নাটকীয় সংঘাত নাটকের প্রাণ সেই সংঘাতটুকু নাট্যকার চিত্রিত করে তুলেছেন চলার ছন্দের সঙ্গে অচলায়তন স্থিতির বিরোধে। এই ছন্দ হল চলমান জীবনের প্রাণ। রাজা নন্দিনীর মধ্যে সেই ছন্দ প্রত্যক্ষ করেছেন। উপনিষদ 'চরৈবেতি' মন্ত্রে এই চলার ছন্দকেই জীবনের ও জগতের মূল সত্য রূপে প্রতিষ্ঠা করেছে। সেই ছন্দ হল নন্দিনী, সেই ছন্দ হল রঞ্জন, সেই ছন্দ হল বিশু পাগলা। তাই তো ব্যক্তি রঞ্জনের মৃত্যু হলেও রঞ্জন মরে না; ছন্দ রঞ্জন অমর। বিশ্বসংসার যতদিন আবর্তিত হবে জন্ম মৃত্যুর মধ্যে ততদিন এই ছন্দ বেঁচে থাকবে; রঞ্জনও বেঁচে থাকবে। তাইতো মৃত রঞ্জনের শবদেহের সামনে দাঁড়িয়ে নন্দিনী ফাগুলালকে বলেছে: ফাগুলাল, আমি চেয়েছিলাম

রঞ্জনকে আমাদের সকলের মধ্যে আনতে। ঐ দেখ এসেছে আমার বীর মৃত্যুকে তুচ্ছ করে।…মৃত্যুর মধ্যে তার অপরাজিত কণ্ঠস্বর আমি যে শুনতে পাচ্ছি। রঞ্জন বেঁচে উঠবে, ও কখনও মরতে পারে না। সত্যিই রঞ্জনের মৃত্যু নেই।

কেননা রঞ্জন ও নন্দিনীর মধ্যে অবিচ্ছিন্ন প্রাণ প্রবাহের নেচে চলার ছন্দ। রাজাও নাটকের শেষ অঙ্কে সাধারণ অর্থে মৃত্যুর জৈবিক ইতির ব্যঞ্জনাটুকু ধরতে পেরেছিলেন। বৃহৎ অর্থে মৃত্যুই হলো বাঁচা। মৃত্যু আমাদের সঞ্চয়ের ক্ষুদ্র বিবরটা থেকে মুক্তি দেয়। আর এই মুক্তিটুকু ঘটলেই তার বিচ্ছিন্নতা ঘুচে যায়। সর্বব্যাপী জীবন-স্রোতের সঙ্গে তার যোগটুকু সত্য হয়ে ওঠে। তাই তো রাজা ফাগুলালকে বলতে পারলেন; 'মরতে তো পারবো। এতদিনে মরার অর্থ দেখতে পেয়েছি—বেঁচেছি।' এই ধরনের মৃত্যুর মধ্যে চরম প্রাণের সন্ধানটুকু লুকিয়ে থাকে: কবি রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস ক'রেছিলেন, মৃত্যুর পথে মৃত্যু এড়িয়ে যাবার তত্ত্বে। নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ আবার সেই কথাই বললেন। সেই তত্ত্বকথাই আবার 'রক্তকরবী' নাটকে অধ্যাপকের কণ্ঠে শুনি। অধ্যাপক বলছেন: 'কে যে বললে রাজা এতোদিন পরে চরম প্রাণের সন্ধান পেতে বেরিয়েছে। পুঁথিপত্র ফেলে সঙ্গ নিতে এলুম।' যে প্রাণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল সেই প্রাণ আবার যুক্ত হতে চেয়েছে অবিচ্ছিন্ন প্রাণপ্রবাহের সঙ্গে।

আগেই বলেছি রঞ্জন আর নন্দিনী এরা দু' জনেই সেই অবিচ্ছিন্ন প্রাণ প্রবাহের নেচে চলার ছন্দ। ছন্দ দ্বৈতবাদী। অর্থাৎ দুই এর মিল না হলে ছন্দ সৃষ্ট হয় না। নন্দিনী তাইত অধ্যাপককে প্রশ্ন করে, "একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। এরা আমাকে এখানে নিয়ে এল' রঞ্জনকে সঙ্গে আনলে না কেন?" কেননা নন্দিনী জানে যে ছন্দ দ্বিপদী। তার চলার ছন্দের সঙ্গে মিল রাখে রঞ্জন। এ দুয়ের চলনই ত ছন্দোবদ্ধ চলা, এ দুইয়ে মিলেই ত ছন্দের প্রবর্তনা। সে কথা নন্দিনী জানে। কিন্তু মোড়ল, সর্দার প্রমুখ রাজ-অনুচরেরা তা জানে না। রাজা নিজেও তা জানেন না। তাই তো নন্দিনী রাজাকে বলেছিল রঞ্জনের সঙ্গে তার ভালোবাসার কথা বলতে গিয়ে: 'জলের ভিতরকার হাল যেমন আকাশের উপরকার পালকে ভালোবাসে পালে লাগে বাতাসের গান আর হালে জাগে ঢেউ এর নাচ,' ঠিক তেমনি করে নন্দিনী রঞ্জনকে ভালোবাসে। সে তার জন্তে প্রাণটাও দিতে পারে। কেন না নন্দিনী জানে যে এই ছোট প্রাণের স্ফুলিঙ্গ যদি নিভে যায় তবু ও তা জ্বলবে অনির্বাণ শিখার অবিচ্ছিন্ন প্রাণ প্রবাহের মধ্যে। সার্বিক প্রাণ

প্রবাহের স্পর্শে খণ্ডিত প্রাণ তার বিচ্ছিন্ন সত্তাটুকুকে হারিয়ে ফেলে। তার বিচ্ছিন্নতা তার বিযুক্তি অবলুপ্ত হয়। ঠাকুর রামকৃষ্ণ যেমন খণ্ডিত প্রাণসত্তা ও মহাপ্রাণসত্তার সম্বন্ধটুকু ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নুনের পুতুলের সমুদ্রে অবগাহন স্নানের কথা বলেছিলেন ঠিক তেমনি কথাই শুনি রাজার মুখে আর এক অর্থে আর এক ব্যঞ্জনায়। নাটকের শেষ অঙ্কে রাজা নন্দিনীকে বলছেন: "আমারই হাতের মধ্যে তোমার হাত এসে আমাকে মারুক, সম্পূর্ণ মারুক, তাতেই আমার মুক্তি।" রাজার বিচ্ছিন্নতা ঘুচে যাবে নন্দিনীর করস্পর্শে; ছিন্নতান সুরের তরণী আবার হিরন্ময় সুরপ্রবাহের সঙ্গে যুক্ত হবে। তাতেই তার অমরত্ব তাতেই তার মুক্তি। রাজা প্রথম অঙ্কে নিজের মধ্যে এই অবিচ্ছিন্ন প্রাণধারাকে খুঁজে পান নি বলেই নাটকের সংঘাত আবর্তিত বিচিত্র রূপ। তিনি নন্দিনীর মধ্যে এই অবিচ্ছিন্ন প্রাণপ্রবাহের লীলা প্রত্যক্ষ করেছিলেন: "সামনে তোমার মুখে-চোখে প্রাণের লীলা, আর পিছনে তোমার কালো চুলের ধারা মৃত্যুর নিস্তব্ধ ঝরণা।" রাজা যেমন নন্দিনীর মধ্যে এই লীলাকে, এই অবকাশকে প্রত্যক্ষ করেছেন ঠিক তেমনি নন্দিনী বিশু পাগলার মধ্যে এই মুক্তি, এই অবকাশটুকুকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। এই অবকাশটুকুই মুক্তি, এই ফাঁকটুকু না থাকলে মানুষের কোন সৃষ্টিই সম্ভব হয় না। প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথ আমাদের বলেছিলেন, "আকাশে ফাঁক না থাকলে বাঁশী বাজে না।" নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ বললেন যে বিশু আর নন্দিনীর মধ্যে সেই আদিম প্রাণ প্রবাহের যোগটুকু বেঁচে আছে বলেই উভয়ের মধ্যেকার যোগসূত্রটুকু কোথাও ব্যাহত হয় নি। তাই ত দুজনার মধ্যেকার আকাশটুকু নিরেট হয়ে ভর্তি হয়ে ওঠে নি। নন্দিনী বিশুকে বলছে: "পাগলভাই, এই বন্ধ গড়ের ভিতরে কেবল তোমার আমার মাঝখানটাতেই একখানা আকাশ বেঁচে আছে। বাকি আর সব বোঝা।" এই আকাশেই প্রাণের নিত্য সঞ্চরণ; এই আকাশেই প্রাণের গান নিত্য ধ্বনিত, প্রতিধ্বনিত। কাজের নিরেট গর্তের মধ্যে এই আকাশকে, এই অবকাশকে ধরা যায় না। জীবন সেখানেই শিল্প হয়ে উঠতে পারে যেখানে জীবন মুক্তির ঐশ্বর্যে ঐশ্বর্যবান; তার বন্ধন নেই, বন্ধনীর কৃচ্ছ্রসাধনও নেই। সেখানে আছে মুক্তির আনন্দ, নেচে চলার ছন্দ। এই ছন্দেই বস্তুর বিপুল ভার হালকা হয়। রাজা সে তত্ত্ব জানতেন। সেই ছন্দে গ্রহনক্ষত্রের দল ভিখারী নটবালকের মতো আকাশে আকাশে নেচে বেড়াচ্ছে। এই নেচে চলার ভাও হল রঞ্জনেরও। সে যে চলমান অখণ্ড

প্রাণের জোয়ার। বন্ধন তার কাছে দুর্বিবহ। সে যা কিছুকে স্পর্শ করে তার মধ্যেই ছন্দ অনুস্যূত হয়ে যায়। সে যখন কাজ করে, তার স্পর্শে কাজের চাকা ঘোরে নাচের ছন্দে। মোড়ল সর্দারের কাছে রঞ্জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে আসে : "বড়ো মোড়ল স্বয়ং এসে বললে" এ কেমন তোমার কাজের ধারা। রঞ্জন বললে 'কাজের রসি খুলি দিয়েছি, তাকে টেনে চালাতে হবে না, নেচে চলবে।' আশ্চর্য ওর ক্ষমতা। কিছুদিন ও এখানে থাকলে খোদাইকর-গুলো পর্যন্ত বাঁধন মানবে না।" বাঁধন মানাই হ'ল বিকার ; বাঁধন ছেঁড়ার ডাক হ'ল রঞ্জনের। সেইখানে আবার রঞ্জনে আর নন্দিনীতে বেজায় মিল। নন্দিনী ও সেই নৃত্যপরা ছন্দের প্রতীক। সেই ছন্দেই মুক্তি, সেই নৃত্যেই আনন্দ। সেই নাচের ছন্দেই নন্দিনী সহজ হয়েছে, সুন্দর হয়েছে। রাজা তা পারে নি। তাই নন্দিনীর ওপর তার অন্ধ ঈর্ষা, যেমন তার ঈর্ষা ছিল রঞ্জনের ওপর। রাজা নন্দিনীকে বলেন : "আমার তুলনায় তুমি কতটুকু ; তোমাকে ঈর্ষা করি।" ছোট হয়েও রাজার তুলনায় আকৃতিতে এবং আয়তনে ক্ষুদ্র হয়েও নন্দিনী রাজার ঈর্ষার পাত্রী। নন্দিনী তার ঐশ্বর্যের কারাগারেও বন্দী নয় ; সে স্বাধীন। সর্বব্যাপী অবিচ্ছিন্ন প্রাণস্রোতের তত্ত্বটুকুকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নির্বাধ স্ববশ্যতা তত্ত্বের উপস্থাপনা করলেন নাট্যকার। নন্দিনী পুব হাওয়ার মতই স্বাধীন, আকাশের আলোর মতই উন্মুক্ত। তার সঞ্চয় নেই, তাই তার বন্ধনও নেই। রাজার অসংখ্য বন্ধন, সে বন্ধন সঞ্চয়ের বন্ধন, শক্তির বন্ধন। রাজা তাই বিষাদভরে বললেন ফাগুলালকে, ওরা "আমারি শক্তি দিয়ে আমাকে বেঁধেছে।" সে সঞ্চয়কে, সেই বিকারকে ভাঙতে না পারলে "বিচ্ছিন্ন জীবন" আবার সুস্থ এবং স্বচ্ছ হয়ে উঠতে পারে না। তাই তো রাজা নাটকের শেষ অঙ্কে আপনার সৃষ্টিকে, আপনার সঞ্চয়কে বিধ্বস্ত করতে উন্মুখ। এই সঞ্চয়ের বাধা অপসারণ করতে না পারলে তাঁর সঙ্গে বিশ্বজীবনের যোগটুকু সত্য হয়ে উঠতে পারে না। তাই ত' রাজা নন্দিনীকে সঙ্গে নিয়ে সব ভাঙার উদ্দাম অভিযানে বেরিয়ে পড়তে চেয়েছিলেন। একদিন কবি ছন্দে গেঁথে কবিতায় বলেছিলেন—

> ভাঙো ভাঙো উচ্চ কর ভগ্নস্তূপ
> জীর্ণতার অন্তরালে জানি মোর আনন্দ স্বরূপ
> রয়েছে উজ্জ্বল হয়ে।......" (জন্মদিন, সেঁজুতি)

আর রক্তকরবীর রাজা সেই কথারই প্রতিধ্বনি করে নন্দিনীকে বললেন :

"এই আমার ধ্বজা। আমি ভেঙে ফেলি এর দণ্ড, তুমি ছিঁড়ে ফেলো ওর কেতন।...... এখনো অনেক ভাঙা বাকি; তুমিও আমার সঙ্গে যাবে নন্দিনী, প্রলয় পথে আমার দীপশিখা।" নন্দিনী সাগ্রহে সঙ্গী হতে চায় রাজার। নন্দিনী জানে যে সঞ্চয়ের অপদেবতার মুখবিকারটুকু ক্ষণস্থায়ী তা অপগত হলেই নুনের পুতুল আবার লবণাম্বুধির অতলতার স্বাদ পেয়ে আপনার হিরণ্ময় সত্তার স্বরূপটুকু বুঝতে পারবে।

কবি তাঁর 'জন্মদিনে' কবিতায় বলেছিলেন:

"অশুচি সঞ্চয় পাত্র করো খালি,
ভিক্ষামুষ্টি ধূলায় ফিরায়ে লও, যাত্রাতরী বেয়ে
পিছু ফিরে আর্ত চক্ষে যেন নাহি দেখি চেয়ে চেয়ে
জীবনভোজের শেষ উচ্ছিষ্টের পানে।"

আমাদের চারপাশের জমানো সম্পদই হ'ল "জীবনভোজের উচ্ছিষ্ট" তাকে সর্বতোভাবে বর্জন করতে হবে। সঞ্চয়ের পাত্রটা অশুচি। সেই সঞ্চয়ের জন্যই মানুষের সব দুঃখ, বেদনা ও সংঘাত। মার্ক্সীয় দর্শনেও তাই সঞ্চয় প্রবৃত্তির নিবৃত্তি-সাধনের কথা ভাবা হয়েছে। বিবাহ প্রথার তাঁরা বিরোধী; আমি আমার পুত্রকন্যাকে 'আমার' বলে চিহ্নিত করতে পারলে তবেই না তাদের নিরাপত্তার জন্য 'সঞ্চয়ের প্রয়োজন'টুকু অনুভব করব। এই সঞ্চয় থেকেই ধন-বৈষম্য এবং তা থেকেই শ্রেণী-সংঘাতের সূত্রপাত। তাই আধুনিক জড়বাদী দর্শনে এই সঞ্চয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণার কথা শুনি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বৈরাগ্য-লাঞ্ছিত জীবন-দর্শনের বিস্তৃত পরিসরে মানুষের এই সঞ্চয় এষণাকে অপাংক্তেয় করতে চেয়েছেন। তাঁর রাজা 'রক্তকরবী' নাটকের শেষ অঙ্কে এই 'জীবনভোজের উচ্ছিষ্টে'র বন্ধন থেকে মুক্তি চেয়েছেন। সে কথা শুধু রাজারই কথা নয়। সে কথা মুমুক্ষু মানব সমাজের কথা।

এই মৌলতত্ত্বের পরিবেশন করলেন নাট্যকার কয়েকটি অপূর্ব সুন্দর চরিত্র কল্পনায়। আগেই বলেছি বাস্তবতার নিরিখে এর বিচার নয়; এর বিচার হবে মহত্তর জীবনবোধের তুলাদণ্ডে। সেই জীবনবোধটুকু নাট্যকার উপস্থাপিত করলেন সরল প্রেম, ক্রুর প্রতিহিংসাবৃত্তি ক্ষুদ্র দ্বেষ, অনির্বাণ লোভ এবং শক্তির দম্ভকে আশ্রয় করে। বিভিন্ন চরিত্রাশ্রয়ী এই সব মানস-প্রবৃত্তির ঘাত-প্রতিঘাতে নাটকের ঘটনাবলী দ্রুত পরিণতির পথে এগিয়ে গেছে। মধুর রস, করুণ রস এবং শান্ত রসের অবতারণা করেছেন নাট্যকার নাটকের বিভিন্ন পর্যায়ে। শেষ দৃশ্যে সব রসের সমন্বয়ে শান্ত রসের আবির্ভাব। কিন্তু সেই রসের আধার।

ডাকঘর নাটকে নন্দনতত্ত্বাভিজ্ঞ পাঠকমাত্রেই লক্ষ্য করবেন যে একটা অন্তর্দ্বন্দ্বের ভূমিকা রচিত হয়েছে সেখানে। একদিকে রয়েছে কবির অখণ্ড জীবনের বিশ্বাস ও অনুভূতি এবং অন্যদিকে পীড়িত কবির সাময়িক অনুভব। সারা জীবন ধরে কবির কণ্ঠে ধ্বনিত হ'ল জীবনের জয়গান। জীবনই একমাত্র সত্য, এই মহাবাণী বার বার ধ্বনিত হ'ল নানান স্বরগ্রামে। জীবনের অসংখ্য বন্ধনকে কবি সাগ্রহে সানন্দে বরণ করেছেন। তারাই তার মুক্তির আনন্দধামের পাণ্ডা। তাদের সঙ্গ করেই তিনি জগন্নাথের সামীপ্য ও সাযুজ্য প্রত্যাশায় তন্ময়। তাঁর মোহই অন্তিমে মুক্তিরূপে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে, এই বিশ্বাস কবির আজন্ম সহচর। "পৃথিবীর প্রেমের মধ্য দিয়াই সেই ভূমানন্দের পরিচয় পাওয়া, জগতের এই রূপের মধ্যেই সেই অপরূপকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করা; ইহাকেই তো আমি মুক্তির সাধনা বলি। জগতের মোহে আমি মুগ্ধ সেই মোহই আমার মুক্তির সেরা আস্বাদন।[১] কবি প্রকৃতির মায়ায় মুগ্ধ, মানব প্রেমে ধন্য। ইন্দ্রিয়-পথবাহী অনন্ত রূপৈশ্বর্য কবির মনে অপার আনন্দের সৃষ্টি করে। সে আনন্দে যদি মোহ থাকে তবে সে মোহকে কবি নিন্দা করেন না। কবির অনন্তের উপলব্ধি সম্ভব হয়। এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বসংসারকে স্বীকার করে, প্রত্যক্ষকে শ্রদ্ধা করে।[২] বসুধার মৃত্তিকার পাত্রেই কবি চিন্ময় আনন্দরসের আস্বাদন করেন। কবির কথায় বলি :

এই বসুধার
মৃত্তিকার পাত্রখানি ভরি বারম্বার
তোমার অমৃত ঢালি দিবে অবিরত
নানা বর্ণ গন্ধময়। প্রদীপের মতো
সমস্ত সংসার মোর লক্ষ্য বর্তিকায়
জ্বালায়ে তুলিবে আলো তোমারি শিখায়
তোমার মন্দির মাঝে। ইন্দ্রিয়ের দ্বার
রুদ্ধ করি যোগাসন, সে নহে আমার।
যা কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে
তোমার আনন্দ রবে তারি মাঝখানে।

১। আত্মপরিচয়, পৃঃ ২২—২৩।
২। 'প্রকৃতি পরিশোধ' দ্রষ্টব্য।

কবি ইন্দ্রিয় পথবাহী অন্তহীন রূপৈশ্বর্যের আস্বাদন করেছেন সমস্ত জীবন ভরে; ইন্দ্রিয়ের আলো নিভিয়ে অতীন্দ্রিয় চেতনার আলোকে কবি সত্য দর্শন করতে চান নি। যোগীর যোগবিভূতি কবির জন্য নয়। তিনি সরল প্রাণের সহজ আনন্দে বিশ্বাস করেছেন। সে আনন্দকেই ভূমানন্দের সহোদর বলে জেনেছেন। তারই মাধ্যমে ভূমানন্দের আস্বাদন হয়। এই প্রত্যয়, এই বিশ্বাস কবির পরিণত বয়সে ব্যাপকতর গভীরতর প্রতীতিরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কবি কোথাও সংসার ত্যাগের সাধনা বা বৈরাগ্যময় উপাসনার কথা বলেন নি। কবির জীবনবেদের মূল মন্ত্রটির বিচার হ'ল জীবনের জয় কীর্তি ঘোষণা ক'রে। কবির চোখে মৃত্যু হ'ল এই জীবনের পরিপূরক। জীবন মৃত্যুকে পূর্ণ করে, জীবনের জীর্ণ-জরা ঝরিয়ে দিয়ে আবার তাকে নতুন প্রাণের নবতর সম্ভাবনায় ঐশ্বর্যশালী ক'রে দেয়। "অহরহই জীবনকে মৃত্যু নবীন করিতেছে। ভালোকে মন্দ উজ্জ্বল করিতেছে, তুচ্ছকে অভাবনীয় মূল্যবান করিতেছে। যখন পরিচয় পাই, তখনি রূপের মধ্যে অপরূপ, বন্ধনের মধ্যে মুক্তির প্রকাশ আমাদের কাছে জাগিয়ে ওঠে।"[১] রূপের মধ্যে অপরূপের বার্তাই ত ব্যঞ্জিত হয়। মৃত্যুর জঠরে জীবনের প্রাণ স্পন্দনটুকু কবি শুনেছেন। পুরাতন দিনকে যেমন রাত্রি নবীনতা দান করে তেমনি করেই মৃত্যু জীবনকে আবার শিশু-জীবনের প্রাণসম্পদের প্রাচুর্যে ও নবীনতায় সম্পদশালী করে। রবীন্দ্র দর্শনে মৃত্যুর এইটুকুই সার্থকতা। যে ইন্দ্রিয়-গ্রাম বয়সের ভারে শিথিল অকেজো হ'য়ে পড়ে তাকে নতুন শক্তি দেয় মৃত্যু জঠরের নব প্রাণসঞ্চারিণী মায়া। এ মায়া হ'ল শক্তি। এ মায়া সত্যকে সৃষ্ট করে; তাই ত' এ মায়া এতো মর্যাদাসম্পন্ন। একথা স্মরণীয় যে মৃত্যু মহৎ কেন না সে মহত্তর জীবনের জন্মদাত্রী। মৃত্যুর স্বকীয় মূল্য নেই। প্রাণের শতদল মৃত্যুর রহস্য তীর্থপথে আপনাকে বিকশিত করে বিভিন্ন জীবনের মৃণাল দণ্ড আশ্রয় ক'রে ক'রে। জীবনের সৌন্দর্য শতদল ঘোমটা খুলে খুলে বার বার নবতর রূপে আত্মপ্রকাশ করে; প্রতিটি নতুন প্রকাশের পূর্বাবস্থা হ'ল মৃত্যুর যবনিকা। এই ত' হ'ল কবি দার্শনিকের জীবন ও মৃত্যুকে দেখার দর্শন-ভঙ্গী। একদিকে ইন্দ্রিয়জ সৌন্দর্যে অনন্ত তন্ময়তা অন্যদিকে জীবনের প্রতি সীমাহীন ভালোবাসা। এই উভয় তত্ত্বই একই সত্যের দু'টি দিক।

'ডাকঘর' নাটকে এই দুটি মৌলিক ভাবকেই অস্বীকার করা হ'য়েছে।

১। আত্ম পরিচয়, পৃঃ ৬৭

নাটকের ভারকেন্দ্র অমলকে আশ্রয় ক'রে আছে। অমল রাজার পত্র প্রত্যাশায় ব্যাকুল। তার ভাল লাগে ডাকহরকরাকে কেন না সেই ত' বহন ক'রে আনছে রাজ-লিপি। বৃষ্টি ধোয়া আকাশের নীচে অনেক দূরে দেখা ঘনবনের পথ দিয়ে ডাকহরকরা আসছে, হাতে তার রাজার চিঠি ; অমল দেখে তাকে—সে একলা নেমে আসছে পাহাড়ের সরু পথ বেয়ে। অনেক দিন, অনেক রাত ধরে সে আসছে ; অনাগত ঝর্ণার পথে, বাঁকা নদীর পথে তার নিত্য আনাগোনা। জোয়ারির খেত, আখের খেত, তার পাশের মেঠো পথে অমল দেখেছে রাজার ডাকহরকরাকে ; সে যত দেখে তাকে ততই তার বুকের মধ্যে খুশি উপচিয়ে পড়ে ; অমল রাজাকে দেখবে, পরিচয় করবে তার সঙ্গে যিনি অমলের জগতে অনেক ডাকঘর বসিয়ে দিয়েছেন। রাজার সঙ্গে দেখা হ'লে সে চাইবে রাজার ডাকহরকরা হ'তে। এইটুকুই তার চাওয়া। এই চাওয়া বুঝি আর পূর্ণ হ'ল না। এই চাওয়াটুকুর পূর্ণতা এলো যখন তখন প্রাণ তার সব আলো নিঃশেষে নিভিয়ে দিয়েছে। মৃত্যু এসে কিশোরের চোখ থেকে সবটুকু রং সবটুকু রস নিঃশেষে মুছে নিয়ে গেছে। এই সুন্দর ভুবনের সব সৌন্দর্য যখন ব্যর্থ হয়ে গেছে অমলের চোখে তখন এলেন রাজা, এলো বুঝি তাঁর সন্দেশ বহু বহু প্রতীক্ষিত পত্র। অমল মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ফকিরকে বলছে, "দেখো ফকির আজ সকাল বেলা থেকে আমার চোখের উপরে থেকে থেকে অন্ধকার হ'য়ে আসছে, মনে হচ্ছে সব যেন স্বপ্ন। একেবারে চুপ করে থাকতে ইচ্ছা করছে। কথা কইতে আর ইচ্ছা করছে না। রাজার চিঠি কি আর আসবে না। এখনই এই ঘর যদি সব মিলিয়ে যায় যদি।" এই আসন্ন মৃত্যুর উপচ্ছায়ার মধ্যেই রাজার আগমন হচ্ছে। তাঁর দূরাগত চরণধ্বনি বুঝি ঠাকুর্দা শুনতে পান। তাই তিনি অমলকে আশ্বাস দিয়ে প্রত্যয়ভরা কণ্ঠে বলেন : আসবে, চিঠি আজই আসবে।' এই চিঠি আসবার লগ্ন যতই এগুচ্ছে ততই অমল এই জীবনের প্রত্যন্ত প্রদোষটুকু পায়ে পায়ে পার হ'য়ে অন্য এক জগতের অন্য এক জীবনের সন্নিধি লাভ করছে, যে জগতে তার মৃত পিতা মাতার কথা শোনা যায়, তাদের সান্নিধ্য লাভ করা যায়। সে জীবনে উত্তরণ সহজসাধ্য নয়। অমল যখন মর্ত্যজীবনের শেষ আলোটুকু থেকে বঞ্চিত হ'ল তখন অন্ধকারের গভীরে রাজা আসেন। মৃত্যুর মধ্যে রাজার আগমন হ'ল, জীবন যেখানে আপনার সব ঐশ্বর্য হারিয়ে নিঃস্ব হ'য়ে বসে আছে সেখানে রাজার আবির্ভাব হ'ল। রাজা এলেন মৃত্যুর সুড়ঙ্গ পথে। জীবনের আলো-ঝলমল

উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে রাজার আবির্ভাব হ'ল না। সে আলো, সে অবকাশ, সে মুক্তি, রাজার ডাকহরকরাকে চেনায়। রাজা আসেন নিঃসীম আকাশের নিরন্ধ্র অন্ধকারের উপচেতনায়। এই মৃত্যুর জয়গানে জীবনের অস্বীকার ধ্বনিত হ'য়ে উঠেছে। রাত্রির অন্ধকারে আলোক-সুন্দর দিনমানের সব সৌন্দর্যকে নিঃশেষ রিক্ততায় ব্যর্থ করে দিল। রবীন্দ্রদর্শনের এই নতুন তত্ত্বটি তাঁর পূর্বতন বিশ্বাসকে তাঁর সুচিরসঞ্চিত জীবনাদর্শকে কী আঘাত করে নি মৃত্যুর স্বীকৃতি আর এক নতুন অর্থে কী অর্থবান হয়ে ওঠে নি? ঐন্দ্রিয়জ সৌন্দর্যের অস্বীকার কী অতীন্দ্রিয় কোন এক পরম সুন্দরের ব্যঞ্জনায় অর্থবহ? এই প্রশ্নগুলি স্বভাবতই আমাদের চোখে বড় হ'য়ে রঠে। আমরা অনুসন্ধান করি কেন ঘটল রবীন্দ্র মননের এই বিপরীত আচরণ?

অবশ্য এ কথা স্বীকার্য যে ডাকঘর নাটকের যবনিকা পতনের পূর্বে কবির চেতন মন মৃত্যুর এই গৌরবকে অবিসম্বাদিত সত্যরূপে গ্রহণ করতে সম্মত হয় নি। তাই দেখি সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে অমলের ঘরে সুধার আবির্ভাব। তার হাতে চয়ন ক'রে আনা এক গোছা ফুল, অমলকে দেবে ব'লে সে বুকে ক'রে এনেছে। অমল রাজ কবিরাজ মাধব দত্ত, ঠাকুরদা—প্রায়ন্ধকার ঘরে এঁদের কথবার্তার সুর যখন এক রহস্যঘন অতীন্দ্রিয় শোক সৃষ্টি করেছিল তখন সুধার প্রবেশ সম্পূর্ণ আকস্মিক ও অতিরিক্ত। সুধার শেষ কথা: "বলো যে সুধা তোমায় ভোলে নি[১]" সুধার আবির্ভাবের মতই অপ্রয়োজনীয় ও অস্বাভাবিক। অমলের ঘরে তখন আসন্ন মৃত্যুর উপচ্ছায়া। ধূসর নৈঃশব্দের পথে যাত্রার

১। নাট্যকার নাটকের এই ঘটনা-পরিণতির প্রস্তুতি অবশ্য ক'রে রেখেছেন ৩৩-৩৪ পৃষ্ঠায়। অমলের কাছে সুধার অঙ্গীকার সর্বশেষ দৃশ্যে সুধার আবির্ভাবকে হয়ত, ব্যাখ্যাত করতে পারে। কিন্তু এ কথা স্বীকার্য যে নাটকের রস-পরিণতির দিক থেকে সুধার আবির্ভাবের কোন প্ররোজন ছিল না। সুধার অঙ্গীকারটুকু পাঠক পাঠিকা সহজেই ভুলতে পেরেছিল। তার কারণ নাটকের আবেশ-ঘন রহস্যময় পরিণতির সঙ্গে এর কোন আত্যন্তিক যোগ নেই। যদি কোন যোগ থেকে থাকে সুধার আবির্ভাবের সঙ্গে নাটকের পরিণতির সে যোগটুকু হ'ল তত্ত্বগত এবং একান্তই আকস্মিক। কবির আজন্মপোষিত তত্ত্ববিশ্বাসকে জয়যুক্ত করবার জন্ম সুধাকে আনতে হ'য়েছে, এ কথা আমরা সত্য বলে মনে করি।

শিখর প্রভৃতি। ঘরের প্রদীপ মৃত-শিখা। উদ্বেগ ব্যাকুল মাধব দত্ত এই অস্বাভাবিক পরিবেশে ভয়-সন্ত্রস্ত। তার কণ্ঠে ভয়ার্ত কথা[১] "আমার কেমন ভয় হচ্ছে। এ যা দেখছি এ সব কি ভালো লক্ষণ। এরা আমার ঘর অন্ধকার করে দিচ্চে কেন।" এই থমথমে ভীতি-সঞ্চারী পরিবেশে শশী মালিনীর মেয়ে গ্রাম্য সুধার মুখে যে কথাগুলি দেওয়া হয়েছে তা একান্তই বিচ্ছিন্ন এবং অসংলগ্ন। মনস্তত্ত্বের যে সব বিধি শিশুমনের ক্রিয়া-কলাপের ব্যাখ্যা করে, তাদের দিয়ে সুধা-মানসের এই অসংলগ্ন উক্তিকে ব্যাখ্যা করা যায় না। স্বাভাবিক হ'ত সুধার পক্ষে অমলের পরিবেশ নিয়ে, অমলের কুশল সম্পর্কে প্রশ্ন করা। ব্যক্তি-ব্যতিক্রমের জন্যই এই বিভ্রাট ঘটেছে। সুধার মুখ দিয়ে রবীন্দ্রনাথ কথা বলেছেন। পলকের মধ্যে সুধা অন্তর্হিত হয়েছে। আমরা সবিস্ময়ে প্রত্যক্ষ করেছি কবি দার্শনিককে যিনি মঞ্চে উপর এসে দাঁড়িয়েছেন আর একবার পাঠককে স্মরণ করিয়ে দিতে যে তিনি ব্রতচ্যুত হ'ন নি। মৃত্যুই শেষ কথা নয়। তার পরেও আছে নাগকেশরের চারা আর পৃথিবীর ভাল-বাসা। যে উপচেতন মন অতর্কিতে মৃত্যুকে মহৎ মর্যাদা দিল, বলল যে স্বয়ং রাজা আসছেন মৃত্যুর রথে, মৃত্যুর মূল্য শুধু জীবনের জননী হিসেবে নয়, তার আত্যন্তিক মূল জীবনের প্রয়োজনকে ছাড়িয়ে গেছে। হঠাৎ পাওয়া এই মহা-সত্যকে কবি তাঁর জীবন দর্শনের বিরোধী জেনে স্বয়ং মঞ্চে আবির্ভূত হলেন তাঁর আজন্ম পোষিত জীবন দর্শনের পক্ষে ওকালতি করার জন্য। তবে মধ্য রাত্রির নিকষ কালো রূপঘোচান অন্ধকারে রাজার আগমন ঘোষণা ক'রে কবি হিরণ্যগর্ভ পুষণের রূপচ্ছটায় যে সৃষ্টি উদ্ভাবিত হ'য়ে ওঠে, যাঁর মধ্যে তিনি আজন্ম অপরূপকে প্রত্যক্ষ ক'রে এসেছেন, সেই আলোকোদ্ভাসিত রূপ অপরূপের লীলাময় তীর্থক্ষেত্রকে যে অস্বীকার করেছেন, এ সত্য তাঁর চোখে কী ধরা পড়ে নি? এ প্রশ্ন অবান্তর। এখানে প্রশ্ন হ'ল এমনটা কেন হ'ল? যে রবীন্দ্রনাথ সারা জীবন ধরে রূপের মধ্যে অপরূপকে দেখলেন তিনি কেন সব বাতি নিভিয়ে দিয়ে দৃশ্য-গন্ধ-সঙ্গীতময় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ধরণীকে অগ্রাহ্য ক'রে রাত্রির রূপহারা গভীরে রাজার আগমন প্রত্যাশা করলেন? কেন এলো কবির মননে এই বিপরীত মার্গে আস্থা? আমরা বলব যে এর উত্তর কবির শিল্প ধারণায় মেলে না। কবির মতে শিল্পীর পুরুষীয় সত্তা তার ধ্যান, তার ধারণা, তার বিশ্বাস আপনাদের প্রকাশ করে শিল্পীর শিল্প কর্মে। এই ধারণার আলোয়

১। ডাকঘর পৃঃ ৬৩।

কবি-মানস ও ডাকঘর অসম্বদ্ধ ব'লে মনে হয়। 'ডাকঘর' উৎকৃষ্ট শিল্প সৃষ্টি ব'লে পরিগণিত হয়েছে যদিও কবির বিশ্বাস থেকে, তাঁর ধারণা থেকে এই সুন্দর নাটকখানি তার জীবনরস আহরণ করেনি। আমরা বলব যে শিল্পকর্ম হ'ল সামগ্রিক অনুভূতির প্রকাশ। সে অনুভূতি ভোক্তার জীবনের গভীরে প্রতিষ্ঠিত বা অপ্রতিষ্ঠিত রইল কি না সে তত্ত্বটা শিল্পের পক্ষে অবান্তর। ডাকঘর নাটকের রচনাকাল ১৩১৮ সাল। এর অল্পকিছুদিন আগে কবি দুরারোগ্য অর্শ ব্যাধিতে খুব কষ্ট পেয়েছেন[১]। তখনও পূর্ণ স্বাস্থ্যলাভ কবির পক্ষে সম্ভব হ'য়ে ওঠে নি। দুরারোগ্য কালব্যাধি তাঁর জীবনীশক্তিকে ক্ষয় ক'রে দিয়েছে। মানসিক অশান্তি ও দৈহিক অস্বাচ্ছন্দ্য কবিকে তাঁর বলিষ্ঠ আশাবাদ থেকে বুঝি বিচ্যুত করেছিল। তাই কবির লেখনীতে অসুস্থ রুগ্ন অমলের জীবনকে আশ্রয় ক'রে এক মহৎ সত্য আবির্ভূত হ'ল যার দেখা সুস্থ সহজ রবীন্দ্রনাথের লেখায় বড় একটা মেলে নি। কবির অবচেতন মন যে সত্যের দেখা পেলো তা তাঁর সমগ্র চেতনার বহির্ভূত ছিল এতোদিন। অসুস্থ শিল্পীমন যে সৃষ্টি করল হয়ত সুস্থ থাকলে তা সম্ভব হ'তো না। যে নন্দনতাত্ত্বিক বৈরাগ্য (Aesthetic detachment) শিল্পসৃষ্টির পক্ষে অপরিহার্য তা অসুস্থ মানসিকতার নিত্য সহচর। অসুস্থ দেহ নির্লিপ্ত দৃষ্টিভঙ্গী দেয় মনকে। প্রাণের আধিক্য মননের স্বচ্ছতাকে অনেকক্ষেত্রে আবিষ্ট করে। শিল্পীর মানসিকতায় দূরত্ব অতি প্রয়োজনীয়। সে দূরত্ব সহজলভ্য হয় যদি দেহের শক্তি স্রোতে কিছু মন্দা পড়ে। মনটা সহজেই বৈরাগ্যের গেরুয়া রঙে লাঞ্ছিত হয়। দূর থেকে সব জিনিষকে দেখা সহজ হ'য়ে ওঠে। বস্তুর সঙ্গে নিজেকে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত করার আর উৎসাহ থাকে না। দূরত্বটা আপনি ঘনিয়ে ওঠে; শিল্পকর্ম সে দূরত্বের স্পর্শ ধন্য হয়। অসুস্থ শিল্পী যে অত্যুৎকৃষ্ট শিল্পরচনা করেছে তার নজির ভূরি ভূরি আছে সারা পৃথিবীর শিল্প-ইতিহাস জুড়ে। শিল্পীরাও অনেকে স্বীকার করেছেন অসুস্থ মনের সৃষ্টি সম্ভাবনাকে। এমন কথাও অনেকে বলেছেন যে উৎকৃষ্ট শিল্পসৃষ্টি অসুস্থ অবস্থায়ও সম্ভব হয়। কেন না তাঁদের মতে সৃষ্টি হ'ল Passive activity বা উদাসীন কর্ম। শুক্তির ভিতর মুক্তা যেমন জন্ম নেয় ঠিক তেমনি করেই শিল্প জন্ম নেয় শিল্পী মনে। সচেতন প্রয়াসে শিল্প সৃষ্টি হয় না। তাই ত' অসুস্থ মনের অবচেতনকে অনেকে

১। শ্রীপ্রভাত মুখোপাধ্যায় কৃত রবীন্দ্র জীবনী প্রথম খণ্ড; পৃঃ ৪৮৮ দ্রষ্টব্য।

শিল্পের জন্মজঠর ব'লে অভিহিত করেছেন। প্রখ্যাত কবি হাউসম্যানের কথা উদ্ধৃত ক'রে দিচ্ছি[১] :

"In short I think that the production of poetry, in its first stage, is less an active than a passive and involuntary process ; and if I were obliged, not to define poetry, but to name the class of things to which it belongs, I shall call it a secretion ; Whether a natural secretion like turpentine in the Fir or a morbid secretion, like the pearl in the oyster. I think that my own case, though I may not deal with the material so cleverly as the oyster does, is the latter ; because I have seldom written poetry unless I was rather out of health and the experience though pleasurable was generally agitating and exhausting." হাউসম্যানের স্বীকারোক্তি অনেক খ্যাতনামা শিল্পীর আপাতবিরুদ্ধ শিল্পকর্মের বা শিল্পদর্শনের সুষ্ঠু ব্যাখ্যা করতে পারবে বলে আমরা মনে করি। যখন জাগ্রত ব্যক্তির চেতনা দুর্বল হ'য়ে পড়ে তখন সীমাহীন অবচেতন মন থেকে বিচিত্র রূপ, বিচিত্র ভাব উঠে এসে আত্ম প্রকাশ করে শিল্পকর্মের মধ্য দিয়ে। তার রং যেমন বিচিত্র, তার ভাবও তেমনি বহুরূপী। সে রঙের, সে ভাবের হয়ত কোন মিলই খুঁজে পাই না আমরা সুস্থ চেতন মনের শিল্প কার্যে। অসুস্থ রবীন্দ্রনাথ তাঁর অসুস্থ মনের অনুভূতিকে রূপ দিলেন, তাঁর তৎকালীন ধারণাকে ফুটিয়ে তুললেন অমলের চরিত্রের মধ্যে। সে ধারণা তার সমগ্র মনন সাধনার বিরোধী হয়েও সত্য। সুস্থ শিল্পীর শিল্পকর্ম যেমন জীবনের দ্যুতিতে প্রাণবন্ত ঠিক তেমনি অসুস্থ শিল্পীর ভ্রান্তি ও অবসাদ এক অনৈসর্গিক রূপচ্ছটায় তার শিল্পকর্মকে সুষমামণ্ডিত করে। উভয়েই সত্য, উভয়েই সুন্দর। গ্যেটের প্রাণপ্রাচুর্য মহৎ শিল্প সৃষ্টি করেছে আবার হাউসম্যানের অসুস্থমনের শিল্পকর্ম ও রসিকজনকে আনন্দ দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের জীবনে ও মননেও এই প্রাণ-প্রাচুর্য ও প্রাচুর্যের অভাব উভয়েই যে মহৎ শিল্প সৃষ্টি করেছে তার প্রমাণ রয়েছে। 'ডাকঘর' অসুস্থ কবি-মনের সৃষ্টি, আর হাজার হাজার অত্যুৎকৃষ্ট লেখা রয়েছে কবির যেগুলি তাঁর পরিপূর্ণ প্রাণশক্তির প্রসাদে সমুজ্জ্বল। ডাকঘর নাটক, অমল চরিত্র হ'ল কবির জীবন-দর্শন থেকে চ্যুত, ভ্রষ্ট। সে ভ্রষ্টতার গভীর অর্থ আছে। সে অর্থ নন্দনতত্ত্বের এক জটিল সমস্যার সমাধান করেছে। গ্যেটে কল্পিত নন্দন-তাত্ত্বিক ধারণার বিকল্প মতবাদ প্রচ্ছন্ন রয়েছে ডাকঘর নাটকের পশ্চাদ্‌পটে।

১। A. E. Houseman লিখিত 'The Name and Nature of Poetry' গ্রন্থের ৪৮-৪৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

নাট্যকার বের্টোলড্ ব্রেশটের নন্দনতত্ত্ব

বের্টোলড্ ব্রেশট বিংশশতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে নাট্যজগতের ইঙ্গিতময় সম্ভাবনাপূর্ণ উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক বলে স্বীকৃত হয়েছেন। নাট্যের কলাকৌশলে কুশলী হয়েছেন ব্রেশট, নাট্যরসের স্বরূপটুকু বোঝার চেষ্টা করেছেন একান্ত-ভাবে; সামাজিক জীবনকে তার নগ্ন প্রতিরূপে রূপায়িত করার এক ধরনের নাট্যসাধনা নাট্যকার ব্রেশট লক্ষ্য করেছিলেন; তিনি এই ধরনের স্থূল স্বাভাবিকতাবাদের বিরোধী ছিলেন। আবার বৈজ্ঞানিক যুগের রঙ্গমঞ্চে তিনি আরো এক ধরনের প্রবণতা লক্ষ্য করেছিলেন; সে প্রবণতা হলো শিল্পানন্দের-উৎসকে বিদ্যালয়ের হরিণবাড়ীর চার-দেওয়ালের মধ্যে বেঁধে দেবার চেষ্টা; যা ছিল আনন্দ বিতরণ কেন্দ্র তাকে এক শ্রেণীর শিল্প-বিজ্ঞানীরা করতে চাইলেন গণসংযোগের মাধ্যম বা উপায়। অবশ্য ব্রেশট লক্ষ্য করেছিলেন যে, মহাবিজ্ঞানী আইনষ্টাইনের মতে বৈজ্ঞানিক গবেষণার বিস্ময়কর অগ্রগতির মূলে যে বিজ্ঞানীর সৌন্দর্যবোধটুকু রয়েছে, সেই তত্ত্বকে পরমাণু পদার্থবিদ ওপেন-হাইমার বৈজ্ঞানিক গবেষণা পদ্ধতির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত দেখেছিলেন। বিজ্ঞান মানুষের সঙ্গে তার চারপাশের জগতের যে সঙ্গতি ঘটিয়েছে তার মধ্যেই ওপেনহাইমার বিজ্ঞানীর সৌন্দর্যদর্শনের মূল সূত্রটি আবিষ্কার করেছেন। ব্রেশট কিন্তু জাগতিক বা বৈজ্ঞানিক জগতের সঙ্গে মানুষের সঙ্গতি বা সমন্বয় সাধনের মধ্যে সৌন্দর্যের মূল সূত্রটি খুঁজে পান নি। তিনি বললেন, রসের কেন্দ্রটুকুই হলো সুন্দরের লীলাক্ষেত্র। যেখানে আনন্দ নেই, সে জগৎ থেকে সুন্দর নির্বাসিত; নিরানন্দ জগতে সুন্দর অন্তেবাসী।

ব্রেশটের মতে নাট্যশালা বা রঙ্গমঞ্চই হলো সুন্দরের পীঠভূমি। রঙ্গমঞ্চ শ্রোতাকে ও দর্শককে আনন্দ দেবে। নাট্যকার নাটকের উপস্থাপিত ঘটনাগুলি হয় জীবন থেকে নেবেন না হলে সেগুলি তিনি কল্পনা করবেন। অবশ্য ব্রেশট বলেছেন যে, মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কটুকু ছাড়াও মানুষের সঙ্গে দেবতার যে সম্পর্কটুকু সম্ভাব্য তাও নাটকের উপজীব্য হতে পারে। রঙ্গমঞ্চের উপর নাট্যকার যাই উপস্থিত করুক না কেন, তার মূল উদ্দেশ্য কিন্তু আনন্দ দান করা, ওই আনন্দ পরিবেশনার মধ্যে নাটক ও নাট্যকারের মর্যাদাটুকু পরিচ্ছিন্ন থাকে। ব্রেশট বললেন, নাট্যকার যেন এই আনন্দটুকু দেবার ভান করে নীতিকথা না বলেন। নীতিকথা পরিবেশন করে আনন্দ দেওয়া অত্যন্ত দুরূহ কাজ।

ব্যবহারিক প্রয়োজনটাকে সর্বোচ্চ মূল্য দিয়ে প্লেতো এবং অ্যারিস্টটল এঁরা দুজনে তাঁদের নন্দনতত্ত্বের কাঠামোটাকে দুর্বল করে ফেলেছিলেন। ব্রেশট তা থেকে শিক্ষা নিলেন। তিনি বললেন, নাটকের জগতে নীতিকথার প্রয়োজনটা এহ বাহ্য। সেখানে আমাদের মূল লক্ষণীয় বিষয়ই হল নাটক আমাদের আনন্দ দিতে পেরেছে কি না? নাট্যবস্তু অনুধাবনের মূল সূত্র হলো আনন্দ, তা সে নাটকের উপজীব্য জাগতিক অথবা পরা-জাগতিক যাই হোক না কেন, যদি তা দর্শককে আনন্দ দিল তবে বুঝতে হবে যে নাটক রসোত্তীর্ণ হয়েছে। অবশ্য ব্রেশট আরিস্ততলীয় নন্দনতত্ত্বে ব্যাখ্যাত 'ক্যাথারসিস' তত্ত্বকে যেভাবে গ্রহণ করেছেন আমরা হয়ত তাকে ঠিক সেই ভাবে গ্রহণ করতে পারছি না। ক্যাথারসিস তত্ত্ব ঠিক আনন্দতত্ত্বের অনুষঙ্গী নয়। ব্রেশট বলেছেন, তারা হলো অনুষঙ্গী, আমরা বলব, ক্যাথারসিস তত্ত্ব ও প্রয়োজনবাদ পরস্পরের সহযোগী। নাটকে যে রস পরিবেশিত হয়, তা থেকে আমরা যে আনন্দ পাই সে আনন্দের মধ্যে উচ্চনীচের স্তর ভেদ নেই। অবশ্য ব্রেশট স্বীকার করেছেন যে নাট্যরসের মধ্যে বা নাট্যানন্দের মধ্যে উচ্চনীচের ভেদ না থাকলেও আমরা জটিল নাটক থেকে বেশী আনন্দ পাই; যে নাটকে নাট্যবস্তু সহজ এবং সরল তার উপস্থাপনায় আমরা যে আনন্দ পাই, স্বাদে বর্ণে গন্ধে জটিল নাট্যবস্তুর দেওয়া আনন্দের চেয়ে তা অনেক তরল এবং ফিকে; এই জটিল নাট্যবস্তু থেকে পাওয়া যে আনন্দ তার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ব্রেশট উপমার আশ্রয় নিয়েছেন। প্রেমিক-প্রেমিকা যেমন প্রেমলীলার চরম পরিণতি এবং পরম সার্থকতা পেয়ে থাকেন যৌন আনন্দে ঠিক তেমনিধারা মহৎ নাটকের অর্থাৎ জটিল নাটকের পরিণতি হলো এই নাট্যানন্দে। তাহলে ব্রেশট ইঙ্গিত করলেন যে, জটিল নাটকই হ'ল মহৎ নাটক; কেননা এই জটিল নাটকের আবেদন দর্শকের কাছে অনেক বেশী সরস ও ঐশ্বর্যবান; এই নাটকের আবেদনে অন্তর্বিরোধ থাকলেও এতে বেশী ফল পাওয়া যায়, অর্থাৎ বেশী মাত্রায় আনন্দ হ'ল এই ধরনের নাটকের ফলশ্রুতি।

নাটকের উপজীব্য হ'ল জীবন ও জগৎ। জীবনধারা সহস্রখাতে নিরবিচ্ছিন্ন ধারায় বয়ে চলেছে। সে ধারা শুধু পরস্পরের থেকে বহিরঙ্গে ব্যাপ্তিতে বা গতিশীলতায় পৃথক নয়; তাদের মধ্যে স্বরূপগত, প্রকৃতিগত প্রভেদও রয়েছে। সেই স্বারূপ্যের বিভিন্নতাটুকু নাট্যবস্তুর উপজীব্য হবে একথা ব্রেশট বললেন। দর্শককে আনন্দ দেবার প্রয়োজনে নাট্যবস্তুর রকমফের করতে হবে।

ব্রেশট ঐতিহাসিকতার নজীর তুললেন। গ্রীস দেশে শ্রোতা আনন্দ পেয়েছে অমোঘ দৈববিধির সমাহীন প্রয়োজনটুকু দেখে। ফরাসীদর্শক সংহৃত প্রত্যাশায় নাটকে দেখতে চেয়েছিল যে, সবাই নিজ নিজ কর্তব্য করছেন। এটুকু পেলেই ফরাসী দর্শক খুশী। এলিজাবেথীয় যুগের ইংরেজ দর্শক সে যুগের নাগরিকদের সদাজাগ্রত ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যটুকুকে নাটকীয় চরিত্রে প্রতিফলিত দেখতে চেয়েছিলেন। যুগে যুগে দেশে দেশে শ্রোতা ও দর্শক নাটক দেখতে গিয়েছেন বিভিন্ন প্রত্যাশা নিয়ে, এ তত্ত্বকে স্বীকার করে নিয়েও ব্রেশট বললেন, —রঙ্গমঞ্চে উপস্থাপিত নাট্যবস্তুকে জীবনের প্রতিচ্ছবি না হলেও চলবে।

নাটকের উপজীব্য যদি জীবনের প্রতিচ্ছবি না হয় তবে তার স্বরূপটা কি হবে, সে প্রশ্ন স্বাভাবিক ভাবে উঠবে। ব্রেশট বললেন, জীবনে যেমনটি ঘটেছে তাকে ঠিক সেইভাবে নাটকে রূপায়িত করার প্রয়োজন নেই। ব্যবহারিক জীবনের সঙ্গে গরমিলটুকু নাট্যবস্তুর গুণে অবক্ষয় ঘটায় না। যা অসম্ভব তাও নাটকের বিষয়বস্তু হতে পারে। এই জীবনের সঙ্গে অসঙ্গতি ও অসম্ভাব্যতা এরা যখন নাটকের উপজীব্য হবে তখন তাদের মধ্যে একটা ছেদহীন ছন্দ অনুস্যূত করে দিতে হবে। এটি নাট্যকারের গুরুদায়িত্ব। নাট্যকারকে কাব্যপ্রকরণ ও নাট্যপ্রকরণের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম প্রয়োগ ক'রে নাটকের গল্পটিকে গতিশীল করে তুলতে হবে। নাটকের মুখ্য চরিত্রের হৃদয়াবেগ প্রবাহ দর্শককে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। তা যখন যায় তখন নাটকের আখ্যানভাগের অসঙ্গতি আমাদের চোখে পড়ে না। সোফোক্লিস, রাচিন অথবা সেক্সপীয়ার কারোর নাটকই এই নাট্যতত্ত্বের ব্যতিক্রম নয়। ব্রেশট সেই সত্যটুকুর ওপর জোর দিয়ে বললেন, (তিনি ইতিহাস থেকে নজীরের পর নজীর উদ্ধৃত করে বললেন) নাট্যের বিষয়বস্তুর "অসম্ভাব্যতা ও অবাস্তবতা" সত্ত্বেও এই সব নাটক আমাদের আনন্দ দিয়েছে। আজও গৌড়জন সেই সব নাটক থেকে আনন্দে সুধাপান করেছেন। তবে ব্রেশটের মতে পুরাতন নাটক থেকে, নাট্যের ঘাত প্রতিঘাতপূর্ণ আখ্যানভাগ থেকে আমরা যথার্থ নাট্যরসটুকু উপলব্ধি করতে পারি না। "ভাষার সৌন্দর্য" নাটকের বিষয়বস্তুর নির্মিতি সৌকর্য অথবা 'কুশীলবের বাচন-কৌশল', এরা আমাদের মোহিত করে। ব্রেশট এদের নাম দিয়েছেন "ইনসিডেন্টালস্ অফ দি ওল্ড ওয়ার্কস্"। তাঁর মতে এই সব কৌশল অবলম্বন করে নাটকের আখ্যানভাগের দুর্বলতাটুকু নাট্যকার ঢেকে রাখেন। আরিস্ততলীয় সূত্র—আখ্যানভাগেই হল নাটকের প্রাণ—আধুনিক দর্শন, এ সম্বন্ধে বোধ হয়

ব্রেশট উদাসীন। ব্রেশট বললেন, পুরানো নাটককে তার সেই পুরানো পরিপ্রেক্ষিতে বুঝতে হবে। 'সহমর্মিতাবোধ' তত্ত্ব দিয়ে ঐ যুগের নাটককে বোঝা যাবে না, কেননা তাঁর মতে এই তত্ত্ব হল বয়সে নবীন ; এ দিয়ে প্রাচীন নাট্যাবলীর রস গ্রহণে বাধা আছে। ব্রেশটের এই মতটি বোধহয় প্রাচীন নাট্যতত্ত্ব ও নন্দনতত্ত্বে আলোচিত তত্ত্বাবলীর দ্বারা বাধিত। অভিনবগুপ্ত বিরচিত 'অভিনব ভারতী' শীর্ষক ভরতমুনির নাট্য শাস্ত্রের টীকা থেকে প্রতিভান শব্দটির ব্যাখ্যা অনুধাবন করলেই আমাদের বক্তব্য সুপরিস্ফুট হয়ে উঠবে। সাধারণ ভাবে জ্ঞানতত্ত্বের আলোচনায় ভারতীয় দর্শনে তার চিত্তবৃত্তি যে 'ঘটাকার' বা 'পটাকার' প্রাপ্ত হয়, একথা সহজ স্বীকৃতির মর্যাদা লাভ করেছে। সুতরাং সহমর্মিতাবোধ আমাদের দেশের জ্ঞানতত্ত্বে একটি সুপরিচিত ধারণা। শিল্পতত্ত্বে এর স্বীকৃতি পেয়েছি নাট্যশাস্ত্রের টীকা গ্রন্থ অভিনবভারতীতে। এই গ্রন্থে "প্রতিভান" শব্দটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এই শব্দটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে প্রতিভা হল কবির শক্তি, প্রতিভান সহৃদয়ের। রাজশেখর প্রতিভার দুটি ভাগ করেছেন। প্রথমটি কারয়িত্রী—যে শক্তি কবির কাব্য রচনায় সহায়ক (কর্বেরূপ কুর্বাসা কারয়িত্রী)। দ্বিতীয়টি ভাবয়িত্রী—যে শক্তি ভাবকের ভাবনায় সহায়ক, যা কবির চেষ্টা, অধ্যবসায় ও অভিপ্রায়ের সঙ্গে একাত্মতা ঘটায় (ভাবকস্তোপ কুর্বাসা ভাবয়িত্রী) সা হি কবেঃ শ্রম অভিপ্রায়ং চ ভাবয়তি'। প্রতিভান বলতে ভাবকত্বশক্তি বা ভাবয়িত্রী প্রতিভাকেই বোঝায়। অতএব একথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, সহমর্মিতা বোধের ধারণা মোটেই আধুনিককালের নয়। অভিনব গুপ্ত যখন ভরতমুনি বিরচিত নাট্যশাস্ত্রকথিত নাট্যতত্ত্বের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, নাট্যে প্রযুক্ত গীতবাদ্য-মঞ্চ-নটী প্রভৃতির জন্যই দর্শকের মনের পরিমিতি বা সঙ্কীর্ণতা দূরীভূত হয় এবং তার মন একান্তভাবে নাট্যের বিষয়মুখী হয়। তখন কি প্রকারান্তরে এই সহমর্মিতার কথা বলা যায় না ?

এতদ্ব্যতীত রসের আলোচনা প্রসঙ্গে মম্মট, বিশ্বনাথ ও জগন্নাথ বললেন যে ভক্তের প্রেম যখন তার ইষ্টদেবতার উদ্দেশ্যে প্রধাবিত হয়, তখন তাকে 'ভাব' আখ্যা দেওয়া হয় এবং এই 'ভাব' (ভক্তি), বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারী ভাবের সংযোগে প্রকট হয়। অবশ্য এঁরা একে 'রস' আখ্যা দেন নি। কিন্তু বৈষ্ণব রসবাদীরা এই ভক্তিকে শ্রেষ্ঠ রস বলেছেন। সে যাই হোক, এ তত্ত্বটি সুপ্রকট হয়ে উঠছে যে সহধর্মিতাতত্ত্ব প্রাচীন ভারতীয় নাট্য তত্ত্বে এবং

কাব্যতত্ত্বে একেবারে অপরিজ্ঞাত ছিল না। তাই ব্রেশটের উপরোক্ত মন্তব্যটি খুব সমীচীন হয় নি বলেই মনে হয়।

(দুই)

নাট্যের মুখ্য উদ্দেশ্য হল আনন্দ দান। আনন্দ দেওয়া ছাড়া, নাটকের যে অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই একথা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বললেন ব্রেশট। দর্শক কখন আনন্দ পান নাটক দেখে, এ প্রশ্ন স্বভাবতই ওঠে। ব্রেশট বললেন, জীবনের হুবহু নকল করতে পারলেই মঞ্চে উপস্থাপিত নাট্যবস্তু দর্শককে যে আনন্দ দিতে পারবে, এ কথাটা কিন্তু সত্য নয়। জীবনে যেমনটি ঘটেছিল, তা থেকে বহু বিচ্যুতি বহু ব্যতিক্রমও কিন্তু নাটকে সার্থকভাবে রূপায়িত হতে পারে। এর ফলে কিন্তু রসাভাস ঘটবে না কোথাও। প্রাকৃতিক ঘটনা-পরম্পরায় যাকে আমরা 'সম্ভাব্যতা' বলি, তাও কিন্তু নাট্যের বিষয়বস্তুর মধ্যে অনুপস্থিত থাকতে পারে। আর এই 'অনুপস্থিতি'টুকুও কোথাও কিন্তু নাটকে রসের হানি ঘটায় না। ব্রেশটের মতে, নাটকের আখ্যানভাগে 'দুর্নিবার গতিবেগের মায়া' এসে লাগলে তবেই নাটক সহৃদয় সামাজিকের চোখে সার্থক হয়ে উঠবে। আর এটি সংসাধন করতে কাব্য এবং নাট্যের সর্ববিধ প্রাসঙ্গিক প্রকরণকে কাজে লাগাতে হবে। ব্রেশট আরিস্ততলকে অনুসরণ করে বললেন, নাট্যের উপজীব্য হলো নাটকের কাহিনী। রঙ্গমঞ্চে মানুষের সঙ্গে মানুষের পারস্পরিক সম্বন্ধটুকু যদি সঠিকভাবে যথাযোগ্য পরিপ্রেক্ষিতে উপস্থাপিত করা না হয় তাহলে আমাদের রসোপলব্ধির পথে বাধা ঘটে। বিজ্ঞান যেমন আমাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধান করে। শিল্পকলা, নাট্যকলা আমাদের তেমনি চিত্ত বিনোদন করে, আনন্দের বিবর্ধন ঘটায়। ব্রেশট বলেছেন, সমকালীন সামাজিক জীবনকে রঙ্গমঞ্চে আমরা যদি উপস্থাপিত না করতে পারি তাহলে তা তৎকালীন দর্শকদের কাছে গ্রাহ্য হবে না। তবে সমকালীন সমাজের প্রতিফলন নাটকে ঘটাতে পারলে, তবেই নাটক গণসংযোগ ও জন শিক্ষার বাহন হয়ে উঠবে। সমকালীন সমস্যার সমাধান থাকবে মঞ্চে উপস্থাপিত নাটকে। সমকালীন সুধীও জ্ঞানীদের প্রজ্ঞা, যৌবনের অপ্রতিরোধ্য ক্রোধ, হতভাগ্যদের জন্য গভীর মমত্ববোধ, এক কথায় এক ধরনের সর্বজনগ্রাহ্য মানবিকতা নাটকে প্রতিফলিত হবে। যুগের কল্যাণবোধ, তার শুভবুদ্ধির ছায়া নীতিজ্ঞানের প্রভাব, এ সবই এসে পড়বে নাটকে। যা কিছু আসুক না কেন, নাটকের উপজীব্য, যাই হোক না কেন, নাট্যকারের

দায়িত্ব হলো তাকে যথাযোগ্যভাবে উপস্থাপিত করা ; এই যথাযোগ্যতার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ব্রেশট 'ফোর্স ফুজি' এবং 'গ্রাণ্ড ফেল', এই দুটি কথার ব্যবহার করলেন অর্থাৎ নাটকের উপজীব্য কাহিনীকে এক ধরনের প্রাণ-মণ্ডিত করতে হবে, যার ফলে ঘটনা তার সাময়িক তুচ্ছতাকে অতিক্রম করে বৃহত্তের সঙ্গে, মহত্তের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে। আমরা বলতে পারি, সাময়িককে সার্বিক আবেদনে মণ্ডিত করাই নাট্যকারের কাজ। এটুকু ঘটাতে পারলেই অতিপরিচিত ঘটনাও অজানার রহস্যে মণ্ডিত হয়ে উঠবে। পরিচিত ঘটনাকে দেখেও তার বিস্ময়ের ঘোর কাটবে না। আমাদের চারপাশের পরিচিত জগৎটা বৈচিত্র্যময় হয়ে উঠবে দর্শকের চোখে। নাট্যকার এটি ঘটাবেন নাটকের আঙ্গিক বা প্রকরণের যথাযোগ্য ব্যবহার ক'রে। ব্রেশট এই নব্য সামাজিক বৈজ্ঞানিক প্রকরণের নাম দিলেন দ্বান্দ্বিক 'জড়বাদ'। সমাজ যে বিধি মেনে এগিয়ে চলে সেই বিধিগুলিকে যথাযোগ্য রূপে ধরতে পারলে আমরা সমাজ বিবর্তনের ছন্দটুকুকে ঠিক মত ধরতে পারব এবং সমাজের অগ্রগতির পথে যে সব অসংলগ্নতা রয়েছে তাদের আমরা বুঝতে পারব। "দ্বান্দ্বিক জড়বাদ" বলল, যার পরিবর্তন আছে তাই-ই অস্তিত্ববান। পরিবর্তন অস্তিত্বের সূচনা করে, অর্থাৎ 'ক' যখন 'খ' এ পরিবর্তিত হয় তখনই কেবল আমরা 'ক'এর অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠি। এই সামাজিক পরিবর্তনকে আবার আমরা বুঝতে পারি নাটকের পাত্রপাত্রীদের অনুভূতি, মনোবৃত্তি এবং মত প্রকাশের ব্যারোমিটারে। মানুষের সমাজ জীবনকে বুঝতে হলে, মানুষের এই বোধের এবং বুদ্ধির জগৎটাকে বুঝতে হবে। সে বোঝার পথে কিন্তু সহমর্মিতাবোধ নয়, ব্রেশটের মূল বক্তব্য আমাদের মনে হয়, "এমপ্যাথি" তত্ত্বের বিরোধী। "There is a great deal to man, we say, so a great deal can be made out of him. He does not have to say the way he is now, nor does he to be seen only as he is now, but also as he might become. We must start with him. We must start on him, This means, however, that I must not simply set myself in his place, but must set myself facing him, to represent us all. That is why the theater must make what it shows seems strange."

ব্রেশটের উপরি-উক্ত বক্তব্য থেকে এক ধরনের বিরোধের ধারণা উঠ

হচ্ছে। নাটক এবং দর্শকের মধ্যে এমন এক ধরনের 'বিরোধ' এক ধরনের অপরিচয় গড়ে তুলতে হবে, যার ফলে অতি পরিচিত ঘটনাও, পরিচিত চরিত্রও অপরিচয়ের বিস্ময়ে মণ্ডিত হয়ে ওঠে। এটি হল নন্দনতাত্ত্বিক দর্শনভঙ্গির ফলশ্রুতি। ব্রেশট পরিষ্কারভাবে বললেন, অভিনেতা যেমন অভিনীত চরিত্রের সঙ্গে একাত্ম হবেন না তেমনি দর্শকও এই অভিনীত চরিত্রের সঙ্গে একাত্ম হবেন না। একাত্ম হওয়া তো দূরের কথা সহানুভূতি থাকাও শিল্পবোধের পরিপন্থী। 'বেঁর্গস' হাস্যরসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বললেন, সহানুভূতি হাস্যরসের এর পরিপন্থী' বেঁর্গসকে অনুসরণ করে ব্রেশট, বললেন যে শিল্পানন্দের মধ্যে যে অপরিচয় ও বিস্ময়ের ঘোরটুকু জেগে থাকে তার অকাল মৃত্যু ঘটবে যদি আমরা অভিনীত চরিত্রের সঙ্গে একাত্ম হয়ে উঠি অথবা তাঁর প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে উঠি ; সুতরাং বলা যেতে পারে যে ব্রেশট হলেন এক অর্থে সহমর্মিতা বিরোধী।

প্রকৃতি যেমন পরিবর্তিত হচ্ছে আমাদের চারপাশের জগৎটার যেমন নিরন্তর পরিবর্তন ঘটছে তেমনি সমাজও নিত্য পরিবর্তনশীল। এই পরিবর্তনের মধ্যেই আনন্দের উৎসটুকু নিহিত আছে। নূতনের, অভিনবের আবির্ভাবকে প্রত্যক্ষ করি। আমাদের মনে বিস্ময় জাগে আর এই বিস্ময় হলো শিল্পানন্দের সূতিকাগৃহ। অতএব মঞ্চে উপস্থাপিত চরিত্র যদি ক্ষণে ক্ষণে না বদলায় তা হলে নাটকের একঘেয়েমির মধ্যে শিল্পানন্দ হারিয়ে যাবে ; তাই ব্রেশট বললেন, মঞ্চে উপস্থাপিত চরিত্রগুলি একে অপরের উপর নির্ভর ক'রে, পরস্পরের কাছ থেকে শিক্ষা নিয়ে পরস্পরের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আপন আপন চরিত্রের ক্রম-বর্ধমানতাকে অব্যাহত রাখবে। নাটকে প্রায়শই একটি চরিত্র প্রধান হয়ে ওঠে এবং অন্যান্য চরিত্র অপ্রধান ভূমিকায় সেই প্রধান চরিত্রটিকে মুখ্য ভূমিকায় উদ্ভাসিত হতে সহায়তা করে মাত্র। ব্রেশট এর বিরোধিতা করেছেন। বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে এই পারস্পরিক সম্পর্ককে ব্রেশট 'গেসটুস' এই আখ্যায় অভিহিত করলেন। অভিনেতাকে এই গেসটুসকে বুঝতে হলে প্রথমেই নাটকের আখ্যানভাগের অন্তরে প্রবেশ করতে হবে। গল্পটিকে পরিচয়ের গণ্ডি অতিক্রম করে অপরিচয়ের সীমানায় পৌঁছিয়ে দিতে হবে বিচিত্র মঞ্চ আঙ্গিকের মাধ্যমে। এই মঞ্চ আঙ্গিকের মাধ্যমেই অভিনেতা এবং দর্শকের মনের মধ্যে যথাযোগ্য নন্দনতাত্ত্বিক (বৈরাগ্য) বা Aesthetic detachmentএর আবির্ভাব ঘটবে। এই পথেই আমাদের শিল্পানন্দের উপভোগ সম্পূর্ণ হবে।

চতুর্থ স্তবক

চতুর্থ স্তবক

আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথের নন্দনতত্ত্ব

আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল রবীন্দ্রনাথের সমকালীন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদ থেকে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত ব্রজেন্দ্রনাথের মনীষা বাংলা তথা ভারত সংস্কৃতিকে উজ্জ্বল করে রেখেছিল। আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথের উদ্দেশে রবীন্দ্রনাথ যে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করেছিলেন, তা মুখ্যত দার্শনিক ব্রজেন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যে এবং কবি ব্রজেন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যে উচ্চারিত হয়েছিল। ইংরেজী ভাষায় অনূদিত হ'য়ে মহাকবির এই দার্শনিক বন্দনা দেশে-বিদেশে বহুখ্যাত হ'য়েছিল:
"Pilgrim the highest peaks of knowledge, hard to climb you have scaled,

These or imagination's canvas in diverse paints and colours

Is painted the invitation of Eternal beauty;

The radiance white from there, garland of glory that is

The Goddess of wisdom's caressing hand, plays round your noble brow.

ব্রজেন্দ্রনাথ ছিলেন একাধারে কবি ও দার্শনিক। কবি ক্রান্তদর্শী, তাই ব্রজেন্দ্রনাথের মধ্যে আমরা পাই সম্যক দর্শনের জন্য সাধনা। একে ব্রজেন্দ্রনাথ "Synoptic view of things", আখ্যা দিয়েছেন। তাঁর প্রখ্যাত দীর্ঘপদী কাব্য Quest Eternal, যে জগতের সন্ধান দিয়েছে, সেই জগতও দার্শনিক ব্রজেন্দ্রনাথের এই "Synoptic view of things"এর সাক্ষ্য বহন করছে।

সমালোচক ব্রজেন্দ্রনাথ বললেন যে, কাব্যের বিচার হ'বে মানুষের ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত জীবনদর্শন পরিকল্পনার কষ্টি পাথরে। বিশ্বসংসারকে দেখার একান্ত রূপে ব্যক্তি আশ্রিত যে দৃষ্টিভঙ্গী, সেই দৃষ্টিকোণ থেকেই কাব্যের বিচার করতে হবে। শিল্পগুণ নির্ণয়ের এই যে মানদণ্ড, এই মানদণ্ডই হ'ল জীবন সমালোচনার মাপকাঠি; একে ব্রজেন্দ্রনাথ বলেছেন, "criticism of life"। এই জীবন হ'ল সমগ্র জীবন, উপনিষদের ভূমা-আশ্রিত মহাজীবন।

এই পূর্ণ সমগ্রতার ধারণা ব্রজেন্দ্রনাথকে একদিকে যেমন শিল্প-সাধনায় উৎসাহিত করেছে, তাঁকে 'Quest Eternal'এর সার্থক কবি করেছে, তেমনি তাঁর শিল্প সমালোচনায়ও তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছে। এই ভূমা-ধারণার মধ্যে আরিস্ততলীয় প্রারম্ভ-মধ্য-সমাপ্তি তত্ত্বকে তিনি স্থান দিয়েছিলেন। এই সমগ্রতাটুকুই হ'ল অনন্ত ব্যক্তিত্ব আশ্রিত মানুষের জীবন পরিকল্পনা বা 'Individual scheme of life'.

এই প্রসঙ্গে ব্রজেন্দ্রনাথ বলেছিলেন: এই বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ যে, নান্দনিক এবং নৈতিক সকল প্রকার নৈতিক নির্মিতি কর্মে মানুষের আবেগ এবং অনুভূতি নিত্য ক্রিয়াশীল হয়ে থাকে; এই অনুভূতি এবং আবেগ ছাড়াও মানুষের ভাব, ভাবনা, কল্পনা ও সহজ সংস্কার সমানভাবে কাজ করে। কিন্তু শিল্প বিচারের মানদণ্ডে এদের প্রবেশ নেই। অনুভূতি ও কল্পনা—এরা কেউই শিল্প সমালোচনার ক্ষেত্রে আমাদের সহায় হয়ে উঠে না। 'No doubt all emotions are proper plastic stuff for constructions in aesthetics as well as ethics, but as building material, experience in all its forms is intrinsically valuable ideation, imagination, instinct, than emotion. But none of these enter into the norm. What does enter into the norm and test of poetry is not emotional exaltation, imaginative transfiguration or disinterested criticism but in and through them all the recreation of personality with an individual scheme of life; an individual out-look on the universe'.

সমালোচক ব্রজেন্দ্রনাথ শিল্প সমালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের অনন্ত ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের কথা বললেন। এই অনন্ত ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য সকল শিল্পেরই উপজীব্য। এই স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের ছাপ একদিকে যেমন শিল্পকর্মের উপর প্রতিফলিত হয় ঠিক তেমনি আবার তা পড়ে সার্থক শিল্প সমালোচনার উপরও। মানুষের অনন্ত স্বাতন্ত্র্যের প্রতি একটা জন্মগত মোহ আছে, এই মোহটুকু মানুষের ব্যক্তিত্বকে বিচিত্র বর্ণে বর্ণময় করে তোলে। মানব ব্যক্তিত্বের এই বহু বিচিত্রতা শিল্প কর্মে প্রতিফলিত হয়ে শিল্পকেও বহুবিচিত্র করে তোলে। এই বহু বৈচিত্র্যই হ'ল একদিকে শিল্পীর চরিত্রের স্বরূপ লক্ষণ, তেমনি আবার তা শিল্প সৃষ্টি বা শিল্পকর্মেরও স্বরূপ লক্ষণ, অনন্ত ব্যক্তিত্বমণ্ডিত শিল্পী 'নির্মাণ

করে'। এই নির্মিতি শক্তিই হ'ল শিল্পীর প্রতিভা: একে সমালোচক বলেছেন, 'অপূর্ব বস্তু নির্মাণ ক্ষমা প্রজ্ঞা'। এই অপূর্বতা না থাকলে শিল্প, শিল্প পদবাচ্য হয় না। তাই বহু শ্রুত, বহুখ্যাত মহাভারতকারপরিকল্পিত কর্ণ চরিত্র রবীন্দ্রনাথের কবি-কল্পনায় যে রূপ পেল সেই রূপ বোদ্ধা পাঠক ও সমালোচকের কাছে অপরিচিত। রবীন্দ্রনাথের কর্ণ কবির অনন্য ব্যক্তিত্বকে আশ্রয় করে আরেক ধরনের নতুন ব্যক্তিত্বের ঐশ্বর্যে ঐশ্বর্যবান হয়ে নতুন করে জন্ম নিল। এই কর্ণ মহাভারতকারের কর্ণ চরিত্র থেকে সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র। আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শিল্পীর আপন ব্যক্তিত্বের ও সৃষ্টির যে অনন্যতার কথা বললেন, সেই অনন্যতাটুকুই শিল্প মূল্যায়নের প্রধানতম মানদণ্ড রূপে গৃহীত হয়েছে ব্রজেন্দ্রনাথের শিল্প দর্শনে। শিল্পকর্মের এই অনন্যতাটুকুকে ভারতীয় রসশাস্ত্রে 'অপূর্ব বস্তু' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। সমালোচক ওয়ার্ডস্বার্থও এই অনন্যতাটুকুর জয় গান করেছেন: 'The light that never was on sea or land' আকাশ-পাতাল, স্বর্গ. নরক দ্যুলোক, ভূলোক কোথাও সেই কনে দেখা আলো আমরা দেখি নি যেমনটা দেখেছি সার্থক শিল্পীর আঁকা ছবিতে অথবা তাঁর লেখা কবিতায়। পূর্বে যদি সেই আলো দেখে থাকি তবে সেই আলো কিন্তু সার্থক শিল্পকে আর উদ্ভাসিত করে তুলতে পারবে না। অর্থাৎ সেই আলোকের আধারে শিল্পকৃতি সৃষ্টির মর্যাদা পাবে না। এই আলোই ব্রজেন্দ্রনাথের শিল্প নির্মিতির অনন্যতা। এই আলো আমরা দেখেছি শেলীর 'Skylark' কবিতায়, কীট্‌সের 'NAUGHTQ BOY' কবিতায় রবীন্দ্রনাথের 'স্মরণ' কাব্যগ্রন্থে, বোত্তিচেলির ও 'Leonardo de vinci'র ছবিতে।

আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথের শিল্পদর্শন প্রসঙ্গে যে সম্যক্ দর্শনের কথা আমরা বলেছি, সেই সম্যক্ দর্শনের ফলশ্রুতি হ'ল তত্ত্বের ক্ষেত্রে ব্রজেন্দ্রনাথের এক-ধরনের সম্যক্ পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনাটিও ঐক্য ও সামান্য লক্ষণের দ্বারা লক্ষণাক্রান্ত। এই পরিকল্পনার প্রথম পর্যায়ে রয়েছে ইতিহাস; মানব অভিজ্ঞতাকে স্থানকালের মধ্যে সীমিত করে দেখাই হল ইতিহাসের ধর্ম; কাল পারম্পর্যকে ইতিহাস শ্রদ্ধা করে। দ্বিতীয় পর্যায়ে আছে বিজ্ঞান এবং দর্শন। বিজ্ঞান ও দর্শনের সত্য হ'ল স্থান কাল নিরপেক্ষ। বিশেষ থেকে সামান্যের দিকে চংক্রমণ হ'ল বিজ্ঞানের ধর্ম; বিজ্ঞান সামান্যকে বিশেষের মধ্যে বিধৃত করে দেখতে চায়; দর্শনের চংক্রমণ হল সামান্য থেকে বিশেষে যাওয়া;

এই বিশেষকে দার্শনিক যখন সামান্যের প্রতিভূ হিসেবে দেখেন তখন বিশেষের মধ্যে সামান্য উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। বিশেষ এবং সামান্য একাকার হয়ে যায়। পরবর্তী পর্যায়ে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ বললেন আমরা পাই শিল্প এবং ধর্মকে ; শিল্পে আমাদের রসোপলব্ধি ঘটে ; সেই রস হ'ল আনন্দ স্বরূপ। ধর্মে আমাদের পরমানন্দ লাভ হয় ; সেই আনন্দের পথ হ'ল মরমীয়া সাধনার পথ। শিল্পের স্বরূপ লক্ষণ হ'ল এই আনন্দটুকু। ব্রজেন্দ্রনাথ এই পথেই কারুকলা এবং চারুকলার বিভিন্নতা নির্দেশ করলেন। তাঁর মতে কারুকলায় আনন্দ নেই এবং আনন্দের ছোঁয়া লাগে চারুকলার সমগ্র অস্তিত্বে। আমরা যখন ছবি দেখি বা গান শুনি অথবা কবিতা পড়ি তখন আমাদের সমগ্র সত্তা অকারণ পুলকে পুলকিত হয়ে ওঠে। রসবাদীর মত ব্রজেন্দ্রনাথ বললেন, রস হ'ল শিল্প প্রাণ। শিল্পীর হাজারো রূপের বৈচিত্র্যের মধ্যে এই একটি ব্যাপারে তাদের সামীপ্য এবং সাযুজ্যটুকু লক্ষণীয় ; সেটি হ'ল এই আনন্দ কেন্দ্রীভূত ব্যক্তিত্বের মূল উপাদান। রূপ-রঙ-রেখার অনন্ত বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে অসংখ্য শিল্প রূপ শিল্পীরা যুগে যুগে, কালে কালে সৃষ্টি করেছেন। ভাস্কর্য, স্থাপত্য, চিত্রণ, সঙ্গীত, কাব্য ও নাটকের অনন্ত রূপভেদ আমরা প্রত্যক্ষ করেছি শিল্প ইতিহাসের সেই প্রথম থেকে আজ পর্যন্ত। এই অনন্ত রূপভেদের ধর্মে আমরা যে অপরিবর্তনীয় অবিচলিত শিল্প লক্ষণটুকু লক্ষ্য করেছি তা হ'ল এই আনন্দটুকু। এই শিল্পানন্দকে প্রাচীন অলংকার শাস্ত্রে ব্রহ্মাস্বাদসহোদরঃ অর্থাৎ ব্রহ্মের আস্বাদ জনিত আনন্দের পরমাত্মীয় রূপ কল্পনা করা হয়েছে।

রস যে মাধ্যমকে আশ্রয় করে, সেই মাধ্যম শিল্পের বিশিষ্ট রূপকে নিরূপিত করে একথা আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ বললেন। ভাস্কর, স্থপতি, কবি, চিত্রী—এঁদের বাচন ভঙ্গী বিভিন্ন, এঁদের ভাষায় অনন্ত রূপভেদ ; আকার আশ্রয়ী তিনটি প্রধান শিল্পের উল্লেখ করলেন ব্রজেন্দ্রনাথ—স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও অঙ্কণ শিল্প-এদের মধ্যে স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের উপজীব্য হ'ল ঘনক্ষেত্র বা Three Dimension। চিত্রক্ষেত্র Two Dimensionকে আশ্রয় করে। স্থাপত্য-শিল্প কর্মে এই ঘনক্ষেত্রের বিস্তার স্থান এবং কালের দ্বারা অতি সীমিত। চিত্রকলা ক্ষেত্র Two Dimensionsকে আশ্রয় ক'রে ব্যঞ্জনার পূর্ণ অভিব্যক্তি ঘটানোর জন্য পরিপ্রেক্ষিত বা perspectiveএর সাহায্য নেয়। ডঃ শীলের কথা উদ্ধৃত করে দিই : "The three plastic arts—architecture, sculpture and painting are distinguished from one another by the number

of Dimensions of the medium in which they work. Architecture works in all the three Dimensions fully and freely so as to form an all sided representation of any given situation, sculpture works in three dimensions, but with a limited field and circumscribed space and line in each direction painting works in two dimensions and achieves its purpose with the help of perspective when so derived."

ব্রজেন্দ্রনাথের মতে এই ত্রিবিধ শিল্প কর্ম থেকে সম্পূর্ণ পৃথক হল সঙ্গীত। সঙ্গীতে জীবন সত্যের কোন প্রতিফলন নেই। জ্ঞাতা-অনির্ভর যে বস্তু জগৎ, সেই অতিবাস্তব জগতের অধিবাসীদের প্রবেশ সঙ্গীতের স্বর্গীয় লাবণ্যের জগতে নিষিদ্ধ। সঙ্গীত সংকেতের স্থূলতাকেও বর্জন করেছে। বাতাসের আন্দোলন ছন্দের নর্তনের মূল সেই ছন্দই হল সঙ্গীতের বস্তুনির্ভর মাধ্যমটুকু। সঙ্গীতের উপজীব্য হল স্বর মাধুর্য বা Melody Harmony বা সুর সমন্বয় অথবা গাণিতিক ছন্দোবদ্ধতা; এই গাণিতিক ছন্দোবদ্ধতার মধ্যে শিল্পের সুমিতি-বোধটুকু প্রকট হয়ে উঠে। এই সুমিতি বোধই হ'ল শিল্পী মনের অনন্ত আশ্রয়। এই সুমিতিবোধ থেকেই জন্ম নেয় Melody, Harmony এবং গাণিতিক ছন্দোবদ্ধতা। আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শূন্যে যে মহাসঙ্গীত প্রতি নিয়ত চলছে, সেই শূন্যের মহাসঙ্গীতে (Music of the Spheres) তিনি এই গাণিতিক ছন্দোবদ্ধতাকে কল্পনা করেছিলেন। অবশ্য ভাস্কর্য, স্থাপত্য, অঙ্কন এবং সঙ্গীত এ সবই ব্রজেন্দ্রনাথের কাছে 'এহবাহ্য'। তিনি আজীবন পূর্ণ রূপের, পূর্ণ সত্যের সাধনায় মগ্ন ছিলেন। তাই তিনি কাব্যকে এই পূর্ণ রূপ এবং পূর্ণ সত্যের প্রতিভূ হিসাবে সর্বোত্তম শিল্প কলার মর্যাদা দিলেন। কাব্যে প্রত্যক্ষভাবে ভাষার মাধ্যমে রসের উদ্বর্তন ঘটে। কাব্যের এই ভাষা কল্পনাকে বিভিন্ন ধরনের চিত্রকলার মাধ্যমে উজ্জীবিত করে তোলে। বাচিক বা Vocal শিল্প এবং আকারগত বা Plastic শিল্পের সুষমা এবং মাধুর্য ব্রজেন্দ্রনাথ কাব্যে ও শিল্পে প্রত্যক্ষ করেছিলেন।

হিন্দু শিল্পে আত্মাকে চিত্রে রূপায়িত করে—Hindu painting paints the soul—এই ধরনের অতিশয়োক্তিকে ব্রজেন্দ্রনাথ মূল্য দেন নি। প্রাচীন শিল্প থেকে আধুনিক শিল্পকে তিনি পৃথকভাবে নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন তাঁর

নন্দনতত্ত্বে। চৈনিক, জাপানী এবং হিন্দু অর্থে প্রাচীন ভারতীয় শিল্পকে তিনি পৃথক করে দেখেছিলেন নব্যযুগের Cubism, Dadaism, Scintinism, Imagism প্রমুখ শিল্প আন্দোলন থেকে। ব্রজেন্দ্রনাথ শিল্পে অনুকৃতিবাদের সমালোচনা করেছেন। তিনি বললেন, শিল্পে বস্তুর রূপান্তর ঘটে শিল্পীর ধ্যান মাধ্যমে ; সেই ধ্যানাশ্রিত শিল্পবিষয় তার জগৎ-আশ্রিত বাস্তব রূপটুকুকে শিল্পীর কল্পনার জারক রসে জারিত হয়ে ধীরে ধীরে হারিয়ে ফেলে। কল্পনার গর্ভে জাত এই অনন্য শিল্পরূপটুকুই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আকার নেয়। ভারতীয় শিল্প শাস্ত্রে শিল্প মূর্তি গঠনের যে নির্দেশনা রয়েছে সেই নির্দেশনা যে সত্যিকারের শিল্প সৃষ্টির প্রতিকূল, এই ধারণা ব্রজেন্দ্রনাথের মনে বদ্ধমূল ছিল। তবে এই নির্দেশনার বন্ধনকে তিনি একেবারে অস্বীকার করেছেন, সে কথা বলা চলে না। অনুকৃতিবাদের বিরুদ্ধাচারী হয়েও তিনি এমন সম্ভাবনার কথা স্বীকার করেছেন, সে ক্ষেত্রে শিল্প শাস্ত্রের নির্দেশিত পথে তথাকথিত বন্ধন শাসনের মধ্যেও শিল্পী আপন সৃষ্টির স্বকীয়তাটুকুকে অক্ষুণ্ণ রাখতে পারে। ব্রজেন্দ্রনাথের মতে প্রতিভাধর শিল্পীরা শাস্ত্র নির্দেশিত অনুশাসন মেনেও সার্থক রূপ সৃষ্টি করতে পারেন। দক্ষিণ ভারতের অসংখ্য দেবমন্দিরে এই ধরনের সার্থক স্থাপত্য ভাস্কর্য কর্মের নিদর্শন ছড়ানো আছে।

ব্রজেন্দ্রনাথের নন্দনতত্ত্বের পূর্ণাঙ্গ বিবৃতি দিতে গিয়ে একথা বলা চলে যে তিনি শিল্পে ত্রিতত্ত্বকে স্বীকার করেছিলেন। প্রথম তত্ত্বটি হল শিল্পবোধের তত্ত্ব। শিল্পে আমরা ক্ষণিক আনন্দের অংশভাগী হই। এই পর্যায়ে ব্রজেন্দ্রনাথ শিল্প মূল্যের ক্ষণিকাবৃত্তির উপর জোর দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় ব্রজেন্দ্রনাথের বক্তব্য বলতে পারি :

'ক্ষণিকের গান
গা রে, আজি প্রাণ
ক্ষণিক দিনের আলোকে'—

রবীন্দ্রকাব্যে এই যে ক্ষণিকতার জয়গান করা হল, এই ক্ষণিকতাকে আশ্রয় করেছেন ব্রজেন্দ্রনাথ তাঁর শিল্পতত্ত্বের প্রথম সূত্রটিতে। দ্বিতীয় সূত্রটিতে তিনি এই ক্ষণিক আনন্দ উপলব্ধিকে সীমাহীনের মধ্যে, অসীমের মধ্যে বিধৃত করে দেখতে চেয়েছেন। এই অসীম হল কালাতীত। ব্রজেন্দ্রনাথের নন্দনতত্ত্বের দ্বিতীয় সূত্রটিতে আমরা ভারতীয় রসশাস্ত্রের রস চর্বনা বৃত্তিটিকে প্রতিষ্ঠা করার আগ্রহটুকু দেখতে পাই। দ্বিতীয় সূত্রের বিবৃতি প্রসঙ্গে ব্রজেন্দ্রনাথ শিল্পকর্মের

অনন্ত ধর্মের কথা বললেন এবং শিল্পের এই অনন্ত ধর্মটুকু 'কালাতীত ক্ষণিকের' পরিপ্রেক্ষিতে তিনি বিচার করেছিলেন।

ভারতীয় রসশাস্ত্রে শিল্পরসের সঙ্গে ব্রহ্মের স্বারূপ্য ঘোষণা করা হয়েছে ; সেই ঘোষিত স্বারূপ্যই ব্রজেন্দ্রনাথের তৃতীয় সূত্রটির প্রধান উপজীব্য। ব্রহ্মের আস্বাদজনিত আনন্দের সামীপ্য এবং সাযুজ্য লাভ ক'রে ব্রজেন্দ্রনাথের মতে শিল্পানন্দ তাঁর অনন্ত ধর্মটুকু লাভ করে। ব্রহ্ম হলেন রস স্বরূপ। ব্রহ্ম যদি অসংজ্ঞেয় অনন্ত হ'ন তাহলে শিল্প ও অসংজ্ঞেয়। ডঃ শীলের কথা উদ্ধৃত করি : 'The aesthetic values or satisfactions are finite values viewing Reality as temporal experience which cannot testify to any ultimate end

(2) That aesthetic values or satisfactions (Rasa) emergent, being manifestation of one ideal ground which is infinite or timeless (or eternal)

(3) That aesthetic satisfaction (or Rasa) testify to a unique Reality which may be termed the momentary infinitum'. *asat* of exaltation in which the experince of a moment is transfigured so as to make an infinite value. শিল্পের এই অসংজ্ঞেয়তা এক দিকে যেমন ব্রজেন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষ করলেন, অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথ সেই অসংজ্ঞেয়তাকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথ শিল্পের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে শিল্পকে মায়া আখ্যায় আখ্যাত করেছেন। শিল্পে এই মায়াতত্ত্বের সঙ্গে শিল্পের অনন্য চরিত্রধর্মের কোন অসঙ্গতি নেই। ব্রজেন্দ্রনাথের অনন্য শিল্প ধারণার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ কথিত মায়া ধারণার গুণভেদ নেই। শিল্প লক্ষণ হ'ল শিল্পের অসংজ্ঞেয়তা। শিল্পের এই অসংজ্ঞেয়তায় বিশ্বাসী হয়ে ব্রজেন্দ্রনাথ শিল্পের অনন্য বাস্তব বা unique Realism-এ বিশ্বাসী হ'য়ে উঠেছেন ; এর মধ্যে কোন না কোন সূত্রে জাতির প্রসারিত মানসিকতাকে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। ব্রজেন্দ্রনাথ একে বলেছেন, গণচেতনা বা 'Mass consciousness' আত্মজাতি চেতনা বা 'Race consciousness'। কথ্য বা লিখিত ভাষা যেমন একটা সমগ্র জাতির বিবর্তন ধারাকে আশ্রয় করে উদ্বর্তিত হয়ে ওঠে ঠিক তেমনি করে শিল্পের ভাষাও তার পরিপূর্ণ রূপটুকু খুঁজে পায় এই প্রজাতি মানসিকতার পরিপূর্তিতে। কথ্য বা লিখিত ভাষার

শব্দের প্রথম স্তর (Primary) ও দ্বিতীয় স্তর (Secondary) আশ্রিত অর্থ ও তাৎপর্য নিয়েই আমাদের সন্তুষ্ট থাকতে হয়। শিল্পের ভাষায় এই দু'য়ের অতিক্রম আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক অর্থকে অতিক্রম ক'রে শিল্পের ভাষা ব্যঞ্জনার অত্যুচ্চ লোকে উড্ডীন হয়ে পড়ে। সেই ভাষা শিল্পসৃষ্টির ভাষা। সেই ভাষা রসোপলব্ধির ভাষা। শিল্পে সংকেত নির্দেশিত যে অনন্ত রূপের জগতের সন্ধান শিল্প আমাদের দেয় সেই জগতের ইঙ্গিত করলেন ব্রজেন্দ্রনাথ; তাঁর মতে শিল্প সেই পূর্ণ রূপের জগতের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে। এই প্রসঙ্গে আমরা ফ্রয়েডীয় পণ্ডিত Erric Frome-এর পূর্বসূরী বলে ব্রজেন্দ্রনাথকে গণ্য করতে পারি। ভারতীয় নন্দনতত্ত্বের অন্যতম পুরোধা ভর্তৃহরির অখণ্ড পঞ্চতত্ত্বের সঙ্গে ব্রজেন্দ্রনাথের ভাষা Gestalt-এর ধারণার নৈকট্যটুকুও লক্ষণীয়।

আনন্দবর্ধনের ধ্বনিবাদে ব্যঞ্জনার যে প্রাধান্য সেই ব্যঞ্জনা শব্দার্থের সীমাকে অতিক্রম ক'রে শব্দার্থের পশ্চাদ্বর্তী যে সাংস্কৃতিক-সামাজিক জগৎ আছে সেই জগতের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে। জাতির সামগ্রিক চেতনায় যে সমকালীন মানুষের 'গণচেতনা' ও 'কালচেতনা' সমন্বিত হয়ে থাকে তারই ইঙ্গিত করলেন আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ। শিল্পীর কল্পনায় ব্রজেন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষ করলেন, জীবন-সত্য প্রকাশ মাধ্যম এবং ভাব-ভাবনা সমন্বিত হয়ে এক অপরূপ শিল্প রূপে পরিণত হয়। ব্রজেন্দ্রনাথ শিল্পের মধ্যে যে আত্ম জাতি চেতনার রূপ প্রত্যক্ষ করেছেন তার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে শ্রীঅরবিন্দ কথিত 'Nation Soul' ধারণার। এই প্রসঙ্গে আমরা শ্রীঅরবিন্দের কথা উদ্ধৃত করে দিই :

'The primal law and purpose of a Society, community or Nation is to seek its own self fulfilment ; it strived rightly to find itself, to become aware withen itself of the law and power of its own being and to fulfill it as perfectly as possible to realise all its potentialities to live its own self-revealing life.' শ্রীঅরবিন্দ কথিত 'Nation Consciousness', আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ কথিত 'Race Consciousnes'-এর অনুরূপ। শিল্পের সর্বজন বোধগম্যতা বা Communication-কে নিয়ে যে ধরনের সমস্যার সূত্রপাত, তার সমাধান এই স্বজাতি-চেতনার মধ্যে হয়ত খুঁজে পাওয়া যাবে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে

শিল্প ইতিহাসের যথাযথ অনুধাবন অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। ব্রজেন্দ্রনাথ তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ New Essays in Criticism-এ সাহিত্যে Romantic আন্দোলনের মূল্য বিচারে হেগেলীয় শিল্প বিচার পদ্ধতি প্রয়োগ করেছেন। Keats's 'Mind and Art'-এর মূল্যায়ন অনুরূপ হেগেলীয় পদ্ধতিতে ব্রজেন্দ্রনাথ সম্পন্ন করেছিলেন।

পরবর্তী যুগে 'New Romantic movement in literature'এ তিনি হেগেলীয় মূল্যায়ন পদ্ধতি প্রয়োগ করেন নি। শিল্প ঐতিহ্যকে অস্বীকার করা যথার্থ শিল্পরসিকের কাজ। অতীতে যা হয়েছে তার পুনরাবৃত্তি করা অনুকৃতি মাত্র। ব্রজেন্দ্রনাথ যে অনুকৃতিবাদী ছিলেন না এ কথা আমরা পূর্বেই বলেছি। তিনি Wagnerএর মতই বলেছেন ঐতিহ্যকে অস্বীকার করার অর্থ ঐতিহ্যকে অনুকরণ না করা। ঐতিহ্যকে শিল্পী যখন আবার আপন প্রতিভার জারক রসে জারিত করে নব নব রূপ কল্পনার মধ্যে স্থাপনা করেন তা ব্রজেন্দ্র-নাথের কাছে গ্রহণযোগ্য। তাই আমরা ব্রজেন্দ্রনাথকে Syncrete বলতে পারি। ব্রজেন্দ্রনাথের মানসিকতার এই সমন্বয় বৃত্তি তাঁকে হেগেলীয় প্রভাব অতিক্রমে প্রভূত সাহায্য করেছিল। হেগেলীয় রৈখিক বিবর্তনের ধারণা (Linear Evolution) দীর্ঘ দিন ব্রজেন্দ্রনাথকে তুষ্ট রাখতে পারে নি। তিনি কালক্রমে বহু রৈখিক বিবর্তনে বিশ্বাস করেছেন। মানুষের সংস্কৃতি ইতিহাসের ধারা পরিণত ব্রজেন্দ্রনাথের মানসিকতায় বহু রৈখিক বিবর্তন (Multi-Linear Evolution) রূপে প্রতিভাত হয়েছিল। তিনি যখন শেষ জীবনে তাঁর Auto-biography'তে লিখেছেন তখন তিনি বহু রৈখিক সংস্কৃতি ইতিবৃত্ত কথায় আস্থাবান হয়ে উঠেছেন। অতি সামান্য থেকে সামান্যে, সামান্য থেকে বিশেষে, বিমূর্তাধিক্য থেকে বিমূর্তি ন্যূনতায় ডঃ শীলের মানস চংক্রমণ আমরা প্রত্যক্ষ করেছি এই Autobiograpy গ্রন্থে। দার্শনিক ক্রোচে যেমন তাঁর শেষ গ্রন্থ 'My Philosophy'তে তাঁর পূর্ব নন্দনতাত্ত্বিক ধারণার পরিবর্তন করেছিলেন। ঠিক তেমনি করে ব্রজেন্দ্রনাথও তাঁর Autobiography গ্রন্থে নানান্ নতুন তত্ত্বের প্রবর্তনা করলেন। তাঁর বহু রৈখিক বিবর্তনের ধারণা তাঁর পরিনত মানসিকতার লক্ষণ। গণিত, তর্কশাস্ত্র, দর্শন ও মনোবিজ্ঞা, সাহিত্য ও শিল্প—ক্রমানুক্রমে ব্রজেন্দ্রনাথ মানুষের চিন্তা বিকলনের ধারাকে মানুষের মনোবিকলন ও চিন্তাভাবনার বিবর্তনকে সাজিয়েছিলেন। অতি বিমূর্তি থেকে বিমূর্তির ন্যূনতায়, সরল থেকে জটিলে অথবা বিপরীতমুখী জটিলতা

থেকে জটিলাধিক্যে ও ডঃ শীল এর ভাবনা ও চিন্তা প্রক্রিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়েছিল। তিনি ধারাবহ গণিতের বা Fluxional Mathematicsএর রীতি পদ্ধতি প্রয়োগ করেছিলেন আমাদের ভাব ভাবনার পরিবর্ধনের ক্ষেত্রে। এমন কি শিল্পের জগতে ও সাহিত্যের জগতেও তিনি এই ধারাবাহ গণিতের প্রয়োগ রীতির প্রযোজনা ক'রে সাহিত্য ও শিল্পের বৈজ্ঞানিক মূল্যায়নের প্রয়াস পেয়েছিলেন। 'New Romantic Movement in literature গ্রন্থে ব্রজেন্দ্রনাথ বললেন :

'It here may be noted en passant that the forms and Symbols of Fluxional Mathematics, completly and systematically applied to the Logic of devlopment (or Phenomenally speaking to the law of Evolutian) will render it possible to treat mathematically of history, which is the material for applied logic of development……It will be then possible, to represent not only the entire movement of history, but also the history of particular movenment or for example, the history of literary art."

ইতিহাস, শিল্পকলা ও সাহিত্য :

Fluxional Mathematics বা ধারাবাহিক গাণিতিক পদ্ধতি প্রয়োগে ঐতিহাসিক ঘটনা প্রবাহের যে স্থির নিশ্চয় ব্যাখ্যা ব্রজেন্দ্রনাথ প্রদান করেছিলেন, তারই ফলশ্রুতি হল ঐতিহাসিক ঘটনা প্রবাহের পরিণতির যথাক্রম ভবিষ্যৎ বর্ণন। ইতিহাসের ধারাবাহিকতা সম্বন্ধে কোন ভবিষ্যৎবাণী করা সম্ভব নয় ; কেননা ঐতিহাসিকের জ্ঞান পুরোপুরি বিষয় নির্ভর নয়। ইতিহাসের পরিণতি সম্বন্ধে যদি যথাযথভাবে ভবিষ্যৎবাণী করতে হয় তাহ'লে, ডঃ শীল বললেন ঐতিহাসিককে কতগুলি বিশেষ ধরনের দার্শনিক ভিত্তি ভূমির উপরে আপন ঐতিহাসিকতার ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। ঐতিহাসিক ইতিহাসের গতিপথের পূর্ব নির্দিষ্টতা তত্ত্বকে গ্রহণ করলে তাকে উর্দ্ধতনমুখী নব নব মূল্যের আবির্ভাবের সম্ভাবনাকে অস্বীকার করতে হবে। তবেই ঐতিহাসিক এমন কথা বলতে পারবেন যে ইতিহাসে পুনরাবৃত্তি বারবার ঘটে।

কার্যকারণ ফলাফলে বিশ্বাসী ঐতিহাসিক কখনই ঘটনা পারম্পর্যের ধারাবাহিকতার ফলশ্রুতি হিসাবে কোন একটি বিশেষ ধরনের পরিণতির কথা ভাবতে পারবেন না; যে দার্শনিক তত্ত্বের উপর এই ঐতিহাসিকতার ধারণা নির্ভরশীল হবে সেই দার্শনিকতার সূত্রাবলীও অনির্দিষ্ট ও অনির্দেশ্য। অতএব ইতিহাসের চরিত্র সঠিক নির্ধারণ, তার পরিণতি সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা করা—এ সবই হ'ল এক ধরনের কল্পনাশ্রয়ী রূপকথা। আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ তাঁর অপ্রকাশিত গ্রন্থ Autobiography'তে পূর্বকথার পুনরাবৃত্তি করে বললেন যে জীবন সমালোচনা হ'ল শিল্প; শিল্প ইতিহাসের ধারা, মহা মহা-শিল্পী এবং শিল্পবেত্তাদের নিয়ে তিনি আলোচনা করেছেন এই গ্রন্থে। শিল্পে এক ধরনের প্রান্তিকতার কথাও তিনি ভেবেছেন। শিল্পের সঙ্গে জীবনের সম্পর্কটি ব্যাখ্যা করে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ বললেন যে, এই সম্পর্ক দ্বিবিধ। (১) শিল্পকে জীবনের অনুকৃতি না বলে তিনি শিল্পকে বলেছেন জীবনের প্রতিরূপ রচনা (Representation and not presentation of life); তাই শিল্প হবে জীবনের অন্তর্নিহিত অর্থ ও তাৎপর্যের প্রতিরূপ। একে জীবনের ভাব ব্যাখ্যাও বলা চলে। ব্রজেন্দ্রনাথ আপন প্রতিচ্ছায়াবাদের আলোচনা প্রসঙ্গে নানান্ ধরনের শিল্পতত্ত্বের পর্যালোচনা করে এ কথা আমাদের বলতে চাইলেন যে, জীবনের সমালোচনা করতে গিয়ে কোন একটি বিশেষ শিল্প হয়তো তার বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে জীবন সমালোচনাকে সার্বিক জীবন সমালোচনার মর্যাদা দিতে চেয়েছেন। কাব্য, উপন্যাস এবং প্রবন্ধ সাহিত্য—এসবেরই নিজস্ব আঙ্গিকগত দৃষ্টিকোণ আছে। জীবনের বিভিন্ন অর্থ ও ব্যঞ্জনার রূপায়ণ এই সব বিভিন্ন ধরনের শিল্পকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। জীবনের অনুরূপ বা অনুকৃতি শিল্প নয়, এ কথা ব্রজেন্দ্রনাথ বার বার বললেন।

জীবন এবং শিল্প উভয়েই সমব্যাপক হবে। কিন্তু গ্রীক শিল্পে এই তত্ত্বের ব্যত্যয় ঘটেছে। শিল্প জীবনকে অনুসরণ করেছে; এমন কি গ্রীসিয় শিল্প কলায় যে Hercules এবং Psyche'এর কল্পনা করা হয়েছে তাঁরাও এসেছেন জীবন প্রবাহের স্ফুলিঙ্গ হিসেবে। প্রাকৃতিক-সাঙ্কেতিক প্রতিনিধি হলেন এই গ্রীক দেবতারা। তাঁরা একদিকে যেমন প্রকৃতিতে আছেন তেমনি আবার তাঁরা প্রকৃতি অতিক্রান্ত (Super nature) ও হয়ে গেছেন। ব্রজেন্দ্রনাথের মতে গ্রীসিয় সংস্কৃতিজাত শিল্পধারা ঈজিপশীয়, ব্যাবিলনীয় এবং ভারতীয় সংস্কৃতির ধারা থেকে পৃথক। ঈজিপশীয় শিল্পে Sphinx অর্থাৎ মানব আর পশুর বিরাট

বিরাট কল্পিত মূর্তি, সূর্য দেবতার মূর্তি এসবই হল নৈসর্গ বস্তুর মানবকৃত 'বিকার'। এই বিকারের মধ্যে শিল্পের আঙ্গিকের মহত্ত্ব আছে, শিল্পীর কল্পনার উদার সঞ্চরণ আছে; তার ফলেই শিল্পরূপ ভয়াবহ, অদ্ভুত এবং বিকৃত হয়ে পড়েছে কখন কখনও। ব্যবিলনীয় শিল্পের বিশালতায় যে সুসমঞ্জস্য-বোধের আপাত অভাব আছে তাতে ব্রজেন্দ্রনাথ অপ্রাকৃত শিল্প লক্ষণ প্রত্যক্ষ করেছিলেন। ব্যবিলনীয় শিল্প তথা সাহিত্য কিয়ৎ পরিমাণে সত্য এবং বিচারসহ।

ব্রজেন্দ্রনাথ হিন্দুদের দেবদেবীর মূর্তির মধ্যে দেবত্বের সংকেত মূল্যটুকু দেখেছিলেন। দেবদেবীর মূর্তির রূপটুকু সে যুগের প্রাচীন শিল্পীরা ধ্যানের মাধ্যমে লাভ করতেন। এই ধ্যানাশ্রিত মূর্তি লাভ বহু শিল্পীর অভিজ্ঞতায় ঘটেছিল। নটরাজের মূর্তি, বুদ্ধের মূর্তি, বিষ্ণু এবং লক্ষ্মী-মূর্তি, সরস্বতীর মূর্তি —এঁদের রূপ কল্পনার উৎস হল শিল্পীর ধ্যানে। মডেল থেকে ছবি আঁকার রীতি পশ্চিম দেশে প্রচলিত থাকলেও পূর্বদেশে এর চল ছিল না। অনুকৃতি যদি শিল্প বলে পরিগণিত হত তাহলে মডেল থেকে ছবি আঁকার রীতি হয়ত ক্রমশঃ স্বীকৃত হত। কিন্তু তা হয় নি। নিগ্রো প্রজাতির বিশেষ ধরনের শিল্পকলা তাদের প্রথাগত সঙ্গীত এবং নৃত্য গীতকে আশ্রয় ক'রে গড়ে উঠেছিল। গ্রীকেতর কল্পনায় মানুষের যে রূপ কল্পনা করা হয়েছিল তাকে অস্বীকার করলে আমরা শিল্প বিবর্তনের ধারাটিকে বোধহয় যথাযথ অনুধাবন করতে পারব না। ব্রজেন্দ্রনাথের মতে গ্রীক শিল্পে আমরা যে ধরনের কলা-কৌশলের সূক্ষ্মতা লক্ষ্য করেছি তার এক ভগ্নাংশও আমরা ইজিপসীয় ও ব্যবিলনীয় শিল্পে প্রত্যক্ষ করি নি। ডঃ শীল গ্রীক ভাস্কর্যের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন এবং গ্রীক ভাস্কর্যের প্রশংসা করতে গিয়ে তিনি হিন্দু চিত্রকলা এবং চৈনিক স্থাপত্য বিদ্যারও প্রশংসা করেছেন। গ্রীক শিল্প চেতনায় অগ্রীসিয় শিল্পকলা সঙ্গতিবিহীন বলে প্রতিপন্ন হত একথা ব্রজেন্দ্রনাথ ক্রোচের সঙ্গে লক্ষ্য করেছেন। গ্রীক শিল্প ছাড়া অন্যত্র সুন্দর রূপের মাধ্যমে সুন্দর কখনও প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। এই ধরনের অলস কল্পনার নিন্দা করেছেন ব্রজেন্দ্রনাথ। কেননা, তাঁর মতে শিল্পের মূল্যায়ন ও জাতীয়করণে প্রাত্যন্তিকতা বা finality নেই। ব্রজেন্দ্রনাথ বললেন যে, কুৎসিত, অসুন্দর এবং অতি সাধারণ এদেরও শিল্পলোকে যথাযথ স্থান আছে।

ডঃ শীলের উপরোক্ত শিল্প ধারণা হেগেলীয় শিল্প ধারণার দ্বারা

আচ্ছাদিত। ১৯০৫ সালে এবং তৎপরবর্তীকালে তিনি ধীরে ধীরে হেগেলীয় প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পেরেছিলেন। কবি কীট্সের শিল্পতত্ত্ব ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ডঃ শীল সূর্য এবং চন্দ্র আশ্রিত রূপকথার সাহায্য নিয়েছিলেন। প্রকৃতির মধ্যে যে ইন্দ্রজাল (The magic of Nature) কাজ করে সেই ইন্দ্রজালের ছোঁয়া এসে লাগে শিল্পীর তুলির টানে, কবির কথা ও ছন্দে। মহাকবি মিলটন 'Paradise Lost' কাব্যে শয়তানকে (satan) মুখ্য ভূমিকা দিয়ে একটা ঐতিহ্যের সূত্রপাত করেছিলেন, তারই অনুসরণ করল Hyperion কাব্য। কীট্স যে রূপকথার আশ্রয় নিলেন তাঁর বিখ্যাত কাব্যে সেই রূপকথার মৌলিকতা স্বীকার করার প্রশ্ন না থাকলেও যে ভাবে, যে যে রূপে এই রূপকথার বিষয়টুকুকে পরিবেশন করা হয়েছে তা সর্বাংশে মৌলিক এবং অনন্ত। নন্দনতাত্ত্বিক Winckelmann-এর সময় থেকে যে সমালোচনার ধারা জার্মানীতে চলে আসছিল সেই ধারাও কীট্সের কল্পনার মৌলিকতাকে স্বীকার করেছিল। কাব্যের মধ্যে রূপকথার দার্শনিকতা অনুস্যুত করে দিয়ে কীট্স কাব্য জগতে নতুন পথের দিশারী হলেন, একথা বললেন ডঃ শীল। সত্য এবং জ্ঞানের পরিপূর্ণ সমন্বয় করার প্রেরণা ভারতীয়রা পেয়েছিল এক ধরনের সুপ্রাচীন আদর্শবাদ থেকে; সেই আদর্শবাদই আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথের কথ্য শক্তিকে উদ্দীপিত করেছিল।

ডঃ শীল বললেন, সত্যের মুখাবরণ অপসারণের জন্যই 'Hyperion' কাব্যগ্রন্থে Oceanes-এর বক্তৃতার সংযোজন করা হয়েছে। Oceanes হল এক ধরনের ঐতিহাসিক চরিত্র; এর ঐতিহাসিকতা জ্ঞাতা অনির্ভর। এই কাব্য কথিত দেবদেবীর সৌন্দর্য এবং কাব্যে সংযোজিত আবর্তনমূলক বা Evolutionary মানব চেতনা বিষয় নির্ভরতা থেকে ব্যক্তি-নির্ভরতা অভিমুখে যখন অগ্রসর হয় তখনই তার বিবর্তন ঘটে। প্রকৃতির নিসর্গ শোভা থেকে শিল্পের নন্দনতাত্ত্বিক মহিমার দিকে তার চংক্রমণ চলে।

হেগেলীয় শিল্প শ্রেণীবিন্যাস ঃ ডঃ শীলের সমালোচনা

পরিণত মানসিকতার অধিকারী হয়ে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ হেগেলীয় শিল্প শ্রেণীকরণের বিরোধিতা করলেন। শিল্প-ধারণার ক্রমবর্ধমানতার পরক্ষেপ হিসেবে ব্রজেন্দ্রনাথ বললেন, Oriental এবং Neo-oriental, Classical এবং

Neo-classical, Romantic এবং Neo-Romantic শিল্পশ্রেণীর কথা। শিল্প ভাব বা Art idea দ্বান্দ্বিক ক্রমবিবর্তনের এই ছয়টি ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার মধ্য দিয়ে ক্রমিক পরিণতি লাভ করে, এই তত্ত্বে ব্রজেন্দ্রনাথ বিশ্বাস করেছেন। ব্রজেন্দ্রনাথের শিল্পের এই ক্রমবর্ধমানতার তত্ত্ব পথে ভারতীয়, চৈনিক, জাপানী এবং ইউরোপীয় শিল্প ক্রমশঃ আপন আপন পরিণতি ও সার্থকতা খুঁজে পেয়েছে। হেগেলীয় শিল্প শ্রেণীকরণের প্রধান তিনটি বিভাগ হ'ল Oriental, Classical এবং Romantic। ব্রজেন্দ্রনাথ বললেন যে, হেগেলীয় শিল্প শ্রেণীকরণ অত্যন্ত সংকীর্ণ এবং রূপভিত্তিক বা Formal। হেগেল কেবলমাত্র যে ইউরোপীয় শিল্পকলার নিদর্শন থেকেই শিল্পের শ্রেণীকরণ করেছিলেন। এই সংকীর্ণ সত্যটুকু ব্রজেন্দ্রনাথের চোখে ধরা পড়েছিল। হেগেলীয় শ্রেণীকরণ তর্কবিদ্যা কথিত Cross Division বা সঙ্কর বিভজন দোষে দুষ্ট এবং কথা বলা চলে যে, হেগেলীয় শিল্প ধারণায় Oriental শিল্পকে, Classical অথবা Romantic আখ্যায় ও আখ্যাত করা যেতে পারে। ব্রজেন্দ্রনাথের মতে হেগেলীয় নন্দনতত্ত্বে বহু পরিচিত এবং নির্দিষ্ট অর্থশালী শব্দ-সম্ভার বহুজন অবজ্ঞাত নানান শব্দের মতন করে অর্থ ও ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এর ফলে নানান ধরনের অর্থ-বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। ডঃ শীল মনে করতেন যে, সাহিত্যের ইতিহাস তথা শিল্পের ইতিহাসে নূতন যুগের সূচনা হয়েছিল এমিল জোলা, ইবসেন এবং তলস্তয়ের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে। শিল্পের সমাজ কল্যাণের উদ্দেশ্য এবং শুভ সাধনের শক্তি যে শিল্প চারিত্র্যকে বহুলাংশে প্রভাবিত ও নির্দিষ্ট করে এই সত্যটুকু আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ যখন গ্রহণ করলেন, তখন অনেকেই ভেবেছিলেন যে ব্রজেন্দ্রনাথের নন্দনতাত্ত্বিক চিন্তার উপর তলস্তয়ের চিন্তাধারার ছাপ পড়েছে। আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ হেগেল সম্বন্ধে যে একদেশদর্শিতার অভিযোগ করেছেন সেই অভিযোগ আংশিক ভাবে সত্য। পরিণত ব্রজেন্দ্রনাথ যখন হেগেলের বিরুদ্ধে একদেশদর্শিতার অভিযোগ করলেন তখন আমরা ব্রজেন্দ্রনাথের সঙ্গে একমত না হয়ে পারি না। কেন না, আমরা জানি যে ভারতীয় শিল্পের সঙ্গে হেগেলের পরিচয় ছিল অত্যন্ত সামান্য। তাই তিনি ভারতীয় শিল্পকে 'Grotesque', 'Bizarre' প্রভৃতি আখ্যা দিয়েছিলেন। অতএব ব্রজেন্দ্রনাথ যদি হেগেলীয় শিল্প-ধারণায় একদেশদর্শিতাকে আবিষ্কার করে থাকেন তবে আমরা সে ক্ষেত্রে ব্রজেন্দ্রনাথকে সমর্থন না করে পারি না। অবশ্য হেগেলীয় শিল্প বিচারে আমরা যে ধরনের

মানসিক ভারসাম্যহীনতার লক্ষণ দেখি তার আভাস পাই ডঃ শীলের সাহিত্য বিচারে। ব্রজেন্দ্রনাথ যখন বাংলা সাহিত্যের বিচার করেছেন তখন এই ধরনের বিচার প্রহসন ঘটেছে বলেই আমরা মনে করি। সেই কথার উল্লেখ এবং আলোচনা আমরা যথা প্রসঙ্গে উত্থাপন করব।

শিল্পের ত্রিসত্তা—শিল্পের The idea অর্থাৎ শিল্পভাব, শিল্পবস্তু বা Symbol এবং শিল্প প্রকাশ অর্থাৎ Reflection; এদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল, শিল্পের প্রকাশটুকু। এই প্রকাশের ধর্ম অনুসারে শিল্পের ধর্ম নিরূপিত হয়। শিল্পের ভাব এবং শিল্প বিষয়ের বার বার রূপভেদ ঘটতে পারে। হেগেলীয় শিষ্য তরুণ দার্শনিক Tainea সঙ্গে এক মত হয়ে ব্রজেন্দ্রনাথ হেগেলীয় শিল্প দর্শনের আলোচনা প্রসঙ্গে বললেন যে, শিল্পের মূল উৎস নির্ধারণ এবং শিল্পের শ্রেণীকরণ সম্বন্ধে সর্ববিধ আলোচনার মৌল ভিত্তি ভূমিটুকু আমরা হেগেলীয় শিল্পদর্শন থেকেই গ্রহণ করতে পারি। অবশ্য শিল্পধারণার যে ত্রিতত্ত্বের কথা আমরা পূর্বে বলেছি সেই ত্রিতত্ত্বের উপকরণ হ'ল শিল্প প্রকাশ। কাব্য, চিত্র প্রমুখ বিভিন্ন শিল্পরূপ সহজেই ক্লাসিক্যাল বা রোমান্টিক হয়ে উঠতে পারে, শিল্পে এই প্রকাশের প্রাধান্য থাকার ফলে রোমান্টিক শিল্পের উদাহরণ হিসেবে ডঃ শীল দান্তের নরকের বর্ণনার কথা বলেছেন। আবার যখন মহাকবি মিলটন কথিত সীমাহীন পাতালপুরীর কথা তিনি বললেন তখন বিষয়বস্তু ভিন্ন জাতের হলেও এই চিন্তাটিকে রোমান্টিক বলতে কোন বাধা থাকে না; শিল্পভাব বা Idea সম্বন্ধে সেই একই কথা। হেগেলীয় শিল্প দর্শনে রোমান্টিক আর্টকে যে চরম মর্যাদা দেওয়া হয়েছে, পরিণত ব্রজেন্দ্রনাথের চোখে রোমান্টিক আর্ট সেই ধরনের মর্যাদালাভের যোগ্য নয়। তিনি বললেন যে, শিল্প বিবর্তনের ক্রমপর্যায়ে হেগেলীয় রোমান্টিক আর্ট ধারণা থেকে যে ধর্ম এবং ধর্ম থেকে দর্শনের উৎপত্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে, সেই তত্ত্ব ভ্রান্ত। ব্রজেন্দ্রনাথ দার্শনিক Tainea অনুসরণে বললেন যে, ধর্ম এবং দর্শনের পাশাপাশি শিল্পধারা প্রবাহিত হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও হবে; শিল্পধারার কালক্রমে দর্শনধারায় রূপান্তরের তত্ত্ব ডঃ শীল গ্রহণ করেন নি। হেগেলীয় শিল্পদর্শনের যে সমালোচনা আমরা ডঃ শীলের মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছি তা অবশ্য ইতিপূর্বে আমরা Schelling প্রমুখ দার্শনিকের শিল্প আলোচনায়ও পেয়েছি। এদের মতে প্রকৃতির ক্রমবর্ধমানতার ইতিহাস আমরা হেগেল কথিত দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে যেমন পাই না, ঠিক তেমনি করে শিল্পের প্রগতির ক্ষেত্রেও এই তত্ত্ব

অপ্রয়োজ্য। দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি যে নূতন সত্য আবিষ্কারের আবিষ্কৃত পদ্ধতি নয় এই সত্যটুকু হেগেলের কাছে ধরা পড়ে নি। পরিণত মানসিকতায় ব্রজেন্দ্রনাথ বললেন যে, হেগেলীয় দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে আমরা যা পেতে পারি, তা হ'ল Codification, Systematization and Rational Explanation. ইতিহাসের বিবর্তনের পথে কোন বিশেষ সত্যের উর্দ্ধতন সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট ধারণা দেবার শক্তি দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি বা Dialectics-এর নেই। অবশ্য এই সত্যটুকু তরুণ Tainea চোখেও ধরা পড়ে নি। ব্রজেন্দ্রনাথ দীর্ঘদিন পূর্ণতা তত্ত্বের অনুধ্যান করেছেন। Rounded perfection বা পূর্ণায়ত জীবনদর্শনের অন্বেষণ করেছেন দীর্ঘদিন ধরে। এই অনুসন্ধান বশেই তাঁর পরিণত বুদ্ধির কাছে হেগেলীয় দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির পরিমিত প্রয়োগ সুবিধার সত্যটি উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।

শিল্প ও নীতির পারস্পরিক সম্বন্ধ বিচারের ক্ষেত্রে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ Moral teaching by Aesthetic culture-এর কথা বললেন। মানুষের আবেগগত জীবনের সংযম এবং নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে যে নৈতিক অভ্যাস এবং ব্যবহার-বিধি গঠন করা যায়, এই তত্ত্বে তিনি বিশ্বাস করেছেন। ডঃ শীলের মতে মানুষের নৈতিক জীবন তার সামাজিক জীবনকে আশ্রয় করে; প্রান্তিক সত্তা সম্পর্কিত ধারণা (Belief in Ultimate Realities) সাধারণতঃ আসে ধর্মীয় বিশ্বাস থেকে নৈতিক বিশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে। প্রথমতঃ তাঁর মতে সামাজিক কল্যাণ এবং অভ্যাস এবং আচরণগত ব্যবহার-বিধি বর্ণনাই হ'ল নীতিশাস্ত্রের উদ্দেশ্য, এই পথে মানুষের সামাজিক কল্যাণ সাধিত হয়। দ্বিতীয়তঃ ডঃ শীল নন্দনতাত্ত্বিক কৃষ্টি বলতে আবেগগত জীবনের অনুশীলন ও পরিণতিকে বুঝেছেন। ধর্মীয় তত্ত্বের উদ্বর্তনকে তিনি তেমন প্রাধান্য দেন নি। বরং মানুষের সংস্কারগত সহজ প্রতিক্রিয়াকে মানুষের জীবনের সঙ্গে যুক্ত করে তিনি মানুষের কৃষ্টি জীবনের একটি জাতা অনির্ভর বা Objective চিত্র তুলে ধরবার চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়ার পরে নীতি শিক্ষা প্রদান করা হ'ল এক ধরনের Hysteron Proteronএর দৃষ্টান্ত। ডঃ শীল সংস্কৃত নাট্যকারদের শিল্প প্রকৃতিতে এই নৈতিক আদর্শের প্রাধান্যটুকু লক্ষ্য করেছিলেন। তাঁর অপ্রকাশিত Autobiography গ্রন্থে তিনি বললেন, 'Sanskrit Dramatist has a sense of propriety and Moral equilibrum which is offended by the final triumph of vice

over virtue, of an unmoral fate over the human demand for equity and justice'. নাটকের আখ্যান ভাগে পাপ যদি পুণ্যের উপর জয়ী হয় তবে সেই নাটক দর্শনে মানুষের মনে নৈতিক আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা কমে যাবে, এই আশংকা সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রকারদের মনে যথার্থই ছিল। তাই এই ধরনের নাটকের অভিনয়ের মধ্য দিয়ে সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রী ধর্মকে জয়ী করেছিলেন। ডঃ শীলের মতে এই বিরোধটা যথার্থ ন্যায়সংগত হয়েছিল, কেননা মানুষের মনের নন্দনতাত্ত্বিক প্রবণতার চেয়ে নৈতিক প্রবণতাটুকু গভীরতর। নৈতিক ভারসাম্যটুকু একদিকে যেমন মানুষের দৈনন্দিন জীবনের পক্ষে কাম্য ঠিক তেমনি ধারা এই নৈতিক ভারসাম্যটুকু রক্ষা করা হল শিল্পের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য; আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে ডঃ জনসনের অনুগামী। Poetic Justice বা কাব্যগত ন্যায়পরায়ণতা—এটি কাব্যের স্বরূপ লক্ষণ বলে জনসনের মতই ব্রজেন্দ্রনাথও চিন্তা করেছেন। মহাকবি মিলটন এই চিন্তাধারা অনুসরণ করেই কাব্যগত ন্যায়পরায়ণতাকে রাজনৈতিক ন্যায়পরায়ণতার অনেক উপরে স্থান দিয়েছেন।

কবি কীট্‌সের কাব্যতত্ত্ব আলোচনায় ডঃ শীল চেতনা এবং আত্মচেতনা এই দুটি মানসিক স্তরের মুখোমুখি সংস্থাপনকে কাব্যসৃষ্টির পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলে গণ্য করেছেন। এই সূত্রের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্যে আমরা হেগেলীয় প্রভাব লক্ষ্য করেছি। কবি যখন জগৎ সম্বন্ধে সচেতন হ'ন না সেই মানস অবস্থা হ'ল Thesis পর্যায়ের; হেগেলের দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে Thesis-এর পরে আসে Anti-thesis। অতএব ব্রজেন্দ্রনাথ Anti-thesis হিসেবে আত্মচেতনতা বা self-consciousness-এর সংস্থাপন করলেন। আত্ম-চিন্তা সুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কবি আপন মনোবিকলন করেন, আপন মনের দুঃখবোধ নিয়ে তাঁর সমীক্ষার অন্ত থাকে না। কবি ক্রমে ক্রমে আপন জীবনের ট্রাজেডীর মূল সত্যটুকুর সন্ধান পান। এতো গেল মনোবিকলনের একদিক, অপর দিকে কবির আত্মচেতনতা তার মানসিক প্রশান্তিকে বিনষ্ট করে, মনের সহজ স্বতঃস্ফূর্তিটুকু হারিয়ে যায়। অবশ্য ডঃ শীলের মতে এই স্বতঃস্ফূর্ততার বিনষ্টি মহৎ শিল্পের উদ্ভব সম্ভব করে। ডঃ শীল মনের এই অবস্থাকে 'Sense of the Luxurious আখ্যা দিয়েছেন। শিল্পী-মনের এই বন্ধ মুখর অবস্থাকে উনি 'Melody' এই নামে অভিহিত করেছেন। ডঃ শীলের মতে কবি মনের এই নিম্নতর বন্ধ মনের সহজ আবেগকে এক ধরনের আত্ম-

লিপীড়ন জাত বিষাদে পরিণত করে তোলে। এই মানসিক অশান্তিকে, ডঃ শীল 'Impersonal Quality বলেছেন। কবি যখন আপন দুঃখকে আপন আনন্দ-বেদনাকে ব্যক্তিসত্তা থেকে বিচ্যুত করে দেখেন তখন এই ধরনের নৈর্ব্যক্তিক গুণ বা 'Impersonal Quality' শিল্পীর মনে উদ্ভব হয়। এই নৈর্ব্যক্তিকতা ডঃ শীলকে ক্রোচে এবং জেন্টিলের মত নব্য হেগেলীয় দার্শনিকদের সমধর্মী করে তুলেছে। কিন্তু বিস্ময়ের কথা যে যদিও কাব্য মূলতঃ কবির একান্ত ব্যক্তিগত অনুভূতির প্রকাশ তবুও কবির ভূমাদর্শনের প্রসাদ গুণে এক ধরনের বৈরাগ্য এই ব্যক্তিগত অনুভূতিটিকে চূড়ান্ত নৈর্ব্যক্তিকতা দান করে। কবি কীট্‌সের আলোচনা প্রসঙ্গে ডঃ শীল বার বার এই Impersonal Quality বা নৈর্ব্যক্তিক প্রসাদ গুণের উল্লেখ করেছেন। ডঃ শীলের মতে কীট্‌সের—'Endymion' কাব্যগ্রন্থে কবি যে সৌন্দর্যের উপাসনার কথা বলেছেন, সেই সৌন্দর্যের উপাসনায় ইন্দ্রিয়গত সুখবোধের স্থান নেই। স্নায়বিক সুখকে অতিক্রম করে সৌন্দর্যের উপাসনায় কবি এক ধরনের ইন্দ্রিয় সুখের সন্ধান পেয়েছেন। এই সুখ এলো কবি মনের কল্পাশ্রিত আদর্শ সুখের মূর্তিতে। এই আদর্শায়িত সুখকে আমরা আনন্দ বলতে পারি। এই আনন্দের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রকৃতিকে এক অবিমিশ্র অবিচ্ছিন্ন সত্তারূপে ব্রজেন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষ করেছেন। নন্দনতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে সুন্দর প্রকৃতির অবিচ্ছিন্নতাকে ব্রজেন্দ্রনাথ বিশ্ব প্রেমের সোপানরূপে ব্যবহার করেছেন। প্রেম ও আত্মরতি এই স্বার্থবুদ্ধি প্রণোদিত মানস প্রবণতাকে ব্রজেন্দ্রনাথ সাহিত্যতত্ত্বে সহজেই অতিক্রম করলেন। তাঁর এই নন্দনতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা প্রকৃতির সৌন্দর্যের অবিচ্ছিন্নতাকে কেন্দ্র করে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের যে একাত্মতাটুকু তিনি আবিষ্কার করেন ; সেই একাত্মতাটুকু এলো সৌন্দর্যের মধ্য দিয়ে ; এর ফলে যে অবিচ্ছিন্নতা বোধটুকু মানুষের মনে সঞ্জাত হয় তাকে আশ্রয় করে এই সার্বিক সুন্দরের প্রভাব সর্বত্রগ হয়। এই যে সৌন্দর্যের সর্বব্যাপী প্রভাবের কথা ডঃ ব্রজেন্দ্রনাথ বললেন, সেটুকু সামগ্রিকভাবে সঙ্গীতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ডঃ শীলের অপ্রকাশিত Autobiography গ্রন্থে আমরা সঙ্গীত সম্বন্ধে যে আলোচনা পাই তাতে তিনি একথা স্পষ্ট করে বললেন যে, সুন্দরের সার্বিকতাটুকু আমরা সঙ্গীতে পাই না। কেন না, সঙ্গীত হ'ল শিক্ষা সাপেক্ষ। শিল্পে অধিকারভেদ তত্ত্বকে ব্রজেন্দ্রনাথ এইভাবে শিক্ষা সাপেক্ষ করে প্রত্যক্ষ করলেন সঙ্গীতের ক্ষেত্রে।

সঙ্গীতের আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি হিন্দু সঙ্গীতের উল্লেখ করেছিলেন এবং এই প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য হ'ল, দীক্ষা এবং শিক্ষা ব্যতীত হিন্দু সঙ্গীতের মর্ম মূলে প্রবেশ সহৃদয় হৃদয় সংবাদীর পক্ষেও সম্ভব নয়।

পাশ্চাত্য সঙ্গীত শাস্ত্রীরা হিন্দু সঙ্গীতে 'Harmony'র সন্ধান নাকি পান নি। ডঃ শীল এই অভিমতের বিরোধিতা করলেন। তিনি তাঁর 'Positive sciences of the Ancient Hindus' গ্রন্থে বললেন: 'This Harmony as evidenced in music and other forms of plastic art was a phenomenon not only of the Aesthetic world but of the phenomenal world as well.' ডঃ শীলের Harmony বা সুরসঙ্গতির ধারণা শুধুমাত্র যে শিল্প এবং কাব্যলোকেই প্রত্যক্ষ ছিল তা নয়, তিনি তাকে প্রত্যক্ষ করলেন মানুষের ব্যবহারিক জগতেও। তাঁর এই চিন্তাধারাটুকু মনে হয় প্রাচীন ভারতের চিন্তাধারার সঙ্গে সংযুক্ত। ভারতীয় নন্দনতাত্ত্বিক ভোজদেব বলেছিলেন যে জীবন সত্য ও শিল্প সত্য সমার্থক। ডঃ শীল এই ধরনের সার্বিক সমন্বয়ে বিশ্বাস না করলেও জীবন এবং শিল্পের ক্ষেত্রে তিনি এক ধরনের সঙ্গীতমুখর সঙ্গতি প্রত্যক্ষ করেছিলেন, যেটা আমরা তাঁর উপরোক্ত উক্তি থেকে দেখতে পাই। শিল্পক্ষেত্রের Harmonyকে জীবনের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ করার ফলশ্রুতি হ'ল ডঃ শীলের দর্শনে প্রেমতত্ত্বের অভিব্যক্তি। মানুষের সঙ্গে মানুষের এই যে আত্যন্তিক ভালবাসাটুকু নিত্য সত্য, সেই ভালোবাসাই হ'ল শিল্প রসিকের পক্ষে শিল্পীর শিল্পকৃতি বিচারের একমাত্র পথ। এই ভালবাসার পথে শিল্পী এবং সমালোচক সামীপ্য এবং সাযুজ্য লাভ করে। তাই ডঃ শীলের শিল্প দর্শনে problem of communication বা সমালোচকের পক্ষে কবিকে বোঝার পথে বাধা নেই। যে সঙ্গীতকে ব্রজেন্দ্রনাথ কাব্যে প্রত্যক্ষ করেছেন, তাকেই আবার তিনি দেখেছেন জীবনে। তাই সঙ্গীতের পরিপ্রেক্ষিতে জীবন এবং শিল্পের অভিন্নতা তিনি ঘোষণা করেছিলেন। কাব্য-সাহিত্যকে তাই তিনি criticism of life বা জীবন বীক্ষণ (জিজ্ঞাসা) বলে আখ্যাত করেছিলেন। যেখানে এই জীবন-বীক্ষণ বা criticism of life নেই সেই শিল্পে সেই কাব্যরসের প্রসাদ গুণের শূন্যতা ঘটে। সে ক্ষেত্রে কাব্য জীবন থেকে বিচ্যুত হয়ে কেবলমাত্র আপন আবয়বিক রূপ গৌরবে উদ্ধত; সেখানে কাব্যকে ব্রজেন্দ্রনাথ 'Formal' আখ্যা দিয়ে তাকে কাব্যের পূর্ণ মর্যাদা দিতে অস্বীকার করেন। রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সাহিত্যের আলোচনা

প্রসঙ্গে ব্রজেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিতে কাব্যের আবয়বিক প্রসাদগুণ বা Formal Quality-র প্রশংসা করতে পারেন নি। তাই আমরা দেখেছি যে, রবীন্দ্রনাথের একান্ত সুহৃদ হয়েও তিনি সর্বক্ষেত্রে রবীন্দ্র-কাব্যের প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠতে দ্বিধা বোধ করেছেন।

ব্রজেন্দ্রনাথের আলোচনা প্রকরণ (His Methodology)

ব্রজেন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক তুলনামূলক প্রকরণ তাঁকে নানান্ বিভিন্ন ধর্মী বাদানুবাদের পরিপ্রেক্ষিতে আপন মতবাদের গৌরবটুকু প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করেছিল। তিনি যখনই ভারতীয় শিল্পের বা সত্যের কথা বলেছেন তখনই আমরা দেখেছি তাঁর আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতটুকু আলোচ্য বিষয়ের সংকীর্ণতাকে অতিক্রম করে একটি সার্বজনীন পশ্চাদ্‌পটকে আশ্রয় করেছে। অনুরূপতা হ'ল ব্রজেন্দ্রনাথের আলোচনা প্রকরণের অন্যতম স্তম্ভ স্বরূপ। আলোচ্য বিষয়ের অনুরূপ আলোচনা কোথায় কবে সংযোজিত হয়েছে সেই তত্ত্ব আমরা ব্রজেন্দ্রনাথের আলোচনায় পাই। শিল্প আলোচনা তিনি কখনও একক ভাবে, অনন্যভাবে করেন নি। ভারতীয় শিল্পের আলোচনা করতে গিয়ে তিনি গ্রীক শিল্প এবং সাহিত্যের ভূরি ভূরি নজীর উদ্ধার করেছেন, চৈনিক এবং জাপানী শিল্পের দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করেছেন। এই ভাবে প্রাচীন এবং সমকালীন ঐতিহাসিক নজীর উল্লেখ করে তার পটভূমিতে তিনি শিল্পের মূল্যায়ন করেছেন। তাঁর এই মূল্যায়ন ব্যাপারে অনুরূপ পদ্ধতি আমরা চিন্তাশীল নব্য নন্দনতাত্ত্বিকদের মধ্যে পেয়েছি। Yvor Winters এই ধরনের ঐতিহাসিক সমালোচনাশ্রিত পদ্ধতির অবতারণা করেছেন। Wintersএর কথার উল্লেখ করি ; তাঁর মতে সমালোচনা পদ্ধতির মধ্যে থাকবে :

(১) To state relevant historical and biographical material. (২) To analyse the writer's relevant theories. (৩) To make a rational criticism of paraphrasable content. (৪) To make a rational criticism of feeing, style, language and technique. (৫) To make a final act of judgement.

Yvon Winters যে দৃষ্টিকোণের কথা বললেন, তা হ'ল সম্যক্ দর্শনের দৃষ্টিকোণ। ব্রজেন্দ্রনাথ যখন এই দৃষ্টিকোণ থেকে রবীন্দ্র সাহিত্যের বিচার

করেছেন তখন তিনি রবীন্দ্র সাহিত্যের পূর্ণায়ত রূপের অসীম সৌন্দর্যটুকু আকণ্ঠ পান করেছেন ; রবীন্দ্রকাব্যের প্রশংসায় তিনি পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছেন। একথা উল্লেখযোগ্য যে, প্রথম জীবনে যখন তরুণ ব্রজেন্দ্রনাথ দার্শনিক হেগেলকে অনুসরণ করেছেন অন্ধভাবে তখন তিনি রবীন্দ্রকাব্যের এই সার্বিক প্রসাদ গুণটুকু প্রত্যক্ষ করতে পারেন নি। দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির বিচ্ছিন্নতা ব্রজেন্দ্রনাথকে রসকে তার স্ব-স্বরূপে প্রত্যক্ষ করার সুযোগ দেয় নি। পরিণত ব্রজেন্দ্রনাথ হেগেলের প্রভাব মুক্ত হয়ে যখন দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির বিচ্ছিন্নতাকে অতিক্রম করলেন তখন তাঁর চোখে রবীন্দ্রনাথের কাব্যের সুষমাটুকু উদ্‌ঘাটিত হয়েছিল। প্রথম জীবনে রবীন্দ্রকাব্যকে তিনি জীবন থেকে বিচ্যুত করে দেখেছিলেন। তাই তা জীবন পর্যালোচনা বা criticism of life নয় বলে তাকে সার্থক কাব্যের গৌরবটুকু দান করেন নি। এই সার্বিকতার দৃষ্টিকোণ হল ভূমার স্পর্শ ধন্য ; এ দেখা হ'ল sub specie aeternitatis, ঔপনিষদিক জীবন দর্শনের আদর্শ ; এই আদর্শ আশ্রিত ভূমার ধারণা ব্রজেন্দ্রনাথকে সম্যক্ দর্শনের অধিকার দিয়েছে। ব্রজেন্দ্রনাথের পূর্ণতার ধারণা এবং সেই ধারণার নিত্য উপাসনা তাঁকে পরিপূর্ণ সৌন্দর্যের পূজারী করে তুলেছিল। রমাঁ রলাঁর মতই তিনি কালাশ্রিত closed systemএর বিরোধিতা করেছেন। তাঁর এই পূর্ণতার ধারণার মধ্যেই তিনি যে Synthetic Philosophy বা সমন্বয়ী দর্শনের কথা বলেছেন, সেই দর্শনের উপর পূর্ণতার প্রভাব বহুলাংশে পড়েছে। এই পূর্ণতার দেখা ব্রজেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের ইংরেজী 'গীতাঞ্জলি'র মধ্যে পান নি। তাই যখন গীতাঞ্জলির কবি বিশ্বনন্দিত হয়েছেন তখন ব্রজেন্দ্রনাথ কবিকে এক পত্রে লিখলেন যে, এই কাব্যগ্রন্থের মধ্যে কবির প্রতিভার সম্যক্ স্ফূর্তি ঘটে নি। এমন কি পাশ্চাত্য দেশের সমালোচকেরা যখন কবিকে Mystic আখ্যায় আখ্যাত করেছেন তখন ব্রজেন্দ্রনাথ তার প্রতিবাদ করেছেন। কেন না তাঁর মতে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার মধ্যে যে পরিপূর্ণতার প্রসাদগুণটুকু অনুস্যূত ছিল তার যথার্থ বর্ণনা এই Mystic শব্দটির দ্বারা করা যায় নি। তরুণ ব্রজেন্দ্রনাথ যখন শিল্পকে কেবলমাত্র জীবনের পর্যালোচনা বা criticism of life রূপে প্রত্যক্ষ করেছেন তখন তিনি শিল্পের বৌদ্ধিক রূপটুকুর উপরই জোর দিয়েছেন বলে আমাদের মনে হয়। অবশ্য ব্রজেন্দ্রনাথ নিজেও এ সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠেছিলেন তাঁর পরিণত বয়সে। তাঁর অপ্রকাশিত Autobiography গ্রন্থে তিনি এই তত্ত্বের পর্যালোচনা করে বললেন, 'The role of art as criticism

of life ought to be subservient to something which has greater appeal to imagination.' অতএব বলা চলে যে, শিল্পকে জীবনের পর্যালোচনা রূপে প্রত্যক্ষ করার কাহিনী হ'ল অপরিণত ব্রজেন্দ্রনাথের শিল্প বিচারের ইতিবৃত্ত।

পরিণত ব্রজেন্দ্রনাথ যখন সম্যক্ দর্শনে বিশ্বাস করেছেন তখন তিনি প্রথম যুগে ব্যবহৃত Historico—Comparative Method বা ইতিহাস আশ্রিত তুলনামূলক পদ্ধতিকে ত্যাগ করে Genetic Methodএর প্রবর্তন করেছেন শিল্প আলোচনার ক্ষেত্রে। তাঁর অপ্রকাশিত Autobiography গ্রন্থে তিনি শিল্প ইতিহাসের যে পর্যালোচনা করেছেন তার ক্রমবিকাশ ঘটেছে Helenic Art, Renaissance Art, The Buddhist and Hindu Art.—এই ক্রমপর্যায়কে আশ্রয় ক'রে। শিল্প আলোচনার এই ঐতিহাসিক সম্পর্কের কালক্রম তিনি শিল্পজগৎ এবং জীব জগতের সর্বত্র প্রত্যক্ষ করেছেন। তাঁর Neo-romantic Art ধারণার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি তিনটি মৌল সত্যের কথা বললেন (১) The ideal content of consciousness (২) The Mythopaeic process (৩) The crowning transfiguration of the birth of a new emotion, as of a new tone or harmony, transfiguring the imaginative material; অর্থাৎ ব্রজেন্দ্রনাথ শিল্পে শিল্পীর কল্পনা শক্তি এবং আবেগের মুখ্যতাকে স্বীকার করলেন। কল্পনা ও আবেগের মুখ্যতা তিনি রবীন্দ্রনাথের 'প্রভাতসঙ্গীত' এবং 'সন্ধ্যাসঙ্গীত'এ প্রত্যক্ষ করেছেন। কবির এই কাব্যগ্রন্থ দুটিকে ব্রজেন্দ্রনাথ Neo-romantic-lyric আখ্যা দিয়েছিলেন। ব্যক্তি-নির্ভর অনুভূতির প্রবল স্রোত কবি এবং পাঠককে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু 'প্রভাতসঙ্গীত' এবং 'সন্ধ্যাসঙ্গীত'এর মধ্যে তিনি জীবনের পর্যালোচনা বা criticism of lifeএর দর্শনীয় রূপটুকু খুঁজে পান নি, আর পান নি Mythpoeiaকে। অবশ্য ব্রজেন্দ্রনাথের মতে 'সন্ধ্যাসঙ্গীত'এর চেয়ে 'প্রভাত সঙ্গীত' উচ্চতর মানের কাব্যগ্রন্থ। কেন না 'প্রভাত সঙ্গীতে' জীবনের পর্যালোচনা অর্থাৎ criticism of lifeকে তিনি কিয়ৎ পরিমাণে প্রত্যক্ষ করেছেন। উপসংহারে এই জীবনের পর্যালোচনা তত্ত্বের অতিক্রমণ বা transcendence যে উচ্চতর মানের এ কথা ব্রজেন্দ্রনাথ স্বয়ং আমাদের দেখিয়েছেন উদাহরণ সহযোগে, তাঁর কাব্যগ্রন্থে 'The Quest Eternal'-এ। ব্রজেন্দ্রনাথ এক ধরনের Mysticismএর প্রয়োগ করেছেন।

এই ধরনের Mysticismএর অভিজ্ঞতায় বুদ্ধি আত্যন্তিক ভাবে সক্রিয় হয়; কবি ব্রজেন্দ্রনাথের কাব্যে আমরা এই বুদ্ধিগত Mysticism প্রত্যক্ষ করেছি। এই ধরনের Mysticismএর দেখা পেয়েছিলাম আমরা পশ্চিমী মহাকবি টেনিসনের মধ্যে। কাব্য বা শিল্পে যখনই এই ধরনের Mysticismএর ছোঁয়া লাগে তখন সেই কাব্যের 'অনন্ততা' বহুগুণে বর্ধিত হয়। কাব্যের অনন্ততা বিচার তখন আর শুধুমাত্র রসিকের ব্যক্তিগত রূপ অরূপের উপর নির্ভরশীল থাকে না। তখন তার যথাযথ মূল্যায়নের ক্ষেত্রে গণ-মানসিকতা বা Mass consciousness এবং কালমানসিকতা বা Age consciousnessএর দিকে লক্ষ্য রাখতে হয়। অর্থাৎ ডঃ শীল এ কথাই বলতে চেয়েছেন যে সহৃদয় হৃদয় সংবাদী' যে মানদণ্ডটি দিয়ে শিল্পীর শিল্পের মূল্যায়ন করেন সেই মানদণ্ডটি গঠিত হয় সমকালীন মানুষের ভাব-ভাবনার প্রভাবে। এই প্রসঙ্গে ব্রজেন্দ্রনাথ কর্তৃক রবীন্দ্রসাহিত্যের মূল্যায়নের কথা একটু বিশদভাবে বলি।

রবীন্দ্রসাহিত্য সমালোচনা প্রসঙ্গে ব্রজেন্দ্রনাথ 'প্রকৃতির প্রতিশোধের' কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমে যে অসার্থক জীবন সমালোচনার আমরা সাক্ষাৎ পাই তারই পরিণতরূপ 'প্রকৃতির প্রতিশোধে' দেখেছি। সমকালীন নাটকগুলির মধ্যে 'প্রকৃতির প্রতিশোধের' স্থান নির্দেশ করতে গিয়ে ব্রজেন্দ্রনাথ বললেন যে, আধুনিক যুগের মহাকাব্যগুলির মধ্যে হেমচন্দ্রের 'বৃত্র সংহার' এবং 'দশমহাবিদ্যার' যে স্থান্ তারই অনুরূপ স্থান হ'ল 'প্রকৃতির প্রতিশোধের' আধুনিক নাটকের ক্রমবিবর্তন ধারায়। পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রতি ডঃ শীলের পক্ষপাতিত্ব সর্বজনবিদিত। তাই দেখি যে, যখন তিনি 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'কে Paracelsusএর সঙ্গে তুলিত করেন এবং Paracelsus এর সাহিত্যিক মূল্যের অত্যুচ্চ মর্যাদার কথা বলেন তখন আমরা ডঃ শীলের সাহিত্য বিচারকে একদেশদর্শী না বলে পারি না। ডঃ শীল বলেন : 'A moment's comparison between the Paracelsus and the Prakritir Pratisodha' make the immense superiority of the former manifest in poiut of profound speculative insight, dramatic range and complexity of life, a sense of the social problem and human perfectibility and a masterly comprehension of the many sided forces and tendencies which go to make up the stream of existance. 'প্রকৃতির প্রতিশোধে' ডঃ শীল প্রত্যক্ষ

করেছেন ব্যক্তি মননের সত্য অস্বীকার সঙ্গে প্রেম ও ভালবাসার দ্বন্দ্ব। তাঁর মতে, রবীন্দ্রনাথের 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'এ ভূমার স্পর্শ নেই; অনন্ত প্রেমের ব্যঞ্জনা নেই। ডঃ শীল কবির এই নাট্য কাব্যটিতে একধরনের যান্ত্রিক বন্ধনকে প্রত্যক্ষ করেছেন; এই যান্ত্রিক বন্ধনের মধ্যে শিল্পীর স্বাধীনতার নিঃশ্বাস রুদ্ধ হয়ে যায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সত্যিকারের শিল্প সৃষ্টিতে শিল্পীর স্বাধীনতা কখনই ক্ষুণ্ণ হয় না। 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'কে যদি আমরা নাট্যকারের মর্যাদা দিই, সার্থক সৃষ্টি বলে গ্রহণ করি, তবে এ কথা স্বীকার করতেই হয় যে এখানে কবির স্বাধীনতার অপলাপ ঘটে নি। ডঃ শীল সন্ধ্যাসঙ্গীত' এবং 'প্রভাত সঙ্গীতের' আলোচনা প্রসঙ্গে যে জীবন বীক্ষণ তত্ত্বের অবতারণা করেছিলেন, সে কথা আমরা পূর্বেই বলেছি। নব্য রোমান্টিক লিরিক কাব্যের প্রকৃষ্ট উদাহরণ হিসেবে ডঃ শীল রবীন্দ্রনাথের 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' এবং 'প্রভাতসঙ্গীত'কে গণ্য করেছে। কাব্য সুষমার জনয়িত্রী হ'ল কবির একান্তভাবে subjective বা বস্তু-অনির্ভর দৃষ্টিভঙ্গী; জীবনের এবং জগতের দুঃখ-বেদনার দ্বন্দ্বকে অতিক্রম করে, কবি মন জয়ী হয়। আমরা পূর্বেই বলেছি যে 'প্রভাতসঙ্গীতের' মধ্যে ব্রজেন্দ্রনাথ যতটা জীবনবীক্ষণ প্রত্যক্ষ করেছেন ঠিক ততটা তিনি 'সন্ধ্যাসঙ্গীতে'র মধ্যে খুঁজে পান নি।

রবীন্দ্রনাথের গীতিধর্মী কবিতায় ব্রজেন্দ্রনাথ প্রাথমিক আবেগের প্রাধান্য লক্ষ্য করেছেন। তাঁর মতে কবি যে ধরনের চিত্রকল্প তাঁর গীতিধর্মী কবিতায় ব্যবহার করেছেন তার অধিকাংশতেই খুব পরিণত মানসিকতার নিদর্শন নেই। অর্থাৎ কবি কর্তৃক সহজ সরল চিত্রকল্পের ব্যবহারকে ডঃ শীল কবি মানসের অপরিণত অবস্থার লক্ষণ বলে গণ্য করেছেন। আমাদের মতে সহজ সরল আঙ্গিক অথবা চিত্রকল্পের ব্যবহারে কবির অপরিণত মানসিকতার লক্ষণ নেই। বরং একথা আমরা বলব যে, সরল আঙ্গিক হ'ল পরিণত মানসিকতার লক্ষণ। বাইবেল ধর্মগ্রন্থের লেখাঙ্গিক অত্যন্ত সরল। তাই বলে বাইবেলের বক্তব্যকে কোন সমালোচকই অপরিণত মানসিকতার ফলশ্রুতিরূপে গণ্য করবেন না। 'ভানুসিংহের পদাবলী'র সমালোচনার প্রসঙ্গে ডঃ শীলের বক্তব্য অনুধাবন করলে আমরা আবার পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রতি ডঃ শীলের পক্ষপাতিত্বটুকু প্রত্যক্ষ করি। এই প্রসঙ্গে বলা দরকার যে ডঃ শীল রবীন্দ্র সাহিত্যের আলোচনা প্রসঙ্গে Historical-Comparative বা ইতিহাস আশ্রিত তুলনাগত পদ্ধতির প্রয়োগ করেছেন। 'ভানুসিংহের পদাবলী'র উৎকর্ষ অনুধাবন করতে গিয়ে

ডঃ শীল প্রাচীন ইতালীয় প্রেমকাহিনীর যে পুনরাবৃত্তি কবি কীট্‌স করেছেন তার সঙ্গে তুলনা করে 'ভানুসিংহের পদাবলী'র মূল্যায়ন করার প্রয়াস পেয়েছেন ডঃ শীল। এই ধরনের তুলনামূলক বিচার আমাদের মতে বহু ক্ষেত্রে রবীন্দ্র সাহিত্যের মূল্য বিচারে অবমূল্যায়ন ঘটিয়েছে। কাব্যকে তার আপন পরিপ্রেক্ষিতে বিচারের প্রয়োজনীয়তাটুকু এ যুগের প্রায় সকল সমালোচকই স্বীকার করে নিয়েছেন। কাব্য তার আপন পরিপ্রেক্ষিতে স্বতন্ত্র। ব্রজেন্দ্রনাথের 'Quest Eternal'কে বুঝতে হলে কবির ভারতীয় মানসিকতাকে প্রথমে যথাযথ অনুধাবন করতে হবে। তারপর তার সঙ্গে বিশ্বমানসিকতার যোগটুকু উপলব্ধি করতে হবে। ব্রজেন্দ্রনাথের 'Quest Eternal' বুঝতে গিয়ে আমরা যে দান্তে অথবা মিলটনের মানসলোকের পরিপ্রেক্ষিতে 'Quest Eternal'কে স্থাপন করি, তবে আমাদের কাব্য বিচার ভ্রান্ত হবে। ডঃ শীল কৃত রবীন্দ্রনাথের 'ভানুসিংহের পদাবলী'র বিচারের মধ্যেও এই ধরনের ভ্রান্তি অনুস্যূত হয়ে গেছে বলে আমাদের বিশ্বাস। এই সমকালীন মানুষের ভাব-ভাবনাকে তিনি Age-consciousness বলেছেন। আমরা এই বিশ্বমানব তত্ত্বকে গ্রহণ করি, আমরা এই তত্ত্বকে স্বীকার করি, কেননা বিশ্বাস করি যে Man is not a moral Melchizedeck. এই কাল মানসিকতা স্বীকার না করলে আমরা কাব্য ও শিল্পের ব্যঞ্জনা তত্ত্বটিকে যথাযথ অনুধাবন করতে পারব না। শব্দের অর্থ আভিধানিক হ'লেও তার ব্যঞ্জনা সঞ্চিত হয়ে থাকে যুগ মানসে এবং জাতি মানসে। যক্ষের বিরহ কাহিনী মেঘদূতের দৌত্য অথবা দুষ্মন্ত শকুন্তলার প্রেম-বিরহ-মিলন কথার মর্মমূলে কেবলমাত্র 'মেঘদূত' বা 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' কাব্যগ্রন্থ পাঠ করে তার শাব্দিক বা বাচিক অর্থটুকু অনুধাবন করলেই প্রবেশ করা যাবে না; ভারতীয় ঐতিহ্যে সন্নিবিষ্ট হ'য়ে তবেই এই দু'টি বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থের যথার্থ রসোপলব্ধি ঘটে। ঠিক এই ভাবেই আমরা রামায়ণ মহাভারত প্রমুখ মহাকাব্য দু'টির কথাও বলতে পারি। মহাভারতের বা রামায়ণের কাহিনীর অন্তরে প্রবেশ করতে হলে ভারতীয় ঐতিহ্যে অবগাহন স্নান করে উঠে তবেই ভারতীয় মহাকাব্য দু'টির রসের জগতে প্রবেশ করা চলতে পারে। মহাভারত পাঠ করার সময় সমগ্র প্রজাতি মানুষ যুগ মানসকে আশ্রয় করে পাঠকের মনে অধিষ্ঠিত হয়। তবেই আমরা মহাকাব্যের রসের জগতে প্রবেশ লাভ করি। মহারথী ভীষ্মদেব যখন অস্ত্র ত্যাগ করে কৃতাঞ্জলিপুটে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বলেন 'শীঘ্র এসো কৃষ্ণ কর আমারে সংহার,

নন্দনতত্ত্বে এই যে প্রজাতি মানসিকতার কথা বলা হ'ল, এই ব্যাখ্যায় আমরা একটা সমগ্র জাতির শিল্পবোধের মধ্যে এক ধরনের ঐক্যের সন্ধান পাই। এই ঐক্য আশ্রিত শিল্পবোধই শিল্প ঐতিহ্য বা শিল্প জাতীয়তার সূচনা করে। তাই ব্রজেন্দ্রনাথ যখন জাপানী চৈনিক ও ভারতীয় শিল্পের, ব্যাবিলনীয়, গ্রীসিয় ও মিশরীয় শিল্পের ঐতিহ্যের বারংবার উল্লেখ করেন তখন আমরা তাঁর নন্দনতত্ত্বে ব্যাখ্যাত শিল্পতত্ত্বের যুক্তিযুক্ততাটুকু লক্ষ্য করি।

সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর শিল্প নিদর্শন সম্পর্কে ঔৎসুক্য স্বাভাবিক। সেই ঔৎসুক্য প্রণোদিত হয়ে আমরা এই নিবন্ধের অবতারণা করছি।

স্বামীজি নির্বিকল্প সমাধি আশ্রয় করে রূপহীন, নিরাকার বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অতিক্রমী এক অনন্ত ছায়ালোকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন; সাধনলব্ধ ঐশী শক্তির প্রসাদে কালান্তরের চিত্র তাঁর মানস নেত্রের সম্মুখে নিত্য সমুদ্ভাসিত ছিল। মহাকালের লীলা তাঁর চক্ষে পরম অর্থে অর্থবান নয়। তিনি জন্মজন্মান্তরের দৃশ্যাবলী অবলোকন করেছেন আপন যোগজ দৃষ্টির সহায়তায়। তাঁর বাল্যবন্ধুকে তিনি সে-কথা বলেছেন, আমরা তা শ্রবণ করেছি। সুন্দর, কালধৃত; যে সুন্দর শিল্প বা প্রকৃতিকে আশ্রয় করে তাকে সাধারণভাবে কালজয়ী বললেও তা পরিপূর্ণরূপে কালকে অতিক্রম করতে পারে না, কেননা, সুন্দর 'বিশেষ'-কে আশ্রয় ক'রে বিশেষ কালের দ্বারা 'বিশেষ'-রূপে চিহ্নিত। শিল্পের উপজীব্য হ'ল সামান্য নয়, বিশেষ মাত্র। তিনি বিশেষকে উত্তীর্ণ হয়ে নির্বিশেষের মধ্যে পরম আনন্দে অবগাহন করেছেন। নন্দনতাত্ত্বিক অভিজ্ঞতায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি সেই পরমসত্তার সাযুজ্য এবং সামীপ্য লাভ করেছেন, যেখানে সব বিশেষ তার চরিত্র হারিয়ে নির্বিশেষ হয়েছে। পরম কবি যিনি, তাঁর সাক্ষাৎ পেয়েছেন স্বামিজী। সুন্দরের উপাসনা হ'ল অবিদ্যাময় জগতের উপাসনা; পরমসুন্দরের উপাসনা হ'ল অমৃতের তপস্যা। এই অবিদ্যাময় জগতের উপাসনাতেই আবার ঐ পরমসুন্দরের উপাসনার জন্য আসন পাতা হয়। এই পরমসুন্দরই হ'লেন, কবি এবং সকল মানবকর্মের নিয়ন্তা। ঈশোপনিষদে তাঁর সম্বন্ধে বলা হয়েছে :

'স পর্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণমস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্।

কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূর্যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ'।

'তিনি চতুর্দিক বেষ্টন করিয়া আছেন। তিনি উজ্জ্বল দেহশূন্য ব্রণশূন্য স্নায়ুশূন্য পবিত্র ও নিষ্পাপ, তিনি কবি, মনের নিয়ন্তা, সকলের শ্রেষ্ঠ ও স্বয়ম্ভূ; তিনিই চিরকাল যথাযোগ্যরূপে সকলের কাম্যবস্তু বিধান করিতেছেন।' এই কবির্মনীষীই প্রকৃতির অনন্ত সৌন্দর্যের ধারক ও সৃজক। তাঁকে পেলে, তাঁকে লাভ করলে সকল সৌন্দর্যের মূলীভূত কারণকে পাওয়া যায়। এই পরমসুন্দরকে স্বামিজী পেয়েছিলেন, তাই তিনি প্রকৃতির রহস্যও জ্ঞাত

হয়েছিলেন। তিনি প্রকৃতির সৌন্দর্যের ধ্যানে 'দৈবী প্রকৃতি'-র চিন্তনে এবং অনুধ্যানে অমৃতত্ব লাভ করেছেন। 'দৈবী প্রকৃতি'র চিন্তনে এবং অনুধ্যানে অমৃতত্ব লাভের কথা ঈশোপনিষদে কথিত হয়েছে। পরমপুরুষের সামীপ্য এবং সাযুজ্য লাভ ঘটলে ভোজ্য এবং ভোক্তা একাত্ম হয়ে যায়। ভোক্তার আত্মসাক্ষাৎকার ঘটে। প্রকৃতি-সৌন্দর্য-ঐশ্বর্য ঐ পরমপুরুষকে আবৃত করে থাকে। তাই তো সুন্দরের পূজারী পরম ভক্ত-ঐকান্তিক নিষ্ঠাসহকারে বলে :

'হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে ॥
······তেজো যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি
যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি' ॥ (ঈশোপনিষৎ, ১৫, ১৬)

'হে সূর্য, হে হিরণ্ময়, পাত্র দ্বারা তুমি সত্যের মুখ আবৃত করিয়াছ, সত্যধর্ম আমি যাহাতে দেখিতে পারি এই জন্য আবরণ অপসারিত কর। আমি তোমার পরম রমণীয়, রূপ দেখিতেছি,—তোমার মধ্যে ঐ যে পুরুষ রহিয়াছেন, তাহা আমি-ই'। রসিক সুজন রূপের মধ্যেই পরমরূপকারকে আবিষ্কার করেন। তাঁহার আবিষ্কারে তদ্দর্শনে সকল রূপের ইতি হয়। ভোক্তা পরম-বিস্ময়ে ঐ পরমরূপকার এবং আপনার মধ্যে একাত্মতা উপলব্ধি করে। নন্দনতাত্ত্বিক অভিজ্ঞতার দ্বৈতভাব দূরীভূত হয়। দুই যে একের মধ্যেই বিধৃত আছে, সেই পরমজ্ঞানের সন্ধানটুকু রূপপিপাসু লাভ করে। তার মধ্যেই তার সকল রূপতৃষ্ণার সমাধি ঘটে। তার দেবদর্শন হয় এবং একই সাথে তার আত্মদর্শনও সংঘটিত হয়। ফরাসী দার্শনিক ব্রেমো বলেছিলেন, ভক্ত এবং রূপ-পূজারী সমগোত্রীয়। বহু দূর পর্যন্ত তাদের একত্র অভিসার। তারপরে ভক্ত ভগবানের দিকে ফেরে আর শিল্পী পরমসুন্দরের সান্নিধ্য লাভ করে। স্বামিজী বললেন যে, সুন্দরের উপাসক এবং ভক্ত এরা একই পথের পথিক। সুন্দরের উপাসক সুন্দরের মধ্যে যেমন পরমসুন্দরকে দেখতে পান তাঁর সাধনার প্রান্তিক সীমায়, ঠিক তেমনি করে তাঁর আত্মসাক্ষাৎকারও ঘটে, কেননা আত্মাই তো ব্রহ্ম।

এই আত্মসাক্ষাৎকার বা ব্রহ্মসাক্ষাৎকার পেতে হলে নন্দনতাত্ত্বিক বৈরাগ্যের পথে তা পাওয়া যায়। এই বৈরাগ্যের পথেও ব্রহ্মলাভ ঘটে। এই ব্রহ্মই তো পরমসুন্দর। স্বামিজীর কথা উদ্ধৃত করি : "একখানি চিত্র কে বেশী উপভোগ করে? চিত্র-বিক্রেতা, না চিত্র-দ্রষ্টা? বিক্রেতা তাহার হিসাব-

কেতাব লইয়াই ব্যস্ত, তাহার কত লাভ হইবে ইত্যাদি চিন্তাতেই মগ্ন। ঐ সকল বিষয়ই তাহার মাথায় ঘুরিতেছে। সে সকল নিলামের হাতুড়ির দিকে লক্ষ্য করিতেছে, এবং দর কত চড়িল, তাহা শুনিতেছে। দর কিরূপ তাড়াতাড়ি উঠিতেছে, তাহা শুনিতেই সে ব্যস্ত। চিত্র দেখিয়া সে আনন্দ উপভোগ করিবে কখনও? তিনিই চিত্র সম্ভোগ করিতে পারেন, যাঁহার বেচা-কেনার কোন মতলব নাই। তিনি ছবিখানির দিকে চাহিয়া থাকেন, আর অতুল আনন্দ উপভোগ করেন।[১] ছবি দেখে নন্দনতাত্ত্বিক আনন্দ উপভোগের পথে যেমন লাভালাভের দৃষ্টিটুকু অন্তরায় হয়, ঠিক তেমনি ব্রহ্মানন্দলাভের পথে প্রধান বাধা হ'ল আমাদের বাসনা পঙ্কিল দৃষ্টিটুকু। নন্দনতাত্ত্বিক আনন্দ হ'ল ব্রহ্মাস্বাদ-সহোদর। 'রসো বৈ স',—তিনি রসস্বরূপ। তাই তো নন্দনতাত্ত্বিক রসাস্বাদনের পথে ব্রহ্মলাভ ঘটা কিছু বিচিত্র নয়। স্বামিজী সৌন্দর্য দর্শনের রূপকল্প প্রয়োগ করলেন ব্রহ্মদর্শনের পরিপ্রেক্ষিতে। আবার তাঁর কথা উদ্ধৃত করে দিই: 'এইভাবে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডই একটি চিত্র স্বরূপ; যখন বাসনা একেবারে চলিয়া যাইবে, তখনই মানুষ জগতকে উপভোগ করিবে, তখন আর এই কেনা-বেচার ভাব, এই ভ্রমাত্মক অধিকার-বোধ থাকিবে না। তখন ঋণদাতা নাই, ক্রেতা নাই, বিক্রেতাও নাই, জগৎ তখন একখানি সুন্দর চিত্রের মত। ঈশ্বর সম্বন্ধে নিম্নোক্ত কথার মতো সুন্দর কথা আমি আর কোথাও পাই নাই; তিনিই মহৎ কবি, প্রাচীন কবি—সমগ্র জগৎ তাঁহার কবিতা, উহা অনন্ত আনন্দোচ্ছ্বাসে লিখিত, এবং নানা শ্লোকে, নানা ছন্দে, নানা তালে প্রকাশিত। বাসনা ত্যাগ হইলেই আমরা ঈশ্বরের এই বিশ্ব-কবিতা পাঠ করিয়া সম্ভোগ করিতে পারিব। তখন সবই ব্রহ্ম ভাব ধারণ করিবে।"[২]

জীব মায়ামুক্ত হয় বাসনা ত্যাগ ক'রে; তার মুক্তি ঘটে এই বৈরাগ্যের পথে। স্বামিজী এই বৈরাগ্যকে নন্দনতাত্ত্বিক বৈরাগ্যের সঙ্গে তুলিত করেছেন। যেমন করে শিল্পের রস অলব্ধ থেকে যায় যদি না রসিকজনার নন্দনতাত্ত্বিক বৈরাগ্যটুকু আয়ত্তে থাকে, ঠিক তেমনি আমাদের মায়াবন্ধনেরও মুক্তি ঘটে না যদি না আমরা বাসনা-বৈরাগ্যটুকু অর্জন করতে পারি। স্বামীজীর পক্ষে এই উভয়বিধ বৈরাগ্যই সহজলভ্য। যিনি নির্বিকল্প সমাধির

১। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, দ্বিতীয় খণ্ড; পৃঃ ১৭২।

২। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ১৭২।

আনন্দ হিল্লোলে অবগাহন করেছেন, যিনি নির্বিশেষ মর্ত্যালোকোত্তর অস্পষ্ট লোকের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছেন আপন তপঃ প্রভাবলে তিনি নন্দনতাত্ত্বিক আনন্দ বা রসের চরম-উপলব্ধি লাভ করেছেন, এ কথা সহজেই অনুমেয়। বিশেষ হ'ল শিল্পের জগৎ, স্বামিজী যখন নির্বিশেষ লোকের আভাস পান তখন শিল্পলোক অতিক্রান্ত। আমাদের ব্যবহারিক জগৎ হ'ল নামরূপের জগৎ। শিল্পজগৎও তাই। রূপ সত্যকে আবৃতও করে, আবার তাকে ব্যঞ্জিতও তাকে। সত্যের ব্যঞ্জনা, তার আভাস রূপের মাধ্যমে পাওয়া যায়। সত্যকে —পূর্ণ সত্যকে নন্দনতাত্ত্বিক পথে, রূপারাধনার পথে লাভ করা যায় না। রূপ অপগত না হ'লে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার বা আত্মসাক্ষাৎকার ঘটে না। তাই পূর্ণ সত্যকে যে লোকে লাভ করা যায় বা পূর্ণ সত্য হওয়া যায়, তা হ'ল অদ্বৈতের জগৎ। আর নন্দনতত্ত্বের জগৎ হ'ল দ্বৈত-আশ্রয়ী। রূপ-ভোক্তা এবং রূপ— এরা এ জগতের সমান অংশভাগী। যখন এই রূপের জগৎ অতিক্রান্ত হয় রূপরসিক পরমরূপকে আপনার মধ্যে প্রত্যক্ষ করেন, তখন তাঁর আত্মসাক্ষাৎকার ঘটে, তখন সুন্দরের জগৎ পরমসুন্দরের মধ্যে আপনার চরম সার্থকতা খুঁজে পায়। এই পরম অভিজ্ঞতাটুকু ক্রমান্বিত। রূপের জগৎ থেকে অরূপলোকের দিকে ভক্তের অভিসার নিত্য চলে। রূপলোক-অতিক্রমণের অভিজ্ঞতা সহজলভ্য নয়। সাধারণত মানুষেরা রূপলোকের সীমানায় আবদ্ধ। এর বাইরে যাওয়া অতীব দুরূহ। এই রূপলোককে অতিক্রম করেছিলেন স্বামিজী তাঁর অলৌকিক তপস্যার বলে আর শ্রীঠাকুরের কৃপায়। তাঁর দেবদুর্লভ এই অভিজ্ঞতার কথা তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন :

'নাহি সূর্য, নাহি জ্যোতিঃ, নাহি শশাঙ্ক সুন্দর।
ভাসে ব্যোমে ছায়াসম ছবি বিশ্বচরাচর॥
অস্ফুট মন আকাশে, জগৎ সংসার ভাসে,
ওঠে ভাসে ডোবে পুনঃ অহং স্রোতে নিরন্তর॥[৩]

পূর্বকথিত ঈশোপনিষদের শ্লোকে সূর্যদেবকে বলা হয়েছে তাঁর আলোক আবরণ অপসারিত করার জন্য। সেই আলো আবরণ অপসারিত করলে তবেই সত্যের স্বরূপ দেখা যায়, তবেই আত্মোপলব্ধি ঘটে, একথা বললেন উপনিষদের ঋষি। তাঁর সুউচ্চ আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতাকে স্বামিজীর অভিজ্ঞতার সঙ্গে তুলনা করলে এ কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, এরা উভয়েই একই ভাবনার দ্বারা ভাবিত ; স্বামিজী

৩। স্বামিজীর বাণী ও রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ২৬৭।

দৃষ্ট এই অস্পষ্ট লোক জ্যোতিঃহারা, সূর্য-বিহীন। সূর্যের আলোক আবরণ অপসারিত হ'লে তবেই সত্যদর্শন ঘটে, এ কথা বলেছেন উপনিষদের ঋষি আর স্বামিজীর অভিজ্ঞতায় আমরা সেই সত্যের আভাস পাই ; স্বামিজী যে অবাঙ্-মনসোগোচরমের কথা বলেছেন সেখানে সূর্য-চন্দ্র, অস্তমিত, সে লোকে জ্যোতিলেখা অলিখিত।

স্বামিজী-কথিত শিল্পমূল্য ও শিল্পব্যঞ্জিত মহামূল্যের ব্যাখ্যা আধ্যাত্মিক জগৎ মানুষের চরম মুক্তির সন্ধান দেয়। বৈদান্তিক বিবেকানন্দ পারমার্থিক পর্যায়কে যেমন স্বীকার করেছেন, তেমনি আবার ব্যবহারিক স্তরকেও স্বীকৃতির মর্যাদা দিয়েছেন। শিল্পের আধ্যাত্মিক মূল্যায়ন হ'লেও ব্যবহারিক সত্তার আলোকে তার মূল্যায়ন বাহুল্য নয়—এ'কথা স্বামিজী মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেছেন। তাই দেখি তাঁর নানান্ লেখায়, বক্তৃতায় এবং আলোচনায় শিল্পের উল্লেখ। দেশ-বিদেশের শিল্প, গ্রীক শিল্প, ভারতীয় এবং এশিয়ার দেশগুলির শিল্প এবং রোমক শিল্পের উল্লেখ আমরা বহুবারই পেয়েছি। কখন কখন শিল্পের চরম আধ্যাত্মিক মূল্যায়ন করেছেন তিনি। তার উল্লেখ পূর্বেই আমরা করেছি। আবার কখন বা বিশ্বপ্রেমিক, মানবপ্রেমিক বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে শিল্পী বড় হয়ে উঠেছে। শিল্পকে অতিক্রম ক'রে শিল্পীর দাবীটা স্বামিজীর কাছে স্বীকৃতি পেয়েছে। তিনি সানন্দে সেই স্বীকৃতিটুকু দিয়েছেন। তিনি শ্রমের গুণগান করেছেন ; শ্রমদানীদের প্রণাম করেছেন।[৪] নির্বিকার নন্দনতাত্ত্বিক বৈরাগ্য তাঁর অনায়াসলভ্য ছিল বলে তিনি সহজেই যথার্থ শিল্প মূল্যায়নটুকু করতে পারতেন। ইউরোপীয় দেশগুলির শিল্পপ্রচেষ্টার তুলনামূলক আলোচনা স্বামিজী করেছেন। আমরা সেটুকু উদ্ধৃত করে দিই : "কৃষ্ণকেশ অপেক্ষাকৃত খর্বকায়, শিল্পপ্রাণ, বিলাসপ্রিয়, অতি সুসভ্য ফরাসীর শিল্পবিন্যাস, আর একদিকে হিরণ্যকেশ, দীর্ঘাকার, দিঙনাগ জার্মানির স্থূল হস্তাবলেপ।...... কিন্তু ফরাসী যে শিল্প সুষমার সূক্ষ্ম সৌন্দর্য, জার্মানে, ইংরেজে, আমেরিকে সে অনুকরণ স্থূল। ফরাসী বলবিন্যাসও যেন রূপপূর্ণ, জার্মানির রূপবিকাশ চেষ্টাও বিভীষণ। ফরাসী প্রতিভার মুখমণ্ডল ক্রোধাক্ত হলেও সুন্দর, জার্মান প্রতিভার মধুর হাস্য-বিমণ্ডিত আননও যেন ভয়ঙ্কর।"[৫]

স্বামিজীর পাশ্চাত্য শিল্প প্রকরণের মূল্যায়ন যে বহুলাংশে যাথার্থ্যের দাবী

৪। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ষষ্ঠ অধ্যায়, পৃঃ ১০৬।

৫। ঐ ঐ ঐ ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ১২৬।

রাখে, এ'কথা বিরূপ সমালোচকেরাও স্বীকার করেন। ফরাসী-শিল্পকলার সুকুমার সৌন্দর্য স্বামিজীকে আকৃষ্ট করেছিল। লুভার মিউজিয়াম দেখে তিনি গ্রীক শিল্প সম্বন্ধে যে মতামত ব্যক্ত করলেন তা শিল্পরসিকমাত্রেরই অনুধাবন করা প্রয়োজন। বিদেশী শিল্পশাস্ত্রে সুপণ্ডিত স্বামিজী লিখেছেন: 'মিউজিয়াম দেখে গ্রীককলার তিন অবস্থা বুঝতে পারলুম। প্রথম 'মিসেনি' (Mycenocan), দ্বিতীয় যথার্থ গ্রীক।......এই 'মিসেনি' শিল্প প্রধানতঃ এশিয়ার শিল্পের অনুকরণেই ব্যাপৃত ছিল। তারপর ৭৭৬ খৃঃ পূঃ কাল হতে ১৪৬ খৃঃ পূঃ পর্যন্ত 'হেলেনিক' বা যথার্থ গ্রীক-শিল্পের সময়।......... ক্রমে এশিয়া শিল্পের ভাব ত্যাগ করে স্বভাবের যথাযথ অনুকরণ চেষ্টা এখানকার শিল্পে জন্মে। গ্রীক আর অন্য প্রদেশের শিল্পের তফাত এই যে, গ্রীক শিল্প প্রাকৃতিক স্বাভাবিক জীবনের যথাযথ জীবন্ত ঘটনাসমূহ বর্ণনা করেছে।"[৬] তারপরে স্বামিজী 'আর্কেইক' ও ক্লাসিক গ্রীক-শিল্পের অভ্যুদয়ের ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা করেছেন। গ্রীক শিল্পের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে তিনি লিখলেন; 'কলাবিদ্যা নিপুণ একজন ফরাসী পণ্ডিত লিখেছেন; (ক্লাসিক) গ্রীক শিল্প চরম উন্নতিকালে বিধিবদ্ধ প্রণালী শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। উহা তখন কোন দেশের কলাবিধিবন্ধনই স্বীকার করে নাই বা তদনুযায়ী আপনাকে নিয়ন্ত্রিত করে নাই। ভাস্কর্যের চূড়ান্ত নিদর্শন স্বরূপ মূর্তিসমূহ যে কালে নির্মিত হয়েছিল, কলাবিদ্যা সমুজ্জল সেই খ্রীঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীর কথা যতই আলোচনা করা যায় ততই প্রাণে দৃঢ় ধারণা হয় যে, বিধি নিয়মের সম্পূর্ণ বহির্ভূত হওয়াতেই গ্রীক শিল্প সজীব হয়ে ওঠে।' এই গ্রীক শিল্পের দুই সম্প্রদায়—প্রথম আটিক, দ্বিতীয় পিলোপনেশিয়েন।"[৭] স্বামিজী আটিক শিল্পগোষ্ঠীর শিল্পকর্মে লক্ষ্য করলেন অপূর্ব সৌন্দর্য মহিমা এবং বিশুদ্ধ দেবভাবের গৌরব; যাহা কোনকালে মানবমনে আপন অধিকার হারাইবে না। এছাড়াও তিনি আটিক শিল্পের অন্যতর প্রবৃত্তিকে আবিষ্কার করেন। সেটা হল শিল্পকে ধর্মের সঙ্গ হতে একেবারে বিচ্যুত করে কেবলমাত্র মানুষের জীবন বিবরণে নিযুক্ত রাখা অলৌকিক দেবমহিমা, একদিকে আটিক শিল্পের উপজীব্য; অন্যপ্রান্তে মানুষ আপন মহিমায় এবং স্বরূপে শিল্প সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। আটিক শিল্পের এই দু'টি ধারা স্বামিজীকে আকৃষ্ট

৬। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ১৪২-৪৩।

৭। " " নবম খণ্ড, পৃঃ ১৪৩।

করেছিল, কেননা স্বামিজী উভয়কেই পরম সত্য বলে স্বীকার করেছিলেন। মানুষের শ্রেয় বিধানের মধ্য দিয়েই তো ভগবানের সেবা করা যায়। তাই দেবভাব এবং মানব-মহিমা স্বামিজীর মতে আর্টিক শিল্পকে অনন্তসাধারণ গৌরব দিয়েছিল। যিনি জীবের মধ্যে ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ করেন তিনি শিল্পে দেবভাব এবং মানবভাব উভয়কেই স্বাগত জানাবেন, এ'আর বিচিত্র কী?

অন্যত্র জাপানী ছবি সম্বন্ধে স্বামিজী যে আলোচনা করেছেন তা কলারসিক এবং নন্দনতত্ত্ব জিজ্ঞাসুর পক্ষে অবশ্য জ্ঞাতব্য। প্রশ্নকর্তা স্বামিজীকে বলছেন: "আমি কতকগুলি জাপানী ছবি দেখেছি। তাদের শিল্প দেখে অবাক হতে হয়। আর তার ভাবটি যেন তাদের নিজস্ব বস্তু, কারও নকল করবার জো নেই।"

স্বামিজী বললেন। "ঠিক, ঐ আর্টের জন্যই ওরা এত বড়। তারা যে Asiatic (এশিয়াবাসী)। আমাদের দেখছিস না, সব গেছে, তবু যা আছে তা অদ্ভুত। এশিয়াটিকের জীবন আর্টে মাখা। প্রত্যেক বস্তুতে আর্ট না থাকলে এশিয়াটিক তা ব্যবহার করে না। ওরে আমাদের আর্টও যে ধর্মের একটা অঙ্গ।"[৮] পাশ্চাত্য দেশের সাধারণ মানুষের শিল্প-জীবনের সঙ্গে আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের শিল্পবোধের তুলনা করে স্বামিজী প্রসঙ্গান্তরে বললেন: "কি জানিস, সাহেবদের utility (কার্যকারিতা) আমাদের Art (শিল্প)। ওদের সমস্ত দ্রব্যেই utility, আমাদের সর্বত্র আর্ট। এখন চাই art এবং utility-র combination (সংযোগ)। গোঁড়া নন্দনতাত্ত্বিক হয়ত বলবেন যে, শিল্প এবং প্রয়োজন এরা হল পরস্পর বিরুদ্ধ। কেমন করে এদের প্রকৃতির যাথার্থ্যকে রক্ষা করে উভয়ের মধ্যে সমন্বয় ঘটানো যায়, সে সম্পর্কে নানান কূটতর্কের অবতারণা হয়ত করা যেতে পারে। কিন্তু ক্রমবর্ধমান আর্ট-ইন-ইণ্ডাষ্ট্রীর প্রসার এবং ঐশ্বর্য স্বামিজীর মতের সারবত্তায় আমাদের আস্থা স্থাপন করতে উৎসাহিত করে। আর এই সমন্বয় প্রচেষ্টার সার্থক রূপায়ণ ঘটেছে জাপানে। স্বামিজী সে কথা আমাদের বলেছেন। আপাতবিরোধী নন্দনতত্ত্বগত দুটি আদর্শের সমন্বয় তিনি ঘটিয়ে দিয়েছেন তাঁর ঋষি দৃষ্টির স্বচ্ছতার প্রসাদ গুণে।

শিল্পে বাস্তবতা সম্পর্কে পণ্ডিতজন নানান ধরনের মত পোষণ করেছেন। শিল্পে প্রয়োজনের স্থান কতটুকু সে সম্বন্ধে স্বামিজীর সুচিন্তিত মতের উল্লেখ

৮। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, নবম খণ্ড; পৃঃ ৪০৬

আমরা করেছি। শিল্পে বাস্তবতা সম্পর্কে তাঁর মতামতও প্রণিধানযোগ্য। শিল্প কতটুকু বাস্তব অনুসারী হবে, কতখানি সে বাস্তবকে অনুসরণ ক'রে তারপরে কল্পনায় ভর করবে, সে প্রশ্ন অতি দুরূহ। স্বামিজী এই দুরূহ প্রশ্নের সমাধানকল্পে শিষ্যকে বলেছেন: "একটা ছবি আঁকলেই কি হল? সেই সময়ের সমস্ত যেমন ছিল, তার অনুসন্ধানটা নিয়ে সেই সময়ের জিনিষগুলো দিলে তবে ছবি দাঁড়ায়। Truth represent (প্রতীক সত্যকে প্রকাশ) করা চাই, নইলে কিছুই হয় না, যত মায়ে-খেদানো, বাপে-তাড়ানো ছেলে— যাদের স্কুলে লেখাপড়া হল না, আমাদের দেশে তারাই যায় Painting (চিত্রবিদ্যা) শিখতে। তাদের দ্বারা কি আর কোন ছবি হয়? একখানা ছবি এঁকে দাঁড় করানো আর একখানা Perfect Drama (সর্বাঙ্গ সুন্দর নাটক) লেখা, একই কথা।" এই মতের বিস্তৃত ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে স্বামিজী বললেন: "শিল্পের বিষয়বস্তুর মুখ্যভাবটুকু শিল্পকর্মের মধ্যে থেকে ফুটে বেরুনো চাই। শিল্পকর্মের বিষয়বস্তুর রূপায়ণে ক্রিয়াও চাই আর গাম্ভীর্য, ধৈর্যও চাই।" ভারতীয় ঐতিহাসিক শিল্পকর্মে স্বামিজী এই দুটি গুণই প্রত্যক্ষ করেছেন। ভারতীয় শিল্প আপন গৌরবে ভাস্বর, কেননা এই দুটি গুণই ভারতীয় শিল্পে অনায়াসে প্রবেশ লাভ করেছে। তিনি অন্যত্র ভারতীয় নাটক এবং গ্রীক নাটকের তুলনামূলক আলোচনা করে দেখিয়েছেন যে, ভারতীয় নাটককে উক্ত দুটি প্রসাদ গুণই বরমাল্য দিয়েছে। তৎকালে প্রচলিত গ্রীক নাটকের দ্বারা ভারতীয় নাটকের প্রভাবিত হওয়ার কথাকে স্বামিজী অস্বীকার করেছেন। বিদ্বজ্জনসুলভ জ্ঞানের আনুকুল্যে সূক্ষ্ম তর্কজালের বিস্তার করে তিনি বললেন: "আর্য-নাটকের সাদৃশ্য গ্রীক-নাটকে আদৌ তো নাই, বরং সেক্সপীয়র প্রণীত নাটকের সহিত ভুরি ভুরি সৌসাদৃশ্য আছে।" শুধু নাটক কেন আর্য-ভাস্কর্যেও গ্রীক প্রভাব তিনি অস্বীকার করলেন। ভারতীয় এবং পাশ্চাত্য শিল্প শাস্ত্রে স্বামিজীর বুৎপত্তি সন্দেহাতীত? বিশেষজ্ঞের সুগভীর পাণ্ডিত্য এবং সূক্ষ্ম মননধর্ম স্বামিজীর সকল আলোচনার বিষয়বস্তুর উপর অলোকসামান্য আলোকপাত করেছে, একথা নির্বিচারে বলা যায়। বিলাতী সঙ্গীত সম্বন্ধে স্বামী শিবানন্দের প্রশ্নের উত্তরে স্বামিজী বললেন: "বিলাতী সঙ্গীত খুব ভাল, harmony-র চূড়ান্ত, যা আমাদের মোটেই নেই। তবে আমাদের অনভ্যস্ত কানে বড় ভাল লাগে না। আমারও ধারণা ছিল যে, ওরা কেবল শেয়ালের ডাক ডাকে। যখন বেশ মন দিয়ে শুনতে আর বুঝতে লাগলুম,

তখন অবাক হলুম। শুনতে শুনতে তন্ময় হয়ে যেতাম। সকল Art এরই তাই। একবার চোখ বুলিয়ে গেলে একটা খুব উৎকৃষ্ট ছবির কিছু বুঝতে পারা যায় না। তার উপর একটু শিক্ষিত চোখ নইলে তো তার অস্থি-সন্ধি কিছুই বুঝবে না।"[১০]

বিলাতী সঙ্গীতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে স্বামিজী শিল্পে অধিকারবাদের নীতিকে গ্রহণ করেছেন। অবশ্য এ অধিকার কুলগত নয়, এ অধিকার অর্জন সাপেক্ষ। পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীতে স্বামিজীর আসক্তি জন্মেছিল ধীরে ধীরে এ কথা স্বামিজীর স্বীকারোক্তিতে পাওয়া যায়। পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীতের পূর্ণ রূপ। সে রূপ দর্শন করা অভ্যাস ও আয়াসসাধ্য। হার্মনি-প্রধান পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীত স্বামিজীকে আকৃষ্ট করেছিল। তিনি পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীতে করুণ রস এবং বীর রস এই উভয়বিধ রসের প্রাধান্য লক্ষ্য করে বললেন যে, আমাদের ভারতীয় সঙ্গীতে harmony-র অভাব ; আর এই অভাবটুকুর জন্য বীর রসের প্রাধান্য বড় একটা ভারতীয় সঙ্গীতে দেখা যায় না। বীর রস, স্বামিজীর মতে, হার্মনি আশ্রয়ী। সকল রাগই Martial হয় যদি harmony-তে বসিয়ে নিয়ে যন্ত্রে বাজানো যায়। রাগিনীর মধ্যেও কতকগুলি হয়। মুসলমান বিজয়ের পর এদেশে টপ্পা গানের বিশুদ্ধতা আর রইল না বলে স্বামিজী আক্ষেপ করেছেন। এদেশে এসে মুসলমান ওস্তাদেরা রাগরাগিনীগুলিকে আত্মস্থ করলেন ; এই প্রক্রিয়ায় তাঁরা টপ্পা এমনভাবে প্রয়োগ করলেন যে টপ্পাগানের নিজস্ব প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটে গেল। স্বামিজীর এই মত সম্বন্ধে মতভেদের অবকাশ থাকলেও এ' কথা বলা যায় যে, তাঁর শিল্পদৃষ্টি শিল্পের নিগূঢ় তত্ত্বাবলীর অনন্যসাধারণ বিশ্লেষণ করেছে। তাঁর কথা উদ্ধৃত করি : 'তোরা এটা বুঝতে পারিস না যে, একটা স্বরের উপর আর একটা স্বর এত শীঘ্র এসে পড়ে যে, তাতে আর সঙ্গীত মাধুর্য (Music) কিছুই থাকে না, উল্টে discordance (বে-স্বর) জন্মায়। সাতটা পর্দার Permutation, Combination (পরিবর্তন ও সংযোগ) নিয়ে এক একটা রাগরাগিণী হয় তো? এখন টপ্পায় এক তুড়িতে সমস্ত রাগটার আভাস দিয়ে একটা তান সৃষ্টি করলে আবার তার উপর গলায় জোয়ারী বলালে কি করে আর তার রাগত্ব থাকবে? আর টুকরো তানের এত ছড়াছড়ি করলে সঙ্গীতের কবিত্ব ভাবটা তো একেবারে যায়।...তবে আমাদের সঙ্গীতে Cadence (মিড় মূর্চ্ছনা) বড় উৎকৃষ্ট জিনিস। ফরাসীরা প্রথমে ওটা

১০। স্বামিজীর বাণী ও রচনা, নবম খণ্ড ; পৃঃ ৩৯৮-৯৯

ধরে, আর নিজেদের Musicএ ঢুকিয়ে নেবার চেষ্টা করে। তারপর এখন ওটা ইউরোপে সকলেই খুব আয়ত্ত করে নিয়েছে।'[১১] উপরি উদ্ধৃত উক্তি থেকে সঙ্গীত তথা শিল্প সম্বন্ধে স্বামিজীর আর একটি মত আমরা আবিষ্কার করতে পারি। তাঁর মতে সঙ্গীতের কবিত্ব ভাবটাকে বিসর্জন দিলে শিল্পের মূল্যহানি ঘটে। অর্থাৎ সঙ্গীত শুধুমাত্র সুরের বা রাগরাগিণীর খেলা নয়। শুধুমাত্র বহিরঙ্গ দিয়ে যেন শিল্পের মূল্যায়ন না করা হয়। সুর একটা ভাব বহন করে; সেই ভাবটি সঙ্গীতের শিল্পমূল্য কতকাংশে নির্ধারিত করে। রবীন্দ্রনাথ বললেন: 'শুধু ভঙ্গী দিয়ে যেন না ভোলায় চোখ।' স্বামিজী ইঙ্গিত করলেন যে, 'শুধু সুর দিয়ে যেন কাণকে আমরা না ভোলাই। মন ভোলাবার জন্য যেন কবিত্ব ভাবটিও অক্ষত এবং পূর্ণ থাকে।' শিল্পের বৃহত্তর প্রাঙ্গণে এই তত্ত্বকে রূপ এবং ভাব (Form and Content) এতদুভয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক নিরূপণ তত্ত্ব হিসেবে দেখা হয়েছে। শিল্পে রূপ বা ফর্মের প্রাধান্য হবে, না ভাব বা কন্টেন্টের প্রাধান্য ঘটবে? এ অতি জটিল প্রশ্ন। স্বামিজীর মত হ'ল আরিস্ততলীর মধ্যপন্থা-আশ্রয়ী। সঙ্গীতে রাগ রাগিণী এবং তার কবিত্ব ভাব, এরা উভয়েই প্রয়োজনীয়। সঙ্গীতকে পূর্ণাঙ্গ শিল্প হতে হলে এই রাগরাগিণী এবং কবিত্বভাবকে সমানভাবে গ্রহণ করতে হবে। স্বামিজীর এই মত তর্কশাস্ত্র অনুমোদনসম্মত।

স্বামিজীর সঙ্গীতবিজ্ঞানে পারঙ্গমতার কথা সর্বজনবিদিত। আমাদের সঙ্গীতে হার্মনির অভাব যেমন তাঁকে পীড়া দিয়েছে ঠিক তেমনি ওদেশের কাব্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের মিল ঘটানো কিছু নয়। ছন্দের মিলই সর্বাপেক্ষা উন্নত রুচির বস্তু নয়। এ' ঘোষণা তিনি করলেন স্যানফ্রানসিস্কো শহরে অবস্থিত ওয়েণ্ড সভাগৃহে। তাঁর কণ্ঠে সেদিন বিষাদের সুর প্রতিধ্বনিত হয়েছিল। ভারতের শিল্পকে, তার শিল্পদর্শনকে তিনি আবার ফিরে পেতে চাইলেন। তিনি বললেন: "বর্তমান ভারতবর্ষকে, তার ব্যক্তি এবং ব্যষ্টি জীবনকে শিল্প আশ্রয়ী হতে হবে। আর সেই দিকে সে কতখানি অগ্রসর হতে পারবে তার উপর তার ভবিষ্যৎ নির্ভরশীল।" সন্ন্যাসীর কম্বুকণ্ঠে সেদিন এই কথাই ধ্বনিত হ'ল: 'ভারতবর্ষে বহুযুগ পূর্বে সঙ্গীতপূর্ণ সপ্ত-স্বরে এমন কি অর্ধ ও চতুর্থাংশ স্বরে বিকশিত হইয়াছিল। ভারতবর্ষ অতীতে সঙ্গীত, নাটক ও ভাস্কর্যে অগ্রণী ছিল। বর্তমানে যাহা কিছু করা হইতেছে, সবই অনুকরণের চেষ্টা মাত্র।

১১। স্বামিজীর বাণী ও রচনা, নবম খণ্ড, পৃঃ ৩৯৯-৪০০

বাঁচিয়া থাকিবার জন্ত মানুষের প্রয়োজন কত অল্প এই প্রশ্নের উপরই বর্তমান ভারতের সব কিছু নির্ভর করে।'[১২]

নব্য ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ তার সৃষ্টিধর্মী শিল্প প্রচেষ্টার স্পর্শধন্ত হয়ে স্বামিজীর কল্পিত মূর্তি পরিগ্রহ করুক। তাঁর আবির্ভাব দেশের শিল্পীদের এই মহান্ দায়িত্ব পালনে প্রণোদিত করুক, শিল্পীদের এইটুকু প্রার্থনা।

১২। স্বামিজীর বাণী ও রচনা, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ৪২৫

শিল্পী শরৎচন্দ্র : নন্দনতাত্ত্বিকের দৃষ্টিতে

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে, বিশেষ করে কথা-সাহিত্যে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের স্থানটি অতিবিশিষ্ট। তাঁর শিল্প-শৈলী, ভাষার গঠন ও ব্যবহার, ঘটনা সন্নিবেশ পদ্ধতি তাঁর শিল্পের এক ধরনের আবেগময়তা (emotive content) অতি স্পষ্ট, মানব-মনের স্নেহ-ভালবাসা, এরা যে সর্বত্র এক এই ধরনের একটা প্রাথমিক ধারণা শরৎচন্দ্রের উপন্যাস পাঠে পাঠকের মনে সহজেই জন্ম নেয়। অতিকথন দোষ শরৎ সাহিত্যের চন্দ্র-কলঙ্ক-শোভা এ কথা না বললেও শরৎ সাহিত্যে যে তার ছায়াপাত ঘটেছে এ সত্যটুকু অনস্বীকার্য ; ব্যঞ্জনা অতিকথনকে পরিহার করে। শরৎচন্দ্রের বাচনভঙ্গী সহজ, সরল ও স্বাভাবিক ভাবেই কাব্যময়। তাই তা সুখপাঠ্য। কিন্তু পাঠান্তে চিন্তার নিক্তিতে শরৎচন্দ্রের বক্তব্য অত্যন্ত সংকুচিত হ'য়ে পড়ে। বুদ্ধির আলোকে শরৎচন্দ্রের সৃষ্টি দেদীপ্যমান নয়। প্রাথমিক হৃদয়াবেগের রামধনুর রঙে শরৎচন্দ্র পাঠকের মনকে রাঙিয়ে তোলেন। আবেগ অনুভূতি সহজেই আশ্চর্য মধুর হ'য়ে শরৎচন্দ্রের লেখনীমুখে পরিবেশিত হয়েছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় শরৎচন্দ্র কোথাও হৃদয়াবেগকে সামাজিক অনুশাসনের বেড়ার বাইরে স্বীকৃতি দেন নি। যে নৈতিক পরিমণ্ডল উনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে আমাদের মানব চেতনাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, বঙ্কিমচন্দ্র থেকে শরৎচন্দ্র পর্যন্ত কেউই তার বাইরে যেতে পারেন নি। একে আমরা উপনিষদের ভাষার অনুকরণে 'লৈখিক ঋত' বলতে পারি। অর্থাৎ তৎকালীন লেখক সম্প্রদায়ের যে নীতিবোধ সযত্নে তাঁদের শিল্প কর্মকে সঞ্জীবিত করে রাখত তাকে অস্বীকার করার চেষ্টা শরৎচন্দ্র কখনও করেন নি। তাঁর নন্দনতাত্ত্বিক ধারণা নীতিবোধের দ্বারা পরিপুষ্ট ও পরিমার্জিত। চরিত্রহীনের সতীশ সাবিত্রীর প্রতি ভালোবাসায় মুগ্ধ, কিন্তু সতীশের প্রেম কখনোই সামাজিক স্বীকৃতির সুনির্দিষ্ট বেড়াটিকে লঙ্ঘন করার প্রয়াস পায়নি। সতীশ কেন শরৎচন্দ্র-সৃষ্ট কোন নায়ক-নায়িকাই এই সামাজিক নীতি ও রীতি ভঙ্গের দায়ে দায়ী নয়। অবশ্য শরৎচন্দ্রের নায়িকারা নায়ককে আসন পেতে অন্ন পরিবেশন করেছেন। এর ফলে হয়ত কোথাও তা অনৈতিক হয়েছে বলে কেউ কেউ মনে করেছেন। কেন না গোঁড়া হিন্দুমতে অনেক সময়ে সামাজিকতা এবং নৈতিকতা সমার্থক ব'লে গণ্য হয়েছে।

আমরা অবশ্য সে মতের পোষকতা করি না। আমরা বলি অজ্ঞান অ-নৈতিক।

ভালবাসা অন্ধ, ভালবাসা মৃত্যুহীন, ভালবাসা যেন রাতের তারা, রাতের অন্ধকারে যেমন সে দেদীপ্যমান, তেমনি দিনের আলোতে সে অতি স্পষ্ট না হলেও তার অস্তিত্বটুকু হারিয়ে যায় না। সতীশ সাবিত্রীর ভালবাসা লোকচক্ষুর অন্তরালে যেমন প্রস্ফুটিত পদ্মের মত ফেটে ওঠে তেমনি আবার লোকাচারের স্পর্শ পেলেই তা' মুদিত আলোর কমল কলিকাটির মত আত্মগোপন করে। প্রেমের এই আত্মগোপনটুকু যেমন মধুর তেমনি সুন্দর। প্রকাশ্য দিবালোকে প্রেম বাঁচে না। দুর্ভেদ্য একান্ততার সুড়ঙ্গ পথে প্রেমের যাতায়াত। সে প্রেম অমর, নিষিদ্ধ। কবি-কল্পনা শ্রীরাধিকাকে কৃষ্ণের মাতুল আয়ান ঘোষের পত্নীরূপে কল্পনা করে এই দিব্যপ্রেমকে অতি নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। আর অতি নিষিদ্ধ বলেই তা এতো মধুর। শরৎচন্দ্র সাবিত্রীকে গৃহ-পরিচারিকারূপে কল্পনা করে সেই প্রেমকে নিষিদ্ধ প্রেমের রূপ দিয়েছেন। আর তা তৎকালীন সমাজ-রীতিতে নিষিদ্ধ বলেই তা এতো মধুর হয়ে উঠেছিল। মহাকবি মিল্টনের ভাষায় এ প্রেম হ'ল "The fruit of that forbidden tree"—নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল। রঙ-বেরঙের বিচিত্র অসংখ্য অসামাজিক প্রেমের কাহিনী যা শরৎচন্দ্র আমাদের শুনিয়েছেন, তারা কিন্তু শালীনতার সীমা কোথাও লঙ্ঘন করে নি।

শরৎচন্দ্র সামাজিক বিধিনিষেধের বেড়াজালে হৃদয়াবেগকে বন্দী করে রেখে সামাজিক স্বাস্থ্যকে অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁর নীতিবোধ তাঁর শিল্পকে ক্ষুণ্ণ করেছিল কিনা সে সম্বন্ধে বিতর্কের অবকাশ আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাশৈলীতে তাঁর উপন্যাসের পরিণতিতে আমরা তৎকালীন নীতি-বিশুদ্ধতার প্রভাব প্রত্যক্ষ করেছি। তৎকালীন নৈতিক পরিমণ্ডলের বিরুদ্ধাচারণের ভয়ে 'কৃষ্ণকান্তের উইল'এ বঙ্কিমচন্দ্র যে পরিণতির কল্পনা করেছিলেন, তা' আমরা লক্ষ্য করেছি। রোহিণীর অপমৃত্যু শিল্পতাত্ত্বিকের দৃষ্টিকোণ থেকে সমর্থন-যোগ্য কিনা, সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে। অবশ্য উপন্যাসের পরিণতিতে ঔপন্যাসিকের কল্পনাই প্রধান। পরিণতির রূপান্তর সম্বন্ধে পাঠকের বা সমালোচকের কোন বক্তব্যই সমীচীন নয়। গ্রন্থকারের সৃষ্টি 'অপূর্ব বস্তু'; তা তিনি বঙ্কিমচন্দ্রই হোন আর শরৎচন্দ্রই হোন। অতএব স্রষ্টা কল্পিত উপন্যাসের পরিণতি সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য অসমীচীন হলেও পাঠকের এইটুকু বলার অধিকার নিশ্চয়ই

আছে যে কোন একটি উপন্যাসের একটি বিশেষ ধরনের পরিণত কেন হল ? এই দৃষ্টিকোণ থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণকান্তের উইল' শরৎচন্দ্রের 'চরিত্রহীন' প্রমুখ উপন্যাসের পরিণতি সম্বন্ধে আমরা আলোচনা প্রাসঙ্গিক বলে মনে করি।

শরৎচন্দ্রের ব্যক্তিগত জীবনে সামাজিক এবং নৈতিক শুচিতাবোধ কতখানি কাজ করেছে সেই তথ্যটা অপ্রাসঙ্গিক : 'কবিরে পাবে না তার জীবনচরিতে'। যে অসামাজিক প্রেম, বৈষ্ণব সাহিত্যে যাকে পরকীয়া প্রেম বলা হয়েছে তার পূর্ণ প্রকাশ, তার চরম প্রস্ফুটন শরৎ সাহিত্যে নেই। নীতিবাগীশ শরৎচন্দ্র এসে, সমাজভয়ে ভীত শরৎচন্দ্র এসে শিল্পী শরৎচন্দ্রকে প্রত্যাহত করেছে বারবার। পঙ্গু, নির্বীর্য, প্লেতোনিক প্রেম শরৎচন্দ্র পরিবেশন করেছেন তাঁর সমগ্র সাহিত্য সম্ভারে। বঙ্কিমচন্দ্র দেবী চৌধুরাণীতে সাগর বৌয়ের মুখ দিয়ে যে Sex Symbol-এর কথা নির্ভয়ে বলালেন সেটুকু সাহসও কিন্তু শরৎচন্দ্রের ছিল না। সেটুকু নির্ভীকতাও শরৎচন্দ্র যদি দেখাতেন তবে বোধ হয় পশ্চিমদেশ থেকে স্বীকৃতি আসতে, নোবেল পুরস্কারের বরমাল্য পেতে তাঁর অসুবিধা হত না। ব্যক্তিগত জীবনের অসামাজিক রীতি ও জীবনধারা হয়ত শরৎচন্দ্রের সাহিত্যিক নির্ভীকতাকে ক্ষুণ্ণ করেছিল। উপন্যাসে কথিত অসামাজিক প্রেমের স্বাভাবিক পরিণতিটুকু ঘটাতে গিয়ে শরৎচন্দ্র বারবার ইতস্ততঃ করেছেন। আমাদের মনে হয় এর মূলে আছে লোকভীতি। সমালোচক হয়ত বলবেন যে শরৎচন্দ্রের ব্যক্তিগত জীবনের অসংযম তাঁর উপন্যাসেও প্রতিফলিত হয়েছে। আমাদের মনে হয় এই লোকভয়টুকু শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের অধিকাংশ প্রেমের আখ্যানকে পঙ্গু এবং অসম্পূর্ণ করে রেখেছে। আমাদের বক্তব্যের সপক্ষে সব থেকে বড় যুক্তি হল রামের সুমতি আখ্যানটুকু ; মানবহৃদয়ে প্রেম প্রবল ; অসামাজিক প্রেম হল দুর্বার। তার অমিত শক্তি। যে প্রেম বিল্বমঙ্গলকে অমর করেছে সার্থকতার মধ্যে দিয়ে, সেই প্রেমই আবার ব্যাহত হ'য়ে ওথেলোকে তাঁর প্রিয়তমা ডেসডিমোনা হত্যায় উদ্বুদ্ধ করেছে। এ প্রেম সমুদ্রের মত উদ্বেল, অশান্ত এবং সর্বগ্রাসী। নীতিনিষ্ঠ শরৎচন্দ্রের হাতে পড়ে সেই প্রেম দেবদাস-পার্বতীকে কেন্দ্র করে ছোট পম্বলে পরিণত হ'ল। সতীশ সাবিত্রীর প্রেম, শ্রীকান্ত-রাজলক্ষ্মীর প্রেম অতি পরিচিত গৃহস্থালীর সামাজিকতার বেড়াজালে বন্দী হয়ে ক্রমেই তাদের আবেদন হারিয়ে ফেলল। প্রেম আর প্রেম হিসেবে বেঁচে রইল না। প্রেমের স্বাভাবিক পরিণতি হয় মিলনে। প্রাচীন সংস্কৃত নাট্যসাহিত্য তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সেই মিলনটুকু সুন্দর ক'রে,

তার বৃত্তান্তটুকুকে রসঘন করে তোলা জাতশিল্পীর কাজ। শরৎচন্দ্র সেটুকু করতে পারেন নি। অথচ স্নেহকে ঘিরে গল্পকার শরৎচন্দ্র যে অনবদ্য কথা-সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন, তার তুলনা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। রামের সুমতিতে রামের জন্ম নারায়ণীর স্নেহ-ভালবাসা, আবেগ অনুভূতির যে অপার দিগন্তকে উদ্ঘাটিত করে দিয়েছে তার তুলনা কোথায়? হৃদয়াবেগের মধ্যে প্রেম প্রচণ্ডতম হয়েও যা করতে পারেনি সেই অসাধ্য সাধন করেছে স্নেহ। স্নেহ প্রেমের মত দুর্বার নয়, সর্বশক্তিমান নয়, তা'সত্ত্বেও স্নেহের জগতে শরৎচন্দ্র যে ব্যঞ্জনার প্রবর্তনা করেছেন, প্রেমের জগতে তা' তিনি করতে পারেননি। এর মূলে রয়েছে—Social taboo এবং ব্যক্তিগত জীবনে শুচিতার অভাবের জন্ম Psychological taboo; অতএব বলা চলে যে সামাজিক প্রেমের উপাখ্যান নিয়ে শরৎসাহিত্য ধীরে ধীরে বাংলাদেশের সাহিত্য-গগনে উদীয়মান হয়েছিল, তার পূর্ণ বিকাশ না ঘটার জন্ম শরৎ প্রতিভা দায়ী ছিল না, যারা দায়ী ছিল তাদের সম্বন্ধে গবেষণা করবেন আগামী যুগের সমাজতত্ত্ববিদ এবং মনস্তাত্ত্বিকের দল।
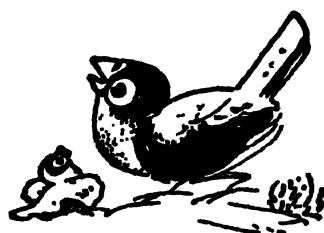
শিল্পী যামিনী রায়ের চিত্রকলা

শিল্পলোকের দিগন্ত অপসৃয়মান এবং তার সম্ভাবনাটুকু আদিম মানুষের আঁকা গুহাচিত্রের মধ্যেই বিধাতা পুরুষ প্রচ্ছন্ন রেখেছিলেন। মনুষ্যশিল্প দেবশিল্পকে অনুকরণ করতে চেয়েছিল, অনুকরণও করেছিল এবং সেই আদিম মনুষ্যশিল্পী তার ছবির প্রথম রেখার টানেই দেবশিল্পের অনুকৃতিতে উত্তীর্ণ হয়েছিল অনায়াসে। মহাদার্শনিক হেগেলের কথা উদ্ধৃত করে বলতে পারি যে প্রকৃতি যে সব মালমশলা দিয়ে সৃষ্টি সৃষ্টি খেলা খেলেছিল, তার মধ্যেই প্রচ্ছন্ন ছিল সুষ্ঠু সৃষ্টির পথে আত্যন্তিক বাধা। প্রকৃতির মধ্যে, তার সহজ শিল্পকর্মের মধ্যে, যেটুকু অপূর্ণতা থেকে গেল তা হচ্ছে তার উপকরণের অপূর্ণতা। সৃষ্টির হাল প্রকৃতি শক্ত হাতেই ধরেছিল কিন্তু তবুও তা লক্ষ্যে পৌঁছুলো না। ডাক পড়ল মনুষ্য শিল্পীর। বর্ণ বহুল বসন্তের ঐশ্বর্য সম্ভার থেকে শীত-রিক্ততায় সমাদৃত বৈরাগী প্রকৃতির অতুলনীয় বর্ণরিক্ততাটুকু শিল্পী প্রত্যক্ষ করলেন। মহৎ ঐশ্বর্য থেকে কেমন করে মহত্তর বৈরাগ্যটুকুকে আহরণ করা যায় তার মন্ত্রগুপ্তিটুকু শিল্পী শিখলেন প্রকৃতির কাছ থেকে। যে ঐশ্বর্য অতিগোচর তার মূল্যকে অস্বীকার করে তিনি দেখলেন সেই ঐশ্বর্যকে প্রচ্ছন্ন হলেও তা দিগন্ত প্রসারী ব্যঞ্জনায় বিসর্পিত। এই ব্যঞ্জনার তত্ত্বটুকু কবি সাগ্রহে গ্রহণ করলেন প্রকৃতির কাছ থেকে, পরিপাটি করে তাকে পরিবেশন করলেন আর এক পরিপ্রেক্ষণায়। বর্ণাঢ্য জটিলতা থেকে শুভ্র সারল্যের আবির্ভাব ঘটলো। দেবশিল্প থেকে মনুষ্য শিল্পের আবির্ভাব ঘটলো।

সমগ্র শিল্প বিবর্তনের ধারা-ইতিহাসটুকু আর একভাবে আমরা প্রত্যক্ষ করেছি শিল্পী যামিনী রায়ের শিল্পে। সেখানেও দেখেছি সেই বর্ণ-সুন্দর বার বার এসেছে যামিনী রায়ের চিত্রপটে; আবার তার ঘটেছে অন্তর্ধান; শুভ্র, রিক্ত, সুন্দর ও প্রতিষ্ঠা পেতে চেয়েছে ঐকান্তিক আগ্রহে যামিনী রায়ের চিত্রপটে। বর্ণ-সুন্দরের সঙ্গে তার দ্বন্দ্ব ঘটেছে, সংঘাত ঘটেছে। অবশেষে এই সহজ সুন্দরের, এই নিরাভরণ রিক্ত সুন্দরের জয় হয়েছে। তার নির্ঘোষ কান পেতে শুনেছি যামিনী রায়ের সমগ্র চিত্র জগৎ জুড়ে। দেশ বিদেশ থেকে শিল্পীকে যে বৈজয়ন্তীমালা দিয়ে অভিনন্দিত করা হয়েছে তা এই রিক্ত সুন্দরের বেদীমূলে সমর্পিত অর্ঘ্য।

বারো বছর বয়সে শিল্পী বাংলাদেশের নিভৃত পল্লীতে বসে আপন মনে যা

যামিনী রায়

খুশী তাই আঁকলেন। আঁকার ছন্দটুকু লীলায়িত, ছবি হ'ল স্বতঃস্ফূর্ত। অনেক ছবি এঁকে চলেছেন: সৃষ্টির প্রেরণায় প্রাণিত কিশোর শিল্পী। কী মহৎ ক্ষুধার আবেশে শিল্পী আবিষ্ট হয়েছিলেন তার কথা আমরা জানি না; হয়তো সেই ক্ষুধার সন্ধান পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ও বাল্মিকী। শিল্পীর আত্মানুসন্ধান চললো; প্রকাশের পথে তিনি নিজেকে সার্থক করতে চাইলেন। রূপের সন্ধানে, রসের সন্ধানে কবি আপন শক্তিকে রীতির বন্ধনে বাঁধতে চাইলেন। কিশোর শিল্পী কলকাতায় এসে গভর্ণমেণ্ট স্কুল অব আর্ট-এ ভর্তি হলেন ১৯০৪ সালে। যে রসের সন্ধানে কিশোর চিত্ত উন্মুখ তার সন্ধান মিলছিল না স্কুল অব আর্টসের চৌহদ্দির মধ্যে। তিনি বার বার তাই বিদ্যালয়ের খাতায় নাম লেখাচ্ছিলেন আবার নাম প্রত্যাহার করে নিচ্ছিলেন। তিনি শেষবার যখন স্কুলে যোগ দিলেন তখন অধ্যক্ষ ছিলেন ব্রাউন সাহেব। অধ্যক্ষ ব্রাউন একদিন আবিষ্কার করলেন যে কিশোর যামিনী রায় কাট বোর্ডে ছোট্ট একটি চৌকো গর্ত করে তার মধ্য দিয়ে নিরন্তর প্রবাহিত প্রকৃতির বন্ধনহীন রূপসাগরের লক্ষ কোটি ঊর্মিমালার কয়েটিকে ধরবার সাধনায় তন্ময় হয়ে গেছেন। অধ্যক্ষ বিস্মিত হয়ে প্রত্যক্ষ করলেন কিশোর শিল্পীর এই সিন্ধুর মধ্যে বিন্দুকে প্রত্যক্ষ করার সাধনা। রেখা এবং রঙের সীমানা টেনে যে ক্ষুদ্র শিল্পকর্ম শিল্পী সৃষ্টি করেন তারই অন্তরে যে ভূমার প্রতিষ্ঠা এই সত্যটুকু উপলব্ধি করেছিলেন সেদিন সেই কিশোর শিল্পী। সুস্পষ্ট রেখায় অনির্দেশ্য ব্যঞ্জনাকে ফুটিয়ে তোলার যে রীতি কিশোর শিল্পী সেদিন আয়ত্ত করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন তা হ'ল তার শিল্প বিবর্তনের মর্মকথা। শিল্প-তত্ত্বের পরিভাষায় বলা চলে যে কিশোর শিল্পী 'কম্পোজিশন'-এরদিকে আকৃষ্ট হয়েছেন এই যুগে। ছবি আঁকা চলল। স্কুলের চৌহদ্দির বাইরে বিরাট পৃথিবীর সৌন্দর্য, মাটির গন্ধ আন্দোলিত শীর্ষ নব দূর্বাদলের শিহরণ শিল্পী মুগ্ধ হয়ে দেখলেন। এই সৌন্দর্যের ঢেউ শিল্পী মনকে অনুকারের দিকে ধীরে ধীরে আকৃষ্ট করল। শিল্পী প্রতিকৃতি অঙ্কন বা পোর্ট্রেট পেইটিং-এর দিকে মন দিলেন। এই অনুকৃতির সাধনা চলল দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে। অনেক ছবি আঁকা হ'ল। শিল্পীমন অশান্ত হয়ে উঠল। তাঁর হাতে পশ্চিমী রীতিতে (Western technique) আঁকা প্রতিকৃতিগুলো বাঙ্ময় হয়ে উঠলো; কবি তাঁর স্টুডিয়োতে বসে নিভৃত আলাপচারী করেন তাঁর সৃষ্টির সঙ্গে। কিন্তু এ ভাষা তো তাঁর অন্তরের কথা বলে না; হৃদয়ের অপরিমেয় সম্পদকে উৎসারিত করে দেয় না।

ভাষার সন্ধানে শিল্পী মেতে উঠলেন ; যে ভাষা ঐকান্তিক ভাবে শিল্পীর মনের কথাটুকু ব্যক্ত করতে পারে ; সে মন যে ঐ বেলেতোড়ের মাটি থেকে তার আকাশ বাতাস থেকে, তার গাছপালা থেকে আপনার ঐশ্বর্যটুকু আহরণ করেছিল। সে মন মাটির ভাষা বোঝে, মাটির গানে ভরে ওঠে। তাই শিল্পীর সাধনা চললো সেই অনন্ত ভাষাটুকু খুঁজে পাবার জন্ত। অপরের ভাষায় শিল্পীর আত্মপ্রকাশ সম্ভব নয়। তাই তো তিনি Oriental School of Artsএ যোগ দিলেন না। ছবি আঁকা চললো, গ্রাম্যজীবনের ছবি, 'সাঁওতাল', 'মা ও ছেলে' প্রমুখ ছবি আঁকা হলো। ছবির উপজীব্য আমাদের অতি পরিচিত দৈনন্দিন জীবন-নাট্যের কুশীলবগণ।

যোগাযোগ ঘটল শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে। রূপের সন্ধানে ব্যাকুল যামিনী রায় শিল্পাচার্যের কাছে আপনার রূপ ব্যাকুলতাটুকু প্রকাশ করলে তিনি তাঁকে উপদেশ দিলেন : 'নন্দর কাছে শেখ'। শিল্পাচার্য ভুল বুঝলেন যামিনীবাবুকে। যামিনীবাবু আঙ্গিক শিক্ষার্থী নন ; তিনি শুদ্ধ মূর্তির সন্ধানে, রূপের সন্ধানে উৎসর্গীকৃত প্রাণ। সাধারণ অর্থে শেখা হয়তো শিল্প-শিক্ষার্থীর পক্ষে সম্ভব আর এই তত্ত্বটিই শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ তাঁর 'ভারত শিল্পের ষড়ঙ্গ' গ্রন্থে ব্যাখ্যাত করে বলেছেন যে রীতি-আঙ্গিক সম্বন্ধে অনুসৃতব্য বিধি-বিধান শিল্প-শিক্ষার্থীর জন্ত, শিল্পীর জন্য নয়। সেদিন হয়তো অসাবধানতাবশতঃ শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ যামিনী রায়ের মধ্যে সেই শিল্প-শিক্ষার্থীকেই দেখেছিলেন, শিল্পী হয়তো নেপথ্যে ছিল ; তাই তিনি তাঁকে যে উপদেশ দিলেন তা যামিনীবাবুর মনঃপূত হলো না। নিঃশব্দ সঙ্কোচে শিল্পী সরে এলেন শিল্পাচার্যের কাছ থেকে তাঁর নিভৃত নিকেতনের মাঝখানে। নিঃসঙ্গ সাধনায় দু'চোখ ভরে দেখা, হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করা গ্রাম্যজীবনের শান্ত সৌন্দর্য ফুটে উঠতে লাগলো একের পর এক ছবিতে। শিল্পরসিকেরা সেদিন এই নবীন শিল্পীকে সাগ্রহে লক্ষ্য করছিলেন। স্বীকৃতি পেতেও দেরী হলো না। ভাইসরয়ের স্বর্ণপদক শিল্পীর কণ্ঠে দুলিয়ে দিলেন সে যুগের কলারসিকেরা। স্বীকৃতির ধারাজলে স্নান করে ক্ষণিকের জন্ত তিনি স্বস্তি পেলেন।

শিল্পরীতির উদ্বর্তন চললো, পরীক্ষা-নিরীক্ষা লেগেই আছে। এবার যামিনীবাবু Flat technique-কে আশ্রয় করলেন, কতো কম রঙে এবং রেখায় ছবি আঁকা যায় তারই পরীক্ষা। কাব্যে যেমন অতিকথন দোষ কাব্যসৌন্দর্যে হানি ঘটায়, অঙ্কনকার্যেও তেমনি রং ও রেখার বাহুল্য ছবির

সৌন্দর্যহানি করে। ছবিতে আঁকা পাত্র-পাত্রীর অঙ্গশয্যা বা drapery কত কম রঙে এবং রেখায় সুব্যক্ত করা যায়—সেটুকু যামিনীবাবু তাঁর সুমিত আঙ্গিকে প্রত্যক্ষ করালেন রসিকসুজনকে। Oriental Art Society-তে চিত্র প্রদর্শনী হলো। নবু ঠাকুর খ্যাতনামা শিল্পরসিক গগনেন্দ্রনাথের পুত্র তিনি এই চিত্র প্রদর্শনীর উদ্যোক্তা, তাঁর আহ্বানে যামিনীবাবু আপনার কয়েকটি ছবি দিলেন এই প্রদর্শনীতে দেখানোর জন্যে। নতুন করে আবার যামিনীবাবুর শিল্প প্রতিভা স্বীকৃত হলো। মহাশিল্পী গগনেন্দ্রনাথ যামিনীবাবুকে আশীর্বাদ করলেন। Flat technique-এ আঁকা 'মা ও ছেলে' শীর্ষক ছবিখানি ছবিখানি গগনেন্দ্রনাথ ক্রয় করলেন। তিনি তখন বাক্‌শক্তি রহিত; তবু ছবির আবেদনে সাড়া তুললো শিল্পীর সত্তার অণুতে পরমাণুতে। প্রশংসার ভাষা নেই; যামিনীবাবুর আঁকা ছবির সামনে গগনেন্দ্রনাথ আত্মস্থ হয়ে গেলেন। তাঁর দু'চোখ দিয়ে আনন্দাশ্রু ঝরতে লাগলো। সে যুগের মহাশিল্পীর আশীর্বাদ অশ্রুধারায় সিঞ্চিত হয়ে ঝরে পড়লো এ যুগের মহাশিল্পীর মস্তকে।

শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ সাগ্রহে লক্ষ্য করছিলেন যামিনীবাবুর শিল্পরীতি উদ্বর্তন। Flat Technique-এ আঁকা ছবি দেখে তিনিও মুগ্ধ হয়েছিলেন। তাঁর যামিনীবাবুকে করা ছোট্ট প্রশ্ন ছিল: 'ততঃ কিম্?' এ প্রশ্ন যামিনীবাবুর অন্তরেরও প্রশ্ন। ১৯২৮ সাল; যামিনীবাবুর মানসলোকে আবার সেই অস্থিরতার ঝড়। এতদিন যা এঁকেছি, এতদিনের রূপকর্ম সবই 'এহবাহ্য'। নতুন আঙ্গিকে, নতুন ভাষায় আপনার মনের কথাটুকু বলতে হবে; পরিমিতি বোধটুকু আরও কৃশকায় করে তুলতে হবে। অর্থাৎ রং তুলির বাহুল্য কর্মকে বিদায় দিতে হবে ছবির জগৎ থেকে। শিল্পী মন দিলেন Line drawing-এ। রেখা, সন্নত রেখা, বিসর্পিত রেখা, সরল রেখা, বক্ররেখা—শুধু এই রেখা দিয়েই জীবনের সহজ ছন্দটিকে ফোটাতে হবে। সহজ ছন্দ অর্থাৎ Simplicity এবং Balance এই দু'টি শিল্পগুণকে সংযোজিত করতে হবে আপন শিল্পকর্মে। উপনিষদকার একে বলেছেন ছন্দ। এই ছন্দই মানুষের জীবনকে মানুষের শিল্পায়নকে এবং মানুষের জীবনায়নকে বিধৃত করে রেখেছে আনন্দের মধ্যে। এই ছন্দ বা Balanceএর সন্ধানে যখন শিল্পী বিভোর হয়ে আছেন। চার বছরের ছেলে অমিয় শ্লেটে একটি ছবি এঁকে পিতৃদেবকে দেখাতে আনলেন ছবিটা। অন্যমনস্কভাবে শিল্পী শ্লেটটি চোখের সামনে তুলে ধরলেন। হঠাৎ

চমকে উঠলেন তিনি। পুত্রের আঁকা সরল অনাড়ম্বর রূপের দিকে চেয়ে মন ভরে উঠলো; মন বললো পেয়ে গেছি। যে রূপ সর্ব ঐতিহ্যের বন্ধনমুক্ত, যে রূপ পূর্ণবয়স্ক মানুষের সংস্কারবদ্ধ নয় সেই রূপটুকু ফুটে উঠলো শিল্পীর মানসনেত্রে। একদিন যেমন মহাকবি ওয়ার্ডস্বার্থের চোখের সামনে সেই 'Craggy hill'-টা বিন্ধ্যাচলের মতই হঠাৎ মাথা তুলতে আরম্ভ করে দিয়েছিল ঠিক তেমনি করেই শিল্পী যামিনী রায়ের চোখের সামনে শিশুশিল্পী অমিয়ের আঁকা ছবিটা প্রাণস্পন্দে স্পন্দিত হয়ে উঠলো। তিনি বুঝলেন শিশুর মতো ঐতিহ্য বিরহিত রীতিতে সহজ করে ছবি আঁকতে হবে, ছবির উপজীব্য সেই গ্রাম্যজীবন। তবে পটুয়া শিল্পরীতি তাঁর জন্য কোন আবেদনই বহন করে আনলো না। সেই গ্রামীণ শিল্পরীতি কলুষিত এবং নানান্ ধরনের অশুভ প্রভাবে প্রভাবিত। আমরা একবারও যেন না ভাবি যে যামিনীবাবুর শিল্পরীতি গ্রামপটুয়ার শিল্প আঙ্গিকের সংস্কৃত সংস্করণ। যামিনীবাবুর শিশুপুত্র অমিয়ের শ্লেটে আঁকা ছবির উল্লেখ করলেম এই কারণে যে এই ছোট্ট ঘটনাটুকুর মধ্যে যামিনী রায়ের শিল্পকর্মকে বোঝবার উপযোগী অনুধাবন সূত্রটুকু লুকিয়ে রয়েছে। সুন্দরের প্রতি শিশুর যে সহজাত প্রবণতা (Pure instinct) রয়েছে সেই প্রবণতাটুকুই হবে শিল্পসৃষ্টির উৎস। প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের মানসিকতা বিমুক্ত একটি সহজ মনন সম্পদের অধিকারী হতে হবে শিল্পীকে। ছবির মধ্যে দিয়ে শিশুর রেখা, শিশুর কথা বলাকে অমেয় মাধুর্যে রূপায়িত করতে হবে। শিশুর দেখার মধ্যে যে বিস্ময়, শিশুর প্রকাশের মধ্যে যে আদিম মানুষের প্রকাশের আনন্দটুকু লুকিয়ে থাকে তাকেই উদ্ঘাটিত করতে চেয়েছেন শিল্পী যামিনী রায় আপন শিল্পকর্মে। তিনি উপলব্ধি করলেন শিশুর দেখায় তার উপলব্ধিতে যে রূপ প্রতিভাত হয়, শিশুর জিজ্ঞাসায় যে অনুসন্ধিৎসা প্রকাশিত হয় তা তো প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের কাছে অবহেলার বিষয় নয়। আত্যন্তিক মূল্যে শিশুর জানার জগৎ থেকে প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের জানার জগতের বিশেষ কোন প্রভেদ নেই। এই সত্যটি যেমন শিল্পী যামিনী রায় উপলব্ধি করলেন তেমনি করে এটির উপলব্ধি ঘটেছে আরও বহু কবি মনিষীর মনে। শিশুমনের সুগভীর জিজ্ঞাসার কথা মহাকবি রবীন্দ্রনাথের কাব্যে আমরা পড়েছি, পড়েছি Walt Whiteman-এর কবিতায়। তাঁর Grass শীর্ষক কবিতাটির কথা বলি:

'A child said what is the grass? Fetching it to me with full hands;
How could I answer the child? I do not know what it is any more that he?"

এই যে শিশুর জ্ঞানের সঙ্গে কবির জ্ঞানের বৃত্তবলয়ের সমীকরণ ঘটেছে তা কবিমনের অত্যুক্তি বিলাসের ফলশ্রুতি মাত্র নয়। জীবনের সত্যকে দর্শন করার এটি একটি বিশেষ ভঙ্গি। যে ভঙ্গিটি Walt Whitman-এর কাব্যে যেমন প্রত্যক্ষ করলেম তেমনি করেই তা প্রত্যক্ষ করেছি যামিনী রায়ের ছবিতে।

১৯৩০ সালের কথা। একদিকে শিল্পী সাধনা করে চলেছেন শিশুর অনাবিল ঐতিহ্যবিমুক্ত দৃষ্টিকোণ থেকে শিল্পের উপজীব্যকে দেখা এবং তাকে চিত্রকর্মে রূপায়িত করা; অন্যদিকে পরিশীলিত সুর সংস্কৃত আঙ্গিকে বর্ণবহুল ছবি আঁকা। গোপিনী, কৃষ্ণলীলা প্রমুখ ছবিতে এই পরিশীলিত আঙ্গিক বা Stylised form-এর দেখা মেলে। শিল্পী যামিনী রায়ের তৎকালীন সৃষ্টি গঙ্গা-যমুনা দ্বিধারায় বহমানা। শিল্পীর তখন সব্যসাচীর ভূমিকা। পরিশীলিত আঙ্গিকে আঁকা 'Krishna and the cow' গোপবালক প্রমুখ ছবি শিল্প-রসিকের প্রশংসাধন্য হ'ল। এই পরিশীলিত রীতির আঙ্গিকে, 'বিড়ালের মুখে মাছ', 'মা ও ছেলে' প্রমুখ ছবি আঁকা হল। এই রীতির স্রষ্টা হলেন প্রাপ্ত-বয়স্ক যামিনী রায়ের অন্তর্বাসী সেই শিশুশিল্পী নিভৃত সাধনার মধ্য দিয়ে শিল্পী যাকে ধীরে ধীরে জাগিয়ে তুলছিলেন। পরিণত যামিনী রায়ের শিল্পে আজ এই শিশুটির পূর্ণায়ত লীলাই আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। এই শিশু শিল্পীটিকে যামিনী রায়ের মনরাজ্যে একচ্ছত্র সম্রাট করে, স্বরাট প্রতিভা করে প্রতিষ্ঠিত করার সাধনা অতীব কঠোর এবং দুরূঢ়। এই কালের যামিনী রায় সেই দুরূহ সাধনায় ব্রতী হলেন। কোনদিকে লক্ষ্য নেই, উদ্‌ভ্রান্ত, রূপস্বাদনায় বিহ্বল প্রাণ। পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা বিপদের সংকেত করছে। শিল্পীর কোনদিকে খেয়াল নেই, নিজের পরণের ধুতি এবং স্ত্রীর পরণের শাড়ী কেটে কেটে ছবি আঁকা চলছে। সন্ধান, শুদ্ধ মূর্তির সন্ধান চলেছে অন্তরে অন্তরে। পারিপার্শ্বিক সম্পর্কে শিল্পী উদাসীন। অভাব, দারিদ্র্য, কৃচ্ছ্রসাধন কোনটাই শিল্পীর রূপের সন্ধানে বাধা সৃষ্টি করতে পারল না।

এলো দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। ১৯৩৯ সাল। শহীদ সুরাবর্দী, সুধীন দত্ত,

মৃণালিনী এমার্সন, অরুণ সিংহ ও বিষ্ণু দে প্রমুখ শিল্পরসিকেরা শিল্পীর একান্ত সাধনাকে সম্মানিত করলেন অভিনন্দিত করলেন তাঁর শিল্পকর্মকে। যামিনী রায়ের শিল্পের প্রসাদগুণেরই সন্দেশ সমুদ্রপারের বন্দরে বন্দরে পৌঁছে গেল। বিদেশী শিল্পী-রসিকেরা দেখা দিলেন শিল্পীর দ্বারে। শিল্পীর স্বীকৃতি দেশের সীমানা পেরিয়ে বিদেশে পৌঁছল। শিল্পীর অন্তরে এই স্বীকৃতির কোন মহৎ মূল্য ছিল না। তিনি তখন শুদ্ধ মূর্তির ধ্যানে তন্ময়। স্বল্পতম উপকরণে বৃহত্তম ব্যঞ্জনায় মহত্তম সৃষ্টি কেমন করে করা যায় তারই সম্ভাব্য কল্পনায় শিল্পী বিভোর।

১৯৪০ সাল; যীশুখ্রীষ্টের ছবি আঁকলেন শিল্পী। এই ছবি আঁকার পিছনে শিল্পীর একটা লোভ লুকিয়ে ছিল। ইউরোপীয় শিল্পীদের আঁকা নানান খ্রীষ্টমূর্তির সঙ্গে শিল্পীর পরিচয় ছিল। তাঁদের অঙ্কন রীতিতে যামিনীবাবু শিল্প ষড়ঙ্গের, গুণীজনগ্রাহ্য শিল্পরীতির ব্যত্যয় প্রত্যক্ষ করলেন; রূপের শুদ্ধমূর্তির নিদারুণ অভাব তিনি এই তথাকথিত ঐতিহ্যবিমণ্ডিত খ্রীষ্টের মূর্তির মধ্যে প্রত্যক্ষ করলেন। অলৌকিক বিষয় লৌকিক প্রথায় যখন শিল্পী প্রবর্তিত করেন তখন তা অশুদ্ধ হয়ে যায়। এই অশুদ্ধ শিল্প-কল্পনার উদাহরণ তিনি দেখলেন পশ্চিমদেশীয় শিল্পীদের সুন্দরী 'মেয়ের গায়ে পাখা লাগিয়ে পরীর রূপকল্পনায়'। তাঁর দেওয়া নূতন রূপে কোথাও লৌকিক রীতিকে ক্ষুণ্ণ না করেও অলৌকিক রূপের ব্যঞ্জনা তিনি দিলেন। 'Annunciation last Supper' প্রমুখ ছবি আঁকলেন শিল্পী। সেই শিল্পরীতিতে 'নিয়তিকৃত নিয়ম' কোথাও ব্যাহত হল না বটে কিন্তু তিনি অনায়াসে প্রকৃতির বিধিবদ্ধতাকে অতিক্রম করে গেলেন। শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ তাঁর 'বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী'তে শিল্পের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছিলেন যে শিল্প হ'ল 'নিয়তিকৃতনিয়মরহিত'। যামিনী রায়ের উপরোক্ত ছবিগুলিতে এই শিল্পতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা দেখলেম। তাঁর আঁকা 'Crucification', 'Mary and Christ' প্রমুখ ছবি রসোত্তীর্ণ হয়ে যে অসামান্যতা অর্জন করেছে তার মূলে রয়েছে সহজ রূপের সহজ সারল্য এবং বিশুদ্ধতা (Simplicity and purity); এক Dimensionএ আঁকা শিল্পীর এই ধরনের ছবিকে ঘিরে এমন একটা বিশুদ্ধ রূপের পবিত্রতা বিরাজ করছে যে সংবেদনশীল মনে এরা সহজেই গভীর শিল্পানুভূতিকে জাগিয়ে তোলে। শিল্পী যামিনী রায়ের আজীবন সাধনা হ'ল এই বিশুদ্ধ, ধৌত শুদ্ধ মূর্তিকে মূর্ত করার সাধনা। এই সাধনায় শিল্পী তাঁর Techniqueএর বারবার

পরিবর্তন ঘটিয়েছেন; কখনও অনেক রং লাগিয়ে আবার কখনো বা রূপান্বেষণের কৃচ্ছ্র সাধনায় রং-এর বৈচিত্র্যকে অনায়াসে ত্যাগ করেছেন। মন ভরেনি; রংকে ত্যাগ করে মনের অভাববোধ তীব্রতর হয়েছে। আবার রং-এর পুনঃসংযোজন ঘটেছে তাঁর ছবিতে। খ্রীষ্ট কাহিনীকে কেন্দ্র করে যে সব ছবি তিনি এঁকেছেন তার মধ্যেই এই সত্যটিকে আমরা অবলোকন করেছি। ক্রমে রূপ তার বর্ণ-বৈচিত্র্য, তার আকার-বৈচিত্র্য হারিয়েছে শিল্পীর হাতে। নিরাবিল, স্বচ্ছ, স্বয়ংসম্পূর্ণ যে রূপটি আপাত-দৃশ্যমান বস্তুর অন্তরে লুকিয়ে থাকে তাকে শিল্পী প্রমূর্ত করে তুললেন ডট অর্থাৎ ফুটকি দিয়ে দিয়ে ছবি এঁকে। রেখা অর্থাৎ লাইন তিনি বার বার ভেঙেছেন, এই লাইন ভাঙার কাজ যামিনী রায়ের হাতে প্রায় সম্পূর্ণ হল আল্‌পনা আঁকার মধ্যে। আল্‌পনা বাংলাদেশের অতি সনাতন শিল্প আল্‌পনা শিল্পীর হাতে ছবির রূপ নিল। Form সেখানে আভাসিত মাত্র, স্বল্প রেখার লীলায়িত ভঙ্গীতে ছবির সম্প্রকাশ। ঐতিহ্য-বিমণ্ডিত যে শিল্প উপজীব্যের ধারণা আমাদের মনে আছে তার সহজ সন্ধান এই আল্‌পনাধর্মী চিত্রকর্মে মেলে না। এই পথে যামিনীবাবু Abstract Form বা অরূপ রূপের যে সন্ধান করে চলেছেন তা আজ শিল্পীর নিরাকার রূপ কল্পনায় সার্থক হতে চলেছে। এ হল শিল্পীর শিল্পবিবর্তনের প্রায় শেষ পর্যায়ের ইতিহাস। জানি না শিল্পবিবর্তনের ধারায় এর পরেও কোন পর্যায়ের অস্তিত্ব আছে কি না। বোধ হয়, শান্ত সকালের তরঙ্গহীন পরিবেশে সমাহিত শিল্পীকে যখন তাঁর স্টুডিওর ঘাসে ঢাকা আঙিনায় ধ্যান-নিমগ্ন দেখি তখন তাঁর ধ্যানের কেন্দ্রবিন্দুটি এই নিরাকার রূপেই নিবিষ্ট হয়ে থাকে। শিল্পী এখানে শিশুমনের চরমতম সারল্যে অন্তরের অমেয় ঐশ্বর্য সম্ভারকে ছোট ছোট রেখা টেনে এবং রঙের ফোঁটা দিয়ে ব্যক্ত করতে চাইছেন। এ কথা অনস্বীকার্য যে এই পর্যায়ে আঁকা একটি ছবি ঘরে থাকলে দর্শকের মনে বিশুদ্ধ এবং পবিত্র ভাবের বান ডেকে যায়; দর্শক অভিভূত হয়ে পড়েন, আর এটি ঘটে বলেই যামিনী রায়ের শিল্প আজ বিশ্বসমাদৃত।

প্রবন্ধ শেষ করার আগে শিল্পী যামিনী রায়ের আজীবন চিত্র সাধনায় যে অসংখ্য ছবি লেখা হয়েছে তাদের ক্রম পর্যায়টুকু বোঝবার চেষ্টা করলে শিল্পীর চিত্রধর্মের পরিণতিটুকু বোঝবার পক্ষে সহায়ক হবে:

(ক) Flat Technique-এ আঁকা ছবি; স্বল্প রং ও পরিমিত রেখার

এদের প্রকাশ। 'বধূ', 'মা ও ছেলে' প্রমুখ ছবি এই পর্যায়ের। অবশ্য Flat Techniqueএ ছবি আঁকা শুরু হবার আগে যামিনীবাবু ইউরোপীয় রীতিতে অনেক ছবি এঁকেছেন; পোর্ট্রেট পেন্টিং-এ যামিনীবাবু যে সফলতা অর্জন করেছিলেন তার মূলে ছিল এই পশ্চিমী শিল্পাঙ্কন রীতি। এই বিদেশী অঙ্কন-রীতিকে পরিত্যাগ করে তিনি যখন নতুন গ্রাম্য শিল্পরীতিকে গ্রহণ করলেন বাংলাদেশের গ্রামের এবং তার মানুষের ঘরের কথা বলার জন্য তখন তাঁর শিল্পবিবর্তনের একটা নতুন অধ্যায়ের সূচনা হ'ল, শিল্পী নিজের ভাষায় কথা বললেন। আঁকা হ'ল বাংলাদেশের গ্রামের ছবি: 'সাঁওতাল', 'মা ও ছেলে' ও 'গ্রাম্যচাষী' প্রভৃতি ছবি। এই ধারায় যখন শিল্পকর্ম বেশ কিছুটা অগ্রসর হল তখনই শিল্পীর হাতে এলো পূর্বকথিত ফ্ল্যাট টেকনিক।

(গ) লাইন, ড্রয়িং-এর পর্যায়: কালো রেখায় সাদা কাগজের উপর ছবি আঁকা শুরু হ'ল। অদ্ভুত তার প্রসাদগুণ, দর্শকের মনে কালো রেখায় যে অসংখ্য দাগ কাটা হ'ল তা সহজে অবলুপ্ত হ'ল না। রসিকসুজন সাধুবাদ জানাল শিল্পীকে। এই প্রথায় তিনি আঁকলেন 'মা ও ছেলে', 'বধূ' ও অসংখ্য জন্তুজানোয়ারের ছবি।

(গ) এই পর্যায়টি সমন্বয়ের পর্যায়। প্রথম যুগে গ্রাম্য ছবি আঁকার রীতি, ফ্ল্যাট টেকনিক ও লাইন ড্রয়িং সমন্বিত হ'ল ও তাদের সাঙ্গীকরণ ঘটলো। 'চাষীর মুখ', 'মা ও ছেলে' প্রমুখ ছবি এই সমন্বিত আঙ্গিকে আঁকা হ'ল।

(ঘ) এর পরের পর্যায়েই হ'ল যামিনী রায়ের শিশু হবার সাধনা। পূর্ব পর্যায়ের সমন্বিত টেকনিক সব প্রচলিত রীতির লক্ষণ অতিক্রান্ত হয়ে গেল, সহজ সরল চিত্ররীতি। বড় হয়েও ছোট ছেলের ভূমিকা নিলেন শিল্পী। নতুন করে আঁকা হ'ল ছবি, জন্তুজানোয়ারের ছবি, শিকার ও নাচের ছবি।

(ঙ) আবার ঊর্ধ্বমুখী বিবর্তন। অতি সরল আঙ্গিকের রিক্ততায় শিল্পী বুঝি আনন্দ পেলেন না। তাই আবার ফিরে গেলেন বর্ণবাহুল্যে। আবার রেখা ও রঙের সমৃদ্ধি সংযোজিত হ'ল শিল্পীর ছবিতে। 'পূজারিণী মেয়ে', 'কীর্তন' এবং বাউল এই পর্যায়ের ছবির মধ্যে অগ্রগণ্য। চিত্রের বর্ণাঢ্যতায় শিল্পী আনন্দ রসঘন মূর্তির সৃষ্টি করেছে। শিল্পী আপন অমেয় আনন্দের অংশভাগী করেছেন রসিক সুজনকে কিন্তু এ আনন্দ শিল্পীমনে স্থায়ী হয় নি; এই বর্ণাঢ্যতা শিল্পীর আনন্দকে বেশীদিন সঞ্জীবিত করে রাখতে পারে নি। আবার তিনি তাঁর সে রূপ সন্ধানের বেদনায় ডুবে গেছেন। রূপকথার কথা ও কাহিনী,

রামায়ণ-মহাভারতের নানান গল্প তাঁর চিত্রকর্মে রূপায়িত হয়েছে। তাঁর আঁকা 'গণেশ জননী' এই পর্যায়ের উল্লেখযোগ্য চিত্র।

(চ) এর পরেই এলো শিল্পীর তুলিতে চিত্রের সুসংস্কৃত পরিশীলিত রূপ। বিদেশী শাস্ত্রশিল্পের পরিভাষায় একে বলা চলে 'Stylised Form'এর পর্যায়। এই ধরনের চিত্রকর্মে অলংকৃত রূপের ছড়াছড়ি: কৃষ্ণলীলার ছবি এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য।

(ছ) এই সংস্কৃত রূপের সৌখীনতা শিল্পীকে বেশীদিন আবিষ্ট করে রাখতে পারল না। চকচকে পালিশের জৌলুস, সোফিষ্টিকেশনের অচ্ছতা শিল্পীর অগ্রগতিকে ব্যাহত করতে পারল না। প্রাণবন্ত উদ্দাম রূপকল্পনা শিল্পীর তুলিতে বাসা বাঁধল। নন্দনতত্ত্বে একে বলা হয়েছে Bold and Rough Form। এই দৃপ্ত বেপরোয়া রূপকল্পনার সামনে দাঁড়িয়ে রসিকমন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো শিল্পীর প্রশংসায়। লাইন বা রেখার ভাঙচুর হ'ল, বলিষ্ঠ প্রাণের মহৎ উন্মাদনা প্রকাশ ঘটাতে গিয়ে শিল্পী রীতি সঙ্গত লাইন বা রেখার ভাঙচুর করলেন। তালপাতার চাটাই এর উপর শিল্পী ছবি আঁকলেন। 'কৃষ্ণ বলরাম' ছবির প্রাণসম্পদ এক বলিষ্ঠ দুর্বারতায় আমাদের মনকে আচ্ছন্ন করে দেয়।

(জ) এর পরের পর্যায়ে শুরু হ'ল ডট বা ফুটকি দিয়ে আঁকা। তালপাতার উপর আঁকা ছবিতে যে সজীবতা বা Boldness অতি প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছিল তা আরও দৃঢ় পিনদ্ধ হয়ে দেখা দিল এই ফুটকি দিয়ে আঁকা ছবিতে। আঙ্গিকের কৃশতা বিষয়বস্তুর দৃঢ়তাকে যে ভাবে প্রতিষ্ঠা করল তা বিস্ময়কর। 'ম্যাডোনা', বিড়াল ও চিংড়িমাছ ইত্যাদি ছবি এই পর্যায়ের শিল্পকৃতির স্বাক্ষর বহন করেছে।

(ঝ) অশান্ত শিল্পীর বিশ্রাম নেই। আবার আঙ্গিকের ভাঙচুর চলল। নতুন করে লোকগাথার আন্তর রূপটিকে শিল্পী খুঁজে পেতে চাইলেন। 'মহাদেব', 'কৃষ্ণলীলা', 'বাঘের পিঠে রাজা', প্রমুখ ছবি এবং রামায়ণের ছবি এই পর্যায়ে আঁকা হ'ল।

(ঞ) এই রীতির ভাঙার কাজ চলল। আধুনিকীকরণে নন্দনতত্ত্ব শিল্প-রীতিকে শিল্পকৃতির বহিরঙ্গ বলে চিহ্নিত করেছে এবং এই বহিরঙ্গটুকু শিল্প-পদবাচ্য নয়। প্রাচীন ভারতের রসশাস্ত্রে বলা হয়েছিল 'রীতিরাত্মাকাব্যস্য'; আর আধুনিক ইতালীয় নন্দনতত্ত্বে এই রীতিকে কাব্যবহির্ভূত বলা হয়েছে। যামিনী রায়ের শিল্পে, আশ্চর্যের কথা, এই আঙ্গিককে আশ্রয় করেই বার বার

শিল্প বিবর্তন ঘটেছে। ছবি এই পর্যায়ে শিল্পীর হাতে আলপনার রূপ নিল। Form কিছুটা থাকলেও ব্যঞ্জনাই সমগ্র ছবিটি জুড়ে বিরাজ করছে। Form শুধুমাত্র আভাসিত, শিল্পের বিষয়বস্তু বা উপজীব্য নেই বললেই চলে, ছবি তবুও স্বপ্রকাশ। কবি রবীন্দ্রনাথের সেই অরূপ বীণার চিত্রকল্পটি এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য : 'অরূপ বীণা রূপের আড়ালে লুকিয়ে বাজে।'

রূপকে প্রায় অবলুপ্ত করে দিয়ে যখন সেই অবলুপ্তির আড়ালে অরূপ বীণার ঝংকার ওঠে তখন সে ঝংকারে কোন রূপলক্ষণ নেই ; কোন বিশেষ নির্দেশে তাকে নির্দিষ্ট করা যায় না। নিরাবয়ব সেই রূপ বিমূর্ততার ইঙ্গিতটুকু করে। এটাই তার ধর্ম। বলতে পারি এই পর্যায়ে শিল্প লিরিকধর্মী হয়ে উঠেছে আপন ব্যঞ্জনার গভীরতায় ও বিস্তারে ; Epicএর অনাবশ্যক আড়ম্বর নেই শিল্প-রীতি ও ব্যবহৃত উপকরণে। বিমূর্ত রূপের শুদ্ধতা শিল্পীর কোন কোন ছবিতে অসম্ভব প্রাখর্যে পরিস্ফুট হয়েছে। এই যুগের অঙ্কনচিত্রে এমন একটি শুচি-শুভ্র ভাব থেকে গেছে যা মনে পবিত্রতার বন্যা বইয়ে দেয়। এখনও পর্যন্ত বলা চলে এই ধরনের ছবি শিল্পী যামিনী রায়ের শেষ পর্যায়ের ছবি।*

* প্রবন্ধটি শিল্পীর জীবদ্দশায় লেখা হয়েছে।

পঞ্চম স্তবক

নন্দনতাত্ত্বিক হিসেবে রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথের নন্দনতত্ত্ব

রবীন্দ্রকাব্যে রূপকল্প

অবনীন্দ্রনাথের শিল্পদর্শন

অবনীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যদর্শন

অবনীন্দ্রনাথের লীলাবাদ

অবনীন্দ্রনাথের শিল্পপ্রকরণতত্ত্ব

আনন্দ কেন্টিশ কুমার স্বামীর নন্দনতত্ত্ব : পর্যালোচনা

পঞ্চম স্তবক

নন্দনতাত্ত্বিক হিসেবে রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ

আমরা জানি যে ছবি দেখে মুগ্ধ হওয়া আর সেই ছবি সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট আদর্শ ও মানদণ্ডের প্রয়োগে তার সহজ মূল্যায়ন করা যে এক কথা নয়, এ সত্য স্বতঃসিদ্ধ ও সর্বজন স্বীকৃত। তাই নন্দনতাত্ত্বিক হিসেবে যখন কোন শিল্পীর মূল্যায়ন প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয় তখন আমরা যে তার দার্শনিক রূপটুকুর সন্ধান করি, একথা বলাই বাহুল্য। অর্থাৎ আমরা তাঁর শিল্পদর্শনের অনুসন্ধান করি। রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথের শিল্পদর্শনের গভীরে যাওয়া আয়াসসাধ্য কর্ম। শিল্পী মন স্বতঃই স্বজ্ঞা বা Intuitionকে আশ্রয় ক'রে 'দৃষ্ট সিদ্ধান্তে' উপনীত হয়েছে এবং শিল্পী সে সিদ্ধান্তটি উপস্থাপিত করেন কল্পনা ও দর্শনের সমন্বয়ে। তাই উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্যটা বড় বেশী ক'রে চোখে পড়ে।

পারিবারিক সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ ছিলেন খুড়ো এবং ভাইপো। উভয়েরই প্রতিভা ছিল বহুমুখী। লেখা এবং আঁকা—এ দুয়েতে দুজনেরই দখল ছিল অসাধারণ। অভিনয় নৈপুণ্যে, কারও কারও মতে অবনীন্দ্রনাথ ছিলেন রবীন্দ্রনাথের চেয়েও উঁচুতে। সে যাই হোক্ উভয়ের লেখায় এমন একটা প্রসাদগুণ ছিল যা অনন্যসাধারণ। প্রতিভার জাদু স্পর্শে উভয়ের লেখাতেই এসে লেগেছিল—'উড়ে চলার ভাও'। প্রতিভাকে বলা হয়েছে 'অপূর্ব বস্তুনির্মাণ ক্ষমা প্রজ্ঞা'—সে হ'ল সৃষ্টির পরশ পাথর। সেই পাথরের তীর্যক দ্যুতি যাকেই স্পর্শ করে, তা অমিত দ্যুতিতে দ্যুতিমান হ'য়ে ওঠে অচিরেই। কিন্তু গোয়ালার গলিতে পড়ে থাকা মরা বেড়ালের ছানার চোখেও আকাশের কনে দেখা আলোর রং যে এসে লাগে, তা এই প্রতিভার দাক্ষিণ্যেই সম্ভব নয়। গ্রামের অতিসাধারণ মেয়ে কাব্যলোকের ক্যামেলিয়ার রূপমাধুর্যে ভরপুর হয়ে ওঠে। এই প্রতিভা বাসা বেঁধেছিল রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথের অন্তরে। তাই অবনীন্দ্রনাথ মস্ত পটুয়া হয়েও অনন্যসাধারণ লেখক। তাই প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথ,. গল্পকার রবীন্দ্রনাথের মতই বড়। আবার গল্পকার অবনীন্দ্রনাথ ও প্রাবন্ধিক অবনীন্দ্রনাথের মতই শ্রদ্ধেয়। যাঁরা তাঁর 'বুড়ো আংলা', 'রাজকাহিনী' পড়েছেন এবং মনোযোগ সহকারে অনুধাবন করেছেন 'বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী', 'ভারত-শিল্পের ষড়ঙ্গ' ও

'ভারত-শিল্পে মূর্তি' গ্রন্থের বক্তব্য, তাঁরা নিশ্চয়ই এই কথা বলবেন যে গল্পকার ও প্রবন্ধকার হিসেবে অবনীন্দ্রনাথ অতুলনীয়। রবীন্দ্রনাথ যেমন তাঁর 'সাহিত্য', 'সাহিত্যের পথে', 'Personality', 'Religion of man', 'শান্তিনিকেতন' প্রমুখ সাহিত্য ও শিল্পবিষয়ক নানান্ লেখায় আপনার নন্দনতাত্ত্বিক বক্তব্যটুকু বিবৃত করেছেন, তেমনিধারা অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর 'বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী', 'ভারত-শিল্পের ষড়ঙ্গ' ও ভারত শিল্পে মূর্তি প্রমুখ গ্রন্থে আপনার শিল্পদর্শনটুকু ব্যাখ্যাত করেছেন।

আমাদের একথা মনে রাখতে হবে যে শিল্প ও শিল্পদর্শন এক নয়। যিনি বলবেন শিল্পের সার্থকতা তার রসাস্বাদনে, তিনি সত্য কথাই বলছেন। কিন্তু রসাস্বাদন করা ত' আর রসের তত্ত্ব বিচার নয়। আগেই বলেছি সুন্দরকে উপভোগ করা আর সুন্দরের মধ্যেকার চারিত্র্য-ধর্ম বিশ্লেষণ করা এক কথা নয়। অবশ্য সুন্দরকে উপভোগের মধ্যে হয়ত তার চারিত্র্যধর্মের সহজ মৌল বিশ্লেষণটুকু অনুস্যূত হ'য়ে থাকে। বুদ্ধির পরিশীলন বিবর্জিত যে উপভোগ সে উপভোগ পশুপক্ষীর ইন্দ্রিয়জ উপভোগের সমতুল্য। সে উপভোগ কবির বা শিল্পীর যোগ্য নয়। অনুক্ত বিশ্লেষণটুকু, অপ্রকট আন্তর অনুশীলনটুকু শিল্পীর বা শিল্পরসিকের উপভোগকে উচ্চগ্রামে বেঁধে দেয়। সংবেদন ও প্রত্যক্ষণের মধ্যে যে ভেদটুকু রয়েছে তা সৃষ্টি করেছে এই বুদ্ধির কারুকর্ম। সেই কারুকর্মটুকু নিঃশব্দে অগোচরে শিল্পীর বা শিল্পীরসিকের রসের উপভোগটুকুকে বাড়িয়ে তোলে। অন্ধ আবেগের বেগশীলতাকে বুদ্ধির হাল দিয়ে সংযত ক'রে রাখে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর একটি বিখ্যাত কবিতায় আমাদের বলেছেন যে নদীবক্ষে বোটের নিভৃত কক্ষে বসে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত আলো জ্বেলে তিনি যখন কাগজ-কলম নিয়ে সৌন্দর্যের তত্ত্ববিচার করবার চেষ্টা করছিলেন এবং কিছুতেই তার স্বরূপটুকু নির্ধারণ করতে পারছিলেন না, তখন তিনি হাল ছেড়ে দিয়ে আলো নিভিয়ে দিলেন। যেই না আলো নিভিয়ে দেওয়া অমনি জানালার বাইরে অপেক্ষমান চাঁদের আলো কবির বিছানায় ঝাঁপিয়ে পড়ে তার মুখে ও বুকে লুটিয়ে পড়ল; তিনি পুলকিত হলেন। এ পুলক কিন্তু রসবিচারের পুলক নয়, এ হ'ল রসোপলব্ধির আনন্দ। এ আনন্দে শিল্পী মেতে ওঠেন; শিল্পরসিকও আত্মহারা হয়ে পড়েন। রবীন্দ্রনাথ যেভাবে তত্ত্বটি পরিবেশন করলেন তাতে আমাদের মতে এই প্রসঙ্গে সত্যের সবটুকু পরিষ্কার ক'রে বলা হয় নি। এমন ধারণা পাঠক হয়ত করতে পারেন যে কবি এই কবিতাটিতে

কাব্যরসিকের সৌন্দর্যের রসবিচারের নিষ্কামতার কথাটুকুই জোর দিয়ে বলতে চেয়েছেন। সে পথে না গিয়ে শুধু রসোপভোগের পথেই বুঝি সুন্দরের চরিত্র-ধর্মটুকু উদ্ঘাটিত হ'য়ে ওঠে। আমরা এই প্রসঙ্গে শুধু বলব যে কবির সুন্দরের স্বরূপ বিশ্লেষণের আপাতঃ নিরর্থক প্রয়াসটাই তার সার্থক সৌন্দর্য-উপলব্ধির সহায়তা করেছে। ঐ যে অনেক রাত অবধি সৌন্দর্য বিশ্লেষণের প্রয়াসটুকু নিষ্ফল হ'ল বলে মনে হ'ল তা কিন্তু বস্তুতঃ নিষ্ফল হয় নি। ঐ প্রয়াসটুকুর আপাতঃ নিষ্ফলতা কবির মনে যে অভাববোধ সৃষ্টি করল, সুন্দরকে ধরার জন্য যে সাময়িক আকুতি সৃষ্টি করল তা কবিকে চন্দ্রলোকের স্নিগ্ধদ্যুতিতে অপরূপকে প্রত্যক্ষায়িত করার অবকাশ ছিল। কবি অঞ্জলি ভরে সেই সুন্দরের দানটুকুকে গ্রহণ করলেন এবং তা অমর হ'য়ে রইল কবির ঐ কবিতাটিতে। সে দান হ'ল আনন্দের সাগরে অবগাহন স্নান। ভরতমুনিকে অনুসরণ করে আনন্দবর্ধন ও অভিনব গুপ্তের অনুসারী হয়ে আনন্দকেই এঁরা উভয়ে 'ব্রহ্মাস্বাদ সহোদর' আখ্যা দিয়েছেন। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ উভয়েই বললেন যে শিল্পানন্দ ত' ব্রহ্মানন্দ, এরা উভয়েই একই কোটির।

শিল্প সৃজনে অথবা শিল্পের রসোপভোগে শিল্পী যেমন শিল্পের সঙ্গে একাত্ম হ'য়েও মরমিয়া সাধকের মতই কোন এক অনির্দেশ্য মন্ত্রগুপ্তির সুড়ঙ্গপথে আপনার শিল্পী সত্তাটুকুকে নিত্য উজ্জীবিত ক'রে রাখেন সবার ঊর্ধ্বে, ঠিক তেমনি ভক্তিমতী শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণকে সর্বস্ব সমর্পণ করেও আপনার নিগূঢ় সাত্ত্বিক সত্তাটিকে নিত্য সত্য ক'রে রেখেছিলেন শ্রীকৃষ্ণ প্রেমরসের আস্বাদন করার জন্য। সে রস হ'ল আনন্দ রস; সেই ব্যক্তিআস্বাদনসাপেক্ষ আনন্দ রসই হ'ল ভক্তি রস। ভক্ত সেই রসে অবগাহন স্নান করেন। তাই ত' ভক্তের আত্মস্বাতন্ত্র্যের মতই শিল্পীর শিল্পী-স্বাতন্ত্র্যটুকু রক্ষা করা একান্ত প্রয়োজন। এটুকু না করলে আমাদের আস্বাদন সম্ভব হয় না—না ভক্তের, না শিল্পীর। এই আনন্দেই সকল সৃষ্টি স্বপ্রতিষ্ঠ।

এই আনন্দই শিল্পসৃষ্টির উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও প্রেরণা। শিল্পী শিল্পসৃষ্টি করেন রসিক সুজনকে এই আনন্দটুকু দেবার জন্যে। একেই বলা হয়েছে রস। রবীন্দ্রনাথ এই রসের আধারকে নির্দিষ্ট করেছিলেন 'সুমিতি বোধের' দ্বারা চিহ্নিত ক'রে। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের মতে সব শিল্পকর্মই শিল্পীর সুমিতি বোধের দ্বারা চিহ্নিত। অবশ্য একথা মানতে হবে যে এই 'সুমিতি বোধের' কোন নির্দিষ্ট অর্থ নেই। কথাটা এই অর্থে বুঝতে হবে যে অর্থে দার্শনিক স্পিনোজা বলেছিলেন :

'All determination is negation'; সুমিতি বোধের অর্থটুকু সুনির্দিষ্ট ক'রে দিলে সৃষ্টির বিচিত্র সম্ভাবনাকে খর্ব করা হয়। যদি বলা হয় যে শেলীর 'Skylark' কবিতাটি 'সুমিতি-বোধের' প্রকৃষ্ট উদাহরণ তখনই প্রশ্ন হবে কীট্‌সের ঐ একই শিরোনামের কবিতাটিতে কী এই সুমিতি-বোধের অবভাস ঘটেছে। অর্থাৎ শেলীর স্কাইলর্কে সুমিতি-বোধ নামক দুর্লভ বস্তুটির সদ্ভাব ঘটলে কীট্‌সের ঐ নামের কবিতায় কী তার অসদ্ভাব ঘটেছে? অবশ্য সমালোচক বলবেন যে সব রসোত্তীর্ণ কাব্যেই কবির সুমিতি-বোধটুকু অনুস্যুত হ'য়ে যায়। তা না হ'লে কাব্য রসোত্তীর্ণ হয় না। একথা বললে 'সুমিতি-বোধ' তার সুনির্দিষ্ট অর্থ টুকু হারিয়ে ফেলে। আমরা 'সুমিতি-বোধে' বহুবিচিত্র এই অর্থের অধ্যাসটুকুকে সম্ভব করার জন্যই বলেছি যে শিল্প প্রসঙ্গে এর কোন নির্দিষ্ট অর্থ নেই। 'সুমিতি' কথাটির অর্থ সর্বকালেই পরিপূরক। অর্থাৎ শিল্পীর 'সুমিতিবোধটুকু' দর্শকের রসবোধের দ্বারা অভিসিঞ্চিত হ'য়ে সব সময়েই পূর্ণাঙ্গ হয়ে ওঠে। অবশ্য কিভাবে কোন্ পথে আমাদের এই চেনা জগৎটার অভিজ্ঞতা 'অপূর্ববস্তুনির্মাণক্ষমপ্রজ্ঞা' অর্থাৎ প্রতিভার স্পর্শ পেয়ে অপরূপ হয়ে ওঠে, তা বলা খুবই শক্ত, আর বেশ শক্ত বলেই রবীন্দ্রনাথ বললেন 'Art is Maya'; অধ্যাপক হুমায়ুন কবির তাঁর 'Poetry Monad & Society' গ্রন্থে দীর্ঘ আলোচনা ক'রে শিল্পের প্রকৃতি নিরূপক সংজ্ঞা দেওয়া অথবা তার ব্যাখ্যা করা যে কী দুরূহ তা সবিস্তারে বিবৃত করেছেন। শিল্পকে ব্রহ্মলাভের উপায় স্বরূপ জ্ঞান করেছেন এমন সমালোচকের অভাব নেই, আবার উৎপীড়িত মানুষের বিদ্রোহী সত্তার জাগরণটুকুকে ঠেকিয়ে রাখার জন্য শিল্পকে অহিফেন হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে এমন অভিযোগও আমরা শুনেছি অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ চিন্তানায়কদের কাছ থেকে। আপাতঃ-দৃষ্টিতে এ দুটি মতই গুরুত্বপূর্ণ। সুদীর্ঘ বিশ্লেষণান্তে এই দুই ভিন্নধর্মী মতের মূল্য যাচাই সম্ভব। অবনীন্দ্রনাথ বললেন তন্ত্রকে অনুসরণ করে: 'এ যেন পাখীর এক গাছ থেকে আর এক গাছে উড়ে চলা, আকাশ পথে তার চিহ্ন রইল না কোথাও।'

আনন্দের সন্ধান হল শিল্পীর সাধনার বস্তু। সেই আনন্দের সন্ধানকেই এঁরা উভয়েই রূপের সন্ধান বলে গ্রহণ করেছেন। অবনীন্দ্রনাথ বলেন যে শিল্পী যখন জানালার পাশে চুপ করে বসে আছেন বাইরের দিকে চোখ মেলে তখন তিনি মোটেই নিষ্ক্রিয় নন। তাঁর অন্তরে তখন রূপের সন্ধান চলেছে।

সেই সার্থক রূপ সৃষ্টিতে রূপের সত্যতা নিহিত থাকে। একথা উভয়েই বলেছেন। রবীন্দ্রনাথ একে বললেন রূপের truth ; অর্থাৎ শিল্পবস্তুর সত্যতা বাস্তব জগতের অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে না। আমরা যখন রামায়ণ পাঠ করি তখন আমরা সীতা, রাম, লক্ষ্মণ, ঊর্মিলার ঐতিহাসিকত্ব নিয়ে তত্ত্বালোচনা করি না। রসের আস্বাদনেই রামায়ণের সত্যতা। যুগ যুগ ধরে যে আনন্দে রসিক-চিত্ত স্নান পান করে ধন্য হয়েছে সেই আনন্দই হ'ল শিল্প সত্যের মাপের মাপকাঠি। সেই মানদণ্ডেই শিল্প উৎকর্ষের পরিমাপ হয়, আবার সেই মাপকাঠিতেই শিল্প ও তার সত্যেরও বিচার হয়। তাই ত' রবীন্দ্রনাথ বললেন: সেই সত্য যা রচিবে তুমি, ঘটে যা তা সব সত্য নহে। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের মতে শিল্প সত্য ও শিল্পরূপ সমার্থক। অবনীন্দ্রনাথও এই মতের পোষকতা করেছেন।

এই ধরনের অভিমত পোষণ করার ফলে রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ উভয়ের চোখেই শিল্পীর স্বাধীনতাটুকু বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল। 'ভারত শিল্পের ষড়ঙ্গ' গ্রন্থে অবনীন্দ্রনাথ বললেন যে ছবি আঁকার আইন-কানুন শিল্প-শিক্ষার্থীর জন্য, শিল্পীর জন্য নয়। শিল্পীর শিল্প হবে সব নিয়মের ঊর্ধ্বে ; শিল্প হবে 'নিয়তিকৃত নিয়ম রহিত'। প্রকৃতির কোন নিয়মেরই অন্ধ পুনরাবৃত্তি শিল্পের জগতে সঙ্ঘটন করানো বাঞ্ছনীয় নয়। আঁকা ছবির চাঁদটাও যদি রোহিণী ভরণী কৃত্তিকা সেবিতা আকাশের চন্দ্রদেবের মতই দেখতে হয় তবে আর লোকে ছবির চাঁদটার দিকে দেখবে কেন? বিশ্ববিধাতা যে উপকরণেই চাঁদটাকে গড়ে থাকুন না কেন ঐ উপকরণের স্থূল বাধাটা বিশ্ববিধাতার কল্পনা ব্যাহত করেছে। দার্শনিক হেগেলের ভাষায় শিল্প হ'ল 'Sensuous presentation of the Absolute' অর্থাৎ নির্বিশেষ মহাসত্তার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিশেষিত রূপটুকুই হ'ল শিল্প। এই রূপটুকু পার্থিব জড় জগতের জড় উপাদানে হয়ত ঠিক মত প্রকট হয়ে ওঠে না। তাই ত' শিল্পীর কল্পনা ও তুলি-রঙের, তার কথা ও কাব্যের প্রয়োজন হয় এই নির্বিশেষে মহৎ রূপটুকুকে বিশেষরূপে ফুটিয়ে তোলার জন্য। হেগেলের মতে এইখানেই শিল্প-সার্থকতা। আমাদের শিল্পশাস্ত্রেও মনুষ্যশিল্প ও দেবশিল্পের সাযুজ্যের কথা ঘোষিত হয়েছে ; সেই সাযুজ্য ও এই অর্থে। প্রকৃতির রূপকে যদি 'দেবশিল্প' বলি তা হ'লে বলব সে রূপ বাধিত রূপ। শিল্পীর হাতে প্রকৃতির যে নবতর রূপায়ণ ঘটে সে রূপ নির্বাধ, বাধাহীন। ছবির পাখীটা ঠিক ঐ গাছে বসা পাখীটার মত নাও হতে পারে। আর তা

হয় নি বলেই তাকে একেবারে নাকচ করা চলবে না। চিত্র প্রদর্শনীতে ছবি দেখতে গিয়ে যাঁরা প্রকৃতির নকলনবীশ হয়বোলাকে খোঁজেন তাঁরা শিল্পের রস থেকে বঞ্চিত হন। অবনীন্দ্রনাথ তাঁর 'সাদৃশ্য' শীর্ষক প্রবন্ধে বললেন যে প্রকৃতির সঙ্গে শিল্পের সাদৃশ্য হবে ভাব-সাদৃশ্য। এই ভাব সাদৃশ্যের তত্ত্বটুকু শিল্পকে প্রকৃতির অনুলিপি বা প্রতিরূপ হতে বলে না। রবীন্দ্রনাথ ও শিল্পে অনুকৃতি তত্ত্বের বিরোধী। এঁরা উভয়েই এই প্রসঙ্গে গ্রীক দার্শনিক আরিস্ততলের সমগোত্রীয়; রবীন্দ্রনাথ যেমন 'সাহিত্য' ও 'সাহিত্যের পথে' গ্রন্থে প্রকৃতির এই অনুকৃতি তত্ত্বের বিরুদ্ধে বললেন তেমনি ধারা অবনীন্দ্রনাথও বললেন সেই কথাই তাঁর 'বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী' গ্রন্থে। শিল্প যদি অনুকৃতি মাত্র হ'ত তাহলে ফোটোগ্রাফি এবং হয়বোলার বুলি সব থেকে বড় শিল্প বলে পরিগণিত হ'ত। তবে তা ত' কোথাও শিল্প শাস্ত্রের বিচারে হয় নি। রবীন্দ্রনাথ বার বার করে বললেন আমরা যেন শিল্পকে প্রয়োজনের বেড়াজালে না বাঁধি। শিল্প হয়েছে অপ্রয়োজনের প্রয়োজনে; দার্শনিক কান্টের ভাষায় শিল্প সৃষ্টির উদ্দেশ্য হ'ল 'Purposiveness without a purpose', অর্থাৎ শিল্পীর শিল্প সৃষ্টির উদ্দেশ্য হল সর্ববাধাহীন এবং যে কোন বিশেষ জাগতিক উদ্দেশ্য বিরহিত। শিল্পের বিচারে শিল্পের প্রকৃতি বহির্ভূত কোন নিমিত্তকারণ অথবা উপাদান কারণের সার্বভৌম স্বীকৃতি প্রকৃত রসিকসুজনেরা কখনই দেন না। যদি শিল্পীর শিল্পেতর কোন প্রয়োজন শিল্প-জননীর ভূমিকায় আবির্ভূত হয় তবে তা শিল্পের স্বচ্ছতাকে ক্ষুণ্ণ ও খর্ব করে। একদিক যেমন এর সাথে শিল্প-চারিত্র্য ক্ষুণ্ণ হয়, অন্যদিকে আবার তা শিল্পীর স্বাধীনতাকেও ক্ষুণ্ণ করে। হেমলিনের বংশীবাদক কোন মহৎ সঙ্গীত সৃষ্টি করে নি কেননা তার উদ্দেশ্য ছিল শিশুপাল হরণ ক'রে হেমলিনের অসাধু পৌর-পিতাদের শাস্তি দেওয়া। সেখানে সঙ্গীতের চেয়ে শাস্তিটাই বড় হয়ে উঠেছে। যেখানে এটা ঘটে, সেখানে শিল্পটা গৌণ হয়ে পড়ে; শিল্পেতর উদ্দেশ্যটা বিন্ধ্য পর্বতের মত মাথা তুলে শিল্পানন্দের সূর্যালোকের পথটাকে অবরুদ্ধ করে দেয়। তখন আর রবীন্দ্রনাথের কথায় শুধু 'অকারণ পুলকে' কবি-মন ক্ষণিক দিনের আলোকে ক্ষণিকের গান গেয়ে ওঠে না। কবি কল্পনা অন্য কারণের গুরুভারে ভারাক্রান্ত হয়ে তার উড়ে চলার ভাণ্ডটুকু হারিয়ে ফেলে। অবশ্য এই প্রয়োজনের কথা প্রসঙ্গে আমাদের মনে রাখা দরকার যে প্রয়োজনেরও শ্রেণীবিভাগ আছে। শিল্পের প্রসঙ্গে প্রয়োজনকে

আমরা আন্তর প্রয়োজন ও বহিঃপ্রয়োজন এই দুটি ভাগে ভাগ করতে পারি। বাইরের জীবনের ও জগতের প্রয়োজনে শিল্প সৃষ্টি হয় না। শিল্প জন্ম নেয় শিল্পীর আন্তর প্রয়োজনে। সেই প্রয়োজনের তাগিদটুকু হল সর্বনাশা, সেই তাগিদে সৃষ্টিশীল হয়ে শিল্পী 'সৃষ্টি সুখের উল্লাসে' মেতে ওঠেন। কিন্তু এই আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে ওঠার পূর্ব অবস্থাটুকু আন্তর প্রয়োজনের উন্মাদনার দ্বারা চিহ্নিত। জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত শিল্পীমনের আন্তর প্রয়োজনটুকুকে উদ্দীপ্ত ক'রে তোলে, সে প্রয়োজন হ'ল সৃষ্টি করার প্রয়োজন। সৃষ্টি করার কাজটুকু সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত শিল্পী শান্তি পায় না। শিল্পীর এই অশান্ত মনের ছবি এঁকেছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ভাষা ও ছন্দ' শীর্ষক কবিতায়। ক্রৌঞ্চ মিথুনের একটির শোকাবহ মৃত্যুতে মর্মান্তিকভাবে বিচলিত হয়েছেন মহাকবি বাল্মীকি; সমবেদনার অশ্রু উথাল পাথাল করেছে তাঁর সবটুকু অন্তর জুড়ে। অব্যক্ত বেদনা প্রকাশের জন্য মাথা কুটে মরছে হৃদয়ের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে; এই প্রকাশের প্রয়োজনটুকু হ'ল শিল্পীর আন্তর প্রয়োজন। সেই আন্তর প্রয়োজনের তড়িতাহত হয়ে মহাকবি বাল্মীকি তমশা নদীর তীরে উদ্‌ভ্রান্তের মত পায়চারি করছেন। রবীন্দ্রনাথ মহাকবি বাল্মীকির সৃষ্টি উন্মুখর সেই ছবিটি আঁকলেন:

"রক্তবেগ তরঙ্গিত বুকে,
গম্ভীর জলদমন্দ্রে বারংবার আবর্তিয়া মুখে
নব ছন্দ; বেদনায় অন্তর করিয়া বিদারিত,
মুহূর্তে নিল যে জন্ম পরিপূর্ণ বাণীর সঙ্গীত,
তারে লয়ে কি করিবে ভাবে মুনি, কি তার উদ্দেশ?"

যে আন্তর প্রয়োজনে শিল্প সৃষ্টি হয় সে প্রয়োজনটুকু হ'ল শিল্পীর আত্মার আত্মীয়। শিল্পী কল্পনার প্রসাদ গুণে, সামীপ্য এবং সাযুজ্যবোধের সজীবতায় যে কোন প্রয়োজনকেই আপন আন্তর প্রয়োজনের রূপটুকু দিতে পারেন, একথা আমরা বিশ্বাস করি। রবীন্দ্রনাথের 'মহুয়া' কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুচ্ছ আমাদের এই বিশ্বাসকে সুদৃঢ় ভিত্তিভূমিতে প্রতিষ্ঠা করেছে। বাইরের প্রয়োজনের এবং অনুরোধের তাগিদে এই কবিতাগুলির জন্ম হ'লেও এদের অধিকাংশই রসোত্তীর্ণ হয়েছে। বাইরের জীবনের প্রয়োজনটুকু কবি আন্তর প্রয়োজন হিসেবে গ্রহণ করেছেন নিষ্ঠার সঙ্গে, আর সে নিষ্ঠাই কবি-কল্পনায় মন্ত্রশক্তির কাজ করেছে। তাই এক্ষেত্রে আন্তর প্রয়োজন ও বহিঃপ্রয়োজন,

এই দুয়ের ভেদটুকু ঘুচে গেছে। যেখানে এই দ্বিবিধ প্রয়োজনের ভেদ ঘুচে যায়, সেখানে শিল্প এক বৃহত্তর অর্থে 'নৈতিক' হয়ে উঠতে পারে। বস্তুতঃ পক্ষে শিল্পজীবনের Response হিসেবে শিল্পীর সমগ্র ব্যক্তিত্বটুকু তার বাস্তব বিস্তার ও সম্ভাব্য প্রসারটুকুকেও ব্যঞ্জিত করে। শিল্পীর ব্যক্তিত্ব, তার ব্যক্তি-মানস আবার সমকালীন সমাজের দ্বারা উজ্জীবিত ও প্রাণিত হয়। তাই দার্শনিক-প্রবর ক্রোচে তাঁর শেষ জীবনের লেখায় শিল্পে এই নৈতিক রূপটুকুকে প্রত্যক্ষ করলেন। শিল্পী বা শিল্প সমালোচক নীতিবাগিশ না হ'লেও আধুনিক নন্দনতত্ত্ববিদদের দৃষ্টিতে তাঁর 'নৈতিক' হ'তে কোন বাধা নেই। নব্যতন্ত্রী কেমব্রিজ সমালোচনা ধারার বাহক F. R. Leavis-এর কথা আমরা এই প্রসঙ্গে স্মরণ করতে পারি। ফ্রেজার (G. S. Fraser) লিভিস প্রসঙ্গে বললেন যে তাঁর মধ্যে নীতিপ্রবণ যে সমালোচকপ্রবর রয়েছেন তার উপস্থিতি আধুনিক ইংরেজী সমালোচনা সাহিত্যে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। অর্থাৎ লিভিস যেভাবে শিল্পের চৌহদ্দিতে নীতি প্রবণতাকে প্রবেশাধিকার দিয়েছেন তা রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথের মৌল শিল্প দর্শনের অনুসারী। সেখানে এঁরা উভয়েই তাঁদের পরবর্তী যুগকে প্রতিফলিত করেছেন আপন আপন শিল্প-চিন্তায় ও শিল্পদর্শনে, একথা বললে অত্যুক্তি হ'বে না।

অবনীন্দ্রনাথের শিল্পচিন্তায় যখনই তিনি অন্তর্গূঢ় ভাবনার প্রবর্তনা করেছেন তখনও দেখি তিনি রবীন্দ্রনাথের কথা উদ্ধৃত ক'রে নিজের সূক্ষ্ম ভাবনাটিকে বিস্তারিত ও প্রাঞ্জল করার প্রয়াস পেয়েছেন। শিল্প সৃষ্টির কথায় আসি। খোলা চোখে দেখাটা যে দর্শন কার্যের সবটুকু নয়, এ সত্যটির দিকে সমালোচকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন এই প্রসঙ্গে।

[রবীন্দ্রনাথ অঙ্কিত]

বিশ্বভারতীর সৌজন্যে

কবি রবীন্দ্রনাথ দার্শনিক হিসেবেও প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন[১]। তাঁর মত মহৎ শিল্পীর শিল্পদর্শন প্রণিধানযোগ্য। রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির বিভিন্ন পর্যায় পর্যালোচনা ক'রে এ কথাই আমাদের মনে হয়েছে যে কবি রবীন্দ্রনাথ এবং দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ যদি কোন দূরাশ্রিত সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হ'ন তবে সে সম্বন্ধটা হ'ল বিরোধের সম্বন্ধ। কবি এবং দার্শনিক রবীন্দ্রনাথের মধ্যে মিলে মিশে এক হয়ে যায় নি। দার্শনিক যা বলেছে কবি তা বলে নি; দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ যে তত্ত্বকথা আমাদের শুনিয়েছেন কবি রবীন্দ্রনাথ তার বিরোধী বার্তা আমাদের পরিবেশন করেছেন। তাই আমরা সম্প্রতিককালে প্রচারিত রবীন্দ্রনাথের মধ্যে কবি এবং দার্শনিকের সমন্বয় তত্ত্ব[২] গ্রহণ করতে পারলাম না। এই যে কবি দার্শনিকের বিরোধ রবীন্দ্রনাথের মধ্যে সুপ্রত্যক্ষ, এর মূলে রয়েছে জীবন ও জগতকে নৈর্ব্যক্তিক ও প্রত্যক্ পথে বিচার পদ্ধতির সঙ্গে ভক্তিবাদীদের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার পদ্ধতির সমন্বয় প্রচেষ্টা।[৩] এই সমন্বয় ঘটেনি; সমন্বয় ঘটাতে গিয়ে বার বার রবীন্দ্রনাথ আপনার ভিতরকার কবির সঙ্গে দার্শনিকের মতবিরোধটুকু দেখবার সুযোগ বোদ্ধা পাঠককে দিয়েছেন। কবির যে বিশ্বাস তাঁর সমগ্র জীবনদর্শনের অন্তর্ভূক্ত তার প্রকাশ যে শিল্পে ঘটবেই, এটা আবশ্যিক সত্য নয়। শিল্পে কবির অনুভূতির নির্ব্যক্তীকরণ ঘটে। শিল্প হ'ল আত্মঅনুভূতিকে আত্মস্বতন্ত্ররূপে প্রত্যক্ষ করা। সেখানে ধ্যান-ধারণা, বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্নটা অবান্তর, অতিরিক্ত। কাজে কাজেই কবি এবং দার্শনিকের মতবিরোধ রবীন্দ্রনাথের মধ্যে প্রত্যক্ষ করা গেলে তার দ্বারা কবি রবীন্দ্রনাথ ও দার্শনিক রবীন্দ্রনাথের মর্যাদাহানি ঘটে না। কবি রবীন্দ্রনাথ বিশ্বজয়ী। রবীন্দ্রনাথের শিল্পদর্শনও বহুজন প্রশংসিত। সমালোচক রবীন্দ্রনাথকে সাধুবাদ জানিয়েছেন বাংলা সাহিত্যের সমালোচক অগ্রগণ্য প্রমথ চৌধুরী মহাশয়। গ্যেটে, কোলরিজ, ওয়ার্ডস্বার্থ এবং শেলীর সমানধর্মা সমালোচক ব'লে চৌধুরী মহাশয় রবীন্দ্রনাথকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।[৪] সে অভিনন্দন অতিকথন বা

১। সুধীর কুমার নন্দীর 'রবীন্দ্র-দর্শন অন্বীক্ষণ' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

২। 'শিল্পলিপি' গ্রন্থে ডঃ শশীভূষণ দাশগুপ্তের আলোচনা দ্রষ্টব্য।

৩। শ্রীপ্রমথনাথ বিশী প্রণীত 'রবীন্দ্রকাব্য প্রবাহ' গ্রন্থের পৃঃ ৪৮ দ্রষ্টব্য।

৪। 'রবীন্দ্র কাব্য-প্রবাহের' ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

অনৃতভাষণ দোষে দুষ্ট নয়। কবি রবীনাথ ও দার্শনিক রবীন্দ্রনাথের মিল না ঘটলেও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে কবির সঙ্গে মিষ্টিকের মালাবদল ঘটেছিল। রবীন্দ্রনাথের দর্শন সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে ডক্টর রাধাকৃষ্ণন[১] রবীন্দ্রনাথের মধ্যে কবি এবং মিষ্টিকের এই মিল প্রত্যক্ষ করেছেন। কবির ভগবান তাঁর সঙ্গে মিলিত হবার জন্য সপ্তস্বর্গের অত্যুচ্চ শিখরলোক থেকে নেমে আসেন; দেবতা কবির দ্বারে বারবার প্রার্থী হয়ে আসেন। কবি পরম নির্ভরতার সঙ্গে বলেন তাঁর দেবতাকে, 'আমার মিলন লাগি' তুমি আসছ কবে থেকে। মিষ্টিক রবীন্দ্রনাথ যে দর্শনে বিশ্বাস করেছেন তা হ'ল ব্যক্তিনির্ভর (Subjective) দর্শন। এই দর্শনমত উপনিষদ থেকে তার প্রাণরস আহরণ করেছে।

নন্দনতত্ত্বের ক্ষেত্রেও কবিগুরু এই ব্যক্তিনির্ভর দর্শনমতের প্রচার করেছেন। সুন্দরের লীলা আমার জন্য; আমি সে লীলায় আনন্দিত হই। আমার চেতনায় সুন্দর সত্য এবং শাশ্বত। গোলাপে মানুষ যে সৌন্দর্য প্রত্যক্ষ করে, তা গোলাপ ফুলে নেই; তা আছে মানুষের অনুভূতিতে। সুন্দরের এই ব্যক্তি-সাপেক্ষ অস্তিত্ব সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে একমত হয়েছেন এ যুগের অন্যতম বিজ্ঞানী-প্রধান আইনস্টাইন। তবে রবীন্দ্রনাথ সত্যকেও যখন ব্যক্তি-সাপেক্ষ বললেন তখন আইনস্টাইন তাঁর মতের বিরোধিতা ক'রে বললেন যে সত্য ব্যক্তিনির্ভর নয়। আইনস্টাইন বললেন যে সত্যের এই ব্যক্তি বা জ্ঞাতা-অনির্ভর সত্তাটুকু তিনি প্রমাণ করতে পারবেন না। তবে এ বিশ্বাসটুকু তাঁর ধর্ম।[২] সুন্দরের এই ব্যক্তি-সাপেক্ষ সত্তায় আস্থাবান হ'লেও শিল্পের অসংজ্ঞেয় প্রকৃতির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কবিকে বহুবারই স্ববিরোধী উক্তি করতে হয়েছে। শিল্পের এই দুর্জ্ঞেয় প্রকৃতির কথা ভেবেই রবীন্দ্রনাথ বললেন যে শিল্প হ'ল মায়া। দ্বৈতবাদী মায়াকে ব্রহ্মের শক্তি ব'লে গণ্য করেছেন। তাই তাঁর কাছে জগৎ মিথ্যা নয়।

রবীন্দ্রনাথের মতে শিল্প হ'ল মানুষের আত্মিক শক্তির বিকাশ। তিনি শিল্পকে 'মায়া' বলেছেন শিল্পের অসংজ্ঞেয় স্বভাবটুকু নির্দেশ করার জন্য। শিল্পকে মিথ্যা বলা তাঁর অনভিপ্রেত। যা মানুষের আত্মিক শক্তির স্পর্শধন্য তা কখনই

১। তাঁর 'Phiosophy of Rabindranath Tagore' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

(২) "I cannot prove that my conception is right but that is my religion." (রবীন্দ্রনাথের Religion of Man গ্রন্থের Appendix দ্রষ্টব্য)

মিথ্যা হ'তে পারে না। ভারতীয় শিল্পের উদার গাম্ভীর্য শিল্পীর আত্মিকশক্তির স্পর্শধন্য বলেই তার আবেদন যুগ থেকে যুগান্তরেও সত্য হয়ে রয়েছে। 'Religon of Man' গ্রন্থে কবি শিল্পীর এই শিল্পকর্মের ব্যাখ্যাদান প্রসঙ্গে বললেন, "পূর্ব গোলার্ধের বিস্তৃত অংশ জুড়ে যে বিরাট সৃষ্টি প্রচেষ্টা পাথরের গায়ে অপরূপ সৌন্দর্য সৃষ্টি করল হাজারো বাধা বিপত্তি অতিক্রম ক'রে তা 'শিল্প কী' এই প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে। শিল্প হ'ল মহাসত্তার আহ্বানে মানুষের সৃষ্টিশীল মনের প্রত্যুত্তর। অতএব শিল্প বা আর্ট হ'ল মানুষের সৃষ্টিশীল আত্মার প্রকাশ। এই শিল্পকে তা হ'লে প্রকৃতির অনুকৃতি বলা চলে না। প্রকৃতির রূপ আর শিল্পের রূপে পার্থক্য বিদ্যমান। তাই রাধাকৃষ্ণণ রবীন্দ্রনাথের শিল্প-দর্শন আলোচনা করতে গিয়ে প্রকৃতিধর্মী কাব্য এবং যথার্থ কাব্যে প্রভেদ করলেন। কাব্য হ'ল প্রকৃতির আদর্শায়িত রূপ। শিল্পকে প্রকৃতির 'আদর্শায়িত রূপ' বললে প্লেতো কথিত শিল্পের বিরুদ্ধে 'অনুকৃতির' অভিযোগ আর টেঁকে না।

রবীন্দ্রনাথের মতে শিল্প হ'ল প্রকাশ। শিল্পী জীবনের দুঃখ-সুখ, আনন্দ বেদনাকে আত্মস্থ ক'রে তার বর্ণ-বৈচিত্র্যে আপন সৃষ্টিকে উজ্জ্বল এবং বর্ণময় ক'রে তোলে। চারপাশের আলো-হাসি-দুঃখ-অন্ধকার ভরা পরিবেশ শিল্পী মানসকে উদ্দীপিত করে, কবির অনুভূতিলোকে আলোড়ন জাগে; এই আলোড়নের পরিশোধিত অস্পষ্ট প্রতিধ্বনি শিল্পকে প্রাণ দেয়। আপন অন্তর লোকের নিভৃত নিকেতনে শিল্পী একক অসঙ্গ।[১] সেখানে গোপনে গোপনে শিল্পীমনের কারখানায় কত না রূপ পরিগ্রহ করছে বাইরের প্রকৃতি থেকে আনা শিল্পের বিষয়বস্তু। তারা যখন শিল্পীর মনের প্রাঙ্গণ পার হ'য়ে বার-মহলের দরবারখানায় বিচিত্র বেশে আবির্ভূত হয় তখন তাদের যে রূপ সে রূপ প্রকৃতিতে অলভ্য ছিল। এই রূপটুকু শিল্পীর দেওয়া। শিল্পীর দেওয়া এই রূপের আলোতেই শিল্পজগৎ উদ্ভাসিত। যে বিষয়বস্তুকে শিল্পী রূপ দিল সেটা কিছুই নয়, এমন কথা কোন কোন দার্শনিক বললেন।[২] কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বললেন যে, রূপের আলোটুকু যেমন সত্য, রূপ যে বিষয়বস্তুকে আশ্রয় করে তাও তেমনই সত্য। তবে শিল্পরূপ হ'ল মুখ্য এবং শিল্পের বিষয়বস্তু হ'ল গৌণ। তিনি কবি কীটসের 'Beauty is Truth' এই খণ্ড পংক্তিটি উদ্ধৃত ক'রে বললেন যে শিল্পের

১। সাহিত্যের স্বরূপ পৃঃ ৬১।
২। উদাহরণ স্বরূপ ক্রোচের নাম করা যেতে পারে।

সত্য হ'ল রূপাশ্রয়ী ; এ সত্য রূপের উৎস ;[১] বস্তুগত বা বাস্তব সত্য সুন্দর নয়। বাস্তব যখন শিল্পীর দেওয়া সাজ-পোশাক প'রে আসে, তখন তাকে আমরা সুন্দর বলব। এই রূপের মাধ্যমেই শিল্পী মানসে তার পারিপার্শ্বিক কী ভাবে প্রতিক্রিয়া করছে তা আমরা বুঝতে পারি। যাঁর রসবোধ যত উচ্চগ্রামে বাঁধা তাঁর মানস প্রতিক্রিয়া তত বিচিত্র, তত বর্ণবহুল হবে। তাঁর দেওয়া রূপ ততই ঐশ্বর্যবান, ততই সুন্দর হবে। একই সূর্যোদয় হাজারো শিল্পীকে হাজারো বর্ণের সৃষ্টিতে অনুপ্রাণিত করেছে। শিল্পের বিষয়বস্তু এক হ'লেও বিভিন্ন রূপের জন্য বিভিন্ন সৃষ্টি নানান্ রকম মূল্যে বিকোয়। শিল্পরসিকের কাছে রূপটাই সত্য। তাই তার চোখে বিষয়বস্তুর ঐক্যটাই বড় নয়। রূপগত বিভেদটাই বড়। রবীন্দ্রনাথ তাই বললেন :[২] "Things are distinct not in their essence but in their appearance ; in other words in their relation to one to whom they appear. This is art, the truth of which is not in Substance or logic but in expression." অর্থাৎ শিল্পীর চোখে বস্তুর যে রূপটা ধরা প'ড়ে শিল্পে প্রতিভাত হয়, শিল্পী যে রূপটিকে প্রকাশ করেন সেটাই হ'ল সত্যরূপ। এই রূপের রমণীয়তা নির্ভর করে তার প্রকাশের ওপর। সুতরাং প্রকাশটাই মুখ্য ;[৩] প্রকাশিত বিষয়বস্তু একেবারেই গৌণ। সাহিত্য মহৎ আইডিয়া বা ভাব ছাড়াও সৃষ্টি হ'তে পারে কিন্তু সুষ্ঠু প্রকাশ ব্যতিরেকে কোন বিষয়বস্তুই 'সাহিত্য' পদবাচ্য হ'তে পারে না। যে গাছের বাড়বৃদ্ধি হ'ল না তাকে গাছ বলা যায় কিন্তু যে বীজ অঙ্কুরিত হ'ল না তাকে ত' আর গাছ বলা যায় না। রবীন্দ্রনাথ নীরব কবিকে সেই কাষ্ঠখণ্ডের সঙ্গে তুলনা করেছেন যাতে অগ্নিসংযোগ করা হয় নি। এখন এই কাষ্ঠখণ্ডকে যেমন 'অগ্নি' বলতে পারি না ঠিক তেমনি ভাবেই নীরব কবিকেও 'কবি' বলতে পারি না। সীমাহীন আকাশের উদার সৌন্দর্য দেখে যে আকাশের মতই নির্বাক হয়ে থাকে তাকে ত' আর শিল্পী বলা চলে না। শিল্পীর অনুভূতির প্রকাশ থাকা চাই। শিল্প জগতে এই প্রকাশটাই বড় কথা। দার্শনিক ক্রোচে বলছেন যে এই প্রকাশটুকুই শিল্পের সর্বস্ব। যাঁর মধ্যে প্রকাশযোগ্য ভাব-ভাবনা আছে তিনি

১। সাহিত্যের স্বরূপ পৃঃ ৯।

২। Contemporary Indian philosophy গ্রন্থে তাঁর Religion an artist প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

৩। সাহিত্যের পথে, পৃঃ ১৭১।

তা প্রকাশ করবেনই। প্রকাশযোগ্য বিষয়বস্তু রইল অথচ তিনি তা প্রকাশ করলেন না, এটা হতেই পারে না। একথা জোর গলায় বললেন নব্যভাববাদী ক্রোচে। রবীন্দ্রনাথও শিল্প প্রকাশকে মুখ্য স্থান দিলেন বটে তবে তাঁর কাছে প্রকাশটাই সব নয়। প্রকাশ মুখ্য হ'লেও 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' নয়। এখানেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ক্রোচের প্রভেদ।

শিল্পের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে এবারে আলোচনা করা যাক্। রবীন্দ্রনাথ বললেন যে সাহিত্যে প্রকাশটাই সব নয়। সাহিত্যে মানব চরিত্রের পূর্ণ এবং সার্থক প্রতিফলন হওয়া দরকার। মানুষের মন ইন্দ্রিয়বৃত্তি এবং অধ্যাত্ম-সত্তা নিয়ে তার সমগ্রতা। এই সমগ্র মানব সত্তার প্রতিফলন যে শিল্পে ঘটে তা-ই সার্থক শিল্প; রবীন্দ্রনাথ এই ধরনের শিল্পকেই পূর্ণ মর্যাদা দেবেন। শিল্পী আপন সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার যথার্থ প্রকাশের মধ্যে দিয়ে অথবা শিল্পীজনোচিত সহানুভূতির দ্বারা অপরের আনন্দ বেদনাকে আত্মস্থ ক'রে তার যথাযথ প্রকাশের দ্বারা সমগ্র মনুষ্য চরিত্রকে প্রকাশ করার চেষ্টা করবেন। তবেই সার্থক শিল্প সৃষ্টি সম্ভব হ'বে। তা হ'লে একথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে রবীন্দ্রনাথ প্রকাশকে মুখ্য বললেও শিল্পের বিষয়বস্তুকে সময়ে সময়ে স্থান-বিশেষে প্রাধান্য দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে মনুষ্য চরিত্রকে প্রকাশ করাই হ'ল শিল্পের কাজ। যা কিছু শিল্প ধারণার মধ্যে বিধৃত তা হ'ল অনুষঙ্গ মাত্র।[১] এই শিল্প জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত; শিল্প জীবন থেকেই প্রাণ রস আহরণ করে। ব্যক্তির মানসজীবন শিল্পে প্রতিফলিত হয়। শিল্পীর মনের নেপথ্যে যারা শিল্প সৃষ্টিতে সহায়তা করে তা হ'ল বুদ্ধিবৃত্তি, ইচ্ছাশক্তি এবং রুচিবোধ। এরা চুপিসারে শিল্পসৃষ্টির কাজে জোগান দেয়। তাই ত' শিল্প-সাহিত্য এমন পূর্ণাঙ্গ রূপ পায়।[২] এখানে রবীন্দ্রনাথ আমাদের মনে এমন একটা ধারণার সৃষ্টি করেন যেন তাঁর মতে শিল্পবস্তু হ'ল মানুষের সমগ্র চরিত্র। মানুষের দ্বিধা দ্বন্দ্ব, লোভ সংশয় সমাকীর্ণ যে পশুপ্রবৃত্তি তাও যেমন শিল্পের উপজীব্য তেমনি মানুষের দেবোপম নিবৃত্তিও শিল্পে সমানভাবে কাম্য। রবীন্দ্রনাথের শিল্প দর্শন সম্বন্ধে আলোচনা করলে এমন ধারণা সহজেই হতে পারে। আবার তিনি এর বিপরীত মতের পোষকতাও করেছেন। তিনি অন্যত্র বলেছেন যে শিল্পলোকে মনুষ্য চরিত্রের সবটাই প্রবেশাধিকার পাবে না। মানুষ যা হ'তে চায়, যে

১। সাহিত্যের পথে, পৃঃ ১৭১।

২। সাহিত্যের পথে, পৃঃ ১৬৩।

চারিত্র্য-উৎকর্ষ মানুষের কাম্য সেটুকুই শিল্পে প্রকাশের যোগ্য। যে মানুষ স্বভাব-ধর্মে সমগ্র মানব সমাজের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে তাকেই শিল্পে প্রকাশ করতে হবে। প্রেম, দয়া, সহানুভূতি দাক্ষিণ্য প্রভৃতি এব গুণে যে মানুষ ঐশ্বর্য-বান তাকে রবীন্দ্রনাথ শিল্পলোকের সিংহাসনে কখন কখন অধিষ্ঠিত দেখতে চাইলেন। রবীন্দ্রনাথ মনে করলেন যে মানুষের অন্তর্নিহিত মহত্তর গুণাবলী এবং জীবনের বৃহত্তর এবং দুর্লভতর অভিজ্ঞতার প্রকাশ যদি শিল্পে ঘটে তবে শিল্পের শাশ্বত মূল্য বেড়ে যাবে এবং যুগযুগান্তরের রসিক মানুষের কাছে সে শিল্পের আবেদন কখন ক্ষুণ্ণ হবে না। আমাদের চরিত্রের মহত্তর দিকটা শিল্পে প্রতিফলিত হ'লে, জীবনের সাধারণ অভিজ্ঞতার পরিবর্তে দুর্লভ অভিজ্ঞতার প্রকাশ শিল্পে ঘটলে তা সর্বজনবোধ্য এবং সহজবোধ্য হবে কী না সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। এ কথা অনস্বীকার্য যে শিল্প যদি সর্বজনবোধ্য করার দিকে শিল্পীর লক্ষ্য থাকে তবে জীবনের অতি সাধারণ অভিজ্ঞতার বর্ণনা যে শিল্পে থাকবে তার আবেদন সর্বত্রগ হবে, এই সহজ সত্যটি শিল্পীকে স্মরণ রাখতে হবে। যে অভিজ্ঞতা সাধারণ মানুষের অলব্ধ এবং অলভ্য তাকে শিল্পের উপজীব্য করলে তার আবেদন স্পষ্ট হবে রসিকজনের কাছে। এ কথা আমরা বলেছি যে শিল্পের উৎকর্ষ-অপকর্ষ নির্ধারিত হয় তার সার্থক প্রকাশগুণে। শিল্পবস্তুর মহনীয়তা শিল্পকে কোন বিশেষ উৎকর্ষের অধিকারী করে না। এ রাজত্বে 'ক্যামেলিয়া' কবিতার সাঁওতালী রমণী এবং সাহাজান প্রেয়সী মমতাজ মহলের সমান মর্যাদা। এই লোকে মানুষের ভোজন বিলাসিতার যেমন সমাদর, তেমনি সমাদর তার হৃদয়ের প্রসারতা এবং চিত্তের ঔদার্য গুণের। যদি রবীন্দ্রনাথ কেবলমাত্র মানব চরিত্রের উপরতলার গুণগুলোকে শিল্পের উপজীব্য ব'লে গ্রহণ ক'রে নীচের তলার প্রবৃত্তিগুলোকে শিল্পে অপাংক্তেয় করে দেন তা হ'লে শিল্পের বৈচিত্র্য হ্রাস পাবে। আমরা এমন সব শিল্পকর্মকে হারাব যা বহুদিন রসিকজনকে আনন্দ দিয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ বলতে পারি স্কটের 'আইভানহো' গ্রন্থের ব্রায়ান ডি বোয়া গিলবার্ট, ওথেলো নাটকের 'ইয়াগো' প্রমুখ চরিত্রকে শিল্পকর্ম ব'লে গ্রহণ করতে দ্বিধা আসবে। কেননা এরা ত' উন্নত মানব চরিত্রের প্রতিনিধি নয়। এমন কি কবি-সৃষ্ট অনবদ্য দুর্যোধন চরিত্রও শিল্পের উপজীব্য ব'লে গৃহীত হ'তে পারবে না। শিল্পের ক্ষেত্রে অপরকে বোঝানোর, রসাস্বাদন করানোর যে সমস্যা রয়েছে সে সমস্যার সমাধান রবীন্দ্রনাথ কথিত মহত্তর মানব চরিত্র প্রকাশের মধ্য দিয়ে সম্ভব হবে না বলে

আমরা মনে করি। অতএব তিনি যে সমগ্র মানব চরিত্রকে শিল্পে প্রকাশযোগ্য বিবেচনা করেছেন, সেই মতটাই যুক্তিসিদ্ধ। অভিজ্ঞতা এবং ইতিহাস এই মতটাই সমর্থন করে। আমরাও এই মত গ্রহণ করি। এই ধরনের আরও স্ববিরোধ রবীন্দ্রনাথের শিল্পদর্শনে রয়ে গেছে। জানি না রিয়ালিটি বিরোধ এবং দ্বন্দ্ব সমাকীর্ণ কী না? তার সঠিক নিশানা পেলে কবির দর্শন চিন্তার স্ববিরোধিতার কোন বৃহত্তর অর্থ হয়ত পাওয়া যেত। রবীন্দ্রনাথ হেগেলীয় চিন্তার প্রভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন এ কথা স্বীকার করলেও এমন কথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, হেগেলীয় দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে কোন কালেই আস্থাবান ছিলেন না।[১] তবে এ কথা বোধহয় বলা যায় যে, রবীন্দ্রনাথের শিল্পদর্শন হেগেলীয় শিল্পদর্শনের দ্বারা কিয়ৎ পরিমাণে প্রভাবিত। রবীন্দ্রনাথ 'সাহিত্যে'[২] উপনিষদিক সচ্চিদানন্দ স্বরূপের আলোচনা প্রসঙ্গে বললেন যে এই মহৎ আনন্দই সকল সৃষ্টির লক্ষ্য। যে প্রকাশ শিল্পের স্বরূপ লক্ষণ, যা হ'ল শিল্পের সমার্থক, তা এই আনন্দের ব্যঞ্জনাই বহন ক'রে আনে। এই আনন্দেই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সব কিছু গতি, সব কিছু স্থিতির নিবৃত্তি। সুতরাং সার্থক শিল্প প্রয়াস এই আনন্দেই বিধৃত। এই আনন্দের পথেই শিল্পীর আত্মোপলব্ধি ঘটে! এই আনন্দই হ'ল আত্মার এবং পরমাত্মার মর্মকোষ। পরমাত্মা হ'লেন আনন্দ স্বরূপ। আবার জীবাত্মা এবং পরমাত্মার কোন মৌল প্রভেদ নেই। সুতরাং জীবাত্মার আত্মোপলব্ধি বললে হেগেলীয় পরমাত্মার আত্মোপলব্ধি বোঝাতে পারে কোন হেত্বাভাস না ঘটিয়ে। যে আনন্দ পরমাত্মার অঙ্গীভূত সেই আনন্দই জীবাত্মা লাভ করে শিল্পসৃষ্টির মাধ্যমে। তাই 'প্রকাশ' এবং প্রকাশের আনন্দকে কবি সমার্থক মনে করেছেন। শিল্পীর আনন্দ হ'ল বিশুদ্ধ, বিমুক্ত আনন্দ। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য যে সুখানুভূতি তাকে এ আনন্দের সমার্থক মনে ক'রলে ভুল করা হবে। আত্মার যেখানে বন্ধনমুক্তি ঘটে সেখানে এ আনন্দের আস্বাদন করা যায়। শিল্পে প্রকাশের মাধ্যমে আত্মার বন্ধনমুক্তি ঘটে। তাই শিল্পকে ব্রহ্মাস্বাদ সহোদর বলা হয়েছে। শিল্পানন্দের সঙ্গে এই পরম আনন্দের কোন প্রভেদ নেই। বস্তুতঃ তারা সমার্থক। শিল্পানন্দের মধ্য দিয়ে আত্মার আত্মোপলব্ধি ঘটে। আত্মজ্ঞান আসে এই পথে। শিল্প মাধ্যমে হেগেলীয় আত্মোপলব্ধির ধারণা রবীন্দ্রনাথকে প্রভাবিত করেছিল বলে মনে হয়। আবার

১। সুধীর কুমার নন্দীর 'দর্শন চারিত্র্য' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

২। সাহিত্য, পৃঃ ৬৪।

দার্শনিক ক্রোচের সুস্পষ্ট ছায়া। রবীন্দ্র-চিন্তায় আমরা লক্ষ্য করি যখন তিনি বলেন যে শিল্পীর সার্থক প্রকাশ যাকে শিল্প বলি, তার মধ্যেও এই আনন্দের অবস্থিতি। সুতরাং তিনি একদিকে প্রকাশকে মুখ্য স্থান দিলেন। এখানে ক্রোচের প্রভাব লক্ষ্যণীয়। আবার অন্যদিকে তিনি বললেন মানুষের মধ্যে যা কিছু মহৎ, যা কিছু শাশ্বত এবং চিরন্তন তাকেই শিল্পে স্থান দিতে হবে। শিল্পের বিষয়বস্তু হিসেবে মানব চরিত্রের ক্ষণিক নশ্বরতাকে গ্রাহ্য করা চলবে না এবং এই 'বৃহৎ' বিষয়বস্তুর কথা-শিল্পীকে মনে রাখতে হবে। প্রকাশই একমাত্র সত্য নয়। এ ক্ষেত্রে হেগেলীয় প্রভাব অস্বীকার করার কোন সঙ্গত কারণ নেই।

সাহিত্যে এবং শিল্পে কবির-ব্যক্তিত্ব বা Personality কী ভাবে প্রকটিত হয় সে সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মতবাদের বিস্তৃততর পর্যালোচনা এক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। রবীন্দ্রনাথ এ কথা আমাদের বললেন যে, শিল্পে বা সাহিত্যে শিল্পীর 'অনুভূতিমাত্র' প্রকাশ পায় না। শিল্প কেবলমাত্র পলায়মান অধ্রুব সাময়িক অনুভূতিকে আত্মস্বতন্ত্র রূপে দেখা নয়। এই অনুভূতির সঙ্গে শিল্পীর ব্যক্তি-চারিত্র্যের নিবিড় যোগ রয়েছে। নব্য ভাববাদী ক্রোচের মত রবীন্দ্রনাথ অনুভূতিকে ব্যক্তিচারিত্র্যের সঙ্গে সম্পর্ক রহিত ব'লে মনে করেন নি। আমাদের অনুভূতির বিচিত্রতা আমাদের ব্যক্তিত্বকে আশ্রয় ক'রে থাকে। শিল্পীর শিল্পকর্ম শুধু তার অনুভূতিরই রূপায়ণ নয়। শিল্পে শিল্পচরিত্র আপনাকে উদ্‌ঘাটিত করে। শিল্পের মধ্যে শিল্পীর ব্যক্তিত্ব ছাপ রাখে।[১] কবির এই ব্যক্তিত্ব ধারণার মধ্যেই মানুষের বুদ্ধি, অনুভব আকাঙ্ক্ষা, প্রত্যাখ্যান এবং অভিজ্ঞতার সীমাহীন বিস্তৃতি বিধৃত। জীবাত্মার পারস্পরিক প্রভেদটুকু এই ব্যক্তিত্ব ধারণার দ্বারা চিহ্নিত। এই ব্যক্তিত্ব শিল্পে আপনাকে প্রকাশ করেছে। রবীন্দ্রনাথ 'সাহিত্যের পথে'তে বললেন যে সেক্সপীয়রের বহু বিচিত্র চরিত্র-চিত্রণে সেক্সপীয়রের ব্যক্তিত্ব আপনাকে প্রকাশ করেছে। আবার তিনি 'সাহিত্যে' বললেন যে দান্তের কবিতার সঙ্গে তাঁর জীবন ওতপ্রোতভাবে মিশে গেছে। সাহিত্য এবং জীবনকে পুরোপুরি বুঝতে হ'লে এ দুটিরই অনুধ্যান অত্যাবশ্যক। জীবনকে বাদ দিয়ে সাহিত্য বোঝা যায় না ; আবার সাহিত্যকে বাদ দিলে সাহিত্যিকের জীবনকথা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। তাই ত' রবীন্দ্রনাথ বললেন : 'কবিরে পাবে না তার জীবনচরিতে'। জীবনীকার জীবনের আকস্মিক ঘটনার মালা সাজিয়ে দিলেই তাতে প্রাণের স্পর্শ এসে

১। সাহিত্যের পথে, পৃঃ ১৬৪ দ্রষ্টব্য।

লাগে না। যে প্রাণপ্রেতি বিচিত্র সজ্জায় জীবনকে সজ্জিত করে তার স্পর্শ এসে লাগে না কবির জীবন কথায়। সে স্পর্শ থাকে তার শিল্পে, তার সৃষ্টিতে। শিল্পীর সমগ্র চরিত্রের ভাষ্যকার হ'ল তার শিল্প। শিল্প শিল্পীর ব্যক্তিত্বের পরিমণ্ডলে শিল্পরসিককে পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়। বোদ্ধা মানুষ শিল্পীর ব্যক্তি চারিত্র্যের স্পর্শ পায়। রবীন্দ্রনাথের শিল্পে ব্যক্তি চারিত্র্যের সমগ্রতার তত্ত্ব অনুধাবনযোগ্য। এর বিরোধী তত্ত্বেরও যে তিনি অবতারণা করেছেন সে কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। 'সাহিত্যে'[১] তিনি বলেছেন যে, মানুষের মধ্যে যা ধ্রুব, অবিনশ্বর, যা সার্বিক এবং আকস্মিক তারই প্রকাশ শিল্পে ঘটে। এই ধ্রুব-চারিত্র্য-প্রকাশ তত্ত্বটি সমগ্র-চারিত্র্য-তত্ত্বের বিরোধী। কেন না আমাদের চারিত্রিক সমগ্রতা ধ্রুব, অধ্রুব এই উভয়বিধ গুণ এবং বৃত্তি সমন্বয়ে গঠিত। অতএব কবিকথিত উভয় তত্ত্বই গ্রাহ্য করা চলে না। এই বিসঙ্গতিকে ব্যাখ্যা করা চলে না পূর্বে উল্লিখিত ক্রোচে হেগেল-প্রভাব তত্ত্বের দ্বারা। ক্রোচীয় প্রভাবে রবীন্দ্রনাথ আমাদের ক্ষণিক অনুভূতিকে শিল্পে আসন দিলেন, আবার হেগেলীয় প্রভাব তাঁকে মানুষের মধ্যে যা কিছু শাশ্বত এবং অবিনশ্বর তাকে শিল্পে প্রাধান্য দান করার জন্য উদ্বুদ্ধ ক'রল।

শিল্পে শিল্পীচরিত্রের সমগ্রতা অর্থাৎ একদিকে তার দ্বেষ, হিংসা, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য অন্যদিকে প্রীতি, প্রেম, দয়া, দাক্ষিণ্য, পরার্থপরতা, এই সব পরস্পর বিরুদ্ধ-গুণ এবং প্রবৃত্তি প্রকাশ পেতে পারে, এই তত্ত্বে আস্থা স্থাপন করলে শিল্পবৈচিত্র্য ব্যাখ্যায় কোন অসুবিধা হয় না। তবে এ প্রশ্ন ওঠে যে, কেমন ক'রে একই শিল্পীর হাতে দেবতা এবং দানবের অনবদ্য চারিত্র্য সৃষ্টি সম্ভব হয়। শিল্পীর মানসিক প্রবণতা যে দিকে, তার চরিত্রের বনিয়াদ যে ধাতুতে গঠিত, সেই ভাবেই তার শিল্প রূপ পাবে। কিন্তু এ কেমন ক'রে সম্ভব হয় যে একই কবির কাব্যে ভিন্নধর্মী প্রবণতা প্রকট হয়; একই নাট্যকারের নাটকে ইয়াগো এবং ইমোজেন সৃষ্ট হয়; একই কাহিনীকারের কাহিনীতে দুর্যোধন এবং গান্ধারী সমান ঔজ্জ্বল্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। আধুনিক সমালোচকেরা একে ব্যাখ্যা করবেন শিল্পে শিল্পীর ব্যক্তিত্ব-বিচ্যুতি তত্ত্বের দ্বারা। রবীন্দ্রনাথ কীটস্-এলিয়ট-ক্রোচে প্রবর্তিত পথের পথিক নন। তিনি বললেন যে, শিল্পীমানসের সর্বগ্রাসী সহমর্মিতাবোধ এই অসাধ্য সাধন করে। শিল্পী একদিকে যেমন বহিঃ প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতা বোধ করেন অন্যদিকে সমগ্র

১। সাহিত্য, পৃঃ ১৬৬।

মানবসমাজের সঙ্গেও তাঁর আত্মীয়তার বন্ধন গড়ে ওঠে। একদিকে যেমন শিমূল-সজিনার সঙ্গে আপনার নিবিড় আত্মীয়তাটুকু কবি উপলব্ধি করেছেন, ধূলি-তৃণ জলে আপনার যুগ যুগান্তরের অবস্থানটুকু অনুভব তেমনই করেছেন। কবি ময়ূরের সখ্যে গর্বিত হয়েছেন অন্যদিকে আবার আদিগন্ত-বিস্তৃত ধরণীর মানুষের সঙ্গে আত্মীয়তা করেছেন পরম পরিতৃপ্তিতে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর শেষ পরিচয়টুকু এই ব'লে দিলেন যে, তিনি 'আমাদেরই লোক'। এই 'তোমাদের লোক' হ'বার সাধনাই শিল্পীর সাধনা। প্রেমের পথে, ভালবাসার পথে সমস্ত মানুষের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির অংশভাগী করে। সর্বশ্রেণীর মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা তাঁর চিত্তে প্রতিফলিত হয়। তিনি তাকে শিল্পে প্রকাশ করেন। যে ব্যথা যে বেদনা তাঁর অভিজ্ঞতায় ছিল না তিনি তার রসঘন করুণ চিত্র অঙ্কিত করেন ; যে স্বপ্ন তাঁর চিত্তাকাশের দিগ্বলয় সীমা নিত্য অতিক্রান্ত তার বহুবিচিত্র ছবি আমরা শিল্পীর লেখায় প্রত্যক্ষ করি। যে আনন্দে শিল্পী কোনদিন বিভোর হননি তার উত্তাল তরঙ্গ তাঁর সৃষ্টিকে উদ্বেলিত করে তোলে। শিল্পীমন সর্বত্রগ হয়ে ওঠে এই সহানুভূতি ও সহমর্মিতার জন্য। এর জন্য শিল্পে বিভিন্নধর্মী মানুষের বিচিত্র কলরব শ্রুত হয় ; এই জন্যই গুরু এবং অন্ত্যজ শিল্পীর জগতে নিকট প্রতিবেশীরূপে বসবাস করে ; উভয়েই রসধন্য হ'য়ে ওঠে শিল্পীর সত্য অনুভূতিকে প্রকাশ ক'রে, শিল্পীর সত্য অনুভূতিকে রূপদান ক'রে। শিল্পীর ব্যক্তিত্বের পরিপ্রেক্ষিতে এই ভিন্নধর্মী অনুভূতিগুলো মিথ্যা নয়। কবির পরস্পর বিরুদ্ধ আবেগ প্রবণতাও মিথ্যা নয়। তাই রবীন্দ্রনাথ শিল্পীর সততাকে শিল্পীর আত্যন্তিক গুণ হিসেবে দেখেছেন যদিও ক্রোচে প্রমুখ নন্দন তত্ত্ববিদেরা শিল্প-সততাকে (Artist's Sincerity) প্রকাশ-সততা অর্থে গ্রহণ করেছেন। শিল্পী যা বলছেন সে সম্বন্ধে তাঁর বিশ্বাস বা আত্যন্তিক বোধের ভিত্তি যদি শিথিল হয় তা হ'লেও শিল্পমূল্য ব্যাহত হ'বে না। 'প্রকাশকর্মটি' শিল্পী সুষ্ঠুরূপে সমাধা করলে শিল্পীর প্রকাশ-সততা প্রকট হ'ল। র‍ঁমা র‍ঁলা ক্রোচে উক্ত এই প্রকাশ সততায় বিশ্বাসী নন। তিনি রবীন্দ্রনাথের মতই শিল্পীর বিশ্বাস এবং ধারণার ঐকান্তিকতাকে শিল্পীর আত্যন্তিক গুণ হিসাবে দেখেছেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের মতই আমাদের বলেছেন যে, অনুভূতির সত্যতা প্রকাশ সার্থকতায় নয়, তা শিল্পীর জীবনের মূলে প্রতিষ্ঠিত।

এই প্রসঙ্গে আমরা শিল্পীর সঙ্গে সামাজিকের সম্বন্ধ আলোচনার অবতারণা

করব। শিল্পী যখন সৃষ্টি করেন তখন সে সৃষ্টিকে যদি স্বতঃস্ফূর্ত এবং উদ্দেশ্য অপ্রণোদিত বলতে হয় তা হ'লে একথা আমাদের বলতেই হবে, শিল্পী তার পারিপার্শ্বিক, তার সমাজ তার সমকাল সম্বন্ধে একেবারেই উদাসীন থাকেন। সমাজের রুচিবান কৃষ্টিবান মানুষেরা 'আমাকে' বুঝবে। আমার দায়িত্ব হ'ল আমার সৃষ্টিকে তাদের বোধগম্য করা, একথা কী শিল্পী ভাবেন শিল্পসৃষ্টির সময়ে? রবীন্দ্রনাথ বললেন যে, শিল্পীকে, স্রষ্টাকে তার সমাজের কথা, তার সমকালের কথা মনে রেখে সৃষ্টিকর্মে ব্রতী হতে হবে।[১] শিল্পী যাঁদের জন্য সৃষ্টি করেছেন তাঁদের রুচি এবং শিল্পবোধের দিকে শিল্পীকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। এ না করলে আবেদন সার্থক হবে না তাঁদের কাছে যাঁদের জন্য শিল্পসৃষ্টি করা হল। রবীন্দ্রনাথের মতে শিল্পীর প্রকাশ কর্ম হ'ল শিল্পীর অন্তরলোকবাসী মহাভাবকে অনেকখানি সাধারণ ক'রে ফেলতে হবে। এতে মহাভাবের মূল্যহানি ঘটবে, তার মর্যাদার লাঘব হবে। শিল্পীর মহাভাবের এই সাধারণীকরণতত্ত্ব রবীন্দ্রনাথের শিল্পবস্তু (Content) সম্পর্কিত তত্ত্বের সঙ্গে বিসঙ্গত হ'য়ে পড়ে। যদি শিল্পের লক্ষ্য হয় মানবচরিত্রের মহত্তর গুণাবলীর প্রকাশ তা হ'লে শিল্পীর পক্ষে আর তার সমকালীন মানুষের রুচি প্রবৃত্তির দিকে দৃষ্টি দেওয়া সম্ভব হয় না। কেননা মহত্তর চারিত্র্যধর্ম সাধারণের কাছে অস্পষ্ট, অবোধ্য। শিল্পের উপজীব্য যদি মানুষের এই মহত্তর চারিত্র্যধর্মই হয় তা হ'লে তার সঙ্গে শিল্পের সাধারণীকরণতত্ত্বের সমন্বয় ঘটানো যায় না। এখানেও রবীন্দ্র শিল্প-দর্শনে যে সঙ্গতি-বিচ্যুতি ঘটেছে তা কবি-জনোচিত হ'লেও দার্শনিকজনোচিত নয়।

মহত্তর মানবচরিত্রের সংবাদ সংবাদী এই যে শিল্প, এ শিল্পের উৎস হ'ল মানুষের অবকাশের সেই বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ যেখানে কাজের ভীড় নেই, প্রয়োজনের তাগিদ নেই, যেখানে জৈব জীবনটার সব দাবীকে অস্বীকার করা হয়েছে। এই অতিরিক্তের রস রাজত্বেই শিল্পের জন্ম।[১] বেদের ভাষ্যকার যজ্ঞশেষের অতিরিক্ত হবিটাকে বললেন ব্রহ্ম-স্বরূপ। ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্তা; ব্রহ্মাই সৃষ্টির উৎস। এই অতিরিক্তটুকুই জীবনের যত সৌন্দর্য, যত সুষমার দ্যোতক।

১। বিস্তৃত আলোচনার জন্য ডঃ সুবোধ চন্দ্র সেনগুপ্তের 'রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থের শেষ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

১। রবীন্দ্রনাথের 'Religion of an artists' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য (Contemporary Indian Philosophy গ্রন্থ)।

রসরাজত্বের সীমানা নির্দিষ্ট হয় এই অতিরিক্তের নিশানাটুকু দিয়ে। যেখানে প্রয়োজন নেই, চাহিদা নেই, চাহিদা মেটাবার দায়িত্বও সেখানে নেই। এই অপ্রয়োজনের লীলাক্ষেত্রে, অতিরিক্তের রসরাজত্বে শিল্প প্রতিষ্ঠিত রবীন্দ্রনাথের এই শিল্পতত্ত্বকথা তাঁর শিল্পদর্শনের উত্তরসূরী অবনীন্দ্রনাথের মধ্যে অনুস্যূত। অত্যাধুনিক কালেও এর প্রতিধ্বনি শোনা যাচ্ছে মার্কসবাদী শিল্পদর্শনের দুন্দুভিনিনাদকে ছাড়িয়ে।

রবীন্দ্র কাব্যে রূপকল্প

রূপকল্প শব্দটির ইংরেজী প্রতিশব্দ হ'ল 'ইমেজারি'। 'ইমেজারি' সর্বযুগের রসসাহিত্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে। গভীর ভাব, সুউচ্চ ধারণা, আকাশ-ছোঁয়া আদর্শ—রূপকল্প এগুলো মানুষকে বুঝিয়েছে অত্যন্ত সহজ ভঙ্গীতে, একেবারে আপনজনার কথায়। যেখানে মানুষের ধারণা বাষ্পায়িত, এলোমেলো, অসংবত, সেখানে রূপকল্পের প্রয়োগ করা হয়েছে—পাঠক বুঝেছে কবি মনের নিগূঢ় অনুভূতি, বুঝেছে ভাষাতীত সুগভীর তাৎপর্য। যেখানে শিল্পী বুঝেছেন যে একটি রূপকল্পের ব্যবহারে অর্থ পরিস্ফুট হ'ল না, কবি মনের কথা পাঠকের কাছে পৌঁছল না, সেখানে কবি একের পর এক ইমেজারি ব্যবহার করেছেন। সে ভাষাচিত্রে রেখা ও রঙের সমন্বয় মূল ভাবের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত। ইংরেজী সাহিত্য থেকে অনেক নজীর দেওয়া যায় এই ধরনের রূপকল্পের অনায়াস ও স্বচ্ছন্দ প্রয়োগের। সংস্কৃত সাহিত্যেও এর অসদ্ভাব নেই।

ইংরেজী সাহিত্যের পাঠকেরা সকলেই শেলীর অতি পরিচিত, যুগে যুগে বহুকণ্ঠে উচ্চারিত 'স্কাইলার্ক' কবিতাটি পড়েছেন। সুরমুগ্ধ কবি 'স্কাইলার্কের' স্বরূপ বুঝতে চান—জানতে চান আনন্দময় অমৃতলোকের এই শরীরী প্রতিনিধিটির কথা। তাঁর কণ্ঠে শুনি—'What thou art we know not'; তারপর শুরু হয় কবিমনের অনুভূতির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ। কল্পলোকের কথা ব্যক্ত হয় এই জীবনের পাওয়া নানা রসানুভূতির মধুর আলেখ্যের মাধ্যমে। শেলী কখনও স্কাইলার্ককে দুর্নিরীক্ষ্য চিন্তার প্রখর আলোকে আচ্ছন্ন কবির সঙ্গে তুলনা করেছেন আবার কখনও তাকে উচ্চকুলোদ্ভবা বিরহাতুরা সুন্দরী তরুণীর সহিত তুলিত করেছেন যে সুন্দরী আপনার হৃদয়কে তার গানে নিঃশেষে ঢেলে দিয়েছে। কবি তার পরে বলেছেন যে, স্কাইলার্কটি যেন একটি স্বর্ণপ্রভ জোনাকী পোকা যে আপনাকে পাতার আড়ালে লুকিয়ে রেখেছে। জোনাকীর প্রজ্বলন্ত স্বর্ণ-প্রভা সন্ধ্যাশিশিরে প্রতিফলিত হয়েছে। আর তার স্বর্ণাভা ঘাসে-পাতায় ছড়িয়ে পড়েছে অনন্ত রূপমাধুর্যে। সেখানেও রূপকল্পের শেষ নয়। কবির মনে হয় সবটা বুঝি বলা হ'ল না। পাঠক বোধ হয় কবির মনের কথা নিজের মনের পত্রপুটে গ্রহণ করতে পারল না। তাই আবার তিনি কথার ছবি আঁকেন—টুকরো টুকরো রেখাচিত্র। এবার তুলনা হ'ল সে

ক্লাইলার্ক যেন সবুজ পাতায় প্রচ্ছন্ন একটি গোলাপ ফুল। চোখের দৃষ্টি তার নাগাল পায় না, তবু তার গন্ধের সমারোহ আপনাকে ঘোষণা করে। তার প্রকাশ আছে, তবুও সে প্রচ্ছন্ন।

এমনিধারা হাজার হাজার মনোজ্ঞ চিত্র এঁকেছেন বহু কবি যুগে যুগে। সে চিত্রণের উদ্দেশ্য হ'ল পাঠককে আপনার রসানুভূতির শরিক করে তোলা। রূপকল্পের মাধ্যমে কবি মন বারে বারে চেয়েছে আপনার রসের বোধকে অন্ত মনে প্রতিষ্ঠিত করতে। আত্মপ্রকাশের জন্তে যে সূক্ষ্ম পরিতৃপ্তির আনন্দ রয়েছে তাকে শিল্পী ষোল আনা ভোগ করেন এই সৃষ্টিকার্যে। গভীর অনুভূতি যখন অগভীর ভাষাকে আশ্রয় করে তখন সে তার আধারের অকিঞ্চনতা উপলব্ধি করে পদে পদে; তাই কবিমন রূপকল্পের আশ্রয় নেয়। এই কারণে সাহিত্যের দরবারে রূপকল্পের সর্বজনমান্য প্রতিষ্ঠা। কোন কোন সমালোচক আবার এই ছবি-আঁকাকেই কাব্য-কবিতার সবচেয়ে বড় উদ্দেশ্য বলে ঘোষণা করেছেন। রূপকল্প যে ভাব বা আইডিয়াকে প্রকাশ করে সে আইডিয়া পিছিয়ে পড়েছে। ছবি এগিয়ে এসে সবটুকু আসন অধিকার করেছে। ল্যাম্বোর্ণ বললেন, কাব্য 'ইমেজ' বা ভাষাচিত্র নিয়েই কারবার করে; ভাব সেখানে অত্যন্ত গৌণ, মুখ্য হ'ল ঐ ভাষাচিত্র। তাঁর কথা উদ্ধৃত করে দিই:

"It deals with images and not with ideas."

অবশ্য আমাদের মতে ল্যাম্বোর্ণের এই কথা অতিশয়োক্তি দোষদুষ্ট। ষ্টিফেন এবং ব্রাউনের তাঁদের 'Relam of Poetry' গ্রন্থে আমাদের মতের সমর্থন আছে। ল্যাম্বোর্ণ যে একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছেন সে সত্যটির প্রতি লক্ষ্য রেখে তাঁরা লিখছেন:

'It is not truer to say that it bodies forth the ideas, even the most abstract through the medium of image?'

ওঁরা ঠিকই বলেছেন যে, কাব্য আইডিয়া বা ভাবকে প্রকাশ করে ছবির মাধ্যমে। সে ছবি সত্য হয়, সে ছবি সুন্দর হয় কবির ভাবনার আলোয় আলোকিত হয়ে। কাব্য সৃষ্টি করতে হ'লে বা কবিতার সঠিক মর্মকথাটি বুঝতে হ'লে মানুষের কল্পনাশক্তিকে সংহত ও সুসংযত করে তুলতে হয়। সর্ এ. টি. কুইলার কাউচ তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'The Art of Writing'এ এদেশের যুবক-যুবতীদের কবিতা লেখার উপদেশ দিয়েছেন। কবিতা লেখার ফলে মানুষের কল্পনা উদ্দীপিত হয়। কল্পনার এই উদ্দীপন ঘটে মানুষের রূপ-সৃষ্টি প্রয়াসে—

যে কবিতাই হোক, উপন্যাসই হোক আর গল্পই হোক। এই ধরনের প্রচেষ্টা মানুষের আন্তর-শক্তিকে সক্রিয় করে দেয়, তার মনে কল্পনাশক্তির বিস্তার ঘটে অভাবনীয় রূপে। বিশেষজ্ঞদের মতে রূপকল্পের প্রয়োগ সাধনের ফলে কবির কল্পনা সুনির্দিষ্ট রূপ লাভ করে। সে তার পথ পায় যেখানে আপনাকে প্রকাশ করবার সীমাহীন অবকাশ আছে: 'And in almost any exercise in composition such training can be given. Particularly valuable, it seems to me, are exercise in the expression of ideas and the description of things through imagery—the very warp and woof of poetry.'*

ভাবের প্রকাশ ও রূপকল্পের ব্যবহার—এরা যেন টানাপোড়েনের সম্বন্ধে সম্বদ্ধ। যেমন করে তাঁতের টানাপোড়েনে কাপড় বোনা হয় ঠিক তেমনি করেই কবিমনের ভাবনার প্রকাশে ও যথাযথ রূপকল্পের ব্যবহারে কাব্য সৃষ্টি হয়। এ কথা অতি সত্য যে, রূপকল্প কাব্যমাধুর্যকে গাঢ়তর করে। এ সত্যের প্রকাশ আমরা দেখেছি পশ্চিমে। প্রাচ্যেও এর ব্যতিক্রম ঘটে নি। রবীন্দ্রনাথ এই রূপকল্প-রীতিকে গ্রহণ করেছেন অন্য দেশের কবিদের মতই। তাঁর কাব্যে আমরা রূপকল্পের বহুল প্রয়োগ দেখতে পাই।

রবীন্দ্র কাব্যে রূপকল্পের মাধ্যমে ভাবরূপ চিত্ররূপ গ্রহণ করেছে। তাকে চোখ দিয়ে বোঝার চেষ্টা করেছি যাকে মন দিয়ে বোঝা দুরূহ। 'যতো বাচো নিবর্তন্তে'—সেখানে রেখা আর রং, বচন আর বাচনভঙ্গি দিয়ে পূর্ণ চিত্র আঁকার প্রয়াস করেছেন কবি। আমরা এই নিবন্ধে বিচার করব রবীন্দ্রনাথের এই রূপকল্প প্রয়োগের উদ্দেশ্য ও সার্থকতা। কবিতার উৎস হ'ল কল্পনা। সে কবি-কল্পনার বহুমুখী স্রোতপথে পলিমাটি পড়েছে দিনের পর দিন আর সেখানে কাব্যকুসুমের অজস্রতা গৌড়জনকে মুগ্ধ করেছে তার রূপে এবং গন্ধে। রবীন্দ্রনাথের কল্পনার স্বরূপ বিচার করতে গিয়ে এ কথা আমরা বুঝি—কবির কল্পনা যে বিচিত্র সুবিশাল প্রচ্ছদপট সৃষ্টি করেছে তা সীমা ও অসীমের সান্ত ও অনন্তের টানা-পোড়েনে গ্রথিত।

কবি কল্পনা অনন্তের দিকে ধেয়ে গেছে। প্রতিমুহূর্তে কবি অনুভব করেন পাওয়াকে ছাড়িয়ে না পাওয়ার দিকে অভিসারের দুর্নিবার আকর্ষণ। তাই কবিমন সদা চঞ্চল। সুদূরের আহ্বান কবিকে উন্মনা করে দেয়, তিনি বলেন, 'আমি সুদূরের পিয়াসি।' তার পরশের লোভে বিমুগ্ধ কবিমন বারে

* (The Realm of Poetry, পৃঃ ১৪৫)

বারে অপরিচিত জগতে ছুটে চলে যায়। সে জগৎ অনাস্বাদিতপূর্ব। সে 'অন্ত কোথায়' মায়া কবিকে নিরন্তন আহ্বান করে। তাই ত' কবির অন্তহীন অভিসার। সে চলার বেগ কবির চোখে সর্বত্র বিরাজমান। কবি দেখেন সারা বিশ্ব চলমান। উপনিষদের ভাবধারার উত্তর সাধক 'চরৈবেতি' মন্ত্রে দীক্ষিত কবি দেখেন যে স্থানু, স্থাবর, পর্বত ও বৈশাখের মেঘের মতই উড়ে চলে যেতে চায়। নিরুদ্দেশের পথে তারও বুঝি অভিসার। তরুশ্রেণী উধাও হয়ে যায় অমর্ত্যের প্রত্যন্ত সীমায়। সীমা চায় অসীমের ক্ষণিক স্পর্শ। তাই ত' বিশ্ব জুড়ে এই গতির সাধনা। দেহের তটে সীমায়িত মানুষের অসীমের সঙ্গ ভোগের তৃষ্ণা অহোরাত্র জেগে থাকে। কবির ভাষায় সে আকুতি হাজারো তন্ত্রীর মূর্চ্ছনায় সহস্র সঙ্গীতধারায় মূর্ত হয়ে উঠেছে। কবিকণ্ঠে শুনি :

আমি চঞ্চল হে,
আমি সুদূরের পিয়াসী,
দিন চলে যায়, আমি আন মনে
তারি আশা চেয়ে থাকি বাতায়নে,
ওগো প্রাণে মনে আমি যে তাহার পরশ পাবার প্রয়াসী।
('আমি চঞ্চল হে'—উৎসর্গ)

এই স্পর্শলাভের ব্যাকুলতা, মিলনাকাঙ্ক্ষা, কবিকে কোন এক রহস্যলোকের দিকে নিরন্তর আকর্ষণ করে। এ ডাকে হয়ত সব সময় সাড়া দেওয়া সম্ভব হয় না। কবির মর্ত্যবন্ধন তাঁর চলার পরিপন্থী। তাই কখন কখন কবি একান্তে বসে মানুষের পথ চলা দেখেন। তাতেও তাঁর তৃপ্তি, তাতেও তাঁর আনন্দ। চলতি পথের ধারে বসে কবি অগণিত মানুষের মিছিল দেখেন। তাদের চলার ছন্দ কবিকে আনন্দ দেয়। এ হ'ল তাঁর বাসনার বিকল্প পরিতৃপ্তি। তাদের আনন্দের ভোজে তিনিও অংশভাগী হন। অন্য মানুষের জীবন পাত্রে যখন মাধুরীর প্রাচুর্য, তখন কবির জীবনেও ত' ফসল ফলবে—সে ফসলে আনন্দলোকের অমৃত স্পর্শ আছে। তাই তাদের আনন্দ দেখে কবিও মনের আনন্দে বলে ওঠেন :

আমার এই পথ-চাওয়াতেই আনন্দ।
খেলে যায় রৌদ্র ছায়া, বর্ষা আসে বসন্ত।
কারা এই সমুখ দিয়ে, আসে যায় খবর নিয়ে—
খুশি রই আপন মনে, বাতাস বহে সুমন্দ।
['পথ-চাওয়া'—গীতিমাল্য]

এ ত' গেল বিকল্প পরিতৃপ্তির কথা। অনন্তের পথে কবির নিত্য অভিসার সফল হয় নি, ধন্য হয় নি মিলনের নিবিড়তায়। সীমাকে ছেড়ে অসীমকে ধরার ব্যর্থ প্রয়াস কবিকে দুঃখ দিয়েছে। তবু প্রথম জীবনে কবি অনন্তের হাতছানিকে উপেক্ষা করতে পারেন নি; বারে বারে ছুটে গেছেন এই অ-ধরা মরীচিকার পিছনে। এই পরম পরিণতি-বিহীন চলার আবেগটাকে কবি যথাযথ ব্যক্ত করেছেন তাঁর 'সিন্ধুপারে' কবিতায়:

> বিদ্যুৎ বেগে ছুটে যায় ঘোড়া বারেক চাহিনু পিছে।
> ঘরদ্বার মোর বাষ্পসমান মনে হল সব মিছে।
> কাতর রোদন জাগিয়া উঠিল সকল হৃদয় ব্যেপে,
> কণ্ঠের কাছে সুকঠিন বলে কে তারে ধরিল চেপে।

জীবনদেবতাকে কাছাকাছি পাবার, তাঁর সন্নিধিলাভের প্রয়াস কবিকে অনেক দুঃখ বরণ করিয়েছে। সে বেদনায় হয়ত নিবিড়তর আনন্দের স্বপ্ন অভিব্যক্তি ছিল। তবু কবি সে বেদনাকে পরিহার করতে চেয়েছেন। না-পাওয়ার ব্যর্থতাকে সত্য হ'তে দেন নি তাঁর জীবনে। অনন্তের আনন্দ মিথ্যা নয়। সে চিরসত্য কবির সমস্ত ক্ষতিকে মিথ্যা করে দিয়ে অম্লান গৌরবে আপনাকে ঘোষণা করেছে। কবি ফিরে এসেছেন আবার তাঁর পরিচিত জগতে, যেখানে শিশুরা খেলা করে, যেখানে মানুষেরা আজও মানুষকে ভালবাসে। সেখানেই তাঁর বাকী জীবনের সাধনা চলল। তিনি সীমা অসীমের মিলন দেখতে চাইলেন এইখানে, অতি পরিচয়ের দৌরাত্ম্যে মলিন তাঁর পারিপার্শ্বিকে। বিপুল সুদূরের প্রাণ-মাতানো বাঁশীর সুর আর কবিকে উন্মনা করে দেয় না। আর নিরুদ্দেশ যাত্রার মোহ কবির জীবনে নেই। তাই তিনি 'সোনার তরী' কাব্যগ্রন্থে জীবনদেবতার উদ্দেশে বলেন:

> আর কতদূরে নিয়ে যাবে মোরে
> হে সুন্দরী
> বল কোন্ পার ভিড়িবে তোমার
> সোনার তরী?

কবি আর দূর থেকে সুদূরে যাত্রা করতে অনিচ্ছুক। এখন তার ঘরে ফেরার পালা। তাঁর ঘর তাঁকে ডাক পাঠিয়েছে; সে অদৃশ্য বিপুল টানে কবিমন গৃহাভিমুখী। তাই সে জীবনদেবতার মনের অভিপ্রায়টুকু জানতে চায়, বুঝতে চায় তার নিগূঢ় উদ্দেশ্য। এ বোধ তখন তাঁর হয়েছে যে চলাই একমাত্র

সত্য নয় ; স্থিতিরও প্রয়োজন আছে মানুষের জীবনে। শুধু উধাও হয়ে যাওয়াই সত্য নয়, চলে আসা, প্রত্যাবর্ত্তন করা সেও সত্য। তাঁর কাছে সত্যের আর এক দিক উদঘাটিত হ'ল। তাই ত' রবীন্দ্রনাথ বারে বারে ফিরে ফিরে আসেন তাঁর অতি পরিচিত অতি আপন ছোট্ট আবাসভূমিতে। এই কারণে অনেকে বলেন রবীন্দ্রনাথ মিষ্টিক নন। অতীন্দ্রিয় লোকে অভিসারই যদি কবির জীবনে একমাত্র সত্য হ'ত তা হ'লে আমরা অসঙ্কোচ রবীন্দ্রনাথকে মিষ্টিক আখ্যায় ভূষিত করতে পারতাম। কিন্তু সম্মুখপথে গতিই ত' রবীন্দ্র-মানসের একমাত্র সত্য ধর্ম নয়। যাওয়া-আসার টানা-পোড়েনে রবীন্দ্রজীবন ও দর্শন গ্রথিত। এই ফিরে আসার জন্তই রবীন্দ্রনাথ মিষ্টিক হয়ে ওঠেন নি।

এ সত্য কবিগুরু বারে বারে উপলব্ধি করেছেন যে, দুরন্ত গতিই মানুষকে অনন্তের প্রতিবেশী করে না। তাকে পাওয়ার অন্য পথ আছে। তার সান্নিধ্য ঘরে বসেও পাওয়া যায়, শুধু সে বোধের প্রয়োজন যে বোধ মানুষকে সীমার মধ্যেই অসীমকে দেখায়। ওয়ার্ডস্বার্থ এই বোধের অধিকারী ছিলেন বলেই ফাটল ধরা প্রাচীরে ফোটা নামগোত্রহীন ফুলের কথা বলতে গিয়ে তিনি বিশ্ববিধানের কথা বলেন। সারা সৃষ্টি যে একই সূত্রে গ্রথিত। একের অর্থ ঠিকমত বুঝতে হ'লে বিশ্বভুবনের সৃষ্টি রহস্যটি আয়ত্ত করতে হবে। ছোট বড় সবার মধ্যেই সেই অনন্তের স্বাক্ষর রয়েছে। তাই ত' কবি ছোট, বড়, দীন, দরিদ্র সকলের মধ্যেই চিত্তের স্থাপনা করার সাধনায় আত্মনিয়োগ করলেন। তাঁর ঘর, তাঁর পরিবেশ, তাঁর ভুবন নতুন অর্থে ব্যঞ্জনাময় হয়ে তাঁর কাছে প্রতিভাত হ'ল। শেষ বয়সে জ্ঞানবৃদ্ধ কবির কণ্ঠে তাই শুনি :

এ দ্যুলোক মধুময়, মধুময় পৃথিবীর ধূলি,
অন্তরে নিয়েছি আমি তুলি,
এই মহামন্ত্রখানি
চরিতার্থ জীবনের বাণী।
দিনে দিনে পেয়েছিনু সত্যের
যা কিছু উপহার
মধুরসে ক্ষয় নাই তার।
তাই এই মন্ত্রবাণী মৃত্যুর শেষের প্রান্তে বাজে—
সব ক্ষতি মিথ্যা করি অনন্তের আনন্দ বিরাজে।

('মধুময় পৃথিবীর ধূলি'—আরোগ্য)

এ হ'ল কবির পরিণত বয়সের সত্য-দর্শন। জীবনের ও জগতের সমস্ত ক্ষয়-ক্ষতির মধ্যেও অমর্ত্যের স্পর্শ আছে। মৃন্ময়ী ধরণীর প্রতিটি ধূলিকণায় অক্ষয় অমৃত ভাণ্ডের আভাস পান কবি। যৌবনের সেই চঞ্চলতা, মধ্য বয়সের সেই পলায়নী মনোবৃত্তি আর নেই। কবি আর তাঁর পরিচিত পরিবেশকে অস্বীকার ক'রে 'অন্ত কোথা'য় খোঁজে বার হন না। স্বীকার করে নেন তিনি তাঁর অপরিচিত ক্ষুদ্র পরিবেশটিকে—তার মধ্যেই আবিষ্কার করেন মধুরসের অনন্ত উৎস; স্বর্গের আনন্দ নেমে আসে মর্তের ধূলিতে। এই মহাসত্যের উপলব্ধিই কবির চরিতার্থ জীবনের মহাসম্পদ। সে সত্য কবিকে পূর্ণ করেছে। অন্তরে তাঁর আনন্দের সম্পদ, মধুরসের অফুরন্ত ঐশ্বর্য। তাই ত' কবি বিদায় নেবার আগে এই মাটির তিলক পরেন তাঁর কপালে, দুর্যোগের মায়ার আড়ালে সত্যের নিত্য জ্যোতিকে প্রত্যক্ষ করেন তাঁর ঘরের বাতায়ন থেকে। অনন্ত অভি-সারিকার স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন সত্য হ'য়েছে নূতন জীবন-দর্শনের পটভূমিতে। ডঃ নীহাররঞ্জন রায় রবীন্দ্রমানসে সীমা-অসীমের নিত্য লীলাটিকে সুন্দর ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। তাঁর কথায় বলি: "অসীম আকাশ আঙিনার ক্ষুদ্র আকাশের মধ্যে ধরা দেয়, ততটুকুর মধ্যেই তাহার বিচিত্ররূপ ফুটিয়া ওঠে; আবার এই অখণ্ড বিচ্ছিন্ন আকাশই সুবিস্তৃত আকাশের মধ্যে নিজেকে প্রসারিত করিয়া দিয়া পরিপূর্ণতা লাভ করে। বিশ্বজীবন আমার ব্যক্তি-জীবনের মধ্যে ধরা দিয়া তবে তাহার বিশেষ অভিব্যক্তি লাভ করে। সেই আমার ব্যক্তিজীবনই আবার বিশ্বজীবনের মধ্যে নিজেকে বিসর্পিত করিয়া নিজের সার্থকতা খুঁজিয়া পাইতে চায়। এমনি করিয়াই, সীমায় অসীমে, খণ্ডে পূর্ণে, ব্যক্তিজীবনে, বিশ্বজীবনে একটি অশেষ অপরূপ চিরন্তন লীলা চলিয়াছে; এই লীলাই সৃষ্টির সৌন্দর্য, ইহাই আনন্দ। এই সৌন্দর্য, এই আনন্দ, ইহার পরিপূর্ণ রসটিকে রবীন্দ্রনাথ আকণ্ঠ পান করিয়াছেন, ভোগ করিয়াছেন। একটি অপূর্ব সুগভীর রহস্যরূপ অনুভব করিয়াছেন।"*

এই সুগভীর রহস্যরূপের অনুভব সম্ভব হয়েছে সীমায়িতের মধ্যে অসীমের নিত্য অবস্থিতির ফলে। প্রথম যৌবনে কবি হয়ত' এই সীমা-অসীমের মিলনকে জ্ঞানের বস্তু হিসাবে জানতেন। সে মহাসত্যের উপলব্ধি তাঁর হয় নি পরিণত বয়সের মানসিক পূর্ণতা না আসা পর্যন্ত। তাই দেখি বারে বারে সম্মুখের পথে অগ্রসরণ, আবার ফিরে আসা—এ দুয়ের নিরন্তর আবর্তন। কবির এ কথা

* রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা, পৃঃ ৮

মনে হয়েছে বারে বারে যে সমুখের পথে অশান্ত পদক্ষেপে এগিয়ে চলা নিরর্থক। অনন্তের জন্ত এই গোপন অভিসার একান্তই অর্থহীন। তাঁর চিরজীবনের যে তৃষ্ণা সে তৃষ্ণা বুঝি আর মিটল না। যে জীবন শাশ্বত, মুক্ত ও সীমাহীন, সে জীবনের অধিকার কবি বুঝি পেলেন না। তাই 'মানসী'তে কবির কণ্ঠে হতাশার কথা ধ্বনিত হয়ে ওঠে :

> শুধু আমারি জীবন মরিল ঝুরিয়া
>
> চির জীবনের তিয়াষে।
>
> এই দগ্ধ হৃদয় এতোদিন আছে কী আশে ?

কবি সেই অশেষকে আপনার মধ্যে পরিপূর্ণ করে পেতে চান। এই অশেষের উপলব্ধিই হ'ল চিরজীবনের উপলব্ধি। অশেষ কবিকে ধরা দেন না। উল্কার মত দুর্বার গতিতে কবি যখন ছুটেছেন তাঁকে পাবার জন্ত, তখন তিনি দূর থেকে সুদূর চলে গেছেন আপনার প্রজ্জলন্ত কক্ষপথে আরও দূরে যাবার আমন্ত্রণ রেখে। কবির সমস্ত ব্যাকুলতা, তাঁর সব আকুতি ব্যর্থ হয়েছে। মিলন হয় নি তাঁর জীবন দেবতার সঙ্গে। তিনি তাঁর কাছে গেছেন, তাঁর আভাস পেয়েছেন, তবু সন্ধান ত' পেলেন না। এই আভাস পাওয়ারও আনন্দ আছে। কবি এই আনন্দটুকুকে সম্বল করেই ফিরে আসেন। ফিরতি পথে তাঁর কণ্ঠে গান শুনি, সে গানে ঐ আভাস পাওয়ার আনন্দের প্রকাশ। সে আনন্দ বর্ণে বর্ণে রেখায় রেখায় অপরূপ রূপ মাধুর্যের সৃষ্টি করেছে। তাঁর গান তাঁর কবিতা চিত্রধর্মী হয়েছে। রূপকল্পের অসঙ্কোচ ও স্বচ্ছন্দ প্রয়োগে কবি বিদেহী আনন্দের বার্তাকে রূপময় করে তুলেছেন আমাদের জন্ত। রূপকল্প ইন্দ্রধনুর বর্ণবিন্যাসে অনন্ত রূপমাধুরী বিস্তার করেছে। তবে এখানে এ কথা মনে রাখতে হবে যে, এই ফিরতি পথের গানে পূর্ণের পরশের প্রসাদ গুণটুকু ততদিন ছিল না যতদিন না কবি সীমার মধ্যেই অসীমকে প্রত্যক্ষ করে তাঁর এই অনন্তের জন্ত নিরন্তর অভিসারকে পরিহার করেছিলেন। যে দিন তিনি স্পর্শের মধ্যে স্পর্শাতীতের সন্ধান পেলেন, দৃশ্যের মধ্যে দৃশ্যাতীতকে দেখলেন দু'টি নয়ন ভ'রে সেদিন তাঁর জীবন কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে উঠল। তিনি বুঝলেন যে, তাঁর দেবতা তাঁর মাটির ঘরে নেমে আসবেন অমরার ঐশ্বর্য ত্যাগ ক'রে। তাই তাঁর কণ্ঠে শুনি গভীর প্রত্যয় ভরা পরম আশ্বাসের কথা :

> সকাল সাঁঝে সুর যে বাজে ভুবনজোড়া তোমার নাটে
>
> আলোর জোয়ার বেয়ে তোমার তরী আসে আমার ঘাটে।

অন্ন কী আর বুঝব কী বা, এই ত দেখি রাত্রি দিবা
ঘরেই তোমার আনাগোনা, পথে কী আর তোমায় খুঁজি।*

এই সত্যটির উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে কবিমনের পথে পথে চংক্রমণ স্তিমিত হয়ে আসে। কবি ঘরে ফেরেন। এবার তাঁর প্রত্যাবর্তনের পালা। যেদিন থেকে তাঁর ফিরতি পথে চলা সুরু হ'ল, সেদিন থেকে তাঁর উপভোগের সুরু। ফেরার পথে এখানে-ওখানে মহীরুহের শ্যামচ্ছায়ায় দু'দণ্ড বিশ্রামের অবসর আছে। তখন কবি দু'চোখ ভরে পরিবেশের শোভাটুকু দেখে নেন। এবার তিনি পত্রে, পুষ্পে, শ্যামশষ্পে সমৃদ্ধ অনন্ত যৌবনা ধরণীকে দেখে নেবার অবকাশ পেলেন—সে সৌন্দর্য আকণ্ঠ পান করলেন। অনন্তের পথে নিরন্তর ধাবমানতার নিরর্থক অবসাদ কেটে গেল। তাঁর আনন্দ গান হয়ে, সুর হয়ে ফুটে উঠল। কথায় কথায় বর্ণাঢ্য আলিম্পন আঁকলেন কবি। বাণী চিত্র অপূর্ব সুন্দর হয়ে উঠেছে কবির অহেতুক আনন্দের পরশ পেয়ে। খণ্ডচিত্র ও পূর্ণাঙ্গ চিত্রের সহায়তায় কবি গভীরত্বকে, দুরূহ ভাবকে, অন্তহীন আনন্দকে আমাদের মনের ঘাটে ঘাটে পৌছে দিয়েছেন। তাঁর আনন্দের প্রসাদ আমরা পেয়েছি। ঘটে ঘটে সে প্রসাদ অক্ষয় হয়ে আছে। রবীন্দ্রনাথ অনলস প্রয়াসে ছবির পর ছবি এঁকেছেন এই ফিরতি পথ চলায়। অনন্তের পথে রবীন্দ্রমানসের অভিসার ব্যর্থ না হলে, তিনি আবার সীমার মাঝে ফিরতেন না। তাঁর অভিসার চিরদিনই সেই অশেষের পলায়ন পথের দিকে চলত। আমরাও রবীন্দ্রকাব্যের অন্যতম সৌন্দর্যের আকর রূপকল্পের অনুপম সৌন্দর্যরস থেকে বঞ্চিত হতাম। কেন না কবি যখন অনন্তের পথে যাত্রী তখন তাঁর আনন্দ উপলব্ধি বা আনন্দ পরিবেশনের অবসর কোথায়? জীবন দেবতার ছলনাময় আহ্বানে কবি যখন ছুটছেন তখন তাঁর বিভ্রান্ত মনের চিত্র আমরা পাই 'চিত্রা' কাব্যগ্রন্থে:

মাঝে মাঝে যেন চেনা চেনা মতো
মনে হয় থেকে থেকে।
নিমেষ ফেলিতে দেখিতে না পাই
কোথা পথ যায় বেঁকে।
মনে হ'ল মেঘ, মনে হ'ল পাখি,
মনে হ'ল কিশলয়
ভালো করে যেই দেখিবার যাই
মনে হ'ল কিছু নয়।

* 'নিঃসংশয়'—গীতিমাল্য

এই হ'ল চলতি পথের বাস্তব চিত্র। সেখানে সবই অনির্দিষ্ট, রূপহীন, রসহীন। এই অবস্থা, অসম্পূর্ণ জগৎ ত' কাব্যের বিষয়বস্তু হ'তে পারে না। এই রূপহীন জগতের প্রকাশ যদি কাব্যে ঘটে তবে সে কাব্য প্রকৃত কাব্যপদবাচ্য হ'তে পারে না। তাই বলছিলাম যে রবীন্দ্রনাথের সমস্ত কাব্য হ'ল ফিরতি পথের গান। সে গানে ফুটে উঠেছে অনন্তকে আভাসে একটু দেখে নেওয়ার অপরিসীম আনন্দ। এর থেকেও বড় আনন্দ, মহত্তর আনন্দ অবশ্য কবি তখনই লাভ করেছেন যখন তিনি সীমার মধ্যে দেখেছেন সেই বিশ্বদেবতার আসন পাতা রয়েছে। সে কথা এখন থাক্। ফিরতি পথে কবি যে গান গাইলেন মনের আনন্দে, সে গানে আনন্দলোকের জাদু, নিত্যকালের মায়া। যে গান রূপ-সমৃদ্ধ, রসময় ও অপূর্ব ব্যঞ্জনামণ্ডিত, সে গানেই রূপকল্পের প্রতিষ্ঠা ও পরিণতি। রূপকল্পের সৃষ্টিতে কবির নিজের ভোগ সমৃদ্ধ হ'ল, মাধুর্যমণ্ডিত হ'ল আর অপরের উপভোগের ক্ষেত্রও বিস্তৃত হ'ল। এই হ'ল রবীন্দ্রকাব্যে রূপকল্পের জন্মকথা। বৈরাগ্য-সাধন মন্ত্র যাঁর জীবনমন্ত্র ছিল না সেই রবীন্দ্রনাথ ভোগের ক্ষেত্রকে রসময় করার জন্য রূপকল্পের প্রতিষ্ঠা করলেন তাঁর কাব্যে ও গানে।

কবি যে আনন্দরস আকণ্ঠ পান করেছেন তার স্বাদ তিনি অপরকেও দিতে চেয়েছেন পরিপূর্ণ রূপে। কিন্তু কবি-মানসের অশরীরী সে আনন্দের যথাযথ প্রকাশের ভাষা নেই ; কবির সে অনুভূতি কবির কাছেই সত্য। ভাষায় তার রূপায়ণ করতে হয়। এমন করেই রূপকল্পের সৃষ্টি হয়েছে রবীন্দ্রনাথের কাব্যে ও গানে। আমরা এখন এই রূপকল্পের চরিত্র বিচার করব।

কবিগুরুর কল্পনায় নানা ভাবনা রূপ পরিগ্রহ করেছে—তার বেশবাস, তার বর্ণবিন্যাস অপূর্ব। নির্বিশেষ বা অ্যাবষ্ট্র্যাক্টকে বিশিষ্টরূপে প্রকাশ করা হ'ল কবিমানসের রীতি। রবীন্দ্রনাথ এই রীতির ব্যতিক্রম নন। কলমের আঁচড় কেটে কেটে ছবি তিনি অনেক এঁকেছেন—তাদের কোনটি লিরিকধর্মী, আবার কোনটি বা হয়েছে এপিকের সমগোত্রীয়। কোথাও-বা ব্যঞ্জনা পাঠককে এক নতুন কল্পলোকের প্রাণকেন্দ্রে নিয়ে গিয়ে উপস্থিত করেছে। কোথাও অল্প কথায় ছোট প্রচ্ছদপটে ছোট কথাচিত্র ফুটেছে আবার কোথাও বা অনেক কথায় একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্রের সৃষ্টি করেছেন কবি। ছোট ছোট আঁচড়ে, অল্প কথায় যে খণ্ডচিত্র রবীন্দ্রনাথ এঁকেছেন তার রূপমাধুর্য কম নয়। উদাহরণ দিই। রূপহীন মৃত্যুকে রূপময় করেছেন, সহজ করেছেন, দুর্জ্ঞেয় মৃত্যু রহস্যকে

আমাদের বোধের কাছে স্বচ্ছ করে তুলে ধরেছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর বর্ণাঢ্য রূপকল্পের সহায়তায়। যে রূপে মৃত্যুকে দেখি রবীন্দ্রনাথের কাব্যে, সে রূপ ত' ভীষণ নয়। মৃত্যুর সে মোহনরূপ দেখে আমরা মুগ্ধ হই। মনে হয় মৃত্যু আমাদের অতি প্রিয়; সে প্রাণের অতি আপনার জন—আত্মার আত্মীয়। ঋষি-কবির দৃষ্টিতে যে রূপটি ধরা পড়েছে, সে রূপ তো আমাদের চোখে ধরা পড়ে না। কবির চোখে যা সত্য হয়েছে সে রূপ ত' আমাদের চোখে সত্য হতে পারে না। কারণ আমাদের চোখ ত' তৈরি নয়। ঋষির ধ্যাননেত্রে যে রূপ ধরা পড়ে সে রূপ ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। সে নিবিড়তম উপলব্ধির ভাষা নেই। তাই কবি রূপকের আশ্রয় নেন। কবি ছবি আঁকেন—সে হ'ল কথা দিয়ে আঁকা ছবি। তিনি মৃত্যুকে বররূপে কল্পনা করেন; পথশ্রান্ত মানুষের প্রাণ যেন নববধূ। বর আসছে তার নববধূকে বরণ করে নেবার জন্য। প্রাণ শিহরিত, কম্পমান। নববধূর সঙ্গে মিলনের প্রত্যাশা তার দেহে মনে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কুশলী লেখনীর টানে মধুর রসঘন কথাচিত্রের সৃষ্টি করলেন :

> ওগো মৃত্যু সেই লগ্নে নির্জন শয়ন প্রান্তে এসো বরবেশে,
> আমার পরাণবধূ ক্লান্ত হস্ত প্রসারিয়া বহু ভালোবেসে
> ধরিবে তোমার বাহু, তখন তাহারে তুমি মন্ত্র পড়ি নিয়ো,
> রক্তিম অধর তার নিবিড় চুম্বন দানে পাণ্ডু করি দিয়ো।

কবি মনন-সাধনের দুর্লভ মুহূর্তে যে সত্যটি উপলব্ধি করেছিলেন তাকে তিনি সর্বজনবোধ্য ভাষায় পরিবেশন করলেন। যে ছবি তিনি আঁকলেন তার আবেদন সর্বকালের সর্বদেশের মানুষের কাছে সত্য। অতি দুরূহ তত্ত্বকে তিনি ঘরোয়া কথায় পরিবেশন করলেন। সকলের মনের কাছে কবির অনুভূতি সত্য হয়ে উঠল বর্ণনার প্রসাদ গুণে। এই ধরনের রূপকল্পের উদাহরণ রবীন্দ্রকাব্যের সর্বত্র রয়েছে। মৃত্যু সম্বন্ধেই রবীন্দ্রনাথের আর একখানি অনবদ্য কথাচিত্রের কথা বলি। মৃত্যুকে কবি জীবনের জন্মদাত্রী মাতা হিসাবে দেখেছেন। সে আর এক মহনীয় রূপ; কবি-মনের সে আর এক নিবিড় উপলব্ধির কথা। জীবন ও মৃত্যু যেন দিন আর রাত্রি; তারা অবিচ্ছিন্ন ধারায় একে অপরের অনুগমন করে। মৃত্যুর কোলেই জীবন আবার নতুন করে জন্ম নেয় পুরাতনের জীর্ণ জরাকে বারিয়ে দিয়ে। মৃত্যু হ'ল জীবনের উৎস —নবীন প্রাণধারার গঙ্গোত্রী। এ সত্য কবি-দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে। কবি তাকে পরিবেশন করলেন আমাদের কাছে একটি সুন্দর ছবি এঁকে :

দিনান্তের মুখ চুম্বি রাত্রি ধীরে কয়
আমি মৃত্যু তোর মাতা নাহি মোরে ভয়।
নব নব জন্মদানে পুরাতন দিন,
আমি তোরে করে দিই প্রত্যহ নবীন।

এ ত গেল জীবন মৃত্যুর রহস্যের কথা, লোকায়ত ও লোকাতীতের সম্বন্ধের কথা। আর একটি সম্বন্ধের কথা বলি। প্রেমের পটভূমিতে নরনারীর মধুর সম্পর্ক যুগে যুগে কবি ও সাহিত্যিকদের রসসৃজনে প্রেরণা যুগিয়েছে। রবীন্দ্র-কাব্যে প্রেমের বহু বিচিত্র রূপ ফুটে উঠেছে নানা চিত্রের মাধ্যমে। নারীর চিরন্তন লীলা বৈচিত্র্য মানুষের জীবনের প্রেম-আখ্যানকে নিত্য নতুন রূপ এবং রঙে সুন্দর করেছে। পুরুষ পাছে সহজে নারীর প্রেম-লীলার ছলটুকু ধরে ফেলে তাই ত তার প্রেমলীলায় অন্তহীন ছলাকলা। পুরুষ পাছে সহজে নারীকে বোঝে তাই ত কত না ছলে নারী তার সহজ রূপটিকে প্রচ্ছন্ন করে রেখেছে; এ ছলাকলাপূর্ণ প্রেমলীলার পরিণতি আত্মনিবেদনে। নারীর সেই চরম আত্মনিবেদনের ধারা অনুপম রূপকের সাহায্যে কবি নিবেদন করেছেন রসিকজনের কাছে তাঁর 'মহুয়া' কাব্যগ্রন্থে। আমি 'অপরাজিত' কবিতাটির কথা বলছি:

বিমুখ মেঘ ফিরিয়া যায় বৈশাখের দিনে
অরণ্যেরে যেন সে নাহি চিনে;
ধরে না কুঁড়ি কানন জুড়ি, ফোটে না বটে ফুল।
মাটির তলে তৃষিত তরুমূল;
ঝরিয়া পড়ে পাতা,

বনস্পতি তবুও তুলি মাথা
নিঠুর তপে মন্ত্র জপে নীরব অনিমেষে
দহনজয়ী সন্ন্যাসীর বেশে।
দিনের পরে যায় রে দিন রাতের পর রাত্তি—
শ্রবণ রহে পাতি
কঠিনতর যবে সে পণ দারুণ উপবাসে
এমন কালে হঠাৎ কবে আসে
উদার অরুণ

আষাঢ় মাসে সজল ভুভক্ষণ ;
পূর্বগিরি আড়াল হ'তে বাড়ায় তার পাণি ;
করিয়ো ক্ষমা, করিয়ো ক্ষমা, গুমরি উঠে বাণী ;
নামিয়া পড়ে নিবিড় মেঘরাশি ;
অশ্রুবারি বন্যা নামে, ধরণী যায় ভাসি ॥
ফিরালে মোরে মুখ,
এ শুধু মোর ভাগ্য করে ক্ষণিক কৌতুক।

নারীর প্রেমলীলায় বৈচিত্র্যটুকু তার আত্মনিবেদনের রীতিটুকু অতি সুন্দর করে কবি আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন মেঘ ও বনস্পতির রসঘন একটি চিত্র সৃষ্টি ক'রে। সহজ কথা সোজা করে বললে বক্রোক্তির রসটুকু আর আমরা পাই না। তাই প্রাচীন আলংকারিকেরা কেউ কেউ বক্রোক্তিকে কাব্য প্রাণ আখ্যা দিয়েছেন। নারীর আত্মনিবেদনের সামান্য ঘটনাটুকুকে কি বলিষ্ঠ রেখায়, কি বর্ণাঢ্য ব্যঞ্জনায় কবি অনন্ত করে তুলেছেন। এটুকু হ'ল কবি কৃতি। নিপুণ শব্দচয়নের দ্বারা কবি কথা সাজিয়ে সাজিয়ে ছবি এঁকেছেন— কথার ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করেছেন। অনুপম রূপকল্পের যোজনায় রবীন্দ্রনাথ অসাধারণ। এবার শেষের দিকের রবীন্দ্রকাব্য থেকে একটি উদাহরণ দিই। রবীন্দ্রনাথের একেবারে শেষজীবনের কাব্যে রং হয়ত ফিকে হয়ে এসেছে ; কিন্তু কথার অভিনব ব্যবহারে ব্যঞ্জনা গভীরতর হয়েছে। তাঁর কবিতা তাঁর ছবির মতই রংচঙে সাজপোশাক বদল করে আসরে নেমেছে অতি সহজ আটপৌরে পোশাকে। তাতে তার সৌন্দর্য ক্ষুণ্ণ হয় নি। বরং সে স্বাভাবিক সৌন্দর্যের দ্যুতি শতগুণ বর্ধিত হয়েছে। শেষ জীবনের কাব্যে বর্ণনায় তেমন বাহাদুরি নেই, শেষজীবনের ছবিতে রঙের কারিগরির একান্ত অভাব। তাই ত তারা এত সুন্দর হতে পেরেছে, তাই ত তারা বরণীয় হয়েছে বিশ্বের রসিকজনের সভায়। অনেক কথা সাজিয়ে ছন্দের রং দিয়ে আর তিনি কথা চিত্র আঁকেন নি। এখানে-ওখানে সামান্য কয়টি আঁচড় টেনে যেমন করে ছবিকে ফুটিয়েছেন ঠিক তেমনি করেই সামান্য কয়েকটি কথার ব্যবহার করে তিনি অপূর্ব সুন্দর ছবি তুলে ধরেছেন আমাদের মনের সামনে। এখানে অনেক কথার ভিড় নেই। অল্প কথায় তিনি যে জগতের প্রবেশ পথে আমাদের নিয়ে গেলেন সেখানে আমাদের কল্পনা মুক্তি পেল সৃষ্টির আনন্দকে পুরোপুরি আস্বাদন করার জন্য। তাই সেটাই হ'ল শিল্পীর সার্থকতর সৃষ্টি। আমরা

'হঠাৎ দেখা' কবিতাটির কথা বলছি। এককালে যাদের মধ্যে ভালবাসা ছিল এমন দু'টি নরনারীর হঠাৎ দেখা হয়েছে রেলের কামরায়। ভাবপ্রবণ পুরুষের স্মৃতি রোমন্থন দ্রুতগামী। তাই সে হঠাৎ নিবিড় কণ্ঠে মেয়েটিকে প্রশ্ন করে যে তাদের প্রেম কি একেবারেই মরে গেছে? মেয়েটি এই আকস্মিক প্রশ্নে একটু থেমে জবাব দেয়, 'রাতেই সব তারাই আছে দিনের আলোর গভীরে।' এক অতীন্দ্রীয় সত্যের প্রকাশ ঘটলো রূপকের সাহায্যে। প্রেম মৃত্যুঞ্জয়ী। যেমন করে দিনের আলোর অন্তরালে রাতের সব তারাই লুকিয়ে থাকে ঠিক তেমনি করেই বর্তমানের প্রত্যক্ষতার অন্তরালে অপ্রত্যক্ষ অতীতের প্রেম শুধু আত্মগোপন করেছে। তার মৃত্যু হয় নি। এমনিতর রূপকল্পের ব্যবহারে কবির আশ্চর্য নৈপুণ্য প্রকাশ পেয়েছে তাঁর অসংখ্য কবিতায় এবং গানে। আমরা হৃদয় যমুনা, সমুদ্রের গতি, মানস সুন্দরী, আলোকধেনু, বিজয়িনী প্রমুখ কয়েকটি কবিতার কথা বিশেষ করে উল্লেখ করছি। এই রূপকের ব্যবহারে বাস্তবিকই রবীন্দ্রনাথের জুড়ি নেই, রূপকল্পের ব্যবহারে কবিগুরু অনন্য সাধারণ।

আগে আমরা বলেছি যে রবীন্দ্রনাথের রূপকল্প কোথাও বা গীতিকাব্য ধর্মী আবার কোথাও বা রূপকল্পে মহাকাব্যের মহৎ ধর্মের ব্যঞ্জনা আছে। এ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের কাব্য সাহিত্য থেকে আমরা যে কয়টি উদ্ধৃতি আহরণ করেছি তা মূলতঃ লিরিকধর্মী। এবার আমরা এপিকধর্মী রূপকল্পের একটি উদাহরণ দিচ্ছি। এ কথা মনে রাখতে হবে যে, আমরা তাকেই মহাকাব্যধর্মী বলছি যে রূপকল্পের আধার পূর্ণতর ও ব্যাপকতর হয়েছে। এখানে কবি শুধুমাত্র কয়েকটি কথার সাহায্যে একখানি খণ্ডচিত্র রচনা করে গভীরতর অর্থটুকু ব্যঞ্জিত করেন নি। এই ধরনের রূপকল্পে মূল বিষয়বস্তুকে পরিস্ফুট করার জন্য কবি আনুষঙ্গিক বিষয়গুলিরও অবতারণা করেন। এপিক ধর্মী রূপকল্পে তাই বড় ক্যানভাসের দরকার। সেখানে অনেক কথা, অনেক ছবি ভিড় করে। মহাকাব্যের আখ্যান বস্তু যেমন সুবৃহৎ পটভূমিকাকে আশ্রয় করে ঠিক তেমনি ধারা এপিক ধর্মী রূপকল্পে অনেক কথায়, নানান রঙে একটি পূর্ণাঙ্গ কথাচিত্র আঁকার প্রয়াস আছে। শুধুমাত্র ইঙ্গিতে-আভাসে মূল ভাবটিকে রূপায়িত করার কথা কবি ভাবেন না। কবি তাঁর গভীর অনুভবকে পরিপূর্ণ রূপে ফুটিয়ে তোলার জন্য কথার পর কথা সাজিয়ে ছবির পরে ছবি এঁকে চলেন। সবটা মিলিয়ে যে আবেদন রসিকজনের কাছে গিয়ে পৌঁছায় তা অপূর্ব মাধুর্যরসে পরিপূর্ণ। 'হৃদয় যমুনা' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ এই ধরনের এপিকধর্মী রূপকল্পের

ব্যবহার করেছেন। মানুষের হৃদয়কে কবি যমুনার সঙ্গে তুলনা করেছেন। হৃদয়-যমুনার দুই তটের, তার নীল জলের সে কি বাস্তবানুগ বর্ণনা। নদীতীরের সবটুকু সৌন্দর্য কবি মন আহরণ করেছে নিখুঁত ভাবে, তার পরে সে সৌন্দর্যকে হৃদয় যমুনার দুই তীরে প্রতিষ্ঠিত করেছে। বর্ষার যমুনা প্রাণবেগে উচ্ছল। তার দুই তীরে মেঘ নেমেছে নদীর জল বর্ষণের প্রত্যাশায় অধীর। শ্যামদূর্বা দলে উভয় তীর সমাচ্ছন্ন, বনস্থলী পুষ্পগন্ধে আমোদিত। সে শোভায় মানুষ মুগ্ধ হয়; নারী কলস ভাসিয়ে দেয় জল নিয়ে ঘরে ফেরার কথা ভুলে গিয়ে। তার মনে মনে স্মৃতি রোমন্থন চলে বঞ্জুলবনের মায়া তাকে মোহগ্রস্ত করে। যদি সে নারী স্নানার্থিনী হয় তবে তারও রসঘন চিত্র আছে এই কবিতাটিতে। যমুনার জলে মানুষ ত শুধু গাগরি ভরে নিতেই যায় না; স্নানার্থিনীদের ভীড়ও ত সেখানে হয়।

তাই কবি তাঁর মানসীকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন যে তাঁর হৃদয় যমুনাতে তাঁর মানসী অবগাহন-স্নানও সেরে নিতে পারেন। সে সুনীল জলের সোহাগ বড়ই মধুর। তার ভাষাহীন স্পর্শে অকথিত অনেক কথাই বলা হবে। কবির মানসী তাঁর হৃদয়ের মর্মবাণীটুকু গ্রহণ করতে সক্ষম হবেন। সবশেষে হৃদয়-যমুনার নীল জলে আত্মবিলুপ্তি ঘটাবার জন্ম কবি তার মানসীকে আহ্বান করেছেন। পরিপূর্ণ মিলন হয় এই আত্মবিলুপ্তির মধ্য দিয়ে। আত্মনিবেদনের ধারা সার্থক হয় দয়িতার পরিপূর্ণ আত্মদানে। কবির হৃদয় যমুনার অতলান্ত গভীরতা; পরিপূর্ণ নৈঃশব্দ সেখানে। কবি তাঁর মানসীকে জীবনের সমস্ত জালজঞ্জাল তীরে ফেলে রেখে সেই নিস্তব্ধ অতলে অবগাহনের জন্ম আহ্বান জানাচ্ছেন। সেখানে সকল কর্মের অবচ্ছেদ, সমস্ত ভাবনার শান্তি। সেই মহাশান্তিকে কবি মৃত্যু আখ্যা দিয়েছেন। এই পূর্ণাঙ্গ-চিত্রটির সঙ্গে পূর্ব-উদ্ধৃত খণ্ডচিত্র গুলির একটা বর্ণগত প্রভেদ রয়েছে। শেলীর স্কাইলার্ক কবিতাটির কথা আবার বলি। কয়েকটি লিরিকধর্মী রূপকল্পের সমাবেশ হয়েছে সেখানে। তাকে আমরা এপিকধর্মী বলব না কারণ সব কয়টি চিত্রই খণ্ডচিত্র—টুকরো টুকরো করে পৃথক পটভূমিতে আঁকা হয়েছে। আর রবীন্দ্রনাথ একখানি সুপরিসর ক্যানভাসে সুবৃহৎ চিত্রের অবতারণা করেছেন তাঁর 'হৃদয়-যমুনা' কবিতায়। শেলীর চিত্রগুলি স্বয়ং-প্রধান, পৃথক এবং অসংলগ্ন। তারা পৃথক ভাবে একই ভাবকে দ্যোতিত করেছে। আর 'হৃদয়-যমুনা' কবিতায় অনেক গুলি ভাব একসঙ্গে দ্যোতিত হয়েছে একটি মূল ভাবের উদ্দীপনের জন্ম এবং

[illegible] ভাবটির একটি বৃহৎ পটভূমিকায় বিস্তার—একেই আমরা এপিকধর্মী রূপকল্প বলছি। এই ধরনের এপিকধর্মী রূপকল্প সকল সাহিত্যেই আছে। রবীন্দ্র-কাব্যে উভয়বিধ রূপকল্পের প্রাচুর্য বিস্ময়কর। এই ভাবসত্তার খণ্ডচিত্র ও পূর্ণচিত্রগুলি রবীন্দ্র-কাব্যকে প্রভাত সূর্যের অপূর্ব রূপচ্ছটায় সুষমা মণ্ডিত করেছে।
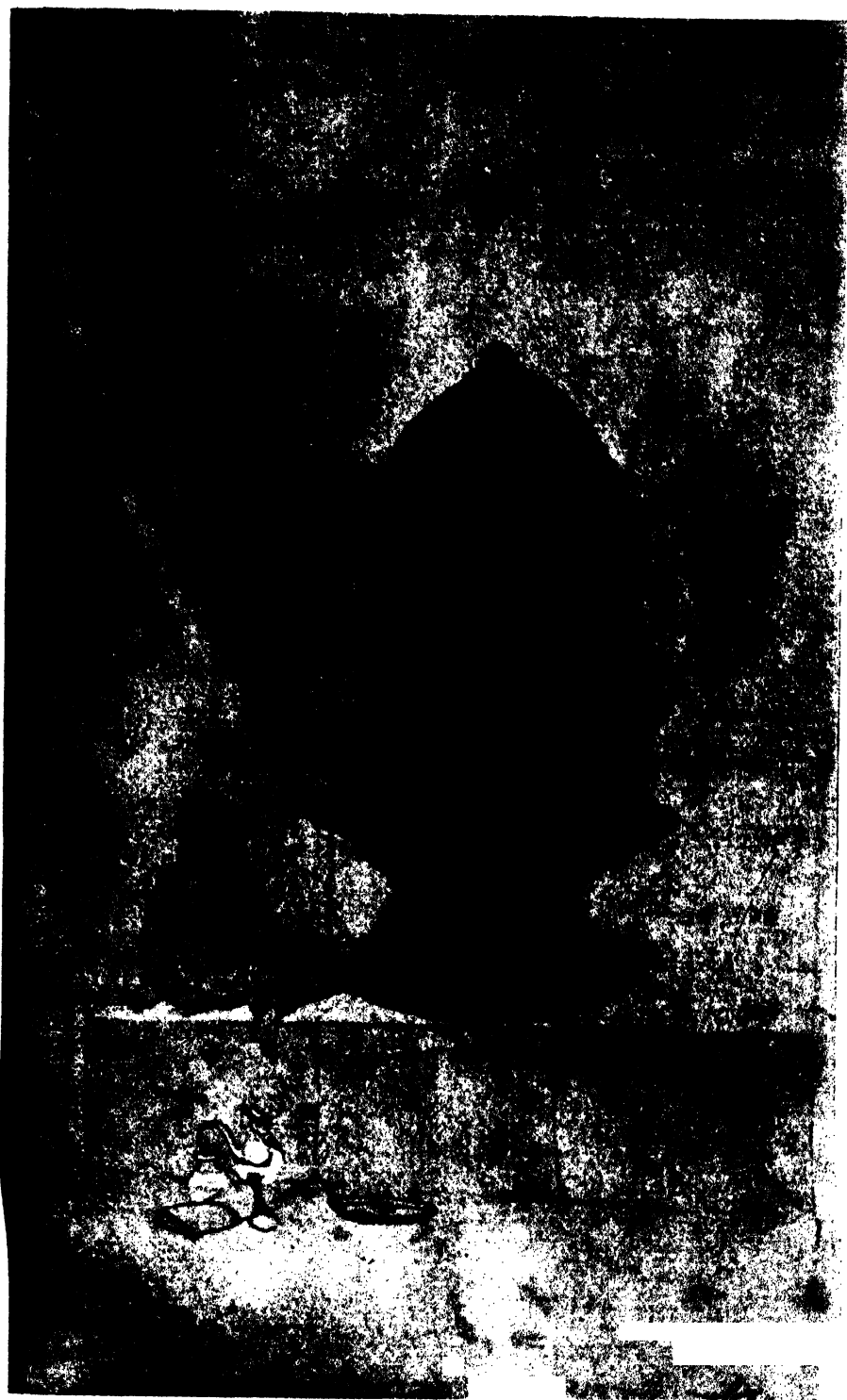
[অবনীন্দ্রনাথ অঙ্কিত]

রবীন্দ্রভারতীর সৌজন্যে

অবনীন্দ্রনাথের শিল্পদর্শন

মনস্বী নন্দনতত্ত্ববিদ্ অবনীন্দ্রনাথের নন্দনতত্ত্বে সিংক্রিটিজমের লক্ষণ হয়তো খুঁজে পাবেন ; সেই সন্ধান এবং আবিষ্কার অনুসন্ধিৎসু পাঠককে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের আধুনিক ও প্রাচীন নন্দনতত্ত্বের বিভিন্ন শাখায় বিচরণে সোৎসুক করে তুলবে। বুদ্ধঘোষ, আনন্দবর্ধন, আরিস্ততল, ক্রোচে প্রমুখ অনন্য-সাধারণ আলংকারিক ও সৌন্দর্যদর্শনবেত্তারা নন্দনতত্ত্বের আলোচনা ক্ষেত্রে অবনীন্দ্রনাথের সমানধর্মা। ভারতীয় শিল্প সাধনার ঐতিহ্যকে বিশ্বসাধনার সঙ্গে তিনি যুক্ত করেছিলেন তাঁর শিল্পচেতনায় পূর্ব, পশ্চিম, বিগত ও অনাগতকাল বিধৃত হয়ে আছে। এই কাল-সীমাকে, এই ঐতিহ্যবাহকতাকে অনায়াসে অতিক্রম করলেন অবনীন্দ্রনাথ তাঁর কালজয়ী সৃষ্টিতে, মননে ও চিন্তনে। শিল্প সৃষ্টিতে তাঁর সাধনা ছিল স্বরাজ্য সাধনা। তাঁর শিল্প চিন্তায় ও শিল্পদর্শনে, তাঁর মননের এই স্বরূপ লক্ষণটুকু হ'ল পরবশ্যতার সম্পূর্ণ অস্বীকার। এই বশ্যতাটুকু, তা যে কোন রূপেই আসুক না কেন, যে বলিষ্ঠ শিল্পতত্ত্বের প্রণয়ন পরিপন্থী এটি তিনি মনে প্রাণে গ্রহণ করেছিলেন। তাই তো 'উমার তপস্যা' শীর্ষক যে বিখ্যাত চিত্রটি আচার্য নন্দলাল এঁকে ছিলেন সে সম্বন্ধে শিল্পীগুরু অবনীন্দ্রনাথ শিষ্য নন্দলালকে যে নির্দেশ দিয়েছিলেন অনবধানবশতঃ তা প্রত্যাহার করে নিতে তিনি বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করেন নি। শিল্পীর সত্য শিল্পীর একান্ত আপন ধন। শিল্পী তাঁকে সৃষ্টি করেন, অবনীন্দ্রনাথ বললেন, আত্মপ্রেরণায়। সেই শিল্পসৃষ্টির বিচার করেন কলা রসিকেরা ; অন্ধের হস্তিদর্শন ঘটে। নানান জনে নানান কথা বলেন। তাই ভগিনী নিবেদিতার মতো শুদ্ধচিত্ত উৎসর্গীকৃত প্রাণা কলারসিক যখন অবনীন্দ্রনাথের বিশ্বজনীনতাকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন তখন দেখি ভারতীয় কলা সাধনার অন্যতম পথিকৃৎ আচার্য কুমারস্বামী অবনীন্দ্রনাথের চিত্রকলায় শুধুমাত্র তাঁর 'ভারতীয়ত্বটুকুকে' প্রোজ্জ্বল মূর্তিতে প্রত্যক্ষ করলেন। তিনি অবশ্য শিল্পীর শিল্পসাধনায় ইউরোপীয় ও জাপানী রীতিটুকুও প্রত্যক্ষ করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে এ কথা স্মরণ করা দরকার যে অবনীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে যে 'ভারতীয়ত্বের' গুণ আরোপিত হয়েছে তা তিনি উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেন নি ; তা তিনি অর্জন করেছিলেন অনেক আয়াসে বহু সাধনার ফলশ্রুতি হিসেবে। অবনীন্দ্রনাথ বললেন, সূর্যের কণা দিয়ে গড়া

কোনার্ক মন্দির, প্রেমের স্বপন দিয়ে ধরা তাজ,এ গুলোতে[১] কী ভারতীয় বলেই আমাদের জন্মগত অধিকার ? ভারতবাসী বলেই কী এগুলো আমাদের হল ? তিনি জোরের সঙ্গে বললেন, না, তা হ'তেই পারে না। এই সব শিল্পের নির্মিতি, এদের আমরা ভারতীয় হিসেবে নিজের বলবার অধিকার অর্জন করব. শুধু সেই দিন, যেদিন শিল্পকে আমরা লাভ করব, তার পূর্বে নয়। শিল্প সেদিন আমাদের হবে, যেদিন জগৎ বলবে এ সবই তো আমাদের !—আমাদের শিল্পও তোমাদের। আমাদের দেশে শিল্পশাস্ত্রীরা শিল্পকে 'অনন্তপরতন্ত্রা' আখ্যা দিয়েছেন। শিল্পের সাধনায় যিনি আত্ম-নিমগ্ন, কি দেশের কি বিদেশের প্রাচীন এবং নবীন সব শিল্পের ভোগ তারই ভাগ্যে ঘটে। 'দেশ দেশ, করে সোচ্চার হ'য়ে যে জাতীয়তার ঘোষণা আমরা করছি, অবনীন্দ্রনাথ তার বিরোধিতা করেছেন শিল্পের ক্ষেত্রে। রহস্য ক'রে তিনি বললেন যে আমাদের দেশ ব'লে ডাক দিলে দেশটা হয়তো বা আমার হ'তেও পারে, কিন্তু দেশের শিল্পের উপরে আমার দাবী যে গ্রাহ্য হবে না, সেটা ঠিক। তা যদি হ'ত তবে কালাপাহাড় থাকলে সেও আজ আমাদের সঙ্গে ভারতশিল্পের চূড়া থেকে প্রত্যেক পাথরটির উপরে সমান দাবী দিতে পারতো ; কেন না কালাপাহাড় ছিল ভারতবাসী। শিল্পীগুরু সেই অধিকার অর্জন করেছেন জীবনব্যাপী সাধনা দিয়ে। প্রাচীন কবিরা কাব্যকথা, শিল্পকথা, গীতিকথাকে 'রসরুচিরা' আখ্যা দিয়েছিলেন ; শিল্পীগুরু এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করেছিলেন ; শিল্প হলাদৈকময়ী, শিল্প অনন্যপরতন্ত্রা। রসিক কবি এঁদেরই শিল্প বরণ করেন। তা সে ভারতীয়ই হোক বা অন্য দেশীয়ই হোক, তাতে কিছু এসে যায় না। তাই ত' শিল্প আলোচনার ক্ষেত্রে ভৌগোলিক সীমাটা একেবারেই প্রাসঙ্গিক নয়। শ্রীমৎ ওকাকুরা যে অধিকাংশ ভারতীয়ের থেকে অধিক ভারতীয় ছিলেন, শিল্পের শ্রীক্ষেত্রে সে কথা শিল্পগুরু আমাদের বলেছেন, শুনিয়েছেন এই ভারতীয় "শিল্পের যথার্থ অনুরাগী বিদেশীটির ইতিহাস।" শিল্পের জগতে তাঁর সব শিল্পেই অধিকার ছিল—ভারতীয়, জাপানী, ইউরোপীয়—কেন না তিনি শিল্পে অধিকারটুকু অর্জন করেছিলেন। ওকাকুরার মত অবনীন্দ্রনাথও শিল্পপথের পথিক ছিলেন বলেই তাঁরও সব শিল্পেই অধিকার ছিল। তাঁকে ভারতীয় রূপে চিহ্নিত করলে তাঁকে বোধহয় সম্মানের গুরুভারটুকু দিতে চেয়ে আমরা তাঁর সম্মান লাঘবই করে বসব। 'শিল্পের অধিকার' প্রবন্ধে তিনি

(১) শিল্পে অধিকার : বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী দ্রষ্টব্য।

বললেন[১] জাপানের শিল্প আয়োজন, আমাদের শিল্প আয়োজন, ইউরোপের শিল্প আয়োজন—সবগুলো দিয়ে খিচুড়ি রাঁধলে রস সৃষ্টি হ'তে পারে কিন্তু সেটাতে শিল্পরসের আশা করাই ভুল। প্রত্যেকে স্বতন্ত্রভাবে মনের পাত্রে শিল্পরসকে ধরবার যে আয়োজন ক'রে নিলে সেইটেই হ'ল ঠিক আয়োজন তাতেই ঠিক জিনিসটি পাওয়া যায়।...আর্টিষ্টের অন্তর্নিহিত অপরিমিতি (বা ইন্‌ফিনিটি) আর্টিস্টের স্বতন্ত্রতা (ইনডিভিজুয়ালিটি)—এই সমস্তের নির্মিতি নিয়ে যেটা এলো সেইটেই আর্ট।" এই শিল্পের প্রথম এবং প্রধান গুণ হ'ল তার সিমপ্লিসিটি বা আড়ম্বরশূণ্যতা; আড়ম্বরের বাহারকে বাদ দিলেই শিল্পের ভৌগোলিক সীমায় অলংকরণ শিল্পের গা থেকে খসে পড়ে গেল। শিল্প তার স্বকীয় সত্তায় উজ্জ্বল হ'য়ে দেখা দিল; তা মোঘল, রাজপুত, গ্রীক বা বাইজান্তীয় কোনটাই নয়। এই যুক্তি পদ্ধতির সূত্র ধরেই অবনীন্দ্রনাথ বললেন অলস শিল্পীর হাতে তার পূর্বসূরীদের শিল্পের উত্তরাধিকার কখনই এসে পৌছায় না। তা যদি পৌছাত তবে অলস মানুষও শিল্পী হ'য়ে উঠত। অবনীন্দ্রনাথ এর ঘোরতর বিরোধী। তিনি বললেন 'অলস্য কুতো শিল্পং?" আমাদের দেশে পূর্বে বারো মাসে তেরো পার্বণ ছিল, সে জন্যে সেকালে কাজেরও কামাই হয় নি, জীবনেরও কমতি ছিল না—শিল্পেরও নয়, রসেরও নয়, রসিকেরও নয়। অতএব বোঝা গেল অলস জীবন শিল্পীর নয়; আর তা নয় বলেই শিল্পে অধিকার জন্মগত বা প্রথাগত নয়; তা অর্জন-সাপেক্ষ। আর অর্জন-সাপেক্ষ বলেই অবনীন্দ্রনাথ একটা সুদীর্ঘ জীবনের সাধনা দিয়ে তথাকথিত জাপানী, ইউরোপীয় এবং ভারতীয় শিল্প পদ্ধতিকে আয়ত্ত ক'রে আত্মস্থ করেছিলেন। শুধুমাত্র আয়ত্ত করলে তাঁকে ইক্‌লেক্‌টিক (Eclectic) আখ্যা দিতাম; আত্মস্থ করেছিলেন বলেই তাকে 'সিংক্রিট' আখ্যা দিয়েছি।

যে সিংক্রিটিজমের কথা বললাম তা হ'ল অবনীন্দ্রনাথের নন্দনতত্ত্বের কেন্দ্র-ধারণা। শিল্প দার্শনিক হিসেবে অবনীন্দ্রনাথ যে সব তত্ত্বের সমন্বয়ের প্রয়াসী হ'লেন তা হ'ল শিল্পের সুবিস্তৃত পরিসরে সৌন্দর্যসাধনা ও কলাসাধনা সমার্থক কি না; আর তারা যদি সমার্থক হয় তা হ'লে সত্যের সঙ্গে তাদের কি কোন প্রাসঙ্গিক সম্বন্ধ আছে? অর্থাৎ এ প্রশ্ন করা চলে যে মানুষের শিল্পসাধনা কি সৌন্দর্য-সাধনারই নামান্তর? রং তুলি দিয়ে যে মূর্তি শিল্পী গড়ে তা কি বাস্তবের প্রতিচ্ছায়া মাত্র? এই বাস্তব বলতেই বা আমরা কি বুঝি? যে

১। বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী দ্রষ্টব্য।

সত্য বস্তুকে আশ্রয় করে থাকে অর্থাৎ বস্তুগত সত্য তা-ই কি বাস্তব? যদি আমাদের বস্তু-ধারণার সঙ্গে সত্য-ধারণাকে এইভাবে মিশ্রিত করে তুলি তা হ'লে শিল্প কি শুধুমাত্র অনুকৃতি-আশ্রয়ী হবে? শিল্পীগুরু যখন তাঁর 'বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী' গ্রন্থে আলোচনা প্রসঙ্গে এই সব সমস্যার সমাধান খুঁজতে চেয়েছেন তখন আমরা প্রত্যক্ষ করেছি কোথাও তিনি গ্রীক মনীষী আরিস্ততলের কোথাও বা ভারতীয় পণ্ডিত আনন্দবর্ধনের আবার কোথাও বা জার্মান দার্শনিক হেগেলের চিন্তার সামিল হয়েছেন; তাঁর চিন্তার সামীপ্যটুকু আমাদের ঔৎসুক্যকে প্রাণবান করেছে। আনন্দবর্ধনের মতই তিনি ব্যঞ্জনার কথা বলেছেন। শিল্পপ্রাণ হ'ল ব্যঞ্জনা। অবনীন্দ্রনাথ একে বললেন 'লাবণ্য'। এই 'লাবণ্যটুকু' শিল্পকর্মের মধ্যে শিল্পীর অসাধারণ অবদান। এই 'লাবণ্যটুকুই শিল্পকে শিল্প পদবাচ্য করে। পশ্চিম আকাশের সূর্যের আলো এসে পড়ল পাহাড়ের চূড়ায়; আর শিল্পী প্রত্যক্ষ করলেন সেই রূপে আর এক পৃথিবী আর এক জগৎ। সে জগতে দুঃখ আছে, বিরহ আছে; আর সেই বিরহ থেকে অবনীন্দ্রনাথ আঁকলেন উমার পতিগৃহে প্রত্যাবর্তনের ছবি। শিল্পসৃষ্টি হ'ল, সুন্দরের প্রতিষ্ঠা ঘটল; তবে তারা সত্য বা বাস্তবকে অনুসরণ করল না। শিল্পী এই অবাস্তব লাবণ্যকে সৃষ্টি করলেন প্রাকৃতিক দৃশ্যে। আবিষ্কার করলেন সেই লাবণ্যের উৎসকে পরাপ্রাকৃতিক রহস্যের মধ্যে। অবনীন্দ্রনাথ সেই শিল্পসৃষ্টির কথা বললেন যা প্রকৃতির ঐশ্বর্যের অন্তস্তলে প্রবেশ ক'রে তার স্বরূপটুকু উদ্ঘাটিত করে। শিল্পীগুরু শিল্পীর দৃষ্টি ও তার সৃষ্টির পারস্পরিক সম্বন্ধটুকু ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বললেন;[১] "সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে সৃষ্টির দিকে এই অভিনিবিষ্ট দৃষ্টি—এইটুকুই ভাবুকের সাধনার চরম হ'ল তা ত' নয়, সৃষ্টির বাইরে যা তাকেও ধরবার জন্যে ভাবুক আর এক নতুন ক্ষেত্র খুললেন—খুবই প্রখর দৃষ্টি যার এমন যে দূরবীক্ষণ যন্ত্র তাকেও হার মানালে মানুষের এই মানস ক্ষেত্র, চোখের দৃষ্টি যেখানে চলে না—দূরবীক্ষণের দূরদৃষ্টিরও অগম্য সে স্থান। মানুষ এই আর এক নতুন দৃষ্টির সাধনায় বলীয়ান হয়ে নিজের মনের রেখা দিয়ে বিশ্ব-রাজ্যের পরপারেও সন্ধানে বেরিয়ে গেল—সেই রাজত্বে যেখানে সৃষ্টির অবগুণ্ঠনে নিজেকে আবৃত করে স্রষ্টা রয়েছেন গোপনে—

"যথাদর্শে তথাত্মনি যথা স্বপ্নে তথা পিতৃলোকে যথাপ্সু পরীব দদৃশে
তথা গন্ধর্বলোকে ছায়াতপয়োরিব ব্রহ্মলোকে।" (২।৬।৫ কঠোপনিষৎ)

১। দৃষ্টি ও সৃষ্টি: বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী দ্রষ্টব্য।

এই শিল্প দৃষ্টি সৃষ্টি-রহস্যের কেন্দ্রস্থলে অনুপ্রবেশ করে স্রষ্টার ঐশ্বর্যের সন্ধানটুকু নেয়; আর তাই ত' কবি ও শিল্পীরা এই দ্বিতীয় স্রষ্টার অসীম গৌরবে গরীয়ান হ'য়ে ওঠেন এই শিল্প-সৃষ্টির প্রসাদ গুণে।

শিল্প যদি বস্তুকে অনুসরণ করত তা হ'লে শিল্প বিচারে একটা বড় ফাঁক থেকে যেত। অবনীন্দ্রনাথ বললেন তা হ'লে Photography হ'ত সবচেয়ে বড় শিল্পকর্ম ও হরবোলার বুলি হ'ত সঙ্গীতের রাজা। কিন্তু এই ধরনের অনুকৃতি কর্মে শিল্পীর স্বাধীনতা ব্যাহত। তাই অবনীন্দ্রনাথ এদের শিল্পলোকে প্রবেশ করতে দিলেন না। তাঁর নন্দনতাত্ত্বিক ধারণার বলিষ্ঠতায় তিনি শিল্পীর স্ব বশ্যতাকে এতখানি মর্যাদা দিলেন যে 'ভারতশিল্পের ষড়ঙ্গ' গ্রন্থে তিনি একথা বলতে দ্বিধা করলেন না যে যথার্থ শিল্পীর জন্য কোন বিধি-বিধান নেই; বিধি-বিধানের নিষেধটুকু থাকে শুধুমাত্র শিল্প-শিক্ষার্থীর জন্য। শিল্পী সৃষ্টি করেন আপন আনন্দে। শৈল্পিক আনন্দে শিল্পী আপন পরিপূর্ণতা খুঁজে পান এবং এই আনন্দের মহত্ত্বের কথা ভারতীয় নন্দনতত্ত্বে সোচ্চার কণ্ঠে বার বার ঘোষিত হয়েছে। শিল্প আনন্দ উৎস থেকে সঞ্জাত এবং শিল্পের লক্ষ্যই আনন্দ। এই দেশের প্রাচীন আলংকারিক মম্মট এবং ওদেশের আধুনিক চিন্তানায়ক জর্জ সাণ্টায়ন এই ধরনের সৃষ্টির কথা বলেছেন। তবুও অবনীন্দ্রনাথের নন্দনতত্ত্বে স্পৃহাহীন উদ্দেশ্যবিহীন যে শিল্পানন্দের কথা পড়ি তার ধারণা তাঁর একান্তই নিজস্ব। তিনি তাঁর "নিয়তিকৃত নিয়ম রহিত" তত্ত্বে শিল্পের যে রূপটি আঁকলেন তা একদিকে যেমন আরিস্ততলীয় "মাইমেসিস" তত্ত্বের সঙ্গী হ'ল অন্যদিকে আবার তা আধুনিক ইউরোপের কপি থিয়োরীকে অস্বীকার করল; অনুকৃতির মধ্যে শিল্পী যখন আপন মনের মাধুরী মিশায়ে রূপ এবং রসের সংযোজন করেন তখন সৃষ্ট বস্তুটি স্বমহিমায় অনন্য হ'য়ে ওঠে। এই অনাস্বাদিতপূর্ব অনন্যতাটুকু আসে অবনীন্দ্রনাথ কথিত 'লাবণ্যের' সংযোজনে; ভোজ্যবস্তুর স্বাদ হ'ল লবণকেন্দ্রিক, শিল্পীর স্বাদও এই 'লাবণ্যে'। লাবণ্যটুকু সৃষ্টি করা কি শিল্পীর ঐচ্ছিক ক্রিয়ামাত্র। সাধারণ মনস্তাত্ত্বিক অর্থে একে ঐচ্ছিক ক্রিয়া বলব না। অবনীন্দ্রনাথও তা বলেন নি। তিনি একে লীলা আখ্যা দিয়েছেন। শিল্পীর এই শিল্পলীলায় অপ্রত্যক্ষ প্রত্যক্ষগোচর হ'য়ে ওঠে। যা প্রত্যক্ষ তার মধ্যেই শিল্পী এই অপ্রত্যক্ষকে ধরে দেন। তাঁর শিল্পব্যঞ্জনায় এই অপ্রত্যক্ষ সত্য হ'য়ে ওঠে। অবনীন্দ্রনাথ বললেন[১]:

১। অরূপ না রূপ: বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী।

'চীনদেশে তাও ইষ্ট সাধক—শিল্পের দিক দিয়ে অপ্রত্যক্ষ সাধনার অনেকগুলি উপায় এঁদের ছবি থেকে পাই। তাঁদের প্রধান কথা হ'ল এই যে, পটের ধৌত অংশ (সাদা জমি) এবং লাঞ্ছিত এবং রঞ্জিত অংশের যথাযথ হিসেবের উপরে ছবির ভাবের বিস্তৃতি নির্ভর করছে ; তাঁরা বলেন যে ঘর সাজানোর বেলায় নানারূপ জিনিস দিয়ে ঘর ভর্তি করা মানে ঘরের প্রসার ও সঙ্গে সঙ্গে মনের এবং দৃষ্টির প্রসার নষ্ট করা। এই হ'ল তাঁদের মত এবং এইভাবে অপ্রত্যক্ষের স্বাদ শিল্পকাজে পৌঁছে দেবার উপদেশ তাঁরা দেন। এই অপ্রত্যক্ষ প্রত্যক্ষের পথে রসিকদের মনে উদয় হয়। এটি কেমন ক'রে ঘটে, শিল্পী কেমন ক'রে এই অসাধ্য সাধন করেন তা সকল ব্যাখ্যার অতীত। একমাত্র লীলাতত্ত্বের সহায়তায় এর ব্যাখ্যার প্রয়াস করা যেতে পারে। শিল্প-লাবণ্য এই অপ্রত্যক্ষ-প্রত্যক্ষের সংযোগের ফলশ্রুতি। এই ধারণাগুলি অবনীন্দ্রনাথের নন্দনতত্ত্বে দৃঢ়পিনদ্ধ। তিনি বলেছেন শিল্পীর লীলায় এই লাবণ্যের উৎসার ; এই লীলা অকারণ পুলক প্রসূত, উদ্দেশ্যের ব্যঞ্জনা তার মধ্যে থাকলেও তার বন্ধন এবং শাসন সেখানে নেই। শিল্পীর এ লীলা হ'ল বিশ্ব-বিধাতার সৃষ্টিলীলার সমগোত্রীয়। তাই তো এ লীলায় যে আনন্দের উদ্বর্তন তা হ'ল 'ব্রহ্মস্বাদ সহোদর'। সৃষ্টির মধ্যে শিল্পী যখন সম্পূর্ণরূপে আত্ম-বিলোপ ঘটায় তখন শিল্পীর ও শিল্পের আত্ম-সমীকরণ ঘটে। এর সাঙ্গীকরণের পরের অবস্থা হ'ল বিযুক্তি, আত্ম-বিচ্যুতি। 'শিল্পীর মানস-প্রকরণে এই সাঙ্গীকরণ ও আত্ম-বিচ্যুতি সমান সত্য ; অবনীন্দ্রনাথ এই নন্দনতাত্ত্বিক সত্যটিকে প্রচার করলেন। প্রখ্যাত ইতালীয় নন্দনতাত্ত্বিক 'বেনেদেত্তো ক্রোচে' এই বিযুক্তি-করণকে আখ্যা দিলেন 'De-Subjectification of Subjective feelings' ; এই প্রসঙ্গে অবনীন্দ্রনাথও ক্রোচের নন্দনতাত্ত্বিক চিন্তার ক্ষেত্রে অত্যন্ত কাছাকাছি এসেছেন। অগ্রচারী পিতৃব্য রবীন্দ্রনাথও নন্দনতাত্ত্বিক চিন্তায় অবনীন্দ্রনাথের সহচর হয়েছেন বহুবার। রবীন্দ্রনাথের 'সেই সত্য যা রচিবে তুমি' তত্ত্ব অবনীন্দ্রনাথের শিল্প সত্যের ধারণায় অনুস্যূত। শিল্পীর রচনাটাই বড় কথা। মেঘদূতের মেঘের কথা বলা শক্ত, ভাব প্রকাশের শক্তি আছে কী না এ কথা মহাকবি কালিদাস একবারও ভেবে দেখেন নি, অচল মেঘকে মহাকবি দিলেন 'মানুষের বাচালতা'। বস্তুতন্ত্রের ধার তিনি ধারেন না! কল্পনার আশ্রয় তিনি 'মেঘদূতের' সৃষ্টি করলেন! অবনীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে বললেন[১] :

১। শিল্প ও দেহতত্ত্ব : বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী।

"অন্তথাবৃত্তি হ'ল আর্টের এবং রচনার পক্ষে মস্ত জিনিস, এই অন্তথাবৃত্তি দিয়েই কালিদাসের মেঘদূতের গোড়াপত্তন হ'ল, অন্তথাবৃত্তি কবির চিত্র মানুষের রূপকে দিলে মেঘের সচলতা এবং মেঘের বিস্তারকে দিলে মানুষের বাচালতা। এই অসম্ভব ঘটিয়ে কবি সাফাই গাইলেন যথা—

"ধূম জ্যোতি সলিলমরুতাং সন্নিপাতঃ ক্ক মেঘঃ
সন্দেশার্থাঃ ক্ক পটুকরণৈঃ প্রাণাভির প্রাপণীয়াঃ।"

ধূম আলো আর জল-বাতাস আর শরীর, তাকে শরীর দাও মানুষের, তবে তা সে প্রিয়ার কানে প্রাণের কথা পৌঁছে দেবে? বিবেক ও বুদ্ধিমাফিক মেঘকে মেঘ রেখে কিছু রচনা করা কালিদাসও করেন নি, কোন কবিই করেন না। তাঁরা যখন সৃষ্টি সুখের উল্লাসে মেতে ওঠেন, তখন অসম্ভবও সম্ভব হয়ে ওঠে এই সৃষ্টিলীলার প্রসাদে। এ লীলায় শিল্পীর আত্যন্তিক অধিকার। অবনীন্দ্রনাথের যে শিল্প-লীলা ধারণার কথা বলেছি সেই প্রসঙ্গেও রবীন্দ্রনাথ স্মরণীয়। তাঁরা উভয়েই বলেছেন সে শিল্প হ'ল শিল্পীর লীলা সম্ভূত। সে লীলা উদ্দেশ্য-বিহীন হলেও হয়তো আনন্দ সৃষ্টির একটা অলিখিত উদ্দেশ্য সাধনের কথা এর মধ্যে উহ্য হয়ে থাকে। তাই শিল্প সৃষ্টির মূলে অকারণ পুলক থাকলেও এই পুলকের একটা লক্ষ্য সন্ধানের ইতিবৃত্ত রয়ে গেছে। সেই ইতিবৃত্তের সন্ধান করেছেন নন্দনতাত্ত্বিকেরা। পুলক আস্বাদনের অলিখিত ক্ষেত্রে সে উদ্দেশ্য পরিশীলিত। মহাদার্শনিক কাণ্ট তাকে আখ্যা দিলেন 'purposiveness without a purpose'. অর্থাৎ উদ্দেশ্যবিহীন উদ্দেশ্য। সাধারণ ভাষায় গতানুগতিক ভাবনায় যদি আমরা শিল্প উদ্দেশ্যের ব্যাখ্যা করি তা হ'লে ভ্রান্তির সম্ভাবনাটুকু থেকে যায়। তাই শিল্পের উদ্দেশ্য, নন্দনতাত্ত্বিক লক্ষ্য, তাকে বিশেষ মর্যাদা দেবার জন্য নন্দনতাত্ত্বিকদের মধ্যে একটা উৎসাহ দেখা যায়। শিল্পের লক্ষ্যকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করার প্রয়াস সেখানে অতি স্পষ্ট। এই প্রয়াসটুকু একদিকে যেমন কাণ্টে প্রত্যক্ষ তেমনি ভারতীয় নন্দনতত্ত্বেও তা অতি প্রত্যক্ষ। অবনীন্দ্রনাথের নন্দনতত্ত্বেও আমরা এই শিল্পানন্দ, এই শিল্প উদ্দেশ্য এবং তাদের উৎস-ভূমি শিল্পীর লীলা-ধারণায় এক অত্যাশ্চর্য স্বকীয়তা লক্ষ্য করেছি। তা একদিকে যেমন ভারতীয় অন্য দিকে তেমনি অভারতীয়ও বটে। এক কথায় অবনীন্দ্রনাথের নন্দনতত্ত্ব তাঁর মহৎ শিল্প-চেতনাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হ'য়ে এক বিশেষ রূপ পরিগ্রহ করেছে। তাই বলছিলাম অবনীন্দ্রনাথের যে সিন্‌ক্রিটিজম্‌কে লক্ষ্য করেছি তা কিন্তু প্রাকরণিক। প্রকরণ

সম্বন্ধে বলা চলে, আঙ্গিক সম্বন্ধে বলা যায় যে এটি হ'ল সিন্‌ক্রিট ; অর্থাৎ অন্য পাঁচটা আঙ্গিক দেখে বহু আয়াসে সেই সব আঙ্গিকের রহস্যটুকু আয়ত্ত ক'রে শিল্পী আপন প্রতিভার গুণে একটা বিশিষ্ট আঙ্গিক আবিষ্কার করেন। রং-এর কথা বলি। ভরতমুনির নাট্যশাস্ত্রে শিল্পীর রং ব্যবহার পদ্ধতির যে নির্দেশনামা লিখিত হয়েছে অবনীন্দ্রনাথ তা উদ্ধার ক'রে বললেন :

'শ্যামো ভবতি শৃঙ্গারঃ সিতো হাস্যঃ প্রকীর্ত্তিতঃ,
কপোতঃ করুণশ্চৈব, রক্তো রৌদ্রঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥
গৌরো বীরস্তু বিজ্ঞেয়ঃ কৃষ্ণশ্চৈব ভয়ানকঃ
নীলবর্ণস্তু বীভৎসঃ পীতশ্চৈবাদ্ভুঃ স্মৃতঃ ॥ (৬।৪৭-৪৮)

কালো রং হল শোকের নিরাকার। মেটে এবং ধূসর রং বোঝায় শুষ্কতা মৃত্যু ইত্যাদি। পীত নীল রক্ত—পরিণতি শক্তি ইত্যাদি ; সবুজ রং তারুণ্য আশা ইত্যাদি। শুভ্রবর্ণ বোঝায় শান্ত সুন্দর ভাবটুকু, উষার নির্মলতা, শুচিতা ইত্যাদি। আদিম যুগের মানুষেরাও এই সব রূপ ও রঙের অচ্ছেদ্য মিলন বিষয়ে অজ্ঞ ছিল না। অবনীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে আমেরিকার রেড্ ইণ্ডিয়ানদের কথা বলেছেন। এই সব রঙের প্রাচীন ব্যবহারবিধি আমরা অবনীন্দ্রনাথে প্রত্যক্ষ করেছি। প্রাচীন রসশাস্ত্রের রাগ এবং রঙকে মিলিয়ে নিয়ে ছবি এঁকেছেন অবনীন্দ্রনাথ। তাঁর শিল্পশাস্ত্রেও প্রাচীন রসশাস্ত্রের 'নীলিরাগ', 'কুসুম্ভরাগ', ও মাঞ্জিষ্ঠরাগ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকৃত হয়েছে ; তাঁর ছবিতেও তারা রূপ পেয়েছে। এ কথা আমরা কিন্তু বলার চেষ্টা করছি না যে অবনীন্দ্রনাথের শিল্প আঙ্গিক ঐতিহ্যবাহী হ'য়েই নিঃশেষ হ'য়ে গেছে। প্রতিভাধর শিল্পীর আঙ্গিক কিন্তু তাঁর নিজস্ব। অবনীন্দ্রনাথের 'ওয়াশ' কিন্তু জাপানী 'ওয়াশ' নয়, তা তাঁর নিজস্ব। কোন্ সময়ে ছবি রচনার কোন্ পর্যায়ে ওয়াশটুকু দিতে হবে, সেটুকুই বোঝাই ত' প্রতিভার কাজ। জোড়াসাঁকোতে অভিনয় হবে, তার মহড়া চলছে। কালোকালো ছেলেটাকে যে একটু গেঁড়িমাটি মাখিয়ে দিলেই তার ভূমিকায় তাকে অদ্ভুত মানবে, কথাটা অবনঠাকুর ছাড়া আর কারো মনে পড়ে নি। এটাই হ'ল প্রতিভাধর শিল্পীর কাজ। ঠিক তেমনি ধারা ছবির ব্যাপার ; ঠিক সময়ে যথাস্থানে একটি আঁচড় টেনে দিতে পারলেই ত' বাজিমাৎ। এই স্থান-কালের সত্তা-সৃষ্টির দুরূহ নৈপুণ্য লক্ষ্য করেই দার্শনিক আলেকজাণ্ডার বলেছিলেন যে S. T. অর্থাৎ স্থান এবং কালের যোগ এবং শিল্প-সমন্বয়ই হ'ল সত্য। শিল্পের ক্ষেত্রে এটা কিন্তু একান্তভাবে সত্য। শিল্প-আশ্রিত

স্থান এবং কাল শিল্পের বিষয়বস্তুকে সৃষ্টি করে। কোথাও স্থানিক ব্যঞ্জনাটি সুপ্রকট আবার কোথাও বা কালগত ব্যঞ্জনা অতিমুখর। শিল্পের সামগ্রিক বিচারে বা শিল্পদর্শনের নিহিতার্থ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সিন্‌ক্রিটিজম্‌ অবনীন্দ্রনাথকে বুঝতে খুব বেশী সহায় হবে বলে মনে হয়। সামগ্রিক শিল্পদর্শনের বিচারে অবনীন্দ্রনাথ মায়াবাদী ; রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন সে শিল্প হ'ল মায়া। শিল্পের ধর্ম ও প্রকৃতি অতি নির্দিষ্ট সংজ্ঞা দিয়ে বেঁধে দেওয়া যায় না। কোথাও কোথাও একটু রহস্য, একটু অনির্দিষ্টতা সার্থক শিল্পকর্মকে ঘিরে থাকবেই। শিল্পের সবটুকু যদি দিবালোকের মত স্বচ্ছ হ'য়ে পড়ত, 'অভিসারিকা'র কোথাও যদি অভিসারের রহস্যতাকে মায়ার আড়াল ক'রে না রাখত, তবে বোধহয় অবনীন্দ্রনাথকে এত বড় শিল্পীর মর্যাদা রসিক সুজন দিত না। তা ছাড়া শিল্পীর আঁকা ছবি বা তাঁর লেখা কবিতা বা গানের সবটুকু বোঝার পথে একটি মস্ত অন্তরায় হ'ল অপরের অনুভূতি বোঝার ব্যাপারে আমাদের স্বাভাবিক অক্ষমতা আমরা জানি যে অপরের আনন্দ বেদনা, দুঃখ নৈরাশ্যের স্মৃতিটুকুর সাহায্যে রামের দাঁতের ব্যাথা শ্যাম কোন দিন বুঝতে পারবে না। শ্যামের কোন দিন দাঁত ব্যথা ক'রে থাকলে শ্যাম হয়ত বড় জোর নিজের ব্যথাটার অনুপাতে রামের ব্যথাটাকে কল্পনা করবে। এ ত' গেল জৈব কারণ সম্ভূত বেদনার কথা। শিল্পী যে অনির্দেশ্য বেদনার কথা বলেন, যে সীমাহীন বেদনা সম্বন্ধে আমাদের ইঙ্গিত দেন. তাকে রসিক বুঝবে কেমন করে ? বড় জোর রসিক আপনার অনুরূপ আনন্দ অথবা বেদনার স্মৃতি দিয়ে কবি কথিত আনন্দ বেদনাকে ধরবার চেষ্টা করবেন। কিন্তু এটা সহজেই অনুমেয় যে শিল্পরসিক কোনদিনই শিল্পীমনে উপজাত আনন্দ, বেদনাকে তার স্বরূপে এবং স্বধর্মে বুঝতে পারবে না। আরিস্ততলীয় তর্কশাস্ত্রে উপমান বা Analogyকে 'যুক্তি'র মর্যাদা দেওয়া হয় নি, উপমান না কি ধারে এবং ভারে যুক্তির চেয়ে ন্যূন। কিন্তু শিল্পরসের অনুধাবনে এবং উপলব্ধিতে এই উপমান ছাড়া গতি নেই। রসিক আপন অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে তবেই শিল্পীকথিত সুখ-দুঃখ-আনন্দ-বেদনার সামিল হয়। এই 'সামিল' হওয়ার মধ্যে শিল্পীর শিল্প প্রকাশিত বিষয়ের সবটুকুকে যে বোঝা বা উপলব্ধি করা যায় না, সেটুকু সহজেই বোঝা যায়। অতএব বলা চলে শিল্পীর 'শিল্পকর্ম' অসংযোগ বা Non-Communicationএর দ্বারা বাধিত। আর এর ফলেই শিল্প রহস্যময় হ'য়ে ওঠে, শিল্প দার্শনিক একে 'মায়া' বলেন, অর্থাৎ এর স্বরূপ দুর্জ্ঞেয়

রহস্যে ঢাকা। তাই ত' অবনীন্দ্রনাথ তন্ত্রশাস্ত্রকে অনুসরণ ক'রে শিল্পের এই অঙ্গের চরিত্রের কথা ঘোষণা করলেন। আমরা বলতে পারি যে শিল্প দার্শনিক হিসেবে অবনীন্দ্রনাথ অনির্বচনীয় শিল্পতত্ত্বে বিশ্বাস করেছিলেন।

"...আর্ট বিষয়ে খেয়ালীর কাছে যেতেই হবে নবযৌবন ভিক্ষা করে।" এর প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত রয়েছে,—আমাদের সঙ্গীত বিদ্যা প্রকরণসার হ'য়ে যে দশা পেয়েছে এখন তার সঙ্গে প্রাণের যোগ করে দেওয়া তম্বুর ঋষিরও কর্ম নয়। যদি কেউ সে কাজ করতে পারে তো সে বিদেশের খেয়ালী বা দেশেরই কোন খেয়ালী যার প্রাণে গানের সখ আছে এবং গানের ইতিহাস কশরত শেখার সখের চেয়ে গান গাইবার সখ যার বেশী। বিশ্বকর্মা একজন খেয়ালী তাই বিশ্বের জিনিস তিনি 'গড়ে উঠতে পারছেন এমন চমৎকার সুন্দর করে'—চামচিকে থেকে আরম্ভ ক'রে জম্বুদ্বীপের এবং তারও বাইরের যা কিছু তা! বিশ্বকর্মা যদি শাস্ত্রের নিয়মপ্রকরণ মেনেই চলতেন তবে শুধু দেবমূর্তির কারিগর বলেই বলাতে পারতেন, বিশ্বকর্মা বলে তাঁকে কোন আর্টিস্ট তাঁকে পূজা দিত না। বিশ্বকর্মা হিন্দুশাস্ত্রের নির্দেশে বিশুদ্ধ গাছ বা তুলসী গাছেই যদি হাত পাকাতেন তবে কি ভয়ঙ্কর একঘেয়ে জগৎ তিনি বানিয়ে তুলতেন! এবং কবি ও রসিকদের তা হ'লে কি উপায় হ'ত—একটা গাছ দেখলেই সব গাছ দেখার আনন্দ এক নিমেষে চুকে যেত। একটা গাছ বারে বারে, একটি পাহাড় একটি নদী, একই সমুদ্র বারে বারে পুনরাবৃত্তি হ'তে হ'তে চলতো আর তার মধ্যে একটিমাত্র মানুষ হয় পুরুষ নয় স্ত্রী দেবতা নয় দেবী থাকত এবং বর্ণসঙ্করতা আসার ভয়েই বিশ্বকর্মার আলো-ছায়ার মেলামেশায় সঙ্করত্ব দিয়ে দুই সন্ধ্যার রমণীয় ছবি ফোটাতে পারতেন না, হয় থাকতো চোখ-ঠিকরানো আগুনের তেজ, নয় থাকতো ভীষণ অন্ধকার বিশ্বছবিটির উপর লেপা।"*

* [শিল্পের ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার ভাল-মন্দ—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

দুই

বারট্রাণ্ড রাসেল দর্শনশাস্ত্র পড়ুয়াদের অভয় দিয়ে বলেছিলেন যে দর্শন আলোচনাতে Paradox অর্থাৎ মনন-সংকট দেখা দিলে তাতে বিব্রত হয়ে পড়বার কিছু নেই; সেই সংকটকে উত্তীর্ণ হবার পথ খুঁজতে হবে। আর সেই খোঁজাই হ'ল দর্শনচিন্তা। শিল্প সম্বন্ধীয় তত্ত্বচিন্তার ক্ষেত্রেও যে বারট্রাণ্ড রাসেলের অভয়বাণীর আশ্বাসটুকু প্রয়োজন এবং অবনীন্দ্রনাথের শিল্পতত্ত্বের আলোচনায় তার প্রাসঙ্গিকতার কথাও আমাদের বোধগম্য হবে যদি আমরা

শিল্পাচার্য কথিত শিল্পতত্ত্বের অভ্যন্তরে প্রবেশ প্রয়াসী হই। অবনীন্দ্রনাথ বললেন[১]—রস জিনিসটা অনির্বচনীয়, সুতরাং তার ক্রিয়ার মধ্যে একটা অনির্বচনীয় দিক রয়েছে, সেই জন্যে ঠিক করে কেউ বলতে পারে না, কেমন করে কোন প্রক্রিয়া ধরে চললে রস হবে বা রস পাওয়া যাবে। কিন্তু শিল্প প্রক্রিয়ার সবখানিই তো অনির্বচনীয় থাকতে পারে না—তা হলে কাজ চলে কেমন করে ?

শিল্পক্রিয়ার অনির্বচনীয়তাকে স্বীকার করে নিলে সে সম্বন্ধে এমন কোন আলোচনার অবতারণা করা চলে না, যা অপরের বোধগম্য হবে। অতএব অনির্বচনীয় তত্ত্ব সর্ববিধ আলোচনার-অপহারক। এ সিদ্ধান্ত তর্কশাস্ত্র-সিদ্ধ। এখানেই আমাদের থামা উচিত। কিন্তু তা ত' হ'ল না ; দেশবিদেশে পণ্ডিতেরা অনেকেই অবনীন্দ্রনাথের মতোই শিল্পসংজ্ঞা ও শিল্প প্রকৃতি নিরূপণের প্রয়াসকে দুঃসাধ্য কৃতি জেনেও, শিল্প আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। আমাদের দেশের প্রাচীন সূরীরাও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। অবনীন্দ্রনাথ এঁদের কথা উল্লেখ করে বললেন, শিল্পশাস্ত্রকারেরা কতকগুলো বাঁধা আইন করে দিয়ে বলেছিলেন—'এই করে চলো, তবেই ভালো হবে, লোকেও রস পাবে।' এই ভাবে শিল্পে একটা বাঁধা প্রকরণে ক্রিয়া করে চলার রাস্তা ক্রমে প্রস্তুত হয়ে চলল। এই পুঁথিগত ক্রিয়াপদ্ধতি যারা নিজের পথ নিজে দেখতে পায় না অথবা নিজেরা পথ কেটে চলতে চায় না, তাদের জন্য। বাঁধা পথে ক্রিয়া করে চলার সুবিধা আছে জেনে কতক লোক সেই রাস্তায় চলল—

'রূপভেদাঃ প্রমাণানি ভাবলাবণ্যযোজনম্।
সাদৃশ্যং বর্ণিকাভঙ্গ ইতি চিত্রং ষড়ঙ্গকম্।'

বাৎস্যায়ন-কামসূত্রের প্রথম অধিকরণ তৃতীয় অধ্যায়ের টীকায় যশোধর পণ্ডিত আলেখ্যের ঐ ছয়টি অঙ্গ নির্দেশ করেছেন ; যথা—প্রথম রূপভেদ, দ্বিতীয় প্রমাণ, তৃতীয় ভাব, চতুর্থ লাবণ্যযোজন, পঞ্চম সাদৃশ্য এবং ষষ্ঠ বর্ণিকাভঙ্গ। যশোধর পণ্ডিতের জয়মঙ্গল টীকায় ব্যাখ্যাত এই ষড়ঙ্গের প্রচলনের উদ্ভব কাল অনির্ণীত রয়ে গেছে। তবে এর প্রচলন যে অতিপ্রাচীন তার প্রমাণ মেলে কামসূত্রের উপসংহারে বাৎস্যায়নের উক্তি থেকে—

'পূর্বাশাস্ত্রাণি সংহৃত্য প্রয়োগানুপসৃত্য চ।
কামসূত্রমিদং যত্নাৎ সংক্ষেপেণ নিবেশিতম্॥'

১। রস ও রচনার ধারা। বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী পৃষ্ঠা ১৩১

অর্থাৎ তাঁর বক্তব্য হ'ল, পূর্ব পূর্ব শাস্ত্রের সংগ্রহ ও শাস্ত্রোক্ত বিভাদির প্রয়োগ অনুসরণ ক'রে অর্থাৎ ঐ সকল বিভাদি কার্যত কি ভাবে লোকে প্রয়োগ করছে তা দেখে শুনে যত্নপূর্বক সংক্ষেপে তিনি কামসূত্র রচনা করেছিলেন। অতএব ষড়ঙ্গের প্রয়োগ এবং ব্যবহার এতদ্দেশে যে বহুদিন থেকে প্রচলিত ছিল তা নিঃসন্দেহে গ্রাহ্য। অবনীন্দ্রনাথ তাঁর এই মতের প্রাসঙ্গিকতায় চীনা শিল্প-ষড়ঙ্গের প্রাচীনতার উল্লেখ ক'রে লরেন্স বিনিময়ের প্রখ্যাত গ্রন্থ[২] থেকে উদ্ধৃতি দিলেন—

(১) Chi-yun Sling-tung—Spiritual tone and life-movemnt.

(২) Ku-Fa Yung-Pi = Manner of brush-work in drawing lines.

(৩) Ying-wu hasiang hsing = Form in its relation to objects.

(৪) Sui-lei Fu-tsai = choice of colour appropriate to the objects.

(৫) Ching-ying wei-chih = composition and grouping.

(৬) Chuan-moi-hsich = The copying of classic master pieces.

তিনি আরও বললেন[৩]—চিত্রকলাকে আমাদের পূর্বপুরুষেরা যে চোখে দেখতেন, এক চীন ও জাপান ছাড়া আর কোন জাত সেই চোখে দেখেছে বলে আমরা অন্ততঃ জানি না। শিল্পচর্চার সঙ্গে সঙ্গে শিল্পশাস্ত্রচর্চার বহুল প্রচার ও প্রসার শিল্পসৃষ্টিকে একটা বাঁধাধরা পথে এনে ফেলার চেষ্টা করল। কিন্তু পাণ্ডিত্যের এই সব টীকা হাতে ক'রে শিল্পশাস্ত্র পড়তে বসলে শিল্পশাস্ত্রের বাঁধন-গুলোই আমাদের চোখে পড়ে ; কিন্তু বজ্র-আঁটুনির ভেতরে-ভেতরে যে ফস্কা গেরোগুলো আচার্যগণ শিল্পের অমরত্ব কামনা ক'রে সযত্নে সংগোপনে রেখে গেছেন, তার দিকে আমরা দেখি না অনবধানতাবশতঃ। অবনীন্দ্রনাথ সেদিকে আমাদের দৃষ্টি দিতে বললেন। 'সেব্যসেবক ভাবেষু প্রতিমালক্ষণং স্মৃতম্।'—এ কথার অর্থ কি শিল্পীকে বলা নয় যে, পূজোর জন্য যখন প্রতিমা গঠন করবে

(২) The Flight of the Dragon প্রথম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

(৩) ভারতশিল্পের ষড়ঙ্গ পৃষ্ঠা ৬

কেবল তখনই শাস্ত্রের মত মেনে চলবে ; অন্য ধরনের মূর্তি গঠন করার সময়ে তোমার যথা অভিরুচি নির্মাণ করতে পার। অর্থাৎ এখানে পরবর্তী যুগের নির্মিতিবাদ বা আধুনিকদের Configuration theory-র কথা বলা হ'ল। হয়ত দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য সৌন্দর্যকে মানপরিমাণ দিয়ে ধরবার চেষ্টা ক'রে ক'রে হতোদ্যম হ'য়েই বলেছিলেন—'সেব্য সেবকাতাবেষু প্রতিমালক্ষণং স্মৃতম্'—লক্ষী আমার শাস্ত্র ও প্রতিমালক্ষণ তোমার জন্য নয় ; কিন্তু এরা সেই সব ফরমাসীল মূর্তির জন্য যাদের কেবল পূজা করার জন্যই নির্মাণ করা হয়।

"সর্বাঙ্গৈঃ সর্বরম্যো হি কশ্চিল্লক্ষে প্রজায়তে।
শাস্ত্রমানেন যো রম্যো স রম্যো নাম্য এব হি ॥
একেষামেব তদ্ রম্যংলগ্নং যত্র চ যস্য হৃৎ।
শাস্ত্রমানবিহীনং যদ্ রম্যং তদ্‌বিপশ্চিতাম্।

শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা হয়ত' বলবেন শাস্ত্রমূর্তিই সুন্দর মূর্তি ; কিন্তু পূর্ণ সুন্দর ত' লাখেও একটা মেলে না একে বলে শিল্প ছাড়া সুন্দর কী ? অন্যে বলে, সুন্দর সে যে হৃদয় টানে, প্রাণে লাগে।[৪]

অবনীন্দ্রনাথ শিল্প প্রকরণ প্রসঙ্গে বললেন—বিপশ্চিতাং মতম্' আর 'একেষাং মতম্', এই নিয়ে পথ হল দ্বিধা-বিভক্ত ; একটা একেবারে নিষ্কণ্টক পথ, শাস্ত্র-কথিত বাঁধা সড়ক ; সেখানে দৌড়ের আনন্দ নেই, বেদনাও নেই। আর অন্য পথটা নানা কাঁটা খোঁচায়, খানা-ডোবায় রহস্য-সঙ্কুল কিন্তু চলার স্বাধীনতা আছে সেখানে যথেষ্ট ; একটা অনির্বচনীয়তার হাওয়াও বইছে সেই অজানা পথের প্রত্যেক ঘোর-প্যাঁচে। শাস্ত্রসিদ্ধ পথে কেমন ক'রে চলতে হবে তা ভাবতে হয় না, চোখ বন্ধ ক'রে শাস্ত্রমতো ক্রিয়া ক'রে চললেই ফল মিলবে। কিন্তু অন্য পথটা ধ'রে চললে চোখ খোলা রেখে চলা ছাড়া আর উপায় থাকে না। বিচিত্র ক্রিয়া ধরে এই পথে মানুষ চলতে চলতে শিল্প-ক্রিয়ার যে সমস্ত ক্রিয়া-প্রক্রিয়া আবিষ্কার করলে তার সংখ্যা করা শক্ত ব্যাপার। এই দুই পথে চলার কিন্তু একটি প্রধান ক্রিয়া হল—মনে ধরা ও ধরানো। প্রথম পথে শুধু বিপশ্চিৎ, যাঁরা তাঁদের মনে ধরানো। দ্বিতীয় পথে বিপশ্চিৎ অবিপশ্চিৎ নেই—মনে ধরা মনে ধরানো নিয়ে কথা। এই দুই ধারাই চলেছে অনির্বচনীয় রসের দিকে, এ কথা অবনীন্দ্রনাথ বললেন[৫]—'অলঙ্কারের পণ্ডিতেরা যে রস চান

৪। ভারত শিল্পে মূর্তি—পৃষ্ঠা ৩

(৫) বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী পৃষ্ঠা ১৬২

তাঁকেও তাঁরা ব্যাখ্যা করলেন অনির্বচনীয় বলে, আর যে অলঙ্কার পড়ে না কিন্তু অলঙ্কার পরে এবং অলঙ্কার গড়ে সেও বললে—মনে ধরলো তো রস হ'ল, না হ'লে হ'ল না।'

রস অর্থাৎ শিল্পানন্দের অনির্বচনীয়ত্ব শুধু প্রাচীন আলঙ্কারিকদের পলায়নী মনোবৃত্তির নিদর্শন হিসেবে নেওয়ার রেওয়াজটা এ যুগে শুধু শিথিল হয়েছে। আধুনিক সেমান্টিকস্ 'অনির্বচনীয়ত্ব', 'দুর্বোধ্যতা' প্রভৃতি ধারণাকে অতি সাধারণ ও সহজলভ্য করে তুলেছে। Good কথাটিকে কেন্দ্র ক'রে যে অর্থবিভ্রাট ঘটেছে তার আলোচনা আর অপ্রাসঙ্গিক নয় শব্দার্থের অনির্বচনীয়ত্ব প্রসঙ্গে। ভোক্তার দিক থেকেও বিচার করলে রসের অনির্বচনীয়ত্ব বা রহস্যময়তার কোনো ন্যূনতা চোখে পড়ে না। অবনীন্দ্রনাথের মতে শিল্পশাস্ত্রের, রসশাস্ত্রের কথা অনেকখানি এই ভোক্তার দিকে। রচয়িতাকে কতকটা ভোক্তার কাজও করতে হয়; কেন না সেও তার বাইরে ও তার অন্তরে যে রসের ফোয়ারা ছুটছে তাকে উপভোগ করছে। মধুকর মধুর স্বাদ পেলে তবেই না মধু সংগ্রহ করে; সে মধুর পদার্থ সৃজন ক'রে চলে। এই যে স্বাদ গ্রহণের ক্ষমতা, এত সবাই পেল না; পেল শুধু দুই শ্রেণীর মানুষ—শিল্পী ও রসিক। এদের দুজনার ক্ষেত্রেই শিল্পরসাস্বাদনে এরা সেই অনির্বচনীয় তত্ত্বেরই পোষকতা করছেন। কেন না স্রষ্টা যে আনন্দ পরিবেশন করলেন, রসিকের আনন্দ ভোক্তার রসাস্বাদন যে ঠিক সেই পরিমাপের হবে, তাদের প্রকৃতিও হবে অভিন্ন, এমন কথা বোধ হয় যুক্তিসঙ্গত হবে না। শিল্পী তাঁর কবিতা লিখে বা তাকে ভোগ করে যে আনন্দ পেয়েছেন, ভোক্তা বা রসিক হয়ত' তার চেয়ে বড় আনন্দের সন্ধান পেয়েছেন। ভোক্তা হয়ত শিল্পীর ছবিতে আঁকা জগৎকে দেখে তাঁর নিজস্ব আর একটা জগৎ সৃষ্টি ক'রে নিয়েছেন। তার রূপ, রং, আকার, প্রকার হয়ত ভিন্ন জগতের ও ভিন্ন প্রকৃতির। তাঁর পাওয়া আনন্দ শিল্পীর আনন্দকে ছাড়িয়ে যেতে পারে। উদাহরণ দিই রবীন্দ্রনাথের একটি গান থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে—

> 'এবার বুঝি ভোলার বেলা হল—
> ক্ষতি কী তাহে যদি বা তুমি ভোল ॥
> যাবার রাতি ভরিল গানে
> সেই কথাটি রহিল প্রাণে,
> ক্ষণেক তরে আমার পানে
> করুণ আঁখি তোল।'

মিলনের আনন্দ ও আসন্ন বিরহ বেদনার পরিমাপ করা দুরূহ কর্ম ; সে অসাধ্য সাধন করা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। কবির আনন্দ বেদনা তাঁর একান্ত গোপন সম্পদ। আবার রসিকের মনের সঠিক খবরটুকুও পাবার উপায় নেই। রসিক বা শিল্পী যদি আপন আপন আনন্দ-বেদনার মাপ-পরিমাপ করতে সমর্থও হন তবু বলতে হয় যে পরিমাণগত বিস্তারটুকু বোধগম্য হলেও তার গুণগত কৌলীন্যটুকু নির্ধারণ করা অসম্ভব বললেই চলে। কবিও তার পরম আনন্দের লগ্নটিকে তার স্বরূপে ধরতে পারেন কি না, সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহের আকাশ আছে। রবীন্দ্রনাথের আর একটি গান উদ্ধৃত করি—

'কী ধ্বনি বাজে
গহন চেতনা মাঝে !
কী আনন্দে উচ্ছ্বসিল
মম তনুবীণা গহন চেতনা মাঝে।'

কবির, শিল্পীর গহন চেতনা মাঝে কি আনন্দ বিষাদের ধ্বনি যে উত্থিত হয়, তার যথাযথ চিত্রণ কবি বা শিল্পীর পক্ষেও সম্ভব হয় না। রসিকসুজন আনন্দ উপভোগ করেই ক্ষান্ত হন ; তার ব্যাখ্যা বা প্রকাশ ভোক্তার কাজ নয় ; আর সে কাজে সে পারদর্শীও নয়। অতএব উভয়ের আনন্দ-বেদনার ধারাই দুর্জ্ঞেয় ও অনির্বচনীয় হয়েই রইল। তাই ত' অবনীন্দ্রনাথ বললেন যে শিল্প-রচনার ধারার মধ্যে গিয়ে মিললো, তার স্বরূপ ধরা গেল না। 'অনির্বচনীয়' বলেই তাকে নির্দেশ করলেন পণ্ডিতেরা। তবে যে-যে উপায়ে, যে-যে প্রক্রিয়ায় ক্রিয়া ক'রে যে-যে রসের উদ্রেক করা যেতে পারে তারি শুধু বিচার ক'রে চললো রসশাস্ত্রের আলাপ-আলোচনা। অবনীন্দ্রনাথও বললেন যে, অনির্বচনীয়ত্বের দোহাই দিয়ে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকলে চলবে না। তাই ত' শিল্প-আলোচনার ধারা উজ্জীবিত হ'য়ে রইল, প্রসারিত হ'য়ে গেল এক যুগ থেকে অন্য যুগে।

অবনীন্দ্রনাথ বললেন—'আমাদের এক শ্রেণীর মূর্তিশিল্প অনেকটা এই শক্ত ক'রে বাঁধা পাথর ; তারপর সঙ্গীত অভিনয় ইত্যাদি, যেখানে দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে এবং নিজের নিজের রুচি অনুসারে যে সব রাগরাগিণী রচনা হয়ে গেল, তার থেকে সময়ে সময়ে নানা বাঁধুনি ও কায়দার হিসেব জড়ো ক'রে আইন প্রস্তুত হ'ল—সঙ্গীতশাস্ত্র হ'ল, ছন্দশাস্ত্র হ'ল, নাট্যশাস্ত্র হ'ল। শুধু নাট্যশাস্ত্রই হ'ল না, তাকে ধ্রুব সত্যের আকর রূপে গ্রহণ করা হ'ল। বলা হ'ল, এমন

জ্ঞান নেই, এমন শিল্প নেই, এমন বিদ্যা নেই, এমন কলা নেই, এমন যোগ নেই, এমন কর্ম নেই, যার দেখা নাট্যশাস্ত্রে মেলে না। অর্থাৎ শিল্পশাস্ত্রকে এক্ষেত্রে একটা অনন্ত মর্যাদা দিয়ে শিল্পকে ভোক্তা অনির্ভর একটা সার্বিক আবেদনে মণ্ডিত ক'রে তোলার প্রয়াস করা হয়েছে। কিন্তু শিল্প বোধ হয় বিষয় এবং বিত্তবৈভব-অনির্ভর। অবজেকটিভ কোনো মানদণ্ডে বোধ হয় এর পরিমাপ করা চলে না। বিষয়-আশ্রিত গাণিতিক বা আনুপাতিক হার শিল্পলোকে একেবারে অচল। ব্যষ্টি-সমষ্টির উৎকর্ষ এবং অপকর্ষের যে পরস্পর পরিপূরক ধারণা আমাদের মনে বদ্ধমূল হয়ে আছে তাও কিন্তু শিল্পের জগতে কাজ করে না। অবনীন্দ্রনাথ বললেন[৬]—

'জাতীয় উৎকর্ষ এবং শিল্পের উৎকর্ষ সমাজের মতো এক ভাবে এক সঙ্গে হয় না। এ এক হিসেব ধরে বাড়ে ও আর এক হিসেব নিয়ে বাড়ে—একের বাড় অন্যের বাড়ের সাপেক্ষ নয়। ধন বাড়লে সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যাও বাড়বে—এ যেমন ভুল, জাতির উৎকর্ষ বলতে শিল্পীর উৎকর্ষ ভাবাও ঠিক তেমনি ভুল। জাত যে হিসেবে বড় হয় সে হিসেবে তার সঙ্গে শিল্পকলাও যে বড় হ'য়ে ওঠে এমনটা ঘটে না।' অর্থাৎ অবনীন্দ্রনাথ বলতে চাইলেন যে সমাজের সামগ্রিক জীবনসাধনার সঙ্গে শিল্পীর শিল্পসাধনার কোনো আত্যন্তিক যোগ নেই। আমাদের জীবনের সামগ্রিক কর্মসাধনার মধ্যে শিল্পসাধনা বিধৃত নয়; মানুষের জীবনধর্মের বৃত্তবলয়ের বাইরে কি তবে শিল্পের স্থান? এ প্রশ্নটি খুবই দুরূহ; বিশেষ ক'রে যখন ভোজদেব বলেন যে, শিল্পচর্চা এবং জীবনচর্যা ভারতীয় জীবনদর্শন প্রসঙ্গে একাত্ম হয়ে উঠেছে। নব্যদার্শনিক ক্রোচেও তাঁর সর্বশেষ গ্রন্থ 'My Philosophy'তে বললেন যে শিল্প প্রচেষ্টাকে নৈতিক বলা যেতে পারে কারণ, মানুষের শিল্প প্রচেষ্টা তার বৃহত্তর জীবনায়নের অঙ্গ মাত্র। বৃহত্তর জীবনসাধনাকে যদি নৈতিক বলা চলে তবে আমাদের শিল্প এষণাকেও নৈতিক ধর্মে ঐশ্বর্যবান ভাবলে ভুল ভাবা হবে না। কিন্তু অবনীন্দ্রনাথ এক্ষেত্রে শিল্পসাধনাকে একটি বৃহত্তর জীবনচর্চার অঙ্গ হিসেবে দেখছেন না। শিল্পাচার্যের এই উক্তি শুধুমাত্র ব্যক্তির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়; একটা জাতি বা মিলনের ক্ষেত্রেও এই তত্ত্বটি প্রযোজ্য। দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি জাপানী শিল্প ও জাপানী জাতির বৈষয়িক উন্নতির দৃষ্টান্তের উপস্থাপনা করেছেন। তিনি বলেছেন যে প্রাচীন জাপান শিল্প-ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ হ'লেও, বৈষয়িক সমৃদ্ধিতে তার স্থান ছিল

৬। জাতি ও শিল্প। বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী—পৃষ্ঠা ২০৭

অকিঞ্চিৎকর। আর নব্য জাপান অর্থে-সামর্থ্যে বলীয়ান হ'য়েও কলাশিল্প-সম্পদে বেশ পিছিয়ে পড়েছে। অর্থাৎ শিল্প-এষণা থেকে বৃহত্তর জীবনসাধনা বিযুক্ত। এলিয়ট শিল্পীর মানসলোকে যে বিভজনটুকু লক্ষ্য করেছিলেন—'The man who suffers' এবং 'The mind which creates'—অবনীন্দ্রনাথ আর এক পরিপ্রেক্ষিতে সেই দ্বিধা-বিভক্ত শিল্পচেতনা ও সমাজচেতনার কথা বললেন—শিল্পীর সঙ্গে জনগণের সামগ্রিক জীবনের দুস্তর ব্যবধান। সামগ্রিক জীবনসন্ধান ও শিল্প সন্ধান, দুটি বিভিন্ন খাতে ব'য়ে চলে। এরা একেবারে সমান্তরাল কিনা সে সম্বন্ধ অবনীন্দ্রনাথ খুব স্পষ্ট ভাবে কিছু বলেন নি। তবে ইঙ্গিতে এবং ব্যঞ্জনায়, রূপকে এবং উপমায় তিনি যে তত্ত্ব পরিবেশন করলেন তাতে মনে হয় যে তিনি সামগ্রিক জীবনসাধনার সঙ্গে শিল্পসাধনার একটা বিষম সম্বন্ধের কল্পনা করেছিলেন। শিল্প সামগ্রিক সমাজ-চেতনার সঙ্গে, সমাজ-কল্যাণের সঙ্গে, সচেতন ভাবে যুক্ত হবে, এ তত্ত্বে তিনি বিশ্বাস করেন নি; এখানে তিনি রমা র'লা, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ মনীষীদের সমধর্মী। তিনি বললেন—'শিল্পের সঙ্গে জাতির বিবাহ রাক্ষস-বিবাহ, জাঁতার সঙ্গে মণিমুক্তার বিবাহ দিলে যা ফল হয় সেই রকমের বস্তু হচ্ছে জাতীয় শিল্প।' অর্থাৎ শিল্প হ'ল শিল্পী-কেন্দ্রিক; ব্যক্তির রুচিকে আশ্রয় ক'রে শিল্পের রসের প্রবর্তনা। সমাজ-মানসের বা গণমানসের কল্পিত সত্তার শিল্পে কোনো স্থান নেই। তাই 'জাতীয় শিল্প' ধারণার কোনো বৈধতা ও উৎকর্ষ অবনীন্দ্রনাথের নন্দনতত্ত্বে নেই বললেই চলে। 'জাতীয় শিল্পের' ধারণায় রসের ব্যত্যয় ঘটে; যে শিল্প একটা বিরাট জাতির সকল মানুষের রসের পিপাসা নিবৃত্তি করার সদিচ্ছা পোষণ করে, সে শিল্প তার স্ব-ধর্ম হারায়। শিল্প যদি সকলের রসের তৃষ্ণার নিবৃত্তি করতে চায় তবে তার উদ্দেশ্য কখনই সফল হবে না। শিল্পের মান ক্রমেই নিম্নগামী হবে; নামতে নামতে ক্রমে সে এমন একটা নিম্নভূমিতে অবতরণ করবে যেখানে আর রসের ধারাকে উজ্জীবিত ক'রে রাখা যাবে না। তাই ত' রঁমা রঁলা বললেন যে, শিল্প সবার জন্য নয়। তাই ত' অবনীন্দ্রনাথ শিল্পে অধিকার ভেদ তত্ত্বকে স্বীকার ক'রে নিলেন। তিনি বললেন—শিল্প 'সহৃদয় হৃদয় সংবাদীর' জন্ত; যিনি রসিক, যিনি বোদ্ধা, যিনি দরদী পাঠক এবং মরমী শ্রোতা তিনিই কেবল শিল্পের রসলোকের অধিকার অর্জন ক'রেছেন; এ অধিকার সকলের জন্ত নয়। অবনীন্দ্রনাথ

লিখলেন[৭]—রসবোধ নেই রসশাস্ত্র পড়তে চাওয়ার যে ফল, শিল্পবোধ না নিয়ে শিল্পচর্চায় প্রায় ততটা ফলই পাওয়া যায়। এর উল্টোটা যদি হ'ত, তবে সব ক'টা অলংকার শাস্ত্রের পায়েস প্রস্তুত করে পান ক'রলেই ল্যাটা চুকে যেত। মৌচাকের গোপনতার মধ্যে কি উপায়ে ফুলের পরিমল গিয়ে পৌঁছোচ্ছে তা দেখতে পাওয়া যায়; কিন্তু মধুর সৃষ্টি হচ্ছে একটা প্রকাণ্ড রহস্যের আড়ালে।' এই রহস্য ভেদ করা সব মানুষের কাজ নয়, তাই ত' শিল্পে অধিকারী ভেদের তত্ত্ব অবনীন্দ্রনাথের কাছে এতো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। শিল্পের এই রহস্যকে বাদ দিলে, শিল্পের আর বিশেষ কিছু থাকে না। তাই ত' রবীন্দ্রনাথ বললেন, art is maya'; অর্থাৎ শিল্পকর্ম যে 'অপূর্ব বস্তু'; এই সত্যটুকু যাঁরাই স্বীকার করেন নি, তাঁরাই শিল্পের যথার্থ স্বরূপটুকু ধরতে পারেন নি। এটা যেমন ব্যক্তি-মানুষের বেলায় ঘটেছে, ঠিক তেমনি ভাবেই ঘটেছে এক একটা সমগ্র জাতির বেলায়ও। শিল্প হ'ল অনন্য পরতন্ত্রা। 'আমার শিল্প এক, আর তোমার শিল্প আর এক, আমাদের দেশের শিল্প এক, তোমার দেশের অন্য—এ না হ'লে মানুষের শিল্পে বিচিত্রতা থাকত না। পৃথিবীতে এক শিল্পী একটা কিছু গড়ত, একটা কিছু বলত বা গাইতো আর সবাই তার নকল ক'রে চলত। যেমন রোমক শিল্প নকল নিয়েই চলেছিল—গ্রীক দেবতার মূর্তিগুলোর কারিগরিটার নকল। রোম ভেবেছিল গ্রীক শিল্পের সঙ্গে সমান হয়ে উঠবে এই সোজা রাস্তা ধরে; কিন্তু যেদিন একটি গ্রীক শিল্পীর হাতের কাজ রসিকের চোখে ধরা দিল তার অপরিসীম পেলব মাধুর্যে, সেইদিনই ধরা পড়ে গেল অত বড় রোমক শিল্পের ভিতরকার সমস্ত শুষ্কতা ও অসারতা। সপ্তম সর্গ, অষ্টম সর্গ, সাত কাণ্ড, অষ্টাদশ পর্বগুলোর ছাঁচের মধ্যে নিজের লেখাকে ঢেলে ফেলতে পারলেই কিংবা নিজের কারিগরি বিদ্যেটাকে হিন্দু, মোঘল অথবা ইউরোপীয় এমনি কোনো একটা যুগের বা জাতির ছাঁচের মধ্যে ধরে ফেলতে পারলেই আমাদের ঘরে শিল্প পুনর্জীবন লাভ ক'রে কলাবৌটি সেজে ঘুর ঘুর করে ঘুরে বেড়াবে, এই যে ধারণা এইটেই হচ্ছে শিল্পীদের সৃষ্টি-আরম্ভের কাজে অতি ভয়ানক সনাতন চোরাবালি। এর মধ্যে একটা চমৎকার, চকচকে সাধুভাষায় যাকে বলে, লোষ্ট্র পড়ে আছে, যার নাম ট্রাডিসন বা প্রথা; একে অতিক্রম ক'রে যাবার কৌশল জানা হ'লে তবে শিল্পলোকের হাওয়া এসে মনের পাল ভরে তোলে; ডোববার আর ভয় থাকে না।

৭। শিল্পে অধিকার। বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী পৃষ্ঠা ৫

এই কৌশল জানে তারা যাদের শিল্পলোকে অধিকার রয়ে গেছে। অরসিকের সে অধিকার নেই। অরসিক হরবোলার বুলি, কলের গান শোনাতে পারে; সে গতানুগতিক ঢঙে পুতুল বানাতে পারে, মূর্তি গড়তে পারে অথবা গান বাঁধতে পারে। তার বেশী কিছু করার শক্তি তার নেই। চিরাগত প্রথার অনুসরণপ্রিয়তার হয়ত' তার শিল্প এষণায় পরিসমাপ্তি ঘটে। এই চোরা-বালিতে বহু ভবভূতির মনের আশা অতলে তলিয়ে গেছে। অবনীন্দ্রনাথ এই লিপিটুকু পাঠ করেছিলেন, তাই শুনি তিনি বারবার এই প্রসঙ্গে আমাদের প্রাচীন শিল্পশাস্ত্রের আর্যবাণী উদ্ধার করেছেন অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে। তিনি বললেন যে এই ট্রাডিসনকে কাটিয়ে ওঠবার শিল্পশাস্ত্র বৈদিক ঋষিরা আমাদের দিয়ে গিয়েছেন—মানুষের নির্মিত এই সব খেলার সামগ্রী, হস্তী, কংস বস্ত্র, হিরণ্য, অশ্বতরীযুক্ত রথ প্রভৃতি যে শিল্প সমস্তই দেব শিল্পের অনুকরণ মাত্র—একে শিল্প বলা চলে না। এতো দেবশিল্পীর দ্বারা করা হয়ে গেছে, মানুষের কৃতিত্ব এর মধ্যে কোথায়? এতো শুধু প্রতিকৃতি (নকল) করা হ'ল মাত্র।[৮]

যাদের শিল্পে অধিকার নেই, তারা ট্রাডিশনকে নকল করল, দেবশিল্পকে নকল করল, কিন্তু 'সৃষ্টি' তাদের ধরা সম্ভব হল না। তারা ফুলের কয়েকটি কোরক নিয়ে নাড়াচাড়া করল, আপন অসহিষ্ণুতায় তাকে বারে বারে আঘাত করতেও ছাড়ল না, কিন্তু তারা ফুল ফোটাতে পারল না। এদের উদ্দেশ্য করেই কবিগুরুর উক্তি—

'তোরা কেউ পারবি নে গো
পারবি নে ফুল ফোটাতে।'

এই ফুল ফোটানোর কাজ হ'ল নিজেকে বাইরে মেলে ধরা—আত্মপ্রকাশ করা। নন্দনতত্ত্বের পরিভাষায় বলব, আত্ম-অনুভূতিকে আত্ম-স্বতন্ত্ররূপে প্রত্যক্ষ করা। এটাই হল মানুষের সবচেয়ে বিস্ময়কর সৃষ্টি। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার এর কাছে নগণ্য, এ কথা বললেন অবনীন্দ্রনাথ—সূর্যের মধ্যে ঝড় বইল, মানুষের গড়া যন্ত্রে তার খবর তার সঙ্গে সঙ্গে এসে পৌঁছোল, নীহারিকার কোলে একটি নতুন তারা জন্ম নিলে ঘরে বসে মানুষ দেখলে! এর চেয়ে অদ্ভুত সৃষ্টি হ'ল—মানুষ তার আত্মাকে রূপ, রং, ছন্দ, সুর গতি, মুক্তি সব দিয়ে ছড়িয়ে দিলে বিশ্বরাজ্যে।'

৮। শিল্পে অনধিকার। বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী, পৃষ্ঠা ৫।

অবনীন্দ্রনাথ বললেন শিল্প হ'ল আত্মিক কর্ম—জড়ধর্মের অতিরিক্ত হ'ল শিল্পধর্ম। এই ভাবনায় ভাবিত হয়েই দার্শনিকপ্রবর ক্রোচে বললেন, শিল্প হ'ল activity of the spirit, কোন কাজ আত্মিক কর্ম আর কোন কাজ তা নয়, তা বোঝা বেশ শক্ত। কেমন ক'রে বুঝব, কোন কাজটা আত্মিক কর্ম? বোঝার সহজ পথ বাতলে দিলেন অবনীন্দ্রনাথ। তিনি বললেন, যে কাজে আনন্দের যোগ, সেই কাজই আত্মিক, সেই কাজই রসের আকর; যে মানদণ্ডে অবনীন্দ্রনাথ আত্মিক কর্মের স্বরূপ নির্ণয় করলেন প্রায় সেই কষ্টি পাথরেই Clive Bell তার 'Significant form তত্ত্বকে' যাচাই করে নিয়েছিলেন। যদি আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অতি সাধারণ কাজে কর্মে এই আনন্দকে এনে যুক্ত করতে পারি তবে তাও শিল্প পদবাচ্য হয়ে উঠতে পারে। হিন্দুদের রামায়ণ, মহাভারত, ভর্তৃহরির বাক্যপদীয়, ক্ষেমেন্দ্রের কলাবিলাস প্রভৃতি গ্রন্থে চতুঃষষ্ঠীকলার উল্লেখ আছে। আবার জৈন আগম গ্রন্থ সমবায়াঙ্গে পুরুষদের জন্য দ্বি-সপ্ততি কলা এবং জম্বুদ্বীপ প্রজ্ঞপ্তির টীকায় মেয়েদের জন্য চতুঃষষ্ঠীকলার উল্লেখ আছে। ভোজদেবের মতো আমরা যদি বলতে পারি যে শিল্পচর্চা ও জীবনচর্যা সমার্থক, তবেই কলার শ্রেণীবিভাগের এই বিস্তৃত তালিকা গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠে। কিন্তু এ কথা আমাদের মনে রাখতে হবে যে এই 'গ্রহণযোগ্য' হয়ে ওঠার মূলে রয়েছে আনন্দ। এই আনন্দের যোগটুকু ঘটলে তবেই জীবন ও শিল্প হয়ে উঠবে অনায়াসে। অন্যথায় ফুল কোনোদিনও ফুটবে না। অবনীন্দ্রনাথ প্রশ্ন করেছেন[১] রসের সঙ্গে কাজের বন্দীর পরিচয়, পরিণয় ঘটাবার কি আশা নেই? কেন থাকবে না? কাজকর্ম আমাদেরই বেঁধে পীড়া দিচ্ছে এবং কবি শিল্পীরসিক—এঁরা সব এই কাজের জগতের বাইরে একটা কোনো নতুন জগতে এসে বিচরণ করছেন তা তো নয়? কিংবা জীবনযাত্রার আখমাড়া কলটার কাছ থেকে চটপট পালাবার উৎসাহ তো কবি শিল্পী এঁদের কারু বড় একটা দেখা যাচ্ছে না। তাঁরা তবে কি ক'রে বেঁচে রয়েছেন? অবনীন্দ্রনাথ দৃষ্টান্ত দিয়ে আমাদের বোঝাতে চাইলেন তাঁর বক্তব্য। তিনি লিখলেন—কবীরের কাজ ছিল সারাদিন তাঁত বোনা, অফিসে বসে কলম পেশার কিংবা পাঠশালে বসে পড়া মুখস্থর সঙ্গে তার কমই তফাত। রসের সম্পর্ক মাকু ঠেলার সঙ্গে যত কলম ঠেলার সঙ্গেও তত। কবীর স্বাধীন জীবিকার দ্বারা অর্জন করতেন টাকা, ইচ্ছাসুখে ঠেলতেন মাকু। আনন্দের

১। শিল্পে অধিকার। বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী, পৃষ্ঠা ১৮।

সঙ্গে কাজ বাজিয়ে চলতেন। ঐ যে কবীরের ইচ্ছাসুখে তাঁত বোনার রাস্তা তারি ধারে তাঁর কল্পবৃক্ষ ফুল ফুটিয়ে ছিল। এই ইচ্ছাসুখটুকুর মুক্তি কবি শিল্পী গাইয়ে গুণী সবাইকে বাঁচিয়ে রাখে। এই হ'ল আনন্দ, একে বলা হয়েছে ব্রহ্মাস্বাদ সহোদর।
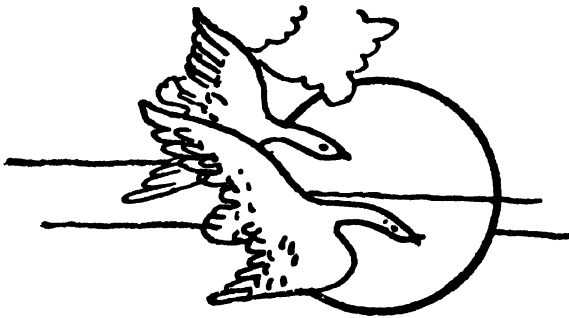
অবনীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য দর্শন

যাঁরা জীবনকে শিল্প এবং শিল্পায়নকে জীবনায়ন বলে গ্রহণ করেছিলেন, শিল্পীশ্রেষ্ঠ অবনীন্দ্রনাথ তাঁদের অগ্রণী একথা আমরা জানি। সুদীর্ঘ জীবনের পথপরিক্রমায় শিল্পীগুরু সাধ্যকে সিদ্ধ করেছেন, আশেপাশে ছড়িয়ে গেছেন সুন্দরের তিলক-আঁকা অজস্র খেলনা। যে খেলনার শিল্পমূল্য উদঘাটিত করেছে শিল্পীর প্রতিভা-ঐশ্বর্য। সোনার আলো স্ফটিকাধারে প্রতিফলিত হ'য়ে যে অপরূপ সৌন্দর্যলোকের সৃজন করে—তা আমরা দেখেছি অবনীন্দ্রনাথের শিল্পে। যে পরমসুন্দরের লীলা চলেছে বিশ্বময়, তাকে দেখবার সাধনাই হ'ল শিল্পীর সাধনা। সে অ-ধরার, অ-দেখার পিছু পিছু শিল্পী অভিসারে চলে। পরম সুন্দর চিরদিনই থেকে যায় মানুষের নাগালের বাইরে। হঠাৎ কখনও সায়াহ্নের সোনাগলানো সূর্যাস্তের চকিত আভায় সেই পরমসুন্দরের দেখা পায় শিল্পী—আভাসে হয়ত' প্রত্যক্ষ হয় সেই পরম সুন্দর। শিল্পীর অন্তরলোকে উদ্ভাসিত হয়, উৎসারিত হয় তার কল্পনা। তবুও সুন্দর ধরা দেয় না। আর সেই পরম সুন্দরের ধরা না দেওয়ার জন্যই ত' সম্ভব হয় যুগে যুগে শিল্প-বিবর্তন। শিল্পীর মনে যে পরম সুন্দরের ধারণা বিচিত্র বিশ্বসৃষ্টির মধ্য দিয়ে বিচিত্রতর হ'য়ে ফুটে উঠেছে, সেই পরম সুন্দরের দেখা পেল না বলেই ত' শিল্পী-মনের অভিসার চলল এক কালের বেড়া ডিঙিয়ে কালান্তরে। অন্তরে সুন্দরের ধারণায় দীপ জ্বালা—সেই দীপের আলোয় পথ চিনে অভিসারে চলেছে শাশ্বত শিল্পী-মানস। শিল্পীগুরুর ভাষায় বলি : 'যদি পরমসুন্দরের প্রত্যক্ষ উপমান পেয়ে সত্যই কোনদিন মিটে যায় মানুষের এই স্পৃহা, তবে ফুলের ফুটে ওঠার, নদীর ভ'রে ওঠার, পাতার ঘন সবুজ হ'য়ে ওঠার, আগুনের জ্বলে ওঠার চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে মানুষেরও ছবি আঁকা, মূর্তি গড়া, কবিতা লেখা, গান গাওয়া ইত্যাদির স্পৃহা আর থাকে না। [সৌন্দর্যের সন্ধান]

মানুষের পরমসুন্দরকে কখনও পূর্ণরূপে প্রত্যক্ষ করা হয়ে ওঠে না, তাই তার আর্টও কোথাও কখনও পূর্ণ সুন্দর হ'য়ে উঠতে পারে না। মানুষের সহজাত অপূর্ণতা তাকে পূর্ণের দিকে নিয়ে চলে—তার অপূর্ণ শিল্পবোধ পূর্ণের সন্ধান করে যুগে যুগান্তরে। দেশে দেশে দেখি তাই শিল্পকলার ক্রমবিবর্তন। লিওনার্দোর কালজয়ী প্রতিভা যখন শিল্পসৃষ্টি করল তখন সে যুগের মানুষ ভেবেছিল বুঝি শিল্পসৃষ্টির শেষ কথা বলা হ'য়ে গেছে। লিওনার্দোর বিজ্ঞানী

মন, তাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য তাঁর শিল্প-শৈলীকে নূতন রূপ দিয়েছিল—তাঁর সৃজনী প্রতিভা সৃষ্টি করেছিল রূপে ও রেখায় অনবদ্য শিল্পসৌন্দর্য। তবু শিল্পের ক্রমবিবর্তন, শিল্পীমনের এগিয়ে চলা সেখানেই থেমে যায় নি। আমরা দেখি জার্মানীর পরবর্তী শিল্প-আন্দোলনের নায়ক ড্যুরারকে—ড্যুরার এগিয়ে চলেছেন লিওনার্দো-যুগকে পিছনে ফেলে। ড্যুরার তাঁর স্বজাতীয় 'রিয়ালিটি'-বোধকে ইতালীয় আঙ্গিক ও শিল্পদর্শনের আলোকচ্ছটায় অপূর্ব সুষমা-মণ্ডিত ক'রে পরিবেশন করেছেন রসিকজনের দরবারে, একথা ইতিহাস বলে।

শিল্পেতিহাসের এই বিবর্তন আমরা প্রত্যক্ষ করেছি গ্রীসদেশে, ভারতবর্ষে এবং মিশরে—এই প্রাচীন সভ্যতাসমৃদ্ধ দেশগুলির সংস্কৃতিবান মানুষের মন পরমসুন্দরকে দেখতে চেয়েছে—সাধনা করেছে সবকিছু পণ ক'রে। তবু দেখা পায়নি এই পরম সুন্দরের। এই দেখা না পাওয়ার জন্যই শিল্পীদের রূপ নিয়ে আর রঙ নিয়ে, রেখা নিয়ে আর ঢং নিয়ে পরীক্ষা চলেছে কেমন করে আভাসে দেখা কল্পলোকের পরম সুন্দরকে ধরে দেওয়া যায় সহৃদয় হৃদয়সংবাদী মানুষের কাছে। তাই এতো পরীক্ষা নিরীক্ষা—তাই খানিক এগিয়ে আবার পিছিয়ে যাওয়া, তারপর আবার এগিয়ে চলা। "আজ যেখানে মনে হ'ল, আর্ট দিয়ে বুঝি যতটা সুন্দর হ'তে পারে তাই হ'ল, দেখি সেইখানেই এক শিল্পী দাঁড়িয়ে, বলছে, হয় নি, আরো এগোতে হবে কিংবা পেছিয়ে অন্য পন্থা ধরতে হ'বে। পরমসুন্দরের দিকে মানুষের মন ও সঙ্গে সঙ্গে তার আর্টের গতি ঠিক এইভাবেই চলেছে—গতি থেকে গতিতে পৌঁছুচ্ছে আর্ট এবং একটা গতি আর একটা গতি সৃষ্টি করছে। ঢেউ উঠল ঠেলে, মনে করলে বুঝি চরম উন্নতিকে পেয়েছি, অমনি আর এক ঢেউ তাকে ধাক্কা দিয়ে বল্লে, চল আরও বাকি আছে। এইভাবে সামনে আশেপাশে নানাদিক থেকে পরমসুন্দরের টান মানুষের মনকে টানছে বিচিত্র ছন্দে বিচিত্রতার মধ্য দিয়ে, তাই মানুষের সৌন্দর্যের অনুভূতি তার আর্ট দিয়ে এমন বিচিত্র রূপ ধরে আসছে—চির যৌবনের দেশে ফুল ফুটেই চলেছে নতুন নতুন।

শিল্পীর এই পরমসুন্দরের অনুধ্যান একতরফা নয়। পরমসুন্দরও শিল্পীকে খুঁজছেন কখনও বা চকিত আভাসে আপনাকে প্রকাশ করছেন শিল্পীর অনাবৃত দৃষ্টির প্রত্যক্ষতায়। রবীন্দ্রনাথ এই পরমসুন্দরের কথাই বলেছেন তাঁর ছন্দোময় ভাষায়ঃ

চকিত আলোকে কখনো সহসা দেখা দেয় সুন্দর
দেয় না তবুও ধরা,
মাটির দুয়ার ক্ষণেক খুলিয়া আপন গোপন ঘর
দেখায় বসুন্ধরা।
আলোকধামের আভাস সেথায় আছে
মর্ত্যের বুকে অমৃতপাত্রে ঢাকা,
ফাগুন সেথায় মন্ত্র লাগায় গাছে,
অরূপের রূপ পল্লবে পড়ে আঁকা,
তারই আহ্বানে সাড়া দেয় প্রাণ, জাগে বিস্মিত সুর
নিজ অর্থ না জানে।
ধূলিময় বাধাবন্ধ এড়ায়ে চলে যাই বহুদূর
আপনারি গানে গানে।

অমৃত পাত্রের সুবর্ণময় আবরণে প্রচ্ছন্ন পরমসুন্দর শিল্পীর মনকে ইঙ্গিতময় আহ্বানে ব্যাকুল করে তোলে। শিল্পী সাড়া দেয়—সে সাড়ায় সুর ফুটে ওঠে, বর্ণাঢ্য আলিম্পন আঁকা হয়। আগেই বলেছি যে শিল্পীই যে কেবল পরম সুন্দরকে খুঁজে ফিরছে তাই নয়, পরম সুন্দরও শিল্পীকে খুঁজছেন। বিশ্বজোড়া রূপ সন্ধান করে ফিরছে একজন 'খেলুড়ি আর্টিষ্ট'কে—যে তাদের নিয়ে লীলা করবে। পরম সুন্দরও খুঁজে ফিরছেন শিল্পীমনকে, নেমে আসছেন তাঁর উত্তুঙ্গ স্বর্গলোক থেকে মর্ত্যলোকের সীমানায়, শিল্পীমনের প্রত্যন্ত তটে। এ যেন হেগেলের Absolute, এ যেন রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা, যাঁর উদ্দেশে কবি বলেছেন: "আমার মিলন লাগি তুমি আসছ কবে থেকে।
তোমার চন্দ্র সূর্য তোমায় রাখবে কোথায় ঢেকে।"
এ অভিসার দু'তরফা—মহাপ্রাণ এবং ক্ষুদ্র প্রাণের দ্বিমুখী যাত্রা শেষ হয় সার্থক শিল্পের রূপায়ণে। আবার শিল্পীগুরুর কথাতেই বলি:

"এমনি রূপ সমস্ত দিকে দিকে জলে স্থলে আকাশে বন্দী থাকে—আর্টিষ্টকে খোঁজে তারা সবাই। তাদের নিয়ে লীলা করবে এমন একজন খেলুড়ি আর্টিষ্টকে খুঁজে ফিরছে বিশ্বজোড়া রূপ সকলে। সেই বিক্রমাদিত্যের আমলে একটা শুকনো গাছ মাঠের ধারে সে অপেক্ষা করছিল যে তাকে নিয়ে একটি বার সত্যি সত্যি খেলবে তার জন্ত। রাজা গেলেন পথ দিয়ে, দেখলেন শুকনো গাছ। রাজার সঙ্গেই রাজকবি—তিনি কবি নন কিন্তু পত্তে কথা বলেন—

তিনি বললেন 'এ যে দেখি শুষ্ক কাঠ।' ভাগ্যি ছিলেন সঙ্গে সত্যিকার কবিও খেলুড়ি। তিনি বলে উঠলেন: 'কি কও শুকনো কাঠ?

"ও সে তরুবর রসের বিরহে

হুতাশে দহে।" (রূপ)

এ কাহিনী শুধু বিক্রমাদিত্যের আমলের নয়, একথা সকল কালের ও সকল দেশের। সত্যিকারের কবি-খেলুড়ির দল অপেক্ষমান রূপকে দেখে দু'চোখ ভ'রে, তারপর রস সৃষ্টি হয়। সে রস হ'ল ব্রহ্মাস্বাদ-সহোদর। সে রস সম্পর্কে দার্শনিক বলেছেন রসো বৈ সঃ।

খেলুড়ি আর্টিষ্ট যে রূপকে দেখে সে রূপ Objective; সে রূপ পরম সুন্দরের প্রকাশ। এই পরম সুন্দরকে যদি Platonic Idea বলি তা হলে হয়ত' অনেকটা ঠিক বলা হবে। এই ব্যক্তি নিরপেক্ষ রূপের কথা নিয়ে, পরম সুন্দরের তত্ত্ব নিয়ে আমরা এতক্ষণ আলোচনা করেছি। এই ধারণার পাশাপাশি আর একটি বিপরীত ধারণাও আমরা শিল্পীগুরুর লেখার মধ্যে অনুস্যূত দেখতে পাই। সে ধারণা হ'ল Subjective সৌন্দর্যের ধারণা। সুন্দর, পরমসুন্দরকে চকিত আভাসে হঠাৎ দেখার আনন্দ নয়, সুন্দরের আনন্দের মধ্যে শিল্পীর সৃষ্টির আনন্দ রয়েছে। সুন্দর যাকে বলছি সে পরম সুন্দরের প্রকাশ বলেই সুন্দর নয়, সে সুন্দর কারণ আমি তাকে সুন্দর করে দেখছি। আমার চোখের আলোয় বিশ্বজগৎ আলোকিত হ'চ্ছে, আমার মনের সুন্দরকে আমি বাইরে দেখে পুলকিত হ'চ্ছি—আমার রুচি বাইরের সুন্দরকে সৃষ্টি করছে, সুন্দরের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করছে। অবনীন্দ্রনাথ বলছেন:

"একটা কথা কিন্তু মনে রাখা চাই, সাজগোজ, পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদির সম্বন্ধে কিছু ওলট-পালট সময়ে সময়ে যে হয়ে আসছে তা ঐ ব্যক্তিগত স্বাধীন রুচি থেকে আসছে। সুতরাং সব দিক দিয়ে সুন্দরের বোঝাপড়া আমাদের ব্যক্তিগত রুচির উপরেই নির্ভর করছে।" (সৌন্দর্যের সন্ধান)

এখানে সুন্দরকে ব্যক্তিনির্ভর হিসেবে দেখা হয়েছে—সুন্দর এখানে পরম সুন্দরের চকিত প্রকাশ নয়। অবনীন্দ্রনাথ এখানে Objective determination-এর কথা বলছেন না। সুন্দর যেন এখানে স্রষ্টার রুচির খেয়াল-খুশিতে চলছে। শিল্পীর সুন্দরের ধারণা বাইরে থেকে আহৃত হয় নি। এখানে শিল্পীগুরু একথা বলছেন না যে রূপ রয়েছে বিশ্বময় ছড়িয়ে। রূপ যেন আসছে শিল্পীর, খেয়াল-খুশির পাখায় ভর ক'রে। রূপ যেন বাঁচছে শিল্পীর রুচিকে

আশ্রয় করে। এই ধারণার কথা ছড়িয়ে রয়েছে অবনীন্দ্রনাথের নানান্ লেখায়। 'জোড়াসাঁকোর ধারে' বইয়ে তিনি বলছেন: "দেখলুম আর আঁকলুম, আমার ধাতে সয় না। অনেক দিন ধরে মনের ভিতরে যা তৈরী হ'ল তাই ছবিতে বের হ'ল। মন ছিপ ফেলে বসে আছে চুপচাপ। আর সবাই কি ঠিকঠাক বের হয়। মুসৌরি পাহাড়ের একটি সন্ধ্যের পাখি আঁকলুম, কি ভাবে সে ছবিটা এল? সন্ধ্যে হচ্ছে, বসে আছি বারান্দায়, বাংলাদেশে সেদিন বিজয়া। হঠাৎ দেখি চেয়ে একটা লাল আলো পরপর পাহাড়গুলির উপর দিয়ে চলে গেল। সেই আলোয় পাহাড়ের উপরে ঘাসপাতা ঝিলমিল করে উঠল। মনে হ'ল যেন ভগবতী আজ ফিরে এলেন কৈলাসে, আঁচল থেকে খসা সোনার কুচি সব দিকে দিকে ছড়াতে ছড়াতে। রঙ, আলোর ঝিলমিল, তার সঙ্গে একটু ভাব—উমা ফিরে আসছেন কৈলাসে। তখনি ধরে রাখল মন। কলকাতায় এসে ছবি আঁকতে বসলুম। ঠিকঠাক সেই ভাবেই কি বের হ'য় ছবি। তা তো নয়, মনের কোন থেকে বেরিয়ে এল সোনালি রূপোলি রঙ নিয়ে সুন্দরী একটি সন্ধ্যের পাখি—সে বাসায় ফিরছে। মনের এ কারখানা বুঝতে পারি নে। এত আলো, এত ভাব, সব তলিয়ে গিয়ে বের হ'ল একটি পাখি, একটি কালো পাহাড়ের খণ্ড, আর তার গায়ে এক গোছা সোনালী ঘাস। অনেক ছবিই তাই—মনের তলা থেকে উঠে আসা বস্তু।

শিল্পীর কাছে সুন্দর হ'ল মনের তলা থেকে উঠে আসা সোনা। যত কিছু কারিগরি, যত কিছু রঙের বাহার সব সেখানে থেকে করে দেওয়া। বাইরে যখন এল তখন সে ভুবনমনোমোহিনী—তার কাছে চাইবার আছে অনেক, তাকে আর দেবার কিছু নেই। তার ঐশ্বর্য ঐ শিল্পীমনের তলা থেকে কুড়িয়ে আনা সাত রাজার ধন। মনের অন্তহীন সম্পদের কতকটা সে গায়ে মেখে এসেছে তাই সে সুন্দর। বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলীতে শিল্পীগুরু বলেছেন: "কাজেই বলতে হবে আয়নাতে যেমন নিজের নিজের চেহারা তেমনি মনের দর্পণেও আমরা প্রত্যেকে নিজের নিজের মনোমতকে সুন্দরই দেখি... সুন্দরকে নিয়ে আমাদের প্রত্যেকেরই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ঘরকন্না তাই সেখানে অন্যের মনোমতকে নিয়ে থাকাই চলে না, খুঁজে পেতে আনতে হয় নিজের মনোমতটি।

এ কথা সত্য। তবে এই নিজের মনোমতটি যদি সুন্দরের নমুনা হয় তা

হ'লে শিল্পের সার্বিকতা বা ইউনিভার্সালিটি বলে কিছু থাকে না বলেই মনে হয়। অন্যের মনোমতকে মনে স্থান না দিতে পারলে শিল্পের জগতে সর্বজন-গ্রাহ্য সুন্দর বলে কিছুই বা থাকবে কি করে? পরমসুন্দরকে স্বীকার করে নিলে অবশ্য আর্টের সার্বিকতাকে যথাযোগ্য মূল্য দেওয়া হয়—এ কথা আমরা মানি। শিল্পীগুরু এখানে কিন্তু শিল্পের Subjectivityকে এত প্রাধান্য দিয়েছেন যে, আর্ট তার সর্বজনগ্রাহ্য আবেদনকে নিঃসন্দেহে হারিয়ে ফেলেছে। অবশ্য কোন শিল্পেরই সর্বজনগ্রাহ্য আবেদন আছে কি না সে সম্পর্কেও যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ বিদ্যমান। নন্দনতাত্ত্বিক পণ্ডিতেরা বলেন যে, সহৃদয় হৃদয়-সংবাদী রসিক মন ছাড়া অন্য কারও রসের অমৃতময়লোকে প্রবেশের অধিকার নেই। এ কথা অনেকেই স্বীকার করেন। শিল্প শিল্পীকেন্দ্রিক। তাই অবনীন্দ্রনাথ আর্টকে শিল্পীর মনের কিনারা থেকে বিশ্বজনের মনের ঘাটে ঘাটে পৌঁছে দেবার কথা ভেবেছেন : তিনি বলছেন :

"আমার নিজের মুখে কি ভাল লাগল না লাগল তা নিয়ে দু'চার সমরুচি বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করা চলে কিন্তু বিশ্বজোড়া উৎসবের মধ্যে শিল্পের স্থান দিতে হ'লে নিজের মধ্যে যে ছোট সুন্দর বা অসুন্দর তাকে বড় ক'রে, সবার ক'রে দেবার উপায় নিছক নিজস্বটুকু নয়; সেখানে individuality-কে universility দিয়ে যদি না ভাঙতে পারা যায় তবে বীণার প্রত্যেক ঘাট তার পুরো সুরেই তান মারতে থাকলে কিম্বা অন্য সুরের সঙ্গে মিলতে চেয়ে মন্দ্র মধ্যম হওয়াকে অস্বীকার করলে সংগীতে যে কাণ্ড ঘটে, পাত্র ও সৌন্দর্য সম্বন্ধে সেই যথেচ্ছাচার উপস্থিত হয় যদি সুন্দর-অসুন্দর সম্বন্ধে একটা কিছু মীমাংসায় না উপস্থিত হওয়া যায় আর্টিষ্ট ও রসিকদের দিক দিয়ে।

শিল্পীগুরু ইউনিভার্স্যালিটির হাতুড়ি দিয়ে ইণ্ডিভিজুয়ালিটির জমাট বাঁধা রূপকে ভাঙতে চাইছেন জনতার মধ্যে সেই রূপকণিকাগুলি পরিবেশন করবার জন্য। নিজের মনোমতকে ভেঙেচুরে তচনচ ক'রে অপরের মনোমত করতে হবে। সমরুচি বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করে খাওয়ালে যদি ইউনিভার্স্যালিটি না থাকে তা ইউনিভার্সালিটি নাই বা রইল। সকলের পাতে পরিবেশন করতে হ'লে সাধারণ খাদ্য পরিবেশন করতে হয়, একথা সহজেই বোঝা যায়। আর যা সাধারণ তার শিল্পমূল্য অসাধারণ হবে কেমন করে? তাই, অনেকের মতে শিল্পের সর্বজনবোধ্য আবেদন থাকে না। সালভাডোর ডালি বা জন ফ্রেডরিক হেরিং সবার জন্য আঁকলে আমরা এঁদের কথা হয়ত জানতে পারতাম না,

দেশ-কালের সীমানা পেরিয়ে হয়ত এঁরা আমাদের কাছে এসে পৌঁছতে পারতেন না। শিল্প সবার জন্য নয়। যাঁরা শিল্পীর সমান ধর্মা, তাঁরা শিল্পীকে বুঝবেন, শিল্পের রসোপলব্ধি করবেন। সেখানে দেশ-কালের বাধা নেই। হাজার বছর পরে হয়ত এক বোদ্ধা মন এসে আবিষ্কার করবে অজন্তা ইলোরার গুহাচিত্রের সৌন্দর্যকে। সে মন গুহাচিত্রের স্রষ্টা শিল্পীদের সমধর্মী। এই সহৃদয় হৃদয়সংবাদী রসিকজনকে রস পরিবেশনের জন্য শিল্পীকে ইউনিভার্স্যালিটির হাতুড়ি দিয়ে তার সুন্দরকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে ফেলার দরকার হয় না। শিল্পীর নিজস্ব রূপবোধ যা ধরা পড়ে শিল্পে, তাকে সহজেই বোঝে সত্যিকারের রসিক মন। কবিতার অনুভূতির কথা বলে গেল, সবাই বুঝল কি না বুঝল সেকথা তার ভাববার দরকার নেই। তার দান ইউনিভার্স্যাল হচ্ছে কি না, এদিকে মন দেবার তার অবকাশ কোথায়? উদাহরণ স্বরূপ রবীন্দ্রনাথের 'স্মরণ' কাব্যগ্রন্থ থেকে কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করছি:

> "এই যে শীতের আলো শিহরিছে বনে,
> শিরীষের পাতাগুলি ঝরিছে পবনে,
> তোমার আমার মন খেলিতেছে সারাক্ষণ
> এই ছায়া-আলোকের আকুল কম্পনে
> এই শীতমধ্যাহ্নের মর্মরিত বনে॥"

পত্নীবিয়োগবিধুর কবিমানস রক্তের আখরে যে কথা লিখল সে কথা ত' সবার জন্য নয়। যারা কোনদিনও প্রিয়া হারানোর ব্যথা বুঝল না নিজের অভিজ্ঞতায়, তাদের কেমন করে দেখাবেন কবি তাঁর অন্তরের অশ্রুর প্রস্রবণকে। তারা শুধু ভাষা পড়ল, অর্থ বুঝল, তারা বুঝল না কবির ব্যথার তল কোথায়? অশ্রুর সমুদ্রে কত বড় বান ডাকলে এমনিধারা কথা বলা যায়? তাই বলছিলাম যে শিল্পকে ইউনিভার্স্যাল করা যায় না—শিল্পের আবেদন কেবল সহৃদয়-হৃদয়সংবাদী রসিকমনের কাছে সত্য। আর সেই রসিকমনের দরবারে পৌঁছে দেবার জন্য শিল্পীকে সজ্ঞানে ইউনিভার্স্যালিটি বা সার্বিকতা দিয়ে ইণ্ডিভিজুয়ালিটি অর্থাৎ ব্যক্তিরুচিকে ভাঙতে হয় না। সেটুকু আপনি আসে।

আমাদের মনে হয়, প্রকৃতপক্ষে অবনীন্দ্রনাথ ব্যক্তিবাদী ছিলেন। ব্যক্তি তার নিজের সুখ, দুঃখ, হাসি, কান্না, ভাবনা, বেদনার কথা বলবে, তাকে রসোত্তীর্ণ করবে প্রতিভার জারক-রসে জারিত ক'রে। সুন্দর তার মনের আলোয় সুন্দর হয়ে উঠবে। তাঁর কথাতেই বলি: "সুতরাং যে আলোর

দোলে অন্ধকারে দোলে, কথায় দোলে সুরে দোলে, ফুলে দোলে ফলে দোলে, বাতাসে দোলে পাতায় দোলে, সে শুকনোই হোক তাজাই হোক, সুন্দর হোক অসুন্দর হোক সে যদি মন দোলালো ত' সুন্দর হ'ল এইটেই বোধ হয় চরম কথা সুন্দর-অসুন্দরের সম্বন্ধে যা আর্টিষ্ট বলতে পারেন নিঃসংকোচে।" (সৌন্দর্যের সন্ধান)

শুধু মন দোলালেই সুন্দর হবে একথা স্পষ্ট করে অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন। কিন্তু একথাই শেষ কথা নয়। এই সাবজেকৃটিভিটির স্বরূপ নির্ধারণ ক'রতে গেলে শিল্পীগুরুর পরবর্তী লেখাগুলোও মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করতে হবে। তিনি অন্যত্র বলছেন: "বালক যখন সুরে বেসুরে তালে বেতালে মিলিয়ে নেচে গেয়ে চলল তখন তার সব অক্ষমতা, সব দোষ ভুলিয়ে দিয়ে প্রকাশ পেল শিশুকণ্ঠের এবং সুকুমার দেহের ভাষাটির অপূর্ব সৌন্দর্য, কিন্তু বড় হয়ে ছেলেমো করা সাজে না একেবারেই। তবেই দেখা যাচ্ছে স্থান-কাল-পাত্র হিসেবে সুন্দর ও অসুন্দর এই ভেদ হচ্ছে নানা রচনার মধ্যে।"

এখানে আবার অবনীন্দ্রনাথ শুধু পাত্রের উপরই সুন্দরের স্বরূপ নির্ণয়ের গুরুদায়িত্ব দেন নি, স্থান এবং কালকেও অনেকখানি মর্যাদা দিয়েছেন সৌন্দর্যের প্রকৃতি নির্ণয়ের ব্যাপারে। অবশ্য যদি স্থান এবং কালকে সাবজেকৃটিক বলে গ্রহণ করা যায় তা হ'লে সুন্দরকে পুরোপুরি সাবজেকৃটিভ বলে নেওয়া চলতে পারে। অন্তথায় সুন্দরের ব্যক্তিনির্ভর রূপটি হারিয়ে যায় স্থান এবং কালের স্থূল হস্তাবলেপে। রূপ হ'ল সাবজেকৃটিভ—এ তত্ত্ব ছড়িয়ে আছে অবনীন্দ্রনাথের শিল্প-আলোচনার নানা অধ্যায়ে। কাজেই এ কথা মনে করাই সঙ্গত হবে যে, অবনীন্দ্রনাথ স্থান এবং কালকেও ব্যক্তিনির্ভর হিসেবেই গ্রহণ করেছেন। কারণ স্থান এবং কালকে অবজেকৃটিভ বলে গ্রহণ করলে তাঁর পরবর্তী অনেক লেখাই অর্থহীন হয়ে পড়ে। রূপ যে পুরোপুরি স্রষ্টানির্ভর—একথা কোনমতেই বলা চলবে না যদি আমরা স্থান-কালকে 'ব্যক্তিনিরপেক্ষ' মনে করি। রূপের জগতে অবনীন্দ্রনাথ ব্যক্তিবাদী একথা আমরা আগেই বলেছি। আবার তাঁর কথা উদ্ধৃত করি:

"মানুষের মন বা চিত্তপট ত' ক্যামেরার প্লেট নয় যে খুললেই ধরলে ছবি বুকে, কার কাছে কি যে মনোরম ঠেকে, কোন্ রূপটা কখনই বা প্রাণে লাগে তার বাঁধাবাঁধি আইন একেবারেই নেই; কিন্তু মনে না ধরলে সুন্দর হ'ল না, মনে ধরলে তবেই সুন্দর হ'ল—এ নিয়ম অকাট্য।"

এই মনে ধরার ব্যাপারটা শিল্পীর কাছে অত্যন্ত মূল্যবান। মনে ধরল, চোখে লাগল ত' সেই হ'ল সুন্দর—আর অপরের মনে ধরানোর কৌশলটুকুই হ'ল সৌন্দর্য সৃষ্টির গূঢ় রহস্য। সুন্দরকে সৃষ্টি করা মানে অপরের মনে ধরানো। তবে এই অপরের মনে ধরানোর জন্য শিল্পীকে সজ্ঞানে কোন কসরৎ করতে হয় না—নিজের মনে ধরলে শিল্পীর সমানধর্মা রসিকজনের কাছে তার আবেদন সত্য হ'য়ে থাকবেই। একথা অনস্বীকার্য যে সুন্দর কখনই একই রূপে সকলের কাছে প্রত্যক্ষ নয়। আমার সুন্দর আর তোমার সুন্দরের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান, কারণ আমাদের মননধর্ম বিভিন্ন। আলো ঝলমল দিনে কাঞ্চনজঙ্ঘার অমল ধবল পাথরের গায়ে দেখেছি সোনালী আলোর রঙ্গনলীলা—রঙ ফুটেছে বরফের গায়ে, জমে ওঠা মেঘের পাহাড়ে আর আমার মনে। আমার বিস্ময় বাধা মানে নি কোথাও—তাকে ছড়িয়ে দিয়েছি আমার সমস্ত সত্তায়। আর একজনের বিস্ময় হয়ত' অতখানি সীমাহারা হবার সুযোগ পেল না—সেও দেখেছে সুন্দরের ঐ অতুলনীয় লীলা, তবু তার হিসেবি মন পারে নি উঠতে তার দৈনন্দিন জীবনের লাভক্ষতির হিসাব-নিকাশের উর্ধ্বে— তার চোখে তাই ব্যর্থ হয়ে গেছে সুন্দরের ঐ ভুবন ভোলানো রূপ। রূপ সার্থক হয় শিল্পীর চোখে। নিজের মনে না ধরলে, নিজের সুন্দরকে সৃষ্টি করতে না পারলে অপরের মনে ধরানোর কথা ওঠে না। আগেই বলেছি যে অপরের মনে ধরানোর জন্য শিল্পীর মনে সজ্ঞান প্রয়াস নেই। যদি শিল্প সৃষ্টি হয়ে ওঠে, তবে অপরের মনে ধরবেই। তবে অপরকেও বোদ্ধা হতে হবে। শিল্প-প্রচেষ্টাকে শিল্পসৃষ্টি করে তোলার কৌশলটুকুই হ'ল শিল্পীর হাতে বিধাতার দেওয়া সোনার কাঠি—এই সোনার কাঠির মায়ায় জেগে ওঠে ঘুমন্তপুরীর রাজকন্যা, তার চরণ পাতে বেজে ওঠে লক্ষ নূপুরের ধ্বনি মূর্চ্ছনা ; জড়ত্বের ধ্বংসস্তূপে প্রাণের ভাগীরথী নেমে আসে দু'কূল-প্লাবী উদ্দামতায়। শিল্পীগুরুর কথায় বলি :

"পাষাণ তার একটা আকৃতি আছে বর্ণও আছে, কাঠিন্য ইত্যাদি গুণও আছে কিন্তু চেতনা নেই। সুতরাং তার সুখ দুঃখ মান অভিমান কিছুই নেই—এই হ'ল নিয়তির নিয়মে গড়া সেই পাষাণ, কিন্তু রূপদক্ষের কাছে পাষাণী অহল্যা নিয়তিকৃত নিয়মের থেকে স্বতন্ত্র নিয়মে যখন রূপ পেলো তখনো সে পাষাণ, কিন্তু তার সুখ দুঃখ মান অভিমান জীবনমৃত্যু সবই আছে। সে মাটির খেলনা গড়লে সে মাটিকে জড়তা থেকে মুক্তি দিয়ে মানুষের খেলার সাথীরূপে ছেড়ে দিলে।"

জড়ত্বের বন্ধনে বন্দীকে প্রাণময় সত্তায় প্রতিষ্ঠিত করাই হ'ল শিল্পীর ধর্ম। পাষাণী অহল্যার প্রাণপ্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে না যদি না শিল্পীকে দেওয়া হয় সর্বপ্রকার বন্ধন থেকে নিরঙ্কুশ মুক্তি—যদি না তাকে তিনটি ভুবনে অবাধ বিচরণের ছাড়পত্র দেওয়া হয় তা হ'লে তার শিল্পলোকে প্রাণের দূতীদের আনাগোনা বন্ধ হয়ে যায়। নিষেধের বন্ধনে শিল্পী পঙ্গু হয়ে পড়ে—আর সে শুকনো গাছে ফুল ফোটার অবকাশ থাকে না।

জাপানী শিল্পে এই প্রাণধর্মকে প্রত্যক্ষ করে শিল্পসমালোচক বউইক (Bowic) জাপানী শিল্পী সম্বন্ধে লিখেছেন :

'Should he depict the sea coast with its cliffs and moving waters, at the moment of putting the wave bound rocks into the picture he must feel that they are placed there to resist the fiercest movement of the ocean, while to the waves in turn he must give an irresistible power to carry all before them ; thus by this sentiment called living movement reality is imparted to the inanimate object.'

(On the laws of Japanese Painting)

এই জড়কে প্রাণ দেওয়া হ'ল শিল্পীর-প্রতিভার ধর্ম। কিন্তু আইনের বাঁধনে শিল্পীকে বাঁধলে বা কোন মডেলের অনুকরণ করতে বললে শিল্পী তার নিজের দেবার সম্পদটুকুকে নিঃশেষে দিতে পারে না। সে মডেল পরমসুন্দরের মডেলই হোক অথবা কলা ভবনে সযত্নরক্ষিত কোন শ্রেষ্ঠ শিল্পীর সৃষ্টিই হোক —মডেল শিল্পীর দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করবে, তার নির্মেঘ মুক্তি ঘটবে না অসীম নীলের নিঃসীমতায়। 'রূপের মান ও পরিমাণ' শীর্ষক নিবন্ধে শিল্পীগুরু এমনি ধারা কথাই বলেছেন : "স্থির প্রতিমা নিয়ে ধর্মের কারবার, মান পরিমাণের অস্থিরতা রাখলে সেখানে কাজ চলেই না, সুতরাং ব্যক্তিগত ভাবের উপরে প্রতিমা লক্ষণ ছেড়ে রাখা চলল না, এই মাপ, এই লক্ষণ, এই দেবতা এমনি বাঁধাবাঁধির কথা উঠল এবং শাসন হ'ল—নান্যেন মার্গেন। এই যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মাপজোখ তার সঙ্গে রীতিমত শাস্ত্রীয় শাসন যা প্রতিমার চোখের তারা, ঠোঁটের হাসি, অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ভঙ্গী ইত্যাদিকে একটু এদিক-ওদিক হ'তে দিলে না, তাতে ক'রে চুল তফাৎ হ'ল না মূর্তিটির প্রথম সংস্করণে ও দ্বিতীয় এবং পর পর তার অসংখ্য সংস্করণে, এতে ক'রে পূজারীর কাজ

ঠিকমত হ'ল কিন্তু আর্টের কাজে ব্যাঘাত এল। শাসনের জোরে মানুষের ক্রিয়া হয়ে উঠল কল তবে চলল যেমন যুদ্ধের কাজ, তেমনি ধর্মটা প্রচার করতে শিল্পজগতে কতকগুলি আর্টিষ্ট ফৌজ সৃষ্টি করলেন শিল্পশাস্ত্রকার।... এই সব দেখেই শিল্পশাস্ত্রকার বলেছেন যে পূজার জন্য যেসব মূর্তি তারি কেবল লক্ষণ ও মাপ লেখা গেল। অন্য সকল মূর্তি যথেচ্ছ গড়তে পারেন শিল্পী মনোমত মাপজোখ দিয়ে।"

তাই বলছিলাম শিল্পীগুরুর শিল্পশাস্ত্রের নিষেধের বাঁধন নেই কোথাও—অবনীন্দ্রনাথ এমনিতর কথা বলতে পেরেছেন, তার কারণ তিনি সাবজেকটিভ শিল্পতত্ত্বে বিশ্বাসী। অবশ্য খাঁটি শিল্পীরাই এই বন্ধনহীন মুক্তির অধিকারী, শিক্ষার্থীদের এতে অধিকার নেই। শিল্পে যাদের হাতেখড়ি হচ্ছে, তাদের জন্য কানুনের বাঁধাবাঁধি, আর যারা এই সৃষ্টির মন্ত্রটি আয়ত্ত করেছে তারা সব নিয়মকানুনের নাগালের বাইরে।

"মুক্তি ধার্মিকের; আর ধর্মার্থীর জন্য ধর্মশাস্ত্রের নাগপাশ। তেমনি শিল্পশাস্ত্রের বাঁধাবাঁধি শিল্পশিক্ষার্থীর জন্য; আর শিল্পীর জন্য তাল, মান, অঙ্গুল, লাইট-শেড, পার্শপেকটিভ আর অ্যানাটমির বন্ধনমুক্তি।"

[ভূমিকা, ভারতশিল্পে মূর্তি]

মুক্তপক্ষ শিল্পীর কাছে অবজেকটিভ সুন্দরের কোন দাবি নেই—বাইরে থেকে আনা কোন নির্দেশের চোখ রাঙানি নেই। শিল্পী তার অন্তরের রূপকে বাইরে মেলে ধরবে—সুন্দরকে বাইরে এনে দেখবে, আর পাঁচজনকেও দেখাবে। নিজের অনুভূতির সৌন্দর্যকে আত্মস্বতন্ত্ররূপে প্রত্যক্ষ করবে শিল্পী আর তখনই হবে সত্যিকারের সৃষ্টি। রূপ ফুটে উঠবে সহৃদয় রসিকজনের চোখে, রসের ঝরণা ধারায় অভিষিক্ত হবে তার সমগ্র চেতনা। সাবজেকটিভ সুন্দরের ধারণা শিল্পীর বন্ধনহীন আত্মার যথেচ্ছ সঞ্চরণের সম্ভাবনাকে সত্য করে—আর সেই বন্ধন মুক্তির উল্লাসে সম্ভব হয় নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ। এই সৃষ্টি সব প্রয়োজনের আওতার বাইরে—এ হ'ল শিল্পীর লীলা সম্ভূত।

ঝড় প্রত্যাসন্ন। কালো মেঘের দিগন্ত ছোঁয়া বেড়ার বেষ্টনে মেঘদীপের চকিত আবির্ভাব। মেঘবহ্নির সাড়ম্বর আত্মঘোষণা। উদভ্রান্ত নারকেল গাছগুলো কালো আকাশের দিয়ে চেয়ে আছে। তাদের বিস্ময়ে লীলাহীন স্তব্ধতা। মন বললে 'বাঃ, ছবির মত সুন্দর।' এ স্বগতোক্তির পিছনে কোন সজ্ঞান যুক্তির বালাই নেই, তবু নির্জ্জন মনের এই রূপানুভূতিটুকু অযৌক্তিক নয়। দার্শনিক বললেন এই স্বগতোক্তি যুক্তিনিষ্ঠ। এখানে যুক্তিটা প্রচ্ছন্ন, সে বাইরে বেরিয়ে এসে তাল ঠোকে নি বটে কিন্তু বিষয়-মাহাত্ম্যে প্রমাণ করেছে যে সে ভিত্তিভূমিতে অন্তরশায়ী। এই যে প্রকৃতির মনোহারিত্বকে ছবির সঙ্গে তুলনা করলাম, এ ছবি ত' কলাকুশলীর সৃষ্টি। এখানে সৌন্দর্যের যথাযথ মূল্যায়নটুকু সম্পন্ন হ'ল। প্রকৃতির সৌন্দর্যের সঙ্গে শিল্পসৌন্দর্যের ভেদ স্বীকৃত হ'ল এবং শিল্পসৌন্দর্যকে মহত্তর মর্যাদা দিয়ে রসিক মন রসবোধের পরিচয় দিল। এর উল্টোটাও ঘটে। ছবি দেখে বলি একেবারে যেন জীবনের নকল। যেমনটি দেখল শিল্পী তেমনি আঁকল। আমাদের মধ্যে অনেকেই হাততালি দিয়ে বাহবা দিলেন শিল্পীকে। আর যদি শিল্পী নকলনবিশী করতে না পারল ত' তাকে দোষ দিলেন দর্শকেরা। তাঁরা মনে করেন ছবি হ'বে ফটোগ্রাফি আর কবিতা গান হ'বে হরবোলার বুলি। অবনীন্দ্রনাথ আমাদের শিল্পদরবারে এই সব দরবারীদের বড় ভয় করতেন। এঁরাই ত' সংখ্যাগরিষ্ঠ। প্রদর্শনীর ছবিতে এঁরা জীবনের প্রতিরূপ খোঁজেন। না পেলেই বলেন 'না, হ'ল না'। এঁদের উদ্দেশ্যে অবনীন্দ্রনাথ বললেন[১]: অন্যথা-বৃত্তি আর্টের এবং রচনার পথে মস্ত জিনিস, এই অন্যথা-বৃত্তি কবির চিত্তে মানুষের রূপকে দিলে মেঘের সচলতা এবং মেঘের বিস্তারকে দিলে মানুষের বাচালতা। এই অসম্ভব ঘটিয়ে কবি সাফাই গাহিলেন যথা...

"ধূমজ্যোতিঃ সলিলমরুতাং সন্নিপাতঃ ক্ব মেঘঃ,
সন্দেশার্থাঃ ক্ব পটুকরণৈঃ প্রাণিভিঃ প্রাপণীয়াঃ।"

ধূম আলো আর জল বাতাস যার শরীর, তাকে শরীর দাও মানুষের, তবে তো সে প্রিয়ার কানে প্রাণের কথা পৌঁছে দেবে? বিবেক ও বুদ্ধিমাফিক মেঘকে মেঘ রেখে কিছু রচনা করা কালিদাসও করেন নি, কোন কবিই করেন না।

১। বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী, পৃঃ ১০৭।

যখন রচনার অনুকূল মেঘের ঠাট কবি তখন মেঘকে হয় মেঘই রাখলেন কিন্তু যখন রচনার প্রতিকূল ধূম জ্যোতি জল বাতাস তখন নানা বস্তুতে শক্ত করে বেঁধে নিলেন কবি। এই অন্যথা-বৃত্তি কবিতার সর্বস্ব, তখন যেমন এখনো তেমন, রসের বশে ভাবের খাতিরে রূপের অন্যথা হচ্ছে। "অন্যথা-বৃত্তি বলল শিল্প মায়াস্বরূপ। শিল্প বা কথা বস্তু অতীত এক বাস্তবকে সৃষ্টি করে। এর পিছনে কোন অভিসন্ধি, কোন নিগূঢ় উদ্দেশ্য থাকে না শিল্পীর। এই উদ্দেশ্য থাকে না বলেই সমালোচক বলেন যে প্রকৃতির সৌন্দর্যের চেয়ে শিল্প-সৌন্দর্য মহত্তর মর্যাদার দাবী রাখে। প্রকৃতি যে কাজ করে চলেছে হাজার হাজার বছর ধরে তার পিছনে একটা অভিপ্রায় সিদ্ধির তাড়া আছে। তাকে জীবপ্রাণের উর্ধ্বতন এবং সংরক্ষণ বলব অথবা তাকে মানব মনের আবির্ভাব বলব সেটা নির্ভর করবে আমাদের দর্শনগত অভ্যাসের ওপর। যে উদ্দেশ্যই আরোপ করি না কেন প্রকৃতির বিবর্তন ধারার পিছনে একটা অভিপ্রায় থেকে যাচ্ছে। এই অভিপ্রায়টুকু একটা প্রাক্-অভাবের সূচনা করছে। উদ্ভিদতত্ত্ববিদরা আমাদের বললেন যে পুষ্পের বর্ণ বৈচিত্র্য আমাদের মনোহরণ করার জন্য নয়। এই বর্ণ সুষমা কীটপতঙ্গকে আকৃষ্ট ক'রে পুষ্পজীবনের সংরক্ষণ করে তার উত্তরাধিকারীদের মধ্যে। মানুষের আঁকা ফুলের ছবি এমনিতরো কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে না। প্রকৃতির বহু বিচিত্র সৃষ্টি তার বিবর্তনের পথে তাকে পূর্ণতার পানে নিয়ে চলেছে। প্রত্যেক একক সৃষ্টি প্রকৃতিকে পূর্ণতর করেছে। জীবাণু থেকে মানব মনের আবির্ভাবাবধি যে বিবর্তন তার পিছনে রয়েছে কুশলী প্রকৃতির একনিষ্ঠ সাধনা। তার সিদ্ধি পূর্বপরিকল্পিত, তাই তার বিবর্তন পথও খানিকটা ধরা-বাঁধা। এই সিদ্ধির ধারণা একটা প্রাক্-অভাবকে সূচিত করেছে এবং এই অভাববোধের জন্যই প্রকৃতির বিচিত্র সৃষ্টি কবি-শিল্পীর সৃষ্টির চেয়ে ন্যূন। শিল্পী হলেন উদ্দেশ্য অপ্রণোদিত। কবি, যখন উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য প্রয়োজনের তাগিদে কাব্য লেখেন তখন তা' প্রায়োজনিক কাব্য হয়, তার মধ্যে অমৃতের আস্বাদ থাকে না। কবি হলেন অপ্রয়োজনের দলে। এই অপ্রয়োজন থেকে যে কাব্যের জন্ম হয় তা কালোত্তীর্ণ এবং রসোত্তীর্ণ হয়। প্রকৃতির সৃষ্টি হ'ল প্রয়োজনের তাগিদে আর কবির লেখা হ'ল অপ্রয়োজনের খেয়ালে। শিল্পীর কর্মপথ অনির্দিষ্ট। অবনীন্দ্রনাথ বললেন যে পাকা শিল্পীর জন্য কোন আইন কানুন নেই, সে সব আইনের বাইরে। যারা শিক্ষানবিশী করবেন আইনের শাসন

তাদের জন্যে। শিল্প হ'ল শিল্পীর লীলা, লীলায় ত' বাঁধাধরা পথে আনাগোনা করার রেওয়াজ নেই। তাই শিল্পী চলেন খেয়ালে, আর প্রকৃতির পাকা বুদ্ধির হিসেব তাকে তার আপন কক্ষপথে ঘোরায়। তাই বুঝি বারে বারে একই ছাঁচের ঋতুবিবর্তন।

দার্শনিক বলবেন মানুষের শিল্পে আত্মার স্বাক্ষর রয়েছে। মানুষের শিল্প আত্মার স্পর্শধন্য। বস্তুর গুরুভার তাকে পঙ্গু করে রাখে না। প্রকৃতির সৌন্দর্য সৃষ্টির মধ্যে বিপর্যয় ঘটায় বস্তুর গুরুভার। অনেক অবাঞ্ছিত জঞ্জাল বুকে ক'রে প্রকৃতির সুন্দরকে বসে থাকতে হয়। তার প্রকাশ পদে পদে ব্যাহত হয়। মানুষের শিল্পে এই অবাঞ্ছিত জঞ্জাল পরিত্যক্ত। তার শিল্প বস্তু-ভারে ভারাক্রান্ত হয়। জড়প্রকৃতির আইন কানুন শিল্পলোকে অচল। তাই ত' আমাদের দেশের পণ্ডিতেরা বললেন, শিল্প হ'ল 'নিয়তিকৃত নিয়মরহিতা'। অনেক বাছাই, অনেক রঙ বদলের পর তবে না মানুষের হাতের ছবি আঁকা হ'ল। প্রকৃতি যেখানে যেখানে অক্ষম তুলিতে ভুল রঙ ধরিয়েছিল মানুষের সন্ধানী চোখ সে রঙগুলোকে তুলে দিয়ে তার ছবিতে নতুন রঙের আমদানী করল। শিল্পী আঁকল যা হ'তে পারত; যা হয়েছে তার প্রতি তার মোহ নেই। প্রকৃতির মধ্যে হওয়াটাই শেষ কথা, কি হতে পারত সে তত্ত্বটা নিয়ে প্রকৃতি মাথা ঘামায় না। তাই ত' মানবশিল্প প্রকৃতির হাতের কারুকাজের চেয়ে বেশী সুন্দর। তাই ত' প্রকৃতির সৌন্দর্য দেখে আমরা বলি 'ছবির মত সুন্দর'।

মানুষ পরমসুন্দরকে খুঁজে বেড়ায়। তার অন্বেষণ নিত্যকালের। রূপ, রঙ ও রেখায় সেই সুন্দরের ক্ষণ-মাধুর্যকে চিরদিনের ক'রে রাখবার তার দুরন্ত প্রয়াস। মানুষের এই প্রয়াসের পিছনে কোন জাগতিক অভাব বা অভীষ্ট সিদ্ধির ব্যঞ্জনা নেই। তবে কী কবি কথিত শুধু অকারণ পুলকে গান গাওয়া হয়, ছবি আঁকা হয়? শিল্পীর কোন নিরুদ্ধ আবেগ শান্ত হয় না তার শিল্প সৃজনের মধ্যে দিয়ে? অবনীন্দ্রনাথ শিল্পী-মানসের আন্তর প্রয়োজনটুকুকে স্বীকার করেছেন। এটুকু হ'ল শিল্পীচিত্তে রূপাভাব। সে অভাবের কোন নির্দিষ্ট সত্তা নেই, তা দূর করবারও কোন বাঁধাধরা নিয়ম নেই। এই অভাবের তাগিদেই রবীন্দ্রনাথ রেখা এবং রঙ নিয়ে পরিণত বয়সে ছবি আঁকতে বসলেন। এই প্রয়োজনের তাগিদেই কবি-শিল্পীদের হাজারো পরীক্ষা নিরীক্ষা। তবে এই প্রয়োজনটুকু হ'ল অপ্রয়োজনের প্রয়োজন। আত্মানুভূতির আত্মস্বতন্ত্ররূপে প্রকাশের মধ্যেই তার পরিসমাপ্তি। আবার সেই পরিসমাপ্তি

থেকেই পরবর্তী প্রয়োজনের জন্ম হয়। হেগেলীয় দ্বন্দ্ববাদের মতই এর নিত্য অভিসার। অবশ্য এই দ্বন্দ্ববিধির কোন আইন কানুনই শিল্পলোকে চলে না। একথা স্বয়ং হেগেলও স্বীকার করেছেন। কেননা আদর্শগত দুই বিরোধী মূল্য সুন্দরের জগতে অবর্তমান। তবে একথা সত্য যে যেখানে একটা শিল্প প্রচেষ্টার পরিণতি তার মধ্যেই থাকে পরবর্তী শিল্প প্রসারের সূচনা। শিল্পী মানসে পরম সুন্দরের প্রতিষ্ঠাভাব শিল্পের বিবর্তন ঘটাচ্ছে যুগ থেকে যুগান্তরে। জনকল্যাণ, ব্যক্তিকল্যাণ প্রমুখ নানান্‌বিধ কল্যাণ-সাধন শিল্পের যে অনভিপ্রেত এটা শিল্পীগুরু আমাদের বলেছেন। শিল্প হবে স্বরাট, সম্রাট। জীবনধর্মের বা প্রাণধর্মের দাসত্ব করা শিল্পের আপন সত্যধর্মের বিরোধী। রূপ নিয়ে শিল্পের কারবার—পরমসুন্দরকে রূপায়ণ করবার ব্রত হ'ল শিল্পীর। সে রূপের প্রয়োজন সেই রূপটুকুর মধ্যেই বিধৃত। বাইরের জীবনের বা জগতের কোন প্রয়োজন মেটাবার দায়িত্ব তার নেই। সে আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ। এমন কী রূপকে প্রতীকধর্মী বললেও রূপের মর্যাদা, শিল্পের গৌরব ক্ষুণ্ণ হয়। রূপ এমনই আত্মনির্ভর, স্বয়ংসম্পূর্ণ। রূপকে অরূপের প্রতীক বললে তার স্বমহিমা স্বীকৃত হয় না। তাই শিল্পীগুরু এই তত্ত্বকে অস্বীকার করলেন[১] : "রূপের দর্শন ক'রে আনন্দিত হওয়াতেই তার পরিণতি, রূপ থেকে স্বতন্ত্র, রঙ থেকে স্বতন্ত্র বর্ণহীন অরূপের প্রতীক হওয়াতে রূপের সার্থকতা নয়।"

মানুষের অভিপ্রায় হ'ল উদ্দেশ্যসিদ্ধির অভিমুখী। সে সিদ্ধির রূপটুকু সদা সচেতন কর্মীর মনে উদ্ভূত হ'য়ে থাকে। শিল্পীর শিল্পচেতনায় এ ধরণের কোন উদ্দেশ্য নেই, একথা আমরা আগেই বলেছি। প্রকাশের প্রয়োজনে শিল্পী সৃষ্টি করেন। তাকে কেউ আত্মপ্রকাশ বলেছেন আবার কারো কারো মতে সে প্রকাশ হ'ল কবির ব্যক্তি-সত্তা-নিরপেক্ষ সাময়িক অনুভূতির প্রকাশ। সে যাই হোক শিল্পীর কাছে প্রকাশটাই বড় কথা। এই প্রকাশের মধ্যেই কাব্যশিল্পের প্রতিষ্ঠা। শিল্পী তাঁর সৃষ্টির মধ্যে আনন্দ পান। শিল্পরসিকও সেই সৃষ্টি থেকে আনন্দ লাভ করেন। কিন্তু আনন্দ পাওয়াটা তাঁদের লক্ষ্য নয়। শিল্পের আত্মধর্মের সঙ্গে এই আনন্দটুকুর কোন বিরোধ নেই। এখন প্রশ্ন হ'ল সম্পূর্ণরূপে উদ্দেশ্য বিরহিত এই যে সৃষ্টি যাকে আমরা শিল্প বলছি তার মূলে তাহ'লে প্রেরণা জোগায় কে? শিল্প কেন জীবনের সব সম্পদকে তুচ্ছ ক'রে তাঁর কলালক্ষ্মীকে নিয়ে জীবন কাটিয়ে দেন পরম আনন্দে? তার উত্তরে

১। বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী পৃঃ ২৪৪।

আমরা বলব, এ যে শিল্পীর লীলা। কবি তাঁর ছন্দ নিয়ে, কথা নিয়ে আজীবন খেলা করলেন কোথাও কোন প্রত্যাশা না রেখে। শিশু যেমন ক'রে সারা দিনমান আপন মনে তার খেলাঘর সাজায় আবার ভাঙ্গে, পটুয়াও তেমনি তার রঙ তুলি নিয়ে ছবি এঁকে চলেছেন, কবি কবিতা বেঁধে চলেছেন সারাজীবন ধরে। এ হ'ল লীলা। সৃষ্টিশীল মানুষের অক্লান্ত লীলায় যুগে যুগে কাব্য লেখা হ'ল, সুর বাঁধা হল, ছবি আঁকা হ'ল। তার কোন প্রয়োজন ছিল না জাগতিক অর্থে। বস্তুতান্ত্রিক তাদের অস্বীকার করবেন হয়ত' তাদের প্রয়োজন নেই ব'লে। কিন্তু শিল্পরসিক যুগে যুগে এই অপ্রয়োজনের প্রয়োজনকে স্বীকার করেছেন সানন্দে, সবিনয়ে। এই অপ্রয়োজনের প্রয়োজনটুকু শিল্পীর লীলা-ধারণার মধ্যে বিধৃত। মানুষের মধ্যে যে চিরন্তন শিল্পীটা রয়েছে সে কারণে এই লীলায় মেতে উঠল সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে। তার খেলার কাজ আজও শেষ হ'ল না। অবনীন্দ্রনাথ এই লীলাটুকুকে প্রত্যক্ষ করলেন মানুষের সমগ্র ইতিহাস জুড়ে "মানুষ কোন্ আদিম যুগ থেকে এই খেলা খেলেছে তার ঠিক ঠিকানা নেই, আজও তার খেলা বন্ধ হ'ল না—এ কি রহস্য, এ কেমন খেলা; মানুষ কোন্ কালে ছবি লিখে লিখে খেলতে সুরু করেছে আজও সেই খেলা চল্লো; মানুষের এ খেলায় অরুচি হ'ল না কেন? সুরের যত রকম খেলা হ'তে পারে মানুষ তা খেল্লে, নাচের ভঙ্গি, কথার ছন্দ, রঙ-রেখার ছন্দ সব নিয়ে খেল্লে মানুষ; কিন্তু সে খেলেই চল্লো, থামলো না।" এই লীলার স্বাক্ষর আদিমতম কালের বিস্মৃত সভ্যতায় রয়ে গেছে। প্রাগৈতিহাসিক ও ঐতিহাসিক যুগে মানুষ ছবি এঁকেছিল। Aurignacian যুগে স্পেনের গুহাবাসী মানুষ ছবি আঁকল; Soletrian যুগে মানুষ মূর্তি গড়ল; Magdalenian যুগে ছবির মধ্যে গতিশীলতার দ্যোতনা সংযোজন করল শিল্পী। এ সবই শিল্পীর লীলাসম্ভূত। এ লীলায় তার পরম আনন্দ।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথও এই লীলাকে প্রত্যক্ষ করলেন[১] "মানুষের কাজের দুটো ক্ষেত্র আছে—একটা প্রয়োজনের আর একট্য লীলার। প্রয়োজনের তাগিদ সমস্তই বাইরের থেকে, অভাবের থেকে; লীলার তাগিদ ভিতর থেকে, ভাবের থেকে।" এই লীলাটুকু হ'ল শিল্পকৃতি। তার মধ্যেই সুন্দরের অধিষ্ঠান। প্রকৃতিতে যখন সুন্দরের দেখা পাই, তখন প্রকৃতি লীলাময়ী। মেঘতিমিরে সমুদ্রের দূরতম প্রশান্তিতে সূর্য যখন অস্ত যায় তখন যে রূপ সৃষ্টি

১। যাত্রী, পৃঃ ৯।

হয় তা রসিকজনার নিত্যকালের আরাধনার বস্তু। পরমসুন্দরের অর্থহীন লীলার যে রেশটুকু রয়ে গেল নামহীন সমুদ্রে চিহ্নহীন আকাশে তার মধ্যে প্রচ্ছন্ন রইল চিরকালের অম্লান ঐশ্বর্য। সৃষ্টির এই অহেতুক লীলার রসটিকে যখন মন পেতে চায় তখন সে শিল্প সৃজন করে, কবিতা লেখে, গান বাঁধে, ছবি আঁকে। এখন প্রশ্ন হ'ল শিল্পীর লীলায় আর শিশুর খেলনায় কি কোন পার্থক্য আছে? অবনীন্দ্রনাথ বললেন যে শিল্পীর লীলা ছেলেখেলা নয়। শিল্পীর লীলায় বেদনা আছে, অভাব আছে, তাই জ্বালাও আছে। যে লীলা আত্মপ্রকাশের তপস্যায় তাপিত। ছেলেখেলার দোহাই দিলে শিল্পীর লীলাটুকু আমরা যথাযথ অনুধাবন করতে পারব না। ছেলেখেলার মধ্যে কোন সৃষ্টি প্রেরণা নেই। আমাদের অবিশ্লেষক মন যদি নির্বিচারে শিল্পলীলাকে ছেলেদের খেলার সমপর্যায়ভুক্ত করে তবে অবনীন্দ্রনাথ তার প্রতিবাদ করবেন।[১] কোন কোন পণ্ডিত তাবৎ রূপবিদ্যাকে এই ছেলেখেলার ভিতে দাঁড় করিয়ে আর্টকে দেখতে চলেছেন একদল মানুষও এদেশে আজকাল দেখি যাঁরা নেশা এবং খেলার কোঠায়-রূপবিদ্যাকে ফেলে এসব থেকে মানুষকে নিরস্ত করতে চাচ্ছেন। ছবি লেখার বিষয়ে একদিন মুসলমান-ধর্মে কঠিন শাসন ছিল, মানুষ লেখার বিরুদ্ধে আমাদের শাস্ত্র শুধু নয় দলে দলে মানুষের নিজের মনেও একটা বিষম ভয় এক এক সময়ে উদিত হয়েছিল।" এই ছেলেখেলার ভিতে দাঁড় করিয়ে শিল্পকে বিচার করলে ভুল করা হবে। দুটোর আত্যন্তিক বিষমতাকে উপেক্ষা করলে বিচারের প্রহসন ঘটবে। সুবিচার হবে না। শিশুর খেলা তার অতিরিক্ত প্রাণশক্তির প্রকাশ; শিল্পলীলায় আত্মার স্পর্শ। মানুষের চিৎশক্তি আপনার স্বাক্ষর রেখে যায় মানুষের শিল্পকর্মে। প্রাণশক্তি শিশুলীলায় প্রকট; সে প্রাণের নাগালের বাইরে হ'ল শিল্পভূমি। মানুষের জৈব বিবর্তন চলেছিল প্রাণ থেকে মনের পর্যায়ে। এই মনই হ'ল শিল্পলোকের পাদপীঠ। প্রাণের সঙ্গে শিল্পের খুব যে ঘনিষ্ঠ যোগ আছে, তা নয়। যেখানে প্রাণ ক্ষীণতম সেখানেও উৎকৃষ্ট শিল্পকর্ম আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। বহু অসুস্থ, অশক্ত গুণী শিল্পীর সৃষ্টিতে বিশ্বচৈতন্য উদ্ভাসিত। এমন কথাও শুনেছি এ যুগের কবি সমালোচকদের মুখে যে প্রাণ যখন অবসন্ন, তখনই উৎকৃষ্ট কাব্য-কলার সৃষ্টি সম্ভব হয়। ক্ষয়রোগাক্রান্ত কীট্‌সের কথা স্মরণ করুন। তাঁর কাল ব্যাধি তাঁর কাব্য সাধনার অন্তরায় হয় নি। গ্রীক দার্শনিক কথিত দেহমনের অবিসম্বাদিত

১। বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী পৃঃ ২৫৮।

ঐক্যতত্ত্ব এ যুগে অস্বীকৃত। প্রাচীনদের মতে এ যুগের নব্য সমালোচক প্রাণশক্তি ও মননশক্তির একটা আন্তরিক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক কল্পনা ক'রে প্রাকৃত সত্যের বিরুদ্ধাচরণ করেন নি। এই প্রাণশক্তি ও মননশক্তির বিচ্ছেদটুকুকে পুরোপুরি অনুধাবন করলে আমরা বুঝতে পারব যে কেন অবনীন্দ্রনাথ বার বার করে খেলা এবং লীলার প্রভেদ করলেন। মানুষ এক খেলা ছেড়ে আর এক খেলা ধরে তার বয়সের তারতম্য অনুসারে। তার খেলার রূপভেদ হয়; তার খেলায় ক্লান্তি আছে, অবসাদ আছে, ছেদ আছে। আর শিল্পীর লীলায় ছেদ নেই, অবসাদ নেই; চিন্ময় আত্মা সে লীলায় নিত্যক্রিয়াশীল। খেলা হ'ল সখের, সে মানুষের বার-মহলের সঙ্গী; আর 'গৃহিণীসচিবঃসখীমিথঃ', তার অন্দরমহলের, তার অন্তরলোকের পাটরাণী! "খেলার নেশা ছুটলে খেলা থেমে যায় কিন্তু লীলার অবসান নেই; লীলা করে চলায় অবসাদ নেই, আজীবন রূপদক্ষ মানুষের কাছে লীলাময়ী, মায়াময়ী বিশ্বরূপিণী। তিনি আসছেন যাচ্ছেন অনন্ত লীলা দেখিয়ে, তারই ছন্দ ধরছে মানুষ রূপবিদ্যা দিয়ে নিজে রচনায়, সে নিজেরও বিশ্বের লীলার পরিচয় ধরেছে যুগ যুগ ধরে।"[১]

শিল্পীর 'হৃদয় দহন জ্বালায়' এ লীলা প্রজ্জ্বলন্ত। অবনীন্দ্রনাথ বললেন যে শিল্পীর লীলায় রয়েছে অন্তহীন রসের অফুরন্ত রূপের জন্য জ্বালা আর তৃষ্ণা'। মানুষ পরমসুন্দরের চকিত সাক্ষাতে যে আনন্দাস্বাদন করে তাই তার চোখে রূপের জ্বালা ধরিয়ে দেয়। সেই রূপতৃষ্ণা তার শিল্পে বাসা বাঁধে। মন যাকে পেল, যাকে রূপের রেখার রঙের কারাগারে বন্দী করল তার প্রতি মনের আর ঔৎসুক্য থাকে না। যাকে পায় নি, যাকে ধরতে পারল না আপনার শিল্পকর্মে মন তার সন্ধান ক'রে চলে। সেই না পাওয়ার বেদনা, সেই অন্তহীন রূপতৃষ্ণাকে বক্ষে ধারণ ক'রে শিল্পীর রূপ থেকে রূপান্তরে নিত্য যাওয়া আসা। মানুষের সীমায়িত শক্তি কিছুতেই সেই পরমসুন্দরকে তার আপন সৃষ্টির সীমানায় আনতে পারে না। সম্যক্ প্রকাশে তাকে প্রকাশিত করাই হ'ল শিল্পীর দুশ্চর তপস্যা। সে ত' তপস্যা সিদ্ধ হয় নি। তাই ত' শিল্পীর বেদনার অন্ত নেই। রাবণের চিতা শিল্পীর বক্ষে অনন্তকাল ধরে জ্বলবে। এই তৃষ্ণার শেষ যেদিন হবে সেদিন মানুষের সব সৃষ্টির প্রয়াস শেষ হ'য়ে যাবে। শিল্পসৃষ্টির জন্য এই জ্বালাটুকুর এই তৃষ্ণাটুকুর প্রয়োজন রয়েছে। এ ছাড়া জ্বালা নিত্য এবং সত্য। সব সৃষ্টির মধ্যেই এই জ্বালার বহ্ন্যুৎসব। তাই ত' শিল্পীকে

১। বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী, পৃঃ—২৫৭

বললেন : "রূপের জ্বালা, রসের জ্বালা বহ্নির সমান জ্বলছে সব উৎকৃষ্ট রচনার মধ্যে, রূপদক্ষের জীবন লীলাময়, জ্বালাময় হ'য়ে উঠেছে, প্রদীপ্ত সমস্ত রূপ ও রসের তপস্যায় মানুষ জীবনপাত করছে, রূপবিদ্যার সাহায্যে এই জ্বালাকে, এই তৃষ্ণাকে রূপের পাত্রে ধরতে।" তাই বলছিলাম অবনীন্দ্রনাথের মতে শিল্প খেলা নয়, এ হ'ল লীলা যে লীলায় রয়েছে মানুষের আত্মনিবেদনের পরম বেদনা।[১]

রূপের অভাব থাকে শিল্পীর অন্তরে। তা হ'ল তার প্রেরণার উৎস। বস্তু জীবনের, পশুজীবনের কোন অপূর্ণতা শিল্পে জগতে এহ বাহ্য। সাধারণ বুদ্ধিতে এইসব স্বাচ্ছন্দ্যগত প্রশ্নকে আমরা শিল্প সহায়ক অথবা শিল্প হন্তারক মনে করি। কিন্তু সেটা আমাদের ভ্রান্তি। র্ঁমা র্ঁলা বস্তুজীবনের অভাব, অনটন ও বাধাগুলোকে শিল্পসহায়ক বলেছেন। আন্তর অভাব বোধকে বাইরের অভাবগুলো উদ্দীপ্ত করে। যাঁরা আরাম কেদারায় শুয়ে মহৎ শিল্পসৃষ্টির স্বপ্ন দেখেন, যাঁদের জীবনে কখনও খর রৌদ্রের দীপ্তিদাহ লাগল না তাঁরা ব্যর্থ হবেন তাঁদের শিল্পসৃষ্টির চেষ্টায়। শিল্পে জীবনের স্পর্শ থাকবে, জীবনের সুখ, দুঃখ, আনন্দবেদনা শিল্পকে রূপ, রঙ ও রসে পূর্ণ করে তুলবে। সমালোচকদের মধ্যে আবার বিপরীত মতেরও অসদ্ভাব নেই। বস্তু জীবনের অভাবকে প্রাসঙ্গিক বলেছেন অনেকে শিল্পপ্রয়াসের প্রতিকূল ব'লে। প্রতিভা বিকাশের পরিপন্থী বলে অনেকে বস্তুজীবনের অপূর্ণতাকে দোষী সাব্যস্ত করেন। দারিদ্র্য যে গুণরাশিনাশী এটা অনেকের কাছেই স্বতঃসিদ্ধ। কিন্তু অবনীন্দ্রনাথ এ তত্ত্বকে অস্বীকার করেছেন কেননা এইসব অভাবের সঙ্গে শিল্পের আত্যন্তিক যোগকে স্বীকার করলে শিল্প ধর্মচ্যুত হবে। সে অভাববোধ যেমন শিল্পকে উদ্দীপ্ত করে না তেমনি তাদের পূর্ণতা সাধনও শিল্পীর লক্ষ্য নয়। শিল্পকে যদি লীলা ব'লে স্বীকার করি তবে লীলার ক্ষেত্রে বস্তুজীবনের এবং বাইরের জগতের কোন অভাবের স্থান নেই। লীলা ধারণার মধ্যে এরা অপাংক্তেয়। শিল্প মানুষের কোন কল্যাণ করল কি না, শিল্পের দ্বারা কোন অকল্যাণ হ'ল কী না, এসব হ'ল অবান্তর, অতিরিক্ত। তাদের সঙ্গে লীলার কোন যোগ নেই, যে লীলায় শিল্পের সত্তাটুকু নিহিত। লীলা উদ্দেশ্য বিরহিত। রূপকার হ'ল লীলাকার। শিল্পী যেরূপ সৃষ্টি করল তাকে প্রয়োজনের বাটখারা দিয়ে ওজন করলে হবে না। "রূপের যথার্থ পরিমাপ একমাত্র রূপবিদ্যার দ্বারা হওয়া সম্ভব, আর কোন বিদ্যা রূপের তল পর্যন্ত

১। বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী পৃঃ—২৫৯।

পৌঁছে দিতে পারে না। দপ্তরী সোজা রেখা টেনে যায় বটে কিন্তু রেখার যে রহস্য তার তল তো পায় না কোনো দিন। রূপবিদের কাছে সামান্য সামান্য আঁচরটিতে আপনার জীবন রহস্য ধরে দেয়।"[১] রূপবিদ তাঁর দেখবার কৌশলে রূপকে আবিষ্কার করেন। অন্য কোন দিকে তার লক্ষ্য নেই। রূপবিদ যেন নির্নিমেষ-লক্ষ্য ফাল্গুনী। অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্যের প্রশ্নের উত্তরে তৃতীয় পাণ্ডব ফাল্গুনীই তাঁর গুরুকে বলেছিলেন যে তিনি পাখীর চোখ ছাড়া অন্য কিছু দেখছেন না। এই একাগ্রতা থাকলে তবেই লক্ষ্যভেদ সম্ভব হয়। শিল্পীর সাধনা একাগ্রতার এই স্তরে উন্নীত হ'লে তবেই সার্থক রূপসৃষ্টি সম্ভব। শিল্প শুধু রূপকে দেখেন। সে দেখা অলস দেখা নয়। শিল্পীর সমস্ত সত্তা ঐ রূপকে প্রত্যক্ষ করে। সে দেখায় সারা মন প্রাণ উন্মুখর হয়ে উঠে। রূপের ধারা অবিশ্রাম বয়ে চলেছে। শিল্পীরও তাই দেখার অন্ত নেই। তাই ত' শিল্পীর অন্তরে লক্ষ রূপের মেলা। তাকে প্রকাশ করাই হল শিল্পীর ধর্ম। শিল্পী তাঁর অন্তরের রূপকে হাজার হাজার লীলা কমলে বাইরে মেলে ধরেছেন। তার গন্ধ, তার রঙ, তার রূপ, তার আমন্ত্রণ বহুবিচিত্র। গুণীজন শিল্পীকে বাহবা দেন, তাঁর প্রশংসায় মুখর হয়ে ওঠেন। সেই প্রশংসার কোলাহলের মধ্যে শিল্পী কখন আবার আপনার সৃষ্টির নিভৃত নিকেতনে আশ্রয় নেন, সে তথ্যটুকু অলক্ষিত থেকে যায়। তাঁর রূপতৃষ্ণা আবার তাঁকে নতুন সৃষ্টির কাজে প্রেরণা দেয়। তাঁর অন্তরের জ্বালা তাঁকে অবিশ্রান্ত ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ায় রসলোকের এক মহল থেকে আর এক মহলে। তাঁর শিল্পসৃষ্টিও বহুবিচিত্র হয়ে ওঠে। শিল্পীর লীলা অব্যাহত গতিতে বয়ে চলে। তাঁর লীলার মধ্যে আমরা দেখি তাঁর বেদনা এবং তাঁর আনন্দ। বেদনা আসে রূপাভাব থেকে, আর আনন্দ আসে প্রকাশ থেকে। এই বেদনায় সৃষ্টির বীজ, এই আনন্দে বিশ্বের কল্যাণ। সে কল্যাণটুকু শিল্পের লক্ষ্য না হ'লেও তার আবির্ভাব ঘটে সব সার্থক শিল্পের রূপায়ণে। রূপবিদ্যা মানুষের কীর্তিকে রূপবান করে, ঋদ্ধিমন্ত করে। মানুষের মহত্তম সৃষ্টিতে তার বৃহত্তম কল্যাণের আশ্বাস। তাই ত' আমাদের প্রাচীন জ্ঞানে সুন্দর এবং শিবের সাজীকরণ ঘটল। শিল্পীগুরু তারই প্রতিধ্বনি ক'রে বললেন: 'রূপবিদ্যা এই ভাবে আশৈশব মানুষের সহচারিণী হ'য়ে প্রতিভাবানের ঘর আলো ক'রে মানবজাতির কল্যাণে নিযুক্ত রইলো।" কল্যাণ এলো সুন্দরের হাত ধরে। শিল্পীর লীলায় উভয়ের অধিষ্ঠান ঘটল। তাই ত' একাসনে দোঁহে অভ্যর্থিত হ'চ্ছে অনাদিকাল ধরে।

১। বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী, পৃঃ ২৬৭।

শিল্পীগুরু অবনীন্দ্রনাথের শিল্প-প্রকরণ তত্ত্ব

'রীতিরাত্মা কাব্যস্য'বাদীরা রীতি বা প্রকরণকেই কাব্যের স্বরূপ বলে ব্যাখ্যা করলেন। আর 'শিল্পস্বরাট'বাদীরা শিল্পে প্রকাশ সার্বভৌমত্বটুকু অক্ষুণ্ণ রাখলেন। প্রকরণ বা টেকনিক গৌণ স্থান অধিকার করল। নব্য দার্শনিক এবং শিল্পশাস্ত্রীরা রীতি প্রকরণের স্থান নির্দেশ করলেন শিল্পলোকের বার মহলে। শিল্পের অন্দরমহলে টেকনিক অপাংক্তেয়। শিল্পীর মনে মনে রঙ রূপ রেখায় যে ছবি আঁকা হ'ল তা-ই শিল্পকৃতি। নীরব কবিও এই তত্ত্বে কবি-মর্যাদা পেলেন। মনে মনে ছবি-আঁকার কাজটুকুই হল শিল্পীর কাজ।' তারপরে সেই মনের পর্দার ছবিকে বাইরের পর্দায় মেলে ধরা। কবি ছন্দোবদ্ধ পথে অক্ষর সাজিয়ে সেই ছবিকে ফোটালেন, চিত্রকর রঙ ও রেখায় সেই মনের সম্পদকে সবার সামনে মেলে ধরলেন, ভাস্কর পাথর কুঁদে কুঁদে সেই অনবদ্য রূপটুকু ফুটিয়ে তুললেন পাথরের গায়ে। এমনি ক'রে শিল্পীর লীলা চলল। এখন প্রশ্ন হ'ল এই যে, মনের ছবি আঁকবার আর সেই ছবিকে তার একান্ত নিভৃতিটুকু থেকে বাইরে মেলে ধরবার যে কৌশল তারা কি সমগোত্রীয়? যখন মনের পর্দায় ছবি ফুটল, তারপর যখন সেই মানস কৃতিটুকুর নির্ব্যক্তিকরণ ঘটল কাগজে, ক্যানভাসে অথবা পাথরের গায়ে তখন কি শিল্পীর মনের ঐশ্বর্যটুকুর রূপান্তর ঘটল? তার কি গোত্রান্তরও ঘটল এই বহিঃপ্রকাশের আঙ্গিক স্পর্শের নব্য শিল্পশাস্ত্রীরা এমন কথা বললেন যে এই বহিরঙ্গীকরণ রীতি বা টেকনিকটুকু শিল্প নয়। রীতি হ'ল শিল্পলোকের দ্বিজসমাজের চোখে অন্ত্যজ। রীতি বা টেকনিক নিয়ে মিস্ত্রির কারবার, ভালো মিস্ত্রী আবশ্যিক ভাবে বড় শিল্পী নয়। যারা ক্রাফ্‌টে বিশারদ তারা শিল্পের দরবারে গুণী বলে গণ্য হয় নি কখনো। তবুও প্রাচীন গ্রীক নন্দনতাত্ত্বিক ঐতিহ্যের কল্যাণে আমরাও শিল্প এবং ক্রাফ্‌ট মিশিয়ে ফেলেছি। আর তাই শিল্প প্রকাশ ও শিল্প প্রকরণের পার্থক্যটুকু সম্বন্ধে অস্পষ্টভাবে সচেতন থাকলেও সব সময়ে সে সম্বন্ধে শিল্পশাস্ত্রীরা অবহিত হন নি। তাই ত' আরিস্ততল কথিত 'ক্যাথারসিস' থিওরির এত সাগ্রহ সমর্থন এবং প্লেতো কথিত 'শিল্পী নির্বাসন' নির্দেশের এতো সরব প্রতিবাদ। প্রয়োজন প্রকরণটুকুকে আঁকড়ে ধরে, খেয়াল খুশিতে শিল্প সৃষ্ট হয়। যারা প্রয়োজনটাকে বড় ক'রে দেখেন তাঁরা প্রকরণটাকে মুখ্য স্থান দেন, আর যারা শিল্পকে প্রয়োজন অতিরিক্ত সৃষ্টিরূপে প্রত্যক্ষ করেন তাঁরা

খেয়ালখুশিকে সর্বোত্তম মর্যাদা দেন। অবনীন্দ্রনাথ এই দ্বিতীয় দলের। তিনি আর্ট এবং ক্রাফ্‌টের পার্থক্যটুকু নির্দেশ ক'রে বললেন:[১] ক্রিয়ার বা Techniqueএর কৃত্রিমতা অকৃত্রিমতা ভেদ নিয়ে কতক শিল্প পড়ল Fine artsএর কোঠায়, কতক শিল্প রইল Craftsএর কোঠায়। ...ক্রিয়া বা Techniqueকে ছাপিয়ে চলা হ'ল সুন্দর চলা।' এই সুন্দর চলাই শিল্পীর সাধনা। এই সুন্দর চলাতেই আনন্দের শতদল প্রস্ফুটিত হয়।

শিল্পীগুরু অবনীন্দ্রনাথ শিল্পের প্রকরণ এবং আঙ্গিককে তার যথার্থ স্থানটিতে প্রক্ষেপ করেছেন।- তাঁর মতে যাঁরা আর্টিস্ট তাঁদের অকৃত্রিম প্রকরণে সাফল্য লাভ করার জন্য সাধনা করতে হয়। শিল্পীরা হলেন শিল্প-প্রকরণ তপস্যায় তপস্বী। কিন্তু এই তপস্যায় যদি কেবলই কঠোর তপ থাকত, যেমন তেমন ক'রেই কাজ সারতে চাইত সবাই, আর এই এদের কাজগুলো কলে প্রস্তুত জিনিষের মত কাজ দিত কিন্তু আনন্দ দিত না। আনন্দ দেওয়াই ত' শিল্পের উদ্দেশ্য। যদি শিল্পকে উদ্দেশ্য-অম্বিত বলতে হয় তবে শিল্প-চারিত্র্যকে ক্ষুণ্ণ না করে এইটুকুই বলা যায় যে শিল্পের লক্ষ্য হ'ল আনন্দ দেওয়া। এই আনন্দের কথা এতদ্দেশের আনন্দবর্ধন, জগন্নাথ প্রমুখ প্রাচীন অলংকারিকেরা বলেন, শিল্প-উদ্দেশ্য হ'ল এই আনন্দাভিমুখী। আনন্দবর্দ্ধন বললেন: 'সহৃদয় হৃদয়হ্লাদি শব্দার্থময়ত্বমেব কাব্যলক্ষণম্।' আর জগন্নাথ এই আনন্দকে বললেন 'লোকোত্তর আহ্লাদ।' নব্য শিল্পদার্শনিক ক্রোচে একে নাম দিলেন 'pure poetic joy'; আনন্দই যদি সৃষ্টির উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য ব'লে ধার্য হয় তা হ'লে শিল্পের বা কলার ধর্ম ক্ষুণ্ণ হয় না। শিল্প হিসাবে শিল্পের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হবার সম্যক সম্ভাবনা, যদি আমরা শিল্প-চারিত্র্য-বহির্ভূত কোন লক্ষ্যকে শিল্প-লক্ষ্য বলে গ্রহণ করি। কিন্তু লক্ষ্য হিসেবে আনন্দের স্বীকৃতি শিল্প-চারিত্র্যকে ক্ষুণ্ণ করে না। শিল্প নির্লক্ষ্য হলেও তার লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যটিকে আনন্দকেন্দ্রিক বললে শিল্প-চারিত্র্য ক্ষুণ্ণ হয় না ব'লেই অনেক বিশ্বাস করেছেন। মহাদার্শনিক কাণ্টের ভাষায়, সর্ব-লক্ষ্য-উত্তর-শিল্পেরও একটা লক্ষ্য আছে। দার্শনিক বললেন এই লক্ষ্যের কথা, দর্শনের আপাতবিরোধী সুগভীর ব্যঞ্জনাদৃপ্ত ভাষায়।[২] শিল্পীগুরু অবনীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করেছেন শিল্পের এই আনন্দ-লক্ষ্যে। তিনি

১। বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী, পৃঃ ১৫৯।

২। "Purposiveness without a purpose".

বললেন[৩] বিষয় ও প্রকরণ এবং তার কঠোরতাই ফোটে নির্মমভাবে কলের কাজে, আর মানুষের আর্টে নিয়ন্ত্রিত আনন্দ ও মুক্তির স্বাদ এসে লাগে। আর্টের প্রকরণগুলিতে আনন্দ না মিশলে আর্ট হ'ত ফটোগ্রাফের মত অসম্পূর্ণ জিনিষ।

শিল্পীগুরু প্রকরণকে শিল্প না বললেও প্রকরণের যথামূল্য নির্দিষ্ট করে দিলেন শিল্পের জগতে। ক্রোচে যেমন প্রকরণকে শিল্পক্ষেত্রে অনাবশ্যক এবং অতিরিক্ত বললেন, অবনীন্দ্রনাথ তা বললেন না। তাঁর মতে প্রকরণ ছাড়া শিল্পসৃষ্টি সম্ভব নয়। শিল্পী প্রকরণকে আত্মস্থ ক'রে প্রকরণকে উত্তীর্ণ হবে। শিল্পলোকে সিদ্ধিলাভের চাবিকাঠিটি তাঁদের হাতেই গেছে যাঁরা শিল্প প্রকরণকে আত্মস্থ করেছেন এবং অনায়াসে প্রকরণের কঠোরতাকে স্বকীয় প্রতিভার জারকরসে জারিত ক'রে তাকে নবরূপ দিতে পেরেছেন। মানুষের অমৃতত্ব-লাভের সাধনা যেমন মৃত্যুকে এড়িয়ে গিয়ে সিদ্ধি লাভ করে না সে সাধনা সিদ্ধিলাভ করে মৃত্যুকে পেরিয়ে গিয়ে; ঠিক তেমনি ক'রে মহাশিল্পীর শিল্পসাধনা প্রকরণের কঠোরতাকে এড়িয়ে গিয়ে সিদ্ধিলাভ করে না। সে সাধনা ফলবতী হয় প্রকরণকে পেরিয়ে গিয়ে। প্রকরণ ছাড়া ছবি, ছবি হয় না; স্বতঃস্ফূর্ত সৃষ্টিশক্তি স্কেচ করে। সেই স্কেচকে ছবির মর্যাদা দিতে হলে শিল্পীকে শিল্প প্রকরণটুকুর প্রয়োগ করতে হয়। সে প্রয়োগে হয়ত' শিল্পী শাস্ত্রীয় প্রকরণকে উত্তীর্ণ হয়ে যান; তবু সেই বাঁধা পথেই তাঁর প্রারম্ভিক পদক্ষেপ। কোন কোন স্কেচ শিল্প পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে, এমন দৃষ্টান্ত রয়েছে। অবনীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে অবহিত। তিনি বললেন, কিন্তু যে স্কেচ করার মধ্যে আর্টিষ্টের আনন্দ নিত্য থাকে তার ধরন স্বতন্ত্র। ছোট গল্পের মত ছোট ও সামান্য হলেও সেটা সম্পূর্ণ জিনিষ এবং সেটা লিখতে অনেকখানি আর্ট চাই। ছোট হ'লেই ছোট গল্প হয় না; একটুখানি টান দিয়ে অনেকখানি বলা বা বেশ ক'রে কিছু ফলিয়ে বলার কৌশল শক্ত ব্যাপার। আর্টিষ্ট কেন সে শ্রম স্বীকার করতে চায় তার একমাত্র কারণ বলার এই যে, নানা কারিগরি—তাতে আনন্দ আছে। ...সঙ্গীতের চিত্রের কাব্যের সব শিল্পেরই প্রকরণের দিকটায় খাটুনী আছে—ভাব ও রসকে ফাঁদে ধরার ছাঁদে বাঁধার খাটুনী।[৪] তবে কলের মজতুর যেমন শুধু রুজি-রোজগারের জন্য নিরানন্দ খাটুনী খাটে,

---

৩। বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী, পৃঃ ১৭৩।

৪। বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী পৃঃ ১৭৪

শিল্পীর খাটুনী তেমন নিরানন্দ নয়। যতনের খাটুনী, যে খাটুনী খাটেন সন্তানের জননী সেই খাটুনী হ'ল শিল্পীর। আর অযতনের খাটুনী, যেমনটি খাটে মাইনে করা ধাত্রী, তার দ্বারা শিল্প সৃষ্টি সম্ভব হয় না। শিল্পী কোন্ ধারা খাটুনী খাটল তার নিশানা রইল শিল্প কর্মে। যেখানে খাটুনীর পিছনে যত্ন রইল সেখানে সুন্দরের আসন পাতা হ'ল, আর যেখানে শ্রম শুধুমাত্র অযত্ন আশ্রিত তা বিশ্রী, উদ্ভট রূপ নিয়ে রসিককে পীড়া দিল। প্রকরণ শুধুমাত্র সৃষ্টি-মাধ্যম ; সেই মাধ্যমটিকে অবহেলা করলে সৃষ্টি সম্ভব হয় না। শিল্পীগুরু আপন মতের স্বপক্ষে মহাশিল্পী রেঁাদার মতের উল্লেখ করলেন :

"Craft is only a means but the artist who neglects it will never attain his end....Such an artist would be like a horseman, who forgets to give oats to his horse."

প্রকরণ ব্যতিরেকে কি শিল্পসৃষ্টি সম্ভব হয় ? রেঁাদা এই দুরূহ প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন যে, সহজ ক'রে, সুন্দর ক'রে লিখতে এবং আঁকতে হ'লে প্রকরণটুকু পরিপূর্ণ রূপে আয়ত্ত করতে হয়। এই আয়ত্তীকরণের ইতিহাস বহু-শ্রম-সিদ্ধ। বহুদিনের অক্লান্ত সাধনায়, বহু বিনিদ্র রাতের তপস্যায় এই প্রকরণকে আত্মস্থ ক'রে একেবারে আপনার ক'রে নেওয়া যায়। এই আপনার ক'রে নেওয়াই হ'ল যথার্থ শিল্পীর কাজ। শিল্পী যখন অনুশীলনের মধ্য দিয়ে এই প্রকরণটিকে একেবারে আত্মস্থ করেন তখন তা শিল্পীর নিজস্ব সৃষ্টি-কৌশল হয়ে পড়ে। তা রসিকজনকে মুগ্ধ করে। প্রখ্যাত বেহালাবাদক মেনুহিনের সুরসৃষ্টির সহজ নৈপুণ্যে মুগ্ধ হয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রশংসা করলে তিনি সবিনয়ে বলেছিলেন :

"God alone knows with what difficulty I acquired this case."

এই যে শিল্পীর সহজ নৈপুণ্য এটি তখনই আসে যখন শিল্প-প্রকরণে শিল্পী পারঙ্গম হয়ে ওঠে। প্রকরণ পারঙ্গম হ'লে তবেই শিল্পীর সৃষ্টিতে স্বতঃস্ফূর্তির প্রসাদ গুণটি এসে যুক্ত হয়। শিল্পীগুরু বললেন[৫] প্রকরণে পূর্ণ অধিকার না হ'লে লেখায়, বলায়, চলায়, কাজে, কর্মে স্বতঃস্ফূর্তি গুণটি আসে না, অথচ এই গুণটি সমস্ত বড় শিল্পের একটা বিশেষ লক্ষণ। এত সহজে কেমন করে আর্টিষ্ট যা বলবার যা দেখবার তা প্রকাশ ক'রে গেল এইটেই প্রথম লক্ষ্য করে আমাদের মন বড় শিল্পীর কাজে। শিল্পী কি কঠিন প্রক্রিয়ায় রচনা করেছে তার সন্ধান ত' রচনায় রেখে দেয় না ; মুছে দিয়ে চলে যায় তার হিসাব এবং এই

৫। বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী, পৃঃ ১৭৭।

কারণে ঠিক সেই কথাটি নকল করতে চাইলে আমরা ঠকে যাই, ঠেকে যাই, হদিস্ পাই নে কি কি উপায়ে কোন্ পথ ধরে গিয়ে শিল্পী তার পরশমণি আবিষ্কার ক'রে নিল। তাই ত' অবনীন্দ্রনাথের পূর্ব-সূরী হিসেবে আমরা তন্ত্রশাস্ত্র রচয়িতাদের মধ্যেও এই মতের পূর্বাভাস পাই। তন্ত্রশাস্ত্রে শিল্পকর্মকে পাখীর এক গাছ থেকে আর এক গাছে উড়ে যাওয়ার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। এক এক পাখীর এক এক ধরনের গতি-শৈলী। দু'জনার বড় একটা মিল পাওয়া যায় না।

এরা সবাই একক, অনন্য। শাস্ত্রীয় প্রকরণকে কেমন ক'রে কোন্ পথে আত্মস্থ ক'রে তাকে একেবারে আপনার ক'রে নিলে সে তত্ত্বটি শিল্পকর্মে অনুল্লিখিত থেকে যায়। কেমন ক'রে কোন্ পথে প্রতিভার স্পর্শটুকু এসে লাগল শিল্পীর আপন শিল্প প্রকরণের মাধ্যমে, সে কথাটা অব্যাখ্যাত রয়ে গেল পৃথিবীর সকল শাস্ত্রে। সুতরাং বলতে হবে, বললেন[৬] শিল্পীগুরু, একজনের Technique অন্যের অধিকারে কিছুতেই আসতে পারে না, সে চেষ্টা করাই ভুল। কেন না তাতে ক'রে চেষ্টা কাজের ওপরে আপনার সুস্পষ্ট ছাপ দিয়ে যায় এবং আর্টিষ্টের কাজে সেই ব্যর্থ চেষ্টার দুঃখই বর্তমান থেকে যায়। তা হ'লে দেখা গেল যে টেকনিক বা প্রকরণ নিয়ে শিল্পীগুরু অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে শিল্প দার্শনিক ক্রোচের মতের একটা মৌল পার্থক্য। অবনীন্দ্রনাথ যখন প্রকরণকে শিল্পের অঙ্গীভূত বলেছেন তখন ক্রোচে তাকে শিল্পলোকের অন্ত্যেবাসী বললেন। অবনীন্দ্রনাথ বললেন, যে প্রকরণ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করলে তবেই শিল্পী রসিককে তাঁর শিল্প মাধ্যমে আনন্দ দান করতে পারেন। আনন্দ দেওয়ার এই দুরূহ ভারটুক শিল্পী বহন করে প্রকরণের সার্থক ব্যবহারে। অবনীন্দ্রনাথ তাঁর অনন্যকরণীয় ভঙ্গীতে এই ভাবটুকু ব্যক্ত ক'রে বললেন, যে প্রকরণ সম্পূর্ণ কায়দা না হ'লে কেউ আর্টিষ্ট হ'তে পারে না সেটি হচ্ছে আকার গড়বার বা বলবার কইবার সামান্য প্রকরণ নয়, সেটি হচ্ছে আনন্দের, হচ্ছে কর্ম সাধনের অসামান্য প্রকরণ। এই অসামান্য প্রকরণটি আয়ত্ত করার পন্থা হ'ল সামান্য প্রকরণের পরিপূর্ণ আয়ত্তীকরণ।

শিল্পীগুরু আমাদের বলেছেন যে শিল্পের আইন-কানুন শিল্প-শিক্ষার্থীর জন্য। শিল্পীর জন্য আইনের অঙ্কুশ-তাড়না নেই। প্রকরণের কৌলীন্য রক্ষার ভার শিক্ষানবীশদের ওপর। যদি আমরা জাতশিল্পীদেরও শাস্ত্রীয় প্রকরণের কৌলীন্য

৬। বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী, পৃঃ ১৭৭।

রক্ষা করবার নির্দেশ দিই তা হলে শিল্পে যে একঘেয়েমি আনবে তার ভয়ঙ্কর রসিক মনকে পীড়া দেবে। শিল্প-সাঙ্কর্যের বিরুদ্ধে অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় প্রমুখ তৎকালীন মনস্বী ব্যক্তিরা যখন মসীযুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন তখন তাঁরা এই ভয়াবহ সম্ভাবনাটি সম্বন্ধে সম্যক্ অবহিত ছিলেন না। ভারতীয় শিল্পশাস্ত্রকথিত প্রকরণকে বিশুদ্ধ রাখবার চেষ্টায় এঁদের উদ্ভব প্রশংসনীয়। তবু শিল্পীগুরু এঁদের মতকে পুরোপুরি গ্রহণ করেন নি। তিনি বললেন যে শিল্পীর পথ হ'ল খেয়ালের পথ। খেয়াল মতো যে পথে চলবার কিছু জো নেই সে পথ কখনও কোন শিল্পের পথ হতে পারে না। ···সঙ্করত্বের ভয় ক'রে হিন্দু শাস্ত্র মত ভারতশিল্পের নিয়মে শিল্পীদের বদ্ধ করলে সঙ্করত্বের হাত থেকে বাঁচাতে পারি শিল্পকে কিন্তু বাঁধা প্রকরণের ভয়ঙ্করত্ব যখন শিল্পের সর্বাঙ্গে জরা আর মৃত্যুর লক্ষণগুলি ফুটিয়ে তুলবে তখন শিবেরও অসাধ্য তাকে শুধরে রমণীয় ক'রে তোলে। আর্ট বিষয়ে খেয়ালীর কাছে যেতেই হবে নবযৌবন ভিক্ষা ক'রে। আর্টিষ্ট চলে খেয়ালের পাখায়, খুশির হাওয়ার ভর ক'রে। তাই ত' প্রকরণসার সঙ্গীতবিদ্যায় ও আমার প্রাণের স্পন্দন ফোটে; তাই ত' বিশ্বকর্মা শুধুই দেব-দেবীর মূর্তি গড়েন নি। সৃষ্টির বিশুদ্ধতা রক্ষা করবার নামে দেবশিল্পী শুধু তুলসী আর চন্দন গাছই সৃষ্টি করলেন না। দেবদারু, নারকেল, পাইন, রডোডেনড্রন, আরও কত গাছ সৃষ্টি হ'ল।

এ ও শিল্পীর খেয়াল খুশির তাগিদে হ'ল। শিল্পীর খেয়ালটাই শিল্পজগতে গ্রাহ্য বলে ভারতশিল্প হিন্দুশিল্প প্রকরণের পবিত্রতা রক্ষা করতে উৎসুক হয় নি। তাই ত' ভারত শিল্পের বিশুদ্ধতা গ্রীক, মোঘল, চৈনিক এবং নেপালী শিল্পরীতির দ্বারা ক্ষুণ্ণ হ'ল; ভারতশিল্প পুষ্ট হ'ল, বেগবান্ হ'ল অপরের শিল্প প্রকরণকে আত্মস্থ ক'রে। হিন্দু শিল্পশাস্ত্রেও এই প্রকরণ সাঙ্কর্যের সমর্থন শিল্পীগুরু আবিষ্কার করেছেন: "শিল্পী দেবতাই গড়ুন আর বানরই গড়ুন বা দেবতাতে বানরে পাখীতে মানুষে মিলিয়ে খিচুড়িই প্রস্তুত করুন, সে যদি শিল্পী হয়, যদি তার প্রকরণের সঙ্গে তার মনের আনন্দ ভাবের বিশুদ্ধ এসব জুড়ে দিয়ে থাকে যে, তবে সে বিশুদ্ধ জিনিষই রয়ে গেল।"[৭] শিল্পী আপন মনের এই আনন্দটুকুর স্পর্শ যখন শিল্পকর্মে অনুস্যূত ক'রে দেন সার্থক ভাবে তখনই সেই শিল্পকর্ম যথার্থ শিল্পকর্ম হয়ে ওঠে। সমালোচক তাঁর প্রকরণের বিশুদ্ধতা দেখেন না, তাঁর শিল্প বিষয়ের যাথার্থ্য সম্বন্ধেও প্রশ্ন তোলেন না; আনন্দ যখন

৭। বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী, পৃঃ ১৮২-১৮৩।

রসিকচিত্তকে স্পর্শ করে তখনই শিল্পকর্মের সার্থকতা সম্বন্ধে আর দ্বিমত থাকে না। কবি বা শিল্পী এই লোকোত্তর আহ্লাদের সন্ধানী ব'লেই কোন প্রকরণ বা শাস্ত্রীয় বিধানের বন্ধন তাদের জন্ত নয়। নিষেধের উদ্যত শাসন শিল্পীর প্রকাশকে ব্যাহত ক'রে, তার আনন্দ দেবার শক্তিটুকুকে খর্ব করে। আর্টিষ্টের চলা হ'ল আনন্দের চলা—হাতুড়ি পিটে, কলম চালিয়ে, সোনা গালিয়ে, হীরে কেটে, সুর ভেঁজে, তাল ঠুকে শাস্ত্রের অঙ্কুশ খেতে খেতে ইন্দ্রের ঐরাবতের মত চলা নয়। আর্টের প্রকরণ নিরঙ্কুশ প্রকরণ, আর্টের পন্থা নিরঙ্কুশ পন্থা, এই জন্ত বলা হয়েছে "কবয়ো নিরঙ্কুশাঃ।"[৮]

৮। বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী, পৃঃ ১৮৬।
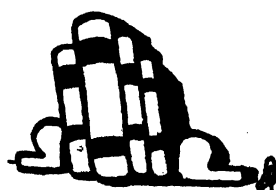
আনন্দ কেন্টিশ কুমারস্বামীর নন্দনতত্ত্ব পর্যালোচনা

শিল্পশাস্ত্রী হিসেবে কুমারস্বামীর নাম দেশবিদেশে বহুখ্যাত। নানান গ্রন্থে বক্তৃতায় এবং প্রবন্ধে কুমারস্বামীর যে পরিচয় আমরা পেয়েছি তা হ'ল শিল্প-শাস্ত্রীর ঐতিহাসিক রূপ, নন্দনতাত্ত্বিকরূপে তাঁর পরিচয় আমাদের চোখে খুব একটা বড় হ'য়ে ওঠে নি: তিনি যুক্তিসিদ্ধ একটি পূর্ণাঙ্গ শিল্পতত্ত্বের প্রস্তাবনা করতে পারেন নি। এ কথা গোড়াতেই বলে রাখা ভাল যে নন্দনতাত্ত্বিক হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে হ'লে একটা তর্কশাস্ত্রসম্মত দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীর একান্ত প্রয়োজন ; সেটুকু আচার্য কুমারস্বামীর মধ্যে আমরা প্রত্যক্ষ করি নি। এই মন্তব্যের স্বপক্ষে আমাদের বক্তব্য নিবেদন করব কুমারস্বামীর লেখা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে। যে কয়টি মৌল নন্দনতাত্ত্বিক তত্ত্ব আমরা কুমারস্বামীর মধ্যে পেয়েছি তারা হ'ল: (ক) শিল্প জীবনমুখী হ'বে ; (খ) জীবন-পর্যালোচনাই হ'ল যথার্থ শিল্প ; (গ) শিল্প মানুষের প্রেম-প্রীতি-সৌহার্দ্যকে মূর্ত ক'রে তুলবে শিল্পরূপের মাধ্যমে, মানুষের সুকুমার বৃত্তিগুলো, যেগুলো প্রীতির, ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনের প্রসার ঘটায়, এদের সুকুমার প্রকাশ শিল্পে ঘটবে। এই মানুষী প্রেমের পরিপূর্ণ প্রকাশটুকু ঘটলে তার চিত্র হ'বে স্বর্গীয় সুষমায় মণ্ডিত। [এই প্রসঙ্গে কুমারস্বামী ফরাসী পণ্ডিত রঁমা রঁলার খুব কাছাকাছি এসেছেন, মনীষী তলস্তয়ের নন্দনতাত্ত্বিক বিশ্বাসের সঙ্গেও কুমারস্বামীর মতের সামীপ্যটুকু এই প্রসঙ্গে লক্ষ্যণীয়।] (ঘ) সুন্দরকে প্রতিষ্ঠা করতে পারলেই শিল্পীর কাজ শেষ হয় না ; সুন্দরকে অন্বেষণ করাই শিল্পীর একমাত্র কাজ নয়। জীবন এবং জগৎ সম্বন্ধে যে সব নিগূঢ় সত্য শিল্পীর অভিজ্ঞতায় ধরা পড়ে, যে সব অন্তর্গূঢ় প্রত্যয় তার ফলে জন্ম নেয়, তা সে জীবন সম্বন্ধেই হোক্ অথবা মৃত্যু সম্বন্ধেই হোক্, তার প্রকাশ ঘটবে যথার্থ শিল্পীর শিল্পকর্মে। (ঙ) কুমারস্বামী শিল্পকে Intuition বলেছেন, অবশ্য তার প্রকৃতি তিনি ব্যাখ্যা করেন নি কোথাও। ক্রোচের Intuition বা স্বজ্ঞা কুমারস্বামীর Intuition নয়, কেননা কুমার-স্বামীর Intuition এক ধরনের অক্লান্ত আবেগ বা Impulse থেকে জাত হয়। তাঁর কথা উদ্ধৃত ক'রে দিই: "For great art results from the impulse to express certain clear intuitions of life and death rather than from the conscious wish of beautiful pictures or

songs".* জীবন পর্যালোচনা বলতে আমরা জীবনের মূল্যায়নকে বুঝি এবং সেই মূল্যায়নটুকুও উৎসারিত হবে যিনি পর্যালোচক, তাঁর ধ্যানধারণা ও মূল্যবোধের মূল কাণ্ডটি থেকে। সেই মূল কাণ্ড থেকেই জীবন-পর্যালোচনারূপ বৃক্ষটি রস আহরণ করবে। অতএব শিল্প যদি 'criticism of life' হয় তবে জীবনের যে ছবিকে বিষয়গত জীবন বলা হয় তা একান্তরূপেই শিল্পে অনুপস্থিত থাকবে। জীবন-বাস্তবতা ও শিল্প-বাস্তবতা দুটি ভিন্ন জগতের সংকেত বা প্রতীক হ'য়ে পড়বে।

শিল্পকে জীবনের পর্যালোচনা রূপে চিহ্নিত ক'রে, শিল্পকে প্রেম-প্রীতি-কেন্দ্রিকরূপে বর্ণনা ক'রে কুমারস্বামী এটুকু বোঝাতে চাইলেন যে শিল্প জীবনের প্রতিচ্ছবি নয়। শিল্প যদি জীবনের প্রতিচ্ছবি হ'ত তা হ'লে শিল্প-মর্যাদা বহুলাংশে ক্ষুণ্ণ হ'ত, ফোটোগ্রাফি সবচেয়ে বড় শিল্পমর্যাদা দাবী ক'রে বসত। তাই প্রাচীন ভারতীয় শিল্পকলার যে বস্তু-চেতনা বা Reality'র স্বাদ তিনি কখন কখন পেয়েছিলেন, তা তাকে বিশেষরূপে মুগ্ধ করতে পারেনি। তাই তিনি যখনই শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্মের নিদর্শন হিসেবে কোন শিল্পকর্মের উল্লেখ করেছেন, তখন তাকে তিনি মানব অভিজ্ঞতার প্রতীক হিসেবে যতটা দেখেছেন তার চেয়েও বেশী মূল্য দিয়েছেন শিল্পীর কল্পনা, তাঁর ভাব-ভাবনা এবং আদর্শ বোধের প্রতিভূ হিসেবে।

কুমারস্বামীর মতে প্রাচীন ভারতীয় শিল্পের একটি বড় গুণ হ'ল শিল্পমাধ্যমে শিল্পাদর্শের ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য রূপদেওয়া। শিল্পীর মনে যে শিল্পাদর্শ বাসা বাঁধে তাকে তিনি নিখুঁত শৈলী এবং আঙ্গিকের মাধ্যমে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ক'রে তোলেন। শিল্পকর্মের বাস্তবতা তাঁর জীবন-মুখীনতায় নয়। সেই বাস্তবতাটুকু নিহিত থাকে তার অনবদ্য শিল্পরূপের মধ্যে। সমকালে রবীন্দ্রনাথ একেই 'রূপের টথ' বলেছেন। এই রূপের টথই হ'ল প্রাচীন ভারতীয় অলঙ্কারশাস্ত্রকথিত শিল্পের ব্যঞ্জনামণ্ডিতরূপ। পাশ্চাত্য সমালোচক এই রূপেই 'Meaning of meaning' প্রত্যক্ষ করেছেন। এই শিল্পরূপ জীবনবিমুখ নয় আবার জীবনঅভিমুখীও নয়। এই রূপের ঐশ্বর্য জীবনের আধারে বিধৃত না হ'য়েও জীবনকে সুষমাটুকু দান করে। অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে গুণের যে বৈপরীত্য আমরা প্রত্যক্ষ করি, সেই বৈপরীত্যকে এই রূপের টথ অনায়াসে অতিক্রম ক'রে

* কুমারস্বামীর History of Indian and Indonesian Art গ্রন্থটি দ্রষ্টব্য।

যায়। তর্কশাস্ত্রের যুক্তিপদ্ধতির ধারণাগুলো এই রূপের টুথের মধ্যে তাদের বৈপরীত্য থাকা সত্ত্বেও স্বাঙ্গীকৃত হ'য়ে যায়। ভিন্ন প্রসঙ্গে দার্শনিক ব্রাডলি যে কথা বলেছিলেন তার অনুসরণে আমরা বলতে পারি যে শিল্পে চিন্তা-বৈপরীত্যের উত্তুঙ্গ শৃঙ্গগুলির রূপান্তর ঘটে; তারা অঙ্গীরূপ পরিহার ক'রে মিলেমিশে একাকার হ'য়ে যায় শিল্পরূপের মোহিনী মায়ায়। দার্শনিক ব্রাডলি পরম ব্রহ্মের মধ্যে (Absolute) নৈতিক ভালো ও মন্দের সহাবস্থান ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছিলেন যে মন্দ পরম ব্রহ্মের (Absoute) মধ্যে স্থান পাবার পূর্বে পরিবর্তিত ও রূপান্তরিত হয় (Gets somehow transformed and transmuted) অবশ্য কোন্ রীতি মেনে এই রূপান্তর ঘটে, তার নির্দেশ এবং ব্যাখ্যা ব্রাডলি দেননি। কুমারস্বামী অনুরূপভাবেই রূপের টুথের মধ্যে গতি এবং স্থিতির অবস্থান-বৈপরীত্যের ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি নটরাজ মূর্তির যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন সেটুকু উদ্ধার করলে আমাদের বক্তব্য পরিষ্কার হ'য়ে উঠবে :

"The Nataraja type is one of the great creations of Indian art, perfect visual image of Becoming adequat complement and contrast to the Buddha type of pure Being. The movement of the Divine figure is so admirably balaced that while it fills all space it seems never the less to be at rest, in the sense that a spinning top or a Gyrostat : thus realising the unity and simultaneity of the five activities, Pancha-kritya viz, Production, Maintenance and Release which the symbolism specifically designates. অর্থাৎ, ভারতীয় শিল্পের অন্যতম মহতী নিদর্শন হ'ল এই নটরাজ গোষ্ঠীর মূর্তি। স্বচ্ছ শুদ্ধ সত্তার প্রতীক যে বুদ্ধমূর্তি তার বিপরীত হ'ল এই নটরাজ মূর্তি এবং এ দুয়ের মিলিত ভাবরূপটুকুই হ'ল পূর্ণ সত্য। এই পূর্ণ সত্যটুকু এককভাবে নটরাজের মূর্তিকে আশ্রয় ক'রে আছে। নৃত্যচ্ছন্দে ছন্দিত নটরাজের রূপটুকু এতোই সুষম যে গতিময় স্থিতির রূপটুকুই প্রধান হ'য়ে ওঠে দর্শকের মনে এই নটরাজ মূর্তি দর্শনে। নৃত্যাঙ্গনের মুক্ত পরিসরটুকু নটরাজের নৃত্যচ্ছন্দ পূর্ণ ক'রে তোলে; আবার সেই একই সঙ্গে মনে হয় যেন নটরাজ স্থির হ'য়ে আছেন। শিল্পরূপের এ এক অসাধারণ ব্যঞ্জনা, পঞ্চকৃত্যের সহাবস্থানের এ এক আশ্চর্য নিদর্শন।

সৃষ্টিকালে শিল্পী স্বীয় প্রতিভাবলে যে 'অপূর্ববস্তুর' নির্মিতি সম্ভব করে তা তাঁর মতে এক সুষ্ঠু আঙ্গিকের ফলশ্রুতি। নটরাজের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কুমারস্বামী শিল্পসৃষ্টিতে আঙ্গিকের প্রাধান্যকে স্বীকার করেছেন; ভারতীয় নন্দনতত্ত্বের পঞ্চকৃত্য তাঁর শিল্পতত্ত্বে প্রাধান্য পেয়েছে। সৃজনধর্ম, সেই সৃষ্টির রক্ষা, তার ধ্বংস, রূপপরিগ্রহণ ও মুক্তি—এই পঞ্চ পদ্ধতির স্বাঙ্গীকরণের ফলশ্রুতি হ'ল নটরাজের ছন্দোময় মূর্তি। মধ্যযুগীয় ভারতীয় শিল্পধারার আলোচনা প্রসঙ্গে কুমারস্বামী এর উল্লেখ করেছেন। বিশেষকে সামান্যের পরিপ্রেক্ষিতে দেখার একটা প্রবণতা কুমারস্বামীর মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। তাই প্রাচীন ভারতীয় চিত্র অলঙ্করণ রীতিকে তিনি ভারতীয় ব'লে স্বীকৃতি দেননি। তিনি এক এশীয় শিল্পধারার কথা ভেবেছেন। 'Common Early Asiatic Ari' এর উদাহরণ হিসেবে তিনি ভারতীয় শিল্পকলার উল্লেখ করেছেন। তাঁর কথা উদ্ধৃত ক'রে দিই :

"Thus so far as its constituent elements are concerned and apart from any question of style there is comparatively lines in Indian decorative art that is beculior to India and much that Indian shares with western Asia.* অর্থাৎ কুমারস্বামী আমাদের এ কথা বোঝাতে চাইলেন যে প্রাচীন ভারতীয় অলংকরণ রীতি ব'লে আমরা যা বোঝাতে চাই তাকে প্রাচীন এশীয় অলংকরণ রীতি বলা ভালো। প্রাচীন এশীয় শিল্প যে সব প্রসাদ গুণে প্রসন্ন তারই প্রতিফলন ভারতীয় শিল্পে পাওয়া যায়। অতএব 'প্রাচীন ভারতীয় শিল্প' না বলে 'প্রাচীন এশীয় শিল্প' বললে ভ্রান্তিপ্রমাদ হয় না বলেই কুমারস্বামীর ধারণা। কুমারস্বামীর এই ধারণা যুক্তিসিদ্ধ ও তথ্যানুসারী নয়। প্রাচীন এশীয়শিল্প যদি প্রাচীনতর আর্যশিল্প বা Aryan Art এর লক্ষণাক্রান্ত হ'য়ে থাকে, তা হ'লে তাঁকে অনুসরণ ক'রে একথা আমাদের বলতে হয় যে ভারতীয় শিল্পে জীবনমুখীনতা নেই। অবশ্য এই নন্দনতাত্ত্বিক সত্যটুকু কুমারস্বামীও গ্রহণ করতে সঙ্কোচবোধ করবেন,

* History of Indian and Indonesion Art, পৃঃ ১৩

Decorative Art বা অলংকরণ শিল্প ব'লে কোন শ্রেণীকরণই বুদ্ধিগ্রাহ্য নয়। কেননা Decorative Art যদি শিল্প হয় তা হলে তা রসনিস্যন্দী। রস ব্যতীত শিল্পে কোন আর্টেরই প্রবর্তনা হয় না। অর্থাৎ Decorative Art বা অলংকরণ শিল্পকেও অর্থবহ হ'তে হ'বে এবং সে অর্থটুকু

কেননা তিনি ভারতীয় শিল্পের জীবনমুখীনতা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। অথচ আর্য শিল্প, এশীয় শিল্প তথা ভারতীয় শিল্পের স্বরূপ লক্ষণের মধ্যে সাযুজ্যকে গ্রহণ করলে একের জীবনমুখীনতা অন্যতে আরোপ করতে হয়; আবার অন্যের অলংকরণ প্রযুক্তি-বিস্তার প্রাধান্যকে আর্য-এশীয়-ভারত শিল্পের ত্রিমূর্তিতেই স্বীকার করতে হয়। আর্যশিল্প সম্বন্ধে কুমারস্বামী বললেন:

"In all probability the early Aryan Art was decorative or more accurately abstract and symbolic." অর্থাৎ কুমারস্বামী আর্যশিল্পের অলংকরণ মূল্যটুকুকে এই প্রসঙ্গে স্বীকার করলেন। এ খানেই শেষ নয়। তিনি অন্যত্র বললেন, জীবন এবং জগত সম্বন্ধে নিগূঢ় অবীক্ষণ, অভিজ্ঞতাজাত রূপৈশ্বর্যের অনুভব ও তার মূল্যায়ন। এরা হ'ল প্রাচীন আর্যশিল্পের মৌল লক্ষণ। প্রাচীন ভারতীয় শিল্পকে এই আর্যশিল্পের উত্তরসূরী রূপে চিহ্নিত ক'রে আর্যশিল্পের এই বিপরীত গুণের সমন্বয় তিনি লক্ষ্য করেছেন ভারতীয় শিল্পের মধ্যেও। Strygowski কে অনুসরণ ক'রে তিনি বললেন যে প্রাচীন আর্যশিল্প তথা ভারতীয় শিল্পের লক্ষণ হ'ল জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে আহৃত রূপকে অলঙ্করণ সমৃদ্ধ বিশুদ্ধ রূপাবস্থায় পর্যবসিত করা; প্রতীক এবং বিশুদ্ধ রূপাবস্থার আশ্রয় নিয়েছেন তিনি। Strygowski কে অনুসরণ ক'রে তিনি আবার শিল্পরীতিকে প্রাধান্য দিয়েছেন: ভারতীয় নন্দনতত্ত্বের 'রীতিরাত্মা কাব্যস্য' তত্ত্ব বোধ হয় কুমারস্বামীকে প্রভাবিত করেছিল। এতদ্ব্যতীত সমকালীন মার্কিণী চিন্তাধারায় 'style is the man' তত্ত্বের প্রভাবও কুমারস্বামীর চিন্তাধারায় অনুমেয়।

কুমারস্বামীর চিন্তায় স্ববিরোধিতার অসদ্ভাব নেই। আর্যশিল্পের সঙ্গে রূপসাদৃশ্য ও ভাবনাসাদৃশ্য কুমারস্বামী প্রত্যক্ষ করলেন প্রাচীন ভারতীয় চিত্রকলায়। নিরাবয়ব সুন্দর অলংকরণকে আশ্রয় ক'রে দেহী হ'য়ে উঠল, মূর্ত হ'ল দর্শকজনার চোখে। অথি তিনি তাঁর মধ্যে বাস্তবতাকে এমন ক'রে প্রত্যক্ষ করলেন যে শিল্পে কল্পনার প্রসাদগুণটুকু স্থান পেলো না। প্রাচীন আর্যশিল্প, এশীয় শিল্প, তথা ভারতীয় শিল্পে এই জীবনস্বরূপ বাস্তবতাকে এমন ব্যাপকভাবে, একান্তভাবে প্রত্যক্ষ করলেন যে তাঁর লিখতে এতোটুকু সঙ্কোচ হ'ল না এই সত্যের ঠিক বিপরীত তত্ত্বটুকু:

"The whole approach like that of early Indian Art

generally is realistic i. e. without Arriere pensee or idealisation." *

অর্থাৎ কুমারস্বামী বলতে চাইলেন, প্রাচীন ভারতীয় শিল্প জীবন-অভিমুখী এবং অতিমাত্রায় বাস্তব ; তার পক্ষে জীবন ও জগতের আদর্শায়িত রূপ 'এহ বাহ্য'। এক্ষেত্রে বাস্তবমুখীনতার অতি প্রাধান্য শিল্পলোকে কল্পনার স্থানকে খর্ব ক'রে দিয়েছে। এই পর্বে আমরা বলতে পারি যে কুমারস্বামী প্রাচীন ভারতীয় শিল্পে শিল্পীর কোন জীবনবিমুখ আধ্যাত্মিক অন্বেষণকে, অধ্যাত্ম মূল্যবোধের এষণাকে শিল্প-বস্তু বা content রূপে স্বীকৃতি দান করলে তা স্ববিরোধদোষদুষ্ট হ'য়ে পড়বে। পরন্তু প্রাচীন ভারতীয় শিল্পে অধ্যাত্মজীবন, অধ্যাত্মমূল্যবোধ, এদের স্থান অনস্বীকার্য। স্থানান্তরে অন্য প্রসঙ্গে আচার্য কুমারস্বামী তা স্বীকারও করেছেন। অথচ যুক্তিসিদ্ধ চিন্তার ভারসাম্য বারবার টলে গিয়েছে কুমারস্বামীর মননে ; তাই অসঙ্গত ও স্ববিরোধী উক্তির এতো প্রাচুর্য কুমার স্বামীর শিল্প-আলোচনায়।

পূর্বে উল্লিখিত আর্যশিল্প এশীয় শিল্পের সঙ্গে প্রাচীন ভারতীয় শিল্পের সম্বন্ধের লক্ষণ বিচারের তত্ত্বে পুনরায় ফিরে আসা যাক্। আচার্য কুমারস্বামীর চিন্তাসূত্র অনুসরণ ক'রে আমরা কী যথার্থই এদের কোন পরাজাতি লক্ষণ এবং বিভেদক নির্ণয় করতে পারি ? শিল্প-স্বরূপকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আঙ্গিককে যদি শিল্পের সবটুকু ব'লে গ্রহণ করা যায় তবেই হয়ত এশীয় শিল্প, ভারতীয় শিল্প তথা আর্যশিল্পের শ্রেণীকরণ সম্ভব হবে। কেননা কালের গতিপথে সকল বস্তুর মত শিল্প আঙ্গিকেরও পরিবর্তন ঘটে ; অন্ততঃ সেই বাহ্য পরিবর্তনটা সহজে চোখে পড়ে ; যদি শিল্পশৈলী শিল্পধর্মের কেন্দ্রমণি-হ'ত তা হ'লে হয়ত উপরোক্ত শ্রেণীকরণে বিশেষ আপত্তির কারণ থাকত না। কিন্তু শিল্প ত শুধুমাত্র ভঙ্গী নয়, আঙ্গিক নয়, শৈলী নয়। 'এহ বাহ্য, আগে কহ আর'—শিল্প হ'ল শিল্পী-মানসিকতার নির্ব্যক্তীকরণ। ভারতীয় শিল্পীর মনন-সাধনের যে বৈশিষ্ট্য তাকে নির্দিষ্ট করা যদি সহজসাধ্য হ'ত, তবেই ভারতীয় শিল্পের লক্ষণটুকু সম্বন্ধে আমরা নিশ্চিন্ত হ'তে পারতাম ; ভারতীয়

* History of Indian Indonesian Art, পৃঃ ২৭

এসে যুক্ত হ'বে শিল্পরসের মাধ্যমে। অতএব এ কথা বললে এ প্রসঙ্গে কুমারস্বামীর শ্রেণীকরণ ও তদনুসারী বক্তব্য অযৌক্তিক।

শিল্পকে 'ভারতীয়' ব'লে চিহ্নিত করাও সহজসাধ্য হত। আবার ভারতবাসীরা 'এশীয়' হওয়ার ফলে এঁদের মননরীতির প্রভাব ভারতীয়দের ওপর যে থাকবে তা অস্বীকার করা চলে না। পরজাতি গুণকে বিভেদকের ওপরে স্থান দিলে ভারতীয় শিল্পকে 'এশীয়' শিল্প বলা চলে; অবশ্য এর ফলে ভারতীয় শিল্পের উৎকর্ষ ক্ষুন্ন হ'বে। যে উৎকর্ষ কুমারস্বামী প্রত্যক্ষ করেছেন গুপ্তযুগের শিল্পকলায় তার সবটুকু এশিয়ার অন্যত্র শিল্পকর্মে প্রত্যক্ষ করা যাবে কী? ভারতীয় শিল্পের গুণাবলী কী আবার আর্যশিল্পেও অধ্যস্ত হয়েছে? এশিয়াবাসীরা অনেকেই আর্যসন্তান অতএব আর্যশিল্পের প্রভাব 'এশীয়' শিল্পে থাকবে কিছুটা, এ সত্যকে স্বীকার করা যায়। কিন্তু তাই ব'লে এই তিনটি শিল্পধারার সমীকরণ করলে তা যুক্তিসিদ্ধ হবে না। ভারতীয় শিল্পের বিভদক গুণ, এশীয় শিল্পের বিভেদক গুণ—এদের অস্বীকার ক'রে আর্যশিল্পের পরজাতিগুণকেই প্রধান ক'রে তোলা হ'লে তা আর যাই করুক, ভারতীয় শিল্পকে বোঝবার এবং বোঝাবার পক্ষে সহায়ক হ'বে না। পরন্তু অভিজ্ঞতালব্ধ কোন তথ্য কোন তত্ত্বকে প্রমাণ বা অপ্রমাণ কোনটাই করে না। শিল্পসত্যের ক্ষেত্রেও এ রীতি একেবারেই অচল; অথচ এই রীতি অনুসরণ করেছেন কুমারস্বামী। তাই তাঁর নন্দনতত্ত্বে এতো স্ববিরোধ।

পূর্বে আমরা কুমারস্বামীর নন্দনতত্ত্ব আলোচনা প্রসঙ্গে জীবনমুখীনতা এবং জীবনবিমুখতা—এই দুটি ধারণা তিনি কী ভাবে শিল্পালোচনায় ব্যবহার করেছেন, তার উল্লেখ করেছি। এই দুটি ধারণাকে কেন্দ্র করেই প্রাচীন ভারতীয় তথা এশীয় শিল্পের বাস্তবতার বিচার হয়েছে; জীবনবিমুখতা এবং আদর্শায়নের কথাও বলা হয়েছে। অথচ একটু তলিয়ে দেখলে জীবনমুখী এবং জীবনবিমুখ, এই দুই ধারণার দ্বন্দ্বটুকু যে অন্তর্হিত হ'য়ে যায়, এ সত্যটুকু আমাদের চোখে ধরা পড়বে। এ দুয়ের মধ্যে যে Dichotomy নেই, সেই তথ্যটুকু আমরা সহজেই গ্রহণ করতে পারব। যখন আমরা জীবনের আদর্শায়িত রূপকে, কল্পনাশ্রিত কোন দূরস্থিত সৌন্দর্য-সত্যকে শিল্পাদর্শরূপে গ্রহণ ক'রে শিল্পকে তদ্রূপে রূপায়িত ক'রে তুলি, তখন কুমারস্বামী তাকে 'জীবনবিমুখ' বলেছেন; আবার যখন জীবনের স্থূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যরূপটুকুকে, স্থূল জীবনবোধটাকে শিল্পে ফুটিয়ে তুলি, তখন তাকে তিনি 'জীবনমুখী' বলেছেন। এই শ্রেণীকরণটিও বিচারসহ নয়। আমাদের জীবনে 'আহারনিদ্রা, ভয়, মৈথুন' যেমন সত্যি, ঠিক তেমনি সত্যি হ'ল আমাদের জীবনের আদর্শবোধ, নিরাবয়ব সুন্দরের

জন্ত এষণা, অনির্দেশ্ত অভাববোধের জন্ত নিরুদ্দেশ মানসযাত্রা। এরা সবাই সমান দাবী নিয়ে আমাদের শিল্পজগতে প্রবেশপ্রার্থী। পৃথিবীর মহতী শিল্পকর্মকে আশ্রয় ক'রে এরা সবাই বেঁচে আছে, কেউ আউরিগনেশীয় পর্যায়ের শিল্পকর্মে, কেউ অজন্তার ছবিতে, আবার কেউ বা এলিফান্টাগুহার শিল্পকর্মে। অতএব শিল্পবিভেদক হিসেবে 'বাস্তবতা' কোন লক্ষণই নয়। কেননা বাস্তবতা শব্দটির এতোদিনের ধ'রে নেওয়া অর্থ সম্বন্ধে আজ সন্দেহের অবকাশ দেখা দিয়েছে; এতোদিনের সনাতন অর্থটি গ্রহণ করেছেন কুমারস্বামী; বাস্তব অর্থে জ্ঞাতাঅনির্ভর বিষয়গত সত্তা; এই সত্তা দুর্জ্ঞেয়; অতএব এই অর্থে বাস্তবতা শব্দটি দুর্জ্ঞেয়। কিন্তু আধুনিক মনস্তত্ত্ব 'বাস্তবতা'র এই জ্ঞাতা-অনির্ভরতাকে স্বীকার করছে না; যাকে আমরা বস্তু জগত বলি, তার মধ্যেও কল্পনার অবদান রয়েছে। যা দেখেছি, তার মধ্যেও জ্ঞাতার মানস-উপাদান অনুস্যূত হ'য়ে গেছে; সুতরাং এ বাস্তবতা জ্ঞাতানির্ভর; এ বাস্তবতা পুরোপুরি বিষয়গত নয়। অতএব কুমারস্বামী বিভিন্ন প্রসঙ্গে 'জীবনমুখী' এবং 'জীবনবিমুখ' এই দুই গুণ দিয়ে শিল্পকে অন্বিত ক'রে যে আলোচনা করেছেন, তার সার্থকতা আজ আর বিশেষ কিছু নেই।

কুমারস্বামী মার্শালের মত প্রকৃতির সহজ, স্বাভাবিক রূপটুকুকে শিল্পে কখন কখন প্রতিফলিত দেখতে চেয়েছিলেন; আবার আমাদের স্মৃতির ভাণ্ডারে জমিয়ে তোলা আবছা প্রকৃতির ছবিগুলোকে তিনি কখন বা ছবিতে ফুটিয়ে তোলার পক্ষপাতী। কুমারস্বামী বললেন; ছবি হ'ল 'a process of mental visualisation; শিল্পসৃজন সজ্ঞান মানস প্রক্রিয়ার ফলশ্রুতি নয় এমন কথা কুমারস্বামী বলেছেন। ছবিকে বা শিল্পকর্মকে a process of mental visualisation বললে তাকে সজ্ঞান মানস প্রক্রিয়াই বলা হ'ল; অথচ কুমারস্বামী উল্টো কথাও বললেন। এই ধরনের স্ববিরোধ অনেক রয়ে গেছে কুমারস্বামীর আলোচনায়।

ভারতীয় শিল্প বড়ঙ্গের কথা, চৈনিক শিল্পশাস্ত্রী হিসিয়াহো কথিত শিল্পরীতি-পদ্ধতির কথা আমরা জানি। শিল্প যখন প্রথাবদ্ধ হ'য়ে পড়ে তখন তা শিল্প-শিক্ষার্থীর কাজে লাগে। সমালোচক সেই সৃষ্টিতে, সেই শিল্প-শৈলীতে শিল্পী মনের Synthesis বা সঙ্গতি-সাধন কর্মকে প্রত্যক্ষ করেন। এই সঙ্গতিসাধন কর্মের মধ্য দিয়ে প্রকৃতির রূপটুকু নিরাবয়ব হ'য়ে গিয়ে শিল্পরূপে পরিণত হয়। কুমারস্বামীর মতে এই নিরাবয়বীকরণের মাধ্যমে প্রকৃতির স্থূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য

রূপটুকু শিল্পীর শিল্পচেতনায় নব রূপ পরিগ্রহ করে। ভারতীয় শিল্পের আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বললেন, শিল্পবস্তু বা Content শিল্পীর কল্পনার প্রসাদগুণে শিল্পী-মননের সঙ্গে সামীপ্য ও সাযুজ্য লাভ ক'রে শিল্পীর সঙ্গে একাত্ম হ'য়ে পড়ে। এই একাত্মীকরণকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কুমারস্বামী আধুনিক শিল্পদর্শনের Empathy তত্ত্বের আশ্রয় নিয়েছেন। এই তত্ত্বের সূত্র ধ'রে তিনি সুঙ্গ, অন্ধ্র ও ইন্দোপাথিয়ান শিল্পের মূল তত্ত্বটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে স্ব-বিরোধী সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন। যাঁরা Empathy তত্ত্বে বিশ্বাস করেন, তাঁরা শিল্পে বাস্তবতাকে নূতন অর্থে গ্রহণ করে থাকেন; এক্ষেত্রে শিল্পরূপ (Form) এবং শিল্প-বিষয় (content) একাত্ম হয়ে পড়ে। তাদের স্বাঙ্গীকরণ ঘটে। দার্শনিকেরা যে অর্থে 'Subjective' ও 'Objective' অর্থাৎ জ্ঞান-নিরপেক্ষ শিল্পবস্তুর বিষয়গুণ ও জ্ঞাতাসাপেক্ষতা বলেন, তাদের সম্মিলন ঘটে এই নান্দনিক কৃতিতে। অতএব Empathy তত্ত্বে বিশ্বাস করলে শিল্পের বাস্তবতাটুকু জ্ঞাতা-সাপেক্ষ হ'য়ে পড়ে। জ্ঞাতা-সাপেক্ষ শিল্পদর্শনে আমরা শিল্প-ইতিহাসের Objectivityটুকু হারিয়ে ফেলি। অবশ্য Empathy তত্ত্বের কুমারস্বামীকৃত ব্যাখ্যায় শিল্পী-মননের শিল্প-বিষয়ের আকারীভূত হওয়ার ফলে শিল্পী মনন এক ধরনের বস্তুনিষ্ঠরূপ লাভ করে। অবশ্য আমরা যাকে বস্তুনিষ্ঠরূপ বলছি তাও জ্ঞাতার জ্ঞান ও অনুভূতি আশ্রিত। অতএব কুমারস্বামী শিল্প-বিষয়ের প্রাধান্য বা শিল্পের Objectivity-র ওপর জোর দিলেও এ ক্ষেত্রে তার মূল্য এবং ব্যঞ্জনা ক্রমেই ন্যূন হ'য়ে পড়েছে। অথচ কুমারস্বামী শিল্প ঐতিহাসিক হিসেবে ভারতীয় শিল্পশাস্ত্রে এই Objectivity-র সন্ধান করেছেন। Objectivity বা বিষয় সচেতনতা সম্বন্ধে কুমারস্বামী এতোটা সচেতন ছিলেন যে এই বিষয় সূত্রটুকু অবলম্বন করেই তিনি ভারতীয় শিল্প-ষড়ঙ্গের অবনীন্দ্রনাথ কৃত ব্যাখ্যাটুকু গ্রহণ করলেন না। কামশাস্ত্রের যশোধর কৃত টীকার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে অবনীন্দ্রনাথ রূপভেদ, প্রমাণ, ভাব, লাবণ্যযোজন, সাদৃশ্য ও বর্ণিকাভঙ্গের যে ব্যাখ্যা করেছেন, সেই ব্যাখ্যা জ্ঞাতার জ্ঞানবুদ্ধি আশ্রিত। তাই অবনীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যা কুমারস্বামী গ্রহণ করেননি। তাঁর কথা উদ্ধৃত ক'রে দিই: "It is impossible to accept Tagore's subjective interpretation of this term; they can be far better understood in a purely practical sense as Distnction of Types, Ideal Proportion, Expression of mood (with reference to the theory

of Rasa), Embodiment of charm, Points of views [with reference to stance (স্থানম্)] and preparation of colours, grindings, levigatons etc.] বিষ্ণুধর্মোত্তরম্ এবং শিল্পরত্নম্ শীর্ষক গ্রন্থে শিল্পের যে শ্রেণীকরণ করা হ'য়েছে সেই প্রকরণবিধি জাতা সাপেক্ষ, একথা কুমারস্বামী বোঝাতে চেয়েছেন। ভারতীয় শিল্পষড়ঙ্গের সঙ্গে চৈনিক শিল্পশাস্ত্রী হিসিয়াহো কথিত শিল্পষড়ঙ্গের একটা সাদৃশ্য আছে, একথা কুমারস্বামী স্বীকার করলেন না। তিনি বিষ্ণুধর্মোত্তরম্ গ্রন্থে বর্ণিত শিল্পচেতনা তত্ত্বের সঙ্গে এর সাযুজ্য লক্ষ্য করেছেন। চৈনিক শিল্পশাস্ত্রী হিসিয়াহো গৃহীত শিল্পতত্ত্ব, জাপানী শিল্পশাস্ত্রের 'Seido বা গতির তত্ত্ব এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। শিল্প বস্তুতঃ শিল্পীর কল্পনার প্রসাদগুণে যখন প্রাণবন্ত হ'য়ে ওঠে তখন সেই জীবন্ত শিল্পবিগ্রহ একদিকে যেমন চৈনিক শিল্পশাস্ত্রে গ্রাহ্য হয়, অন্যদিকে তা আবার জাপানী শিল্পশাস্ত্রে ও ভারতীয় শিল্পদর্শনে সাদরে বৃত হয়েছে। আধুনিক শিল্পশাস্ত্রে Empathy বা Einfühlung তত্ত্ব বিষ্ণুধর্মোত্তরের গতিচেতনা ধর্মের সমধর্মী। কবি বা শিল্পী ঐকান্তিক সহমর্মিতাবোধের মাধ্যমে শিল্পবিষয়ের সঙ্গে নিগূঢ় একাত্মতা লাভ করে। তার সঙ্গে শিল্পী এবং শিল্প-বিষয়ের মধ্যেকার ভেদটুকু ঘুচে যায়, একথা পূর্বে উল্লেখ করেছি। এই একাত্মীকরণের ফলে শিল্পী কিন্তু আর শিল্পবিষয় সম্বন্ধে সচেতন থাকেন না। এই সচেতন না থাকা অবস্থাতেই যে সৃষ্টিটুকু সম্ভব হয়, তা প্লেতোনিক বা তদনুরূপ অনুপ্রেরণা সঞ্জাত শিল্পকর্মের সামীপ্য লাভ করে। এসব প্রশ্ন হ'ল, শিল্পীর শিল্প-সচেতনতাটুকু অবলুপ্ত হ'লে সে ক্ষেত্রে 'স্বর্গীয় শিল্পসৃষ্টি' সম্ভব কী না? এই প্রশ্নটির সমাধান প্রচেষ্টা, মনস্তাত্ত্বিক এবং পরাতাত্ত্বিক নানান্ তত্ত্বকে আশ্রয় ক'রে আছে। অথচ আচার্য কুমারস্বামী বিষয়টি তলিয়ে না দেখে একটু অসতর্কতার সঙ্গে শিল্পীর চেতনা ও শিল্পবিষয়ের একাত্মীকরণের কথা বললেন এবং শুধু এই একাত্মীকরণের কথা বলেই তিনি ক্ষান্ত হলেন না। তিনি একাত্মীকরণকে এতোটা মূল্য দিলেন যে গুপ্তযুগের শিল্পকলার সার্বভৌমত্ব ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি একাত্মীকরণতত্ত্বকে প্রধান যুক্তি হিসেবে ব্যবহার করলেন। অর্থাৎ তাঁর মতে বাইরের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপের জগত এবং শিল্পী মনের অনুভব, কল্পনা, এদের সম্যক মিলন না ঘটলে স্বর্গীয়, সার্থক শিল্পসৃষ্টি সম্ভব হয় না। আর এই মিলনটুকু ঘটাতে পারলেই বাইরের সঙ্গে ভিতরের মালাবদল সম্পূর্ণ হ'লে সার্থক শিল্প সৃষ্টি হয়। তার আবেদন হয়

সর্বরূপ ; এই সত্যটুকু রয়েছে গুপ্তযুগের শিল্পকলার সার্বিক আবেদনের মূলে। ডক্টর কুমারস্বামী এই বাইরের এবং ভিতরের হরপার্বতীর মিলনকে মুখ্যতঃ প্রাধান্য দিলেন। তাঁর কথায় বলি: "It is this psycho-physical identity that determines the universal quality of the Gupta painting."

শিল্প-বিষয়ের সঙ্গে যখন শিল্পীমনের সাযুজ্য এবং সামীপ্য ঘটে তখন শিল্পবস্তু (content) এবং শিল্পরূপ (form), এই দুয়ের সম্মিলিত রূপটাই চোখে পড়ে ; পৃথক করে এদের অস্তিত্বকে তর্কশাস্ত্রে বিবেচনাধীন করে তুললেও কল্পনায় দৃষ্ট তথাকথিত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যরূপে এদের পৃথক অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যায় না। তাই শিল্পশাস্ত্রে এদের একাত্মীকরণের এতোখানি মর্যাদা এবং মূল্য। মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই সত্যটুকু অনস্বীকার্য যে আমাদের মনের মধ্যে যে রূপটুকু ফুটে ওঠে তার বিষয়গত পরিমাণ অপরিমেয় ; অর্থাৎ তা নিরূপণ করা দুঃসাধ্য। রূপের মহিমার মতই রূপান্তরিত বিষয়ের পরিধিটুকুও অনির্ণেয়। শিল্পবিষয় এবং শিল্পরূপ, এই দুটির মিলন এমনই সার্থক এবং পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে জাতশিল্পীর শিল্পকর্মে, যে তাদের অভিন্ন সত্তাকে খণ্ডিত ক'রে চিন্তা করাও দুরূহ হয়ে ওঠে। বস্তুতঃপক্ষে এই content এবং form-এর মধ্যে যুগস্বীকৃত পার্থক্যটুকু আজকের দিনের নব্য মননরীতি স্বীকার করে না। বস্তু-সত্য এবং রূপ-সত্য এরা অভিন্ন। শিল্পবিষয় শিল্পরূপের ব্যঞ্জনায় অসীম হ'য়ে ওঠে আর শিল্পরূপ শিল্পবিষয়ের প্রসাদে উদ্দাম কল্পনার উদ্দামতা থেকে আপনাকে সযত্নে রক্ষা করে। ঠিক এই সত্যেরই সন্ধান দিলেন কুমারস্বামী ; তিনি বললেন যে শিল্পবিষয় অর্থাৎ 'Subject' তার সঙ্গে শিল্পীর বাণীবিনিময় হয় (speaking with the artist) অর্থাৎ কবি যখন কবি-কথা বলেন, শিল্পী যখন মূর্তি গড়েন, তখন শিল্পের বিষয় যেন ব্যক্তিকে প্রকাশ করে শিল্পীর চিন্তা ভাবনা এবং কল্পনার মাধ্যমে। বিষয় প্রধান হ'য়ে পড়ে। তাইত প্রাচীন ভারতীয় শিল্পে আমরা শিল্পীকে দেখি না ; সন্ধান করেও শিল্পীর মনের পরিচয়টুকু জানতে পারি না। প্রাচীন ভারতীয় শিল্পীরা এই ভাবেই অপরিজ্ঞাত রয়ে গেছেন ; যদিও তাঁদের শিল্পকর্ম বিশ্বজোড়া খ্যাতি পেয়েছে। শিল্পীর কল্পনায়, শিল্পীর মননে কীভাবে শিল্পবিষয় প্রাণবন্ত হ'য়ে ওঠে তার একটা উৎকৃষ্ট ব্যাখ্যা করলেন আচার্য কুমারস্বামী জাপানী শিল্পী হকুসাইয়ের কথা উদ্ধৃত ক'রে :

"Only when I was seventy three, had I got some sort of insight into the real structure of nature........at the age of eighty, I shall have advanced still further ; at ninety I shall grasp the mystery of things ; at hundred I shall be a marvel and at 110 every blot every line from my brush shall be alive."

কবি-কল্পনা, কবি-মনন কীভাবে ধীরে ধীরে শিল্পবিষয়ের অন্তরে প্রবেশ করে স্রষ্টার প্রসাদগুণে, সেই ইতিবৃত্তটুকু হকুসাই ব্যাখ্যা করলেন। শিল্পীর সাধনা নিরন্তর চলছে। আলস্যের আচ্ছাদনে শিল্পীর নিরলস সাধনার প্রয়োজন হয় শিল্পবিষয়ের সঙ্গে শিল্পীর একাত্মতাটুকু ঘটানোর জন্য। শিল্পীসত্তা শিল্পবিষয়ের মধ্যে প্রাণের প্রতিষ্ঠা করে। কবির সঙ্গে বাইরের জগতটুকুর আত্মিক মিলন যখন পরিপূর্ণ হয় শিল্পী-মননের এই বহিরঙ্গীকরণের জন্য তখনই অজন্তার চারুকলা, ইলোরার স্থাপত্য ও ভাস্কর্য কৃতির সৃষ্টি হয়। কুমারস্বামীর কথায় বলি :

"The Ajanta art though it deals with religious subject is too free to be spoken of as hieretic ; it is rather discovering than followiug the types that were to remain prepotent through so many later centuries."* অজন্তা শিল্পের আলোচনা প্রসঙ্গে কুমারস্বামী কবি মনন এবং কবি কল্পনার objectification-এর কথা বললেন। অর্থাৎ কবি বা শিল্পী এমন সুন্দর এবং সহজভাবে desubjectification অর্থাৎ পরতন্ত্রীকরণকর্মটুকু সম্পন্ন করেন যে, যে রূপটুকু যে রসটুকু যে যে সত্যটুকু শিল্প কর্মে শিল্পী নিজে অনুস্যূত করে দিয়েছেন তা তার কাছে বিষয়গত বলে ভ্রম হয়। তাইতো কুমারস্বামী উপরি-উক্ত উদ্ধৃতিটুকুতে 'Discovery' বা আবিষ্করণ তত্ত্বের অবতারণা করলেন।

অজন্তা শিল্পের আলোচনা প্রসঙ্গে কুমারস্বামী শিল্প আঙ্গিকের কথাও আলোচনা করেছেন। যে-কোনো শিল্পশাস্ত্রের পক্ষেই আঙ্গিকের আলোচনা অপরিহার্য। ভারতীয় শিল্প ষড়ঙ্গের আলোচনা করতে গিয়ে আচার্য কুমারস্বামী আমাদের বলেছেন যে শিল্পবিধি হবে ব্যক্তি অনির্ভর এক ধরনের শাস্ত্রীয় বন্ধন যা শিল্প শিক্ষার্থীকে আবশ্যিকভাবে পালন করতে হবে। ষড়ঙ্গের অবনীন্দ্রনাথ

* The Arts & Crafts of India & Ceylon পৃ: ৮২

কৃত ব্যাখ্যাকে তিনি অগ্রাহ্য করেছেন, এই প্রসঙ্গে আমরা ইতিপূর্বেই উল্লেখ করেছি। অবনীন্দ্রনাথ বড়ঙ্গের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শিল্পীর স্বাধীনতার উপর জোর দিয়েছেন কিন্তু আচার্য কুমারস্বামীর লেখায় আমরা সেই 'জোরটুকু' খুঁজে পাই না; তিনি বিধিবদ্ধতাকে বেশী মূল্য দিয়েছেন। তাঁর কথা দিয়ে বলি: "One does not know whether to wonder most at their advanced technique or at the emotional intensity that informs these works as if with a life very near our own—for they are as modern in the draughtmanship as in sentiment."*

অর্থাৎ অজন্তার ছবি দেখে আমরা সেই চিত্রীকরণের আঙ্গিকে এমন মুগ্ধ হই যে আমাদের আত্মবিস্মরণ ঘটে; সেই বিমুগ্ধতার সঙ্গে এসে যুক্ত হয় ছবির, চিত্রের বিষয়ের দ্বারা উদ্দীপিত আনন্দ লহরী। এই দুয়ে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। আমরা যে রসাস্বাদন করি অজন্তার চিত্র দেখে, সেই রসের কতটুকু এই সুন্দর আঙ্গিকের দান এবং কতটুকুই বা শিল্প বিষয়ের দ্বারা উদ্দীপিত, তা নির্ণয় করে বলা সহজসাধ্য নয়। আচার্য যেভাবে শিল্পকর্মে আঙ্গিকের স্থান নির্দেশ করলেন, সেই নির্দেশনার সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথ কৃত বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলীতে প্রাসঙ্গিক আলোচনার উল্লেখ করে বলা যায় যে, শিল্প আঙ্গিক শিল্প মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ স্থান জুড়ে থাকলেও কোথাও তা রসের নিয়ামক রূপে গণ্য হতে পারে না। অবনীন্দ্রনাথের এই অভিমতের সঙ্গে আচার্য কুমারস্বামীর মত পার্থক্য দেখা যায়। তিনি আঙ্গিককে, শিল্প প্রকরণকে একটু বেশী মর্যাদা দিয়েছেন। অবনীন্দ্রনাথ বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলীতে 'একেসাং মতম,-এর যে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন তা এখানে প্রাসঙ্গিক। শাস্ত্রীয় আঙ্গিকে যে ছবি, যে শিল্পকর্ম রচিত হয় তা শিল্পের 'টাইপ' সৃষ্টি করে। সব শিল্পীই যদি একপথে চলেন তবে একই ধরনের একই জাতের একই আঙ্গিকের ছবি এবং গান প্রমুখ চারুশিল্প অথবা কারুশিল্পের রচনা হবে: তার মধ্যে কেউই স্বমহিমায় ভাস্বর হয়ে উঠবে না। আঙ্গিক বা শৈলীকে প্রাধান্য দেওয়ার এটাই সবচেয়ে বড় বিপদ। তাইতো অবনীন্দ্রনাথ 'একেসাং মতম্'-এর আলোচনা করে 'বিপশ্চিতাং মতম্'-এর আলোচনা করলেন। তিনি বললেন, যথার্থ শিল্পী যে হবে তিনি এই 'বিপশ্চিতাং মতম্' পথের সন্ধানী। তিনি যে আঙ্গিকে ছবি আঁকেন, গান বাঁধেন সেই আঙ্গিকটুকুও

* The Arts & Crafts of India & Ceylon পৃঃ ৮২

তার প্রতিভার স্পর্শ পেয়ে অনবদ্য রূপে রূপায়িত হবে। ছবি যদি ছবি না হ'ল অর্থাৎ ক্লান্ত মানব মনে মোহময় মায়াজাল বিস্তার করে তাকে রসের সমুদ্রে অবগাহন করাতে না পারল, তবে সে শিল্প সার্থক শিল্প হ'ল না। কিন্তু আচার্য কুমারস্বামী এই তত্ত্বটির বিরোধিতা করলেন। তাঁর কথায় বলি : "Perhaps the most worthy technical peculiarity of the work at Ajanta is that it is essentially an art and brush drawing, depending for its expression mainly on the power and swiftness of its outlines and not at all on attempt at producing an illusion of relief." শিল্পে সুষ্ঠু আঙ্গিকের প্রয়োগে যে অনুভূতির জগৎ সৃষ্টি হয় তা এমনই সুন্দর এবং সহজ রূপ পরিগ্রহ করে যে বাস্তবের সঙ্গে শিল্পের পার্থক্যটুকু নির্দেশ করা কঠিন হয়ে পড়ে। শিল্পের রূপের জগতটা বাস্তব সত্যের জগতের চেয়েও বেশী মর্যাদার দাবী করে বোদ্ধা মানুষের কাছে। রবীন্দ্রনাথ এই পরমসত্যটাকে বুঝেছিলেন বলেই মহর্ষি নারদের কণ্ঠ নিঃসৃত বাণীতে মহাকবি বাল্মীকিকে সেই মহৎ সত্যের সন্ধান দিলেন :

'সেই সত্য যা রচিবে তুমি
ঘটে যা তা সব সত্য নহে'

কবি-কল্পনা এই যে কাব্য সত্যের সৃষ্টি করে, অজন্তার শিল্পী এই যে অবিনশ্বর চিত্রমালা এঁকেছেন শিলাগাত্রে, মোগল যুগের অসামান্য শিল্পীরা এই যে অত্যদ্ভুত চিত্রকল্প সৃষ্টি করেছেন, এই সবেরই মধ্যে একটা অদ্ভুত ধরনের বিষয়াশ্রয়ী শিল্প চরিত্র প্রস্ফুটিত হয়েছে। অজন্তার 'মা ও ছেলে' ছবিতে মাতা এবং পুত্রের জগতকে কেন্দ্র করে যে অনির্বচনীয় রূপসুষমার সৃষ্টি হয়েছে, সেই সুষমাটুকু অলৌকিক ও অনির্বচনীয়। তা ছবিটিকে এমন একটি স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব দান করেছে যা কোন কালেই ক্ষুন্ন হবে না। বিশেষ ক'রে মোঘল যুগের চিত্রকলা প্রসঙ্গে আচার্য কুমারস্বামী এই ধরনের মন্তব্য করলেন :

"It is profoundly interested in individual character and splendid ceremonials of court life. Its key note accordingly is portraiture—not the Asiatic conception of portraiture, the rendering of type but actual likeness, verisimilitude." মানুষের অসাধারণ ব্যক্তিত্বের মতই ছবিরও অসাধারণ ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে। মানুষের ব্যক্তিত্ব হ'ল 'ব্রহ্মাসৃষ্টি', ছবির ব্যক্তিত্ব হ'ল কবিসৃষ্টি। এই কবি সৃষ্টি করেন

যে ব্যক্তিত্ব সেই ব্যক্তিত্বটি হয়তো বা মানুষটির জীবৎকালে ছিল না ; শিল্পী এই ব্যক্তিত্বটি তাঁর শিল্পকর্মকে দান করেন। কেননা এটুকু তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন সেই ব্যক্তি মানুষটির মধ্যে, যার ছবি তিনি এঁকেছেন। ঐ যদ্ দৃষ্টং তল্লিখিতং আইনটুকুও এক্ষেত্রে চলে না। মোঘলযুগের অজস্র miniature-এ এই সত্যটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে শিল্পী যথার্থ মানুষটিকে আঁকেন নি ; তিনি সেই ভাবে মানুষটির চরিত্র চিত্রণ করেছেন, যেভাবে তিনি তাকে দেখেছেন। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ-এর মত মোঘলযুগের শিল্পীর মধ্যে (অজন্তার শিল্পীদেরও) এই বিশ্বাস ছিল যে

> 'আমারই চেতনার রঙে পান্না হ'ল সবুজ
> চুনি উঠল রাঙা হয়ে'

অতএব শিল্পীর কল্পনায় যে সত্যের সৃষ্টি হ'ল তা কিন্তু নৈর্বক্তিক নয়। প্রাচীন ভাস্কর্যকর্মকে এক সময় কুমারস্বামী নৈর্বক্তিক বা impersonal বলেছিলেন ; অজন্তা বা মোঘল যুগের শিল্প তিনি এই নৈর্বক্তিকতার মহিমায় মণ্ডিত করেন নি। এই ক্ষেত্রে তিনি অসাধারণ ব্যক্তিত্বমণ্ডিত শিল্পসৃষ্টির কথা বললেন। মোঘল যুগের আঁকা সম্রাট-ওমরাহ-আমীর প্রমুখ যাঁরাই চিত্রিত হয়েছেন, সে যুগের শিল্পীদের তুলির টানে তাঁরাই অসাধারণ হয়ে উঠেছেন ; চিত্রকর্ম অসাধারণ মহিমায় মণ্ডিত হয়ে উঠেছে ; সাধারণ অসাধারণ হয়েছে শিল্পীর কল্পনায় ; কুমারস্বামী বললেন : "So it happens that we have remarkable gallery of representatives of the great men of Moghoul time treated with a quite convincing actuality."

ষষ্ঠ স্তবক

হেগেলীয় শিল্পতত্ত্ব

বরিস পাস্তেরনাকের নন্দনতত্ত্ব

রঁমা রঁলার শিল্পদর্শন

পিকাসোর শিল্পদর্শন

কার্ল মার্কসের নন্দনতাত্ত্বিক সূত্র

হেগেলীয় শিল্পতত্ত্ব

হেগেলীয় ব্রহ্ম শিল্প, ধর্ম ও দর্শণের সরণী বেয়ে নিজের কাছে আবার ফিরে আসে, নিজেকে ফিরে পায়। এ কথা হেগেলীয় ভাষ্যকার বলেন। শিল্প হ'ল Absolute-এর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য-রূপ, 'Sensuous presentataion of the Absolute'-রূপ, বর্ণ ও রসের সমারোহে সেখানে নির্বিশেষ ঐশী সত্তার অভিষেক। এই রূপের জগতে হেগেলীয় মননভঙ্গী দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি আশ্রয় করেনি, এটা লক্ষ্য করবার বিষয়। কী করে 'না' 'হ্যাঁ' হয়ে ফুটে উঠেছে, নয় হয় হয়েছে, কেমন করে অসুন্দর সুন্দরের মোহে মুগ্ধ হ'ল, সে কথাটা উহ্য রয়ে গেছে সর্বদেশের সর্বকালের শিল্পদর্শনে। আমাদের দেশের তন্ত্রশাস্ত্রে শিল্পীর এই সৌন্দর্যসৃষ্টির তত্ত্বটিকে সুন্দরভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে: এ যেন পাখীর এক গাছ থেকে আর এক গাছে উড়ে যাওয়া চলতি পথের কোন চিহ্ন না রেখে। কেমন করে গেল, কোন শূন্যে ছায়াপথ রচে দিল দু'টি ক্ষুদ্র পাখার পরিশ্রান্ত বিধূনন, সে পথের হদিস কোন শিল্পরসিক শিল্পী বা দার্শনিক আজ পর্যন্ত দিতে পারেন নি। সে পথ কোন বাঁধা পথ নয় তার ঐতিহাসিক ভিত্তি অত্যন্ত শিথিল। শিল্প-সৌন্দর্যের এই অনির্বচনীয় রূপসত্তাকে বাঁধা ধরা নিয়মে আনবার অপপ্রয়াস না করে হেগেল দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন, একথা আমরা ঠিক বলে মনে করি। হেগেলীয় Absolute-এর শিল্প-ধর্ম-দর্শন-সমন্বিত ত্রিপদী গতি দ্বান্দ্বিক গতি পদ্ধতির সাথে সমার্থক নয়—তারা ভিন্নগোত্রীয়।[১]

১। বোসাংকে লিখেছেন: "In Hegel's aesthetic, we possess a specimen of the reasonable connection which the dialectic was intended to emphasise without constant parade of unfamiliar terms which have been thought to be mere lurking places of fallacy."......আবার তাঁর কথাতেই বলি: "The triadic movement of the spirit through art, religion and philosophy, does not represent the true picture of the dialectical movement as conceived by Hegel". —*History of Aesthetic*, পৃ: ৩৩৫ দ্রষ্টব্য।

হেগেলীয় ব্রহ্মের ত্রিপদী-গতির প্রথম পদক্ষেপ হ'ল শিল্প। শিল্প ধর্মে এবং ধর্ম-শিল্প দর্শনে পরিণত লাভ করে। এই তিন পর্বের মধ্য দিয়ে আত্মার বন্ধন মুক্তি ঘটে। এই তিন পর্বে মমুক্ষু আত্মার অনন্ত আকুতির স্বাক্ষর রয়েছে, আর রয়েছে আত্মার আত্মোপলব্ধির আশ্বাস। সুন্দরের লীলায় হেগেলীয় ব্রহ্ম ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয়—সে লীলা চলে প্রকৃতিতে, সে লীলা চলে শিল্পলোকে। 'বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?'— —বিশ্ব-ভুবনে লক্ষরূপে সেই ব্রহ্মেরই প্রকাশ। রূপের আলো সেই অরূপের কাছে ধার করা, সেই সীমাহীন অপরূপের রূপার্থীর কাছে আত্মনিবেদনের প্রকাশ। এইরূপ সত্যকেও প্রকাশ করছে অনাদিকাল থেকে।[২] কাজেই সত্য সুন্দরকে আশ্রয় করেছে আবার এই সুন্দরই প্রকাশ করেছে ব্রহ্মকে, ব্রহ্মের রূপময় অনন্ত ঐশ্বর্যকে। হেগেলের সুন্দর সত্যাসত্য-নিরপেক্ষ নয়; ক্রোচের মত তিনি বলেননি যে, শিল্পের ক্ষেত্রে সত্যাসত্যের প্রশ্নটা অবান্তর। তাঁর মতে beauty is truth—সত্য সুন্দরে বিধৃত। শিল্প, ধর্ম ও দর্শন এই তিনটি পর্বেই ভাবের (content) স্বধর্ম বজায় রয়েছে—শুধু প্রভেদ হচ্ছে প্রকাশভঙ্গীর, রূপভেদ ঘটছে আত্মার প্রকাশে।[৩] সুন্দরের নির্বিশেষ সত্তার

২। নন্দ প্রণীত The aesthetic Theories of Kant, Hegel and Schopenhauer, গ্রন্থের পৃঃ ৮২ দ্রষ্টব্য।

৩। হেগেলের কথাতেই বলি: "Accepting then, this fundamental similiarity of content, those three spheres of Absolute spirit only differ in the forms under which they present their objects, that in, the Absolute, to human consciousness...............The form of Sensous perception it appropriates is art in the sense that it is art which presents truth to consciousness in its Sensuous Semblance; but it is a Semblance, which under the mode of its appearance, possesses a higher and profounder meaning and significance although it is not its function to render the universality or the Notion wholly intelligible through the medium of Sense." —*Hegel's Philosophy at Fine Arts* (Osmaston's translation), Vol. I. পৃঃ ১৩৭ দ্রষ্টব্য।

বিশেষিত প্রকাশ ঘটল সর্বপ্রথম কিন্তু এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রকাশই তার আত্মপলব্ধি তত্ত্বের শেষ কথা, চরম সত্য নয়।

সুন্দরের সাথে আমাদের সাক্ষাৎ হয় প্রকৃতির রূপের হাটে। যে রূপে হেগেলীয় ব্রহ্মের স্বাক্ষর রয়েছে—ব্রহ্ম যেখানে প্রকাশিত। তবে প্রকৃতির সৌন্দর্য হ'ল খণ্ড সৌন্দর্য; পরম সুন্দরের অনাহত প্রকাশ সেখানে নেই। Idea-র প্রকাশের আধার হিসাবে প্রকৃতির বিস্তার পর্যাপ্ত নয়—তাই সে প্রকাশ ক্ষুণ্ণ হয়, ব্যাহত হয়। জড় উপাদানের জড়তায় আচ্ছন্ন হেগেলীয় Idea-র প্রকাশ আবার সর্বত্র সমান হয় না—কোথাও বা সে প্রকট আবার কোথাও বা প্রচ্ছন্ন। তাই হেগেল প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের স্তরভেদ (Degrees) স্বীকার করেছেন। যেখানে প্রকৃতির বুকে Idea-র প্রকাশ যত সুষ্ঠু হ'য়েছে, সেখানে সুন্দরও মহত্তর মর্যাদায় প্রকাশ পেয়েছে। Idea-র প্রকাশের ফলে প্রকৃতির জড় উপাদানে সাযুজ্য ও সামীপ্য-বোধ আসে—আমরা প্রকৃতির মধ্যে unity খুঁজে পাই। হেগেলীয় দর্শনের আলোচনা প্রসঙ্গে দার্শনিকপ্রবর উইলিয়াম নাইট এই বহুধাবিভক্ত সৃষ্টির মধ্যে যে ঐকতান রয়েছে তাকে বলেছেন 'Unity of the manifold'; এই unity যেখানে আছে সেখানে আমরা সুন্দরকে পাই। এক তাল লোহা, তাকে আমরা সুন্দর বলব না কারণ তার বিভিন্ন অংশগুলি কোন সুসমঞ্জস ঐক্যের মধ্যে বিধৃত নয়—সেখানে সঙ্গতি নেই, মিল নেই, ছন্দ নেই, কাজে কাজেই সুন্দরও সেখানে অপ্রকাশ। এই জড়কে উত্তীর্ণ করে যখন জীবজগতে আসি তখন সুন্দরের সুষ্ঠু প্রকাশের দেখা পাই। জীবের মধ্যে দেখি এমন একটি ঐক্যসূত্রের লীলা যা জীবসত্তায় সমগ্রতা এনে দেয়। মানুষের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, তার ধ্যানধারণা, তার সাধনা ও ভজনা, সব কিছুর মধ্যে আমরা একমুখী প্রয়াসের সন্ধান পাই। তার চেতনার আলো ছড়িয়ে পড়ে তার সমস্ত অস্তিত্বে, তাই সেখানে এক অংশকে আর এক অংশের পরিপূরক মনে হয়। এককে বাদ দিয়ে অন্যটি হ'ল পঙ্গু, অচল। জীবের মধ্যে এই সজীব ঐক্যানুভূতিই তার সৌন্দর্যের মূল কারণ তবে জীবজগতে যে সৌন্দর্য আমরা প্রত্যক্ষ করি, সুন্দরের প্রকাশলীলায় সেটাই শেষ কথা নয়। জীবজগৎ বা প্রাকৃতিক জগৎ নিঃশেষে সুন্দরকে প্রকাশ করতে পারে না, কারণ প্রকৃতি সীমাহীন নয়, কারণ প্রকৃতির জড় উপাদানে Idea-র প্রকাশ পদে পদে ব্যাহত হয়। Idea হ'ল অন্তহীন (Infinite) সত্তা তাকে সীমাহীন জড় প্রকৃতির আধারে সম্যক্ প্রকাশ করা

সম্ভব নয়। তাই হেগেলের মতে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে অনেক বড় বড় ত্রুটি রয়ে গেছে। সে সৌন্দর্য অপূর্ণ।[১] তাই চলে মানুষের পূর্ণতর সৌন্দর্য সৃষ্টির প্রয়াস। এরই ফলে শিল্পের জন্ম ; স্থাপত্য, ভাস্কর্য, রেখাঙ্কন, সঙ্গীত এবং কাব্যের সৃষ্টি। এ সৃষ্টিতে প্রকৃতির জড়বস্তু Idea-র প্রকাশকে ব্যাহত করে না। আত্মা বা spirit এখানে সৃষ্টিশীল, নিজের সৃষ্টিতে নিজেই মশগুল। বাইরের কোন জড়বস্তুর বাধা বা নির্দেশ সেখানে নেই—শিল্প হ'ল শিল্পীর মনের পটভূমিতে Idea-র প্রকাশ।[২]

'আমারই চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ
চুনি উঠল রাঙা হয়ে।'—(আমি)

মনের রঙ ছড়িয়ে পড়েছে নিখিল ভুবনে—সে চুনি-পান্নাকে রঙীন করেছে, আকাশকে নীল আর প্রকৃতিকে শ্যামল করেছে। মেঘের কোলে মন রঙ ঢেলে রূপকথার আনন্দ-লোকের সৃষ্টি করেছে। যেখানে শিল্পী সম্রাট ; কোন বাধা নেই তার সৃষ্টির অমরাবতীতে। সেখানে জন গিলপিন অবিশ্রান্ত ঘোড়া ছুটিয়েছে, গালিভারের পথচলা অব্যাহত হ'য়েছে, অবিনের[৩] গল্পবলার শেষ নেই।

সরু মোটা ছুটো তারে জড়িয়ে গেছে—ছুটি সত্তা এমনিভাবে মিশেছে যে, তাদের পৃথক করা অসাধ্য। শিল্পভাব (content) এবং শিল্পরূপ (form) হ'ল ছুটি তার—শিল্পসৃষ্টিতে এরা ছুয়ে মিলে একটি নতুন সত্তার সৃষ্টি করে, একটি

১। W. T. Stace প্রণীত The Philosophy of Hegel, পৃঃ ৪৪৪ দ্রষ্টব্য।

২। নাইট লিখেছেন: 'Beauty, according to Hegel in the disclosure of mind or of the idea through sensuous forms or media ; and as mind is higher than nature, by so much is the beauty of that higher than the beauty of Nature. Natural beauty is but the reflection of the beauty of mind.' [Philosophy of the Beautiful, পৃঃ ৭১ দ্রষ্টব্য।] শেষের পংক্তিতে নাইট সাহেব হেগেলীয় সৌন্দর্যদর্শন সম্বন্ধে যে কথা বলেছেন সে কথাগুলি প্রণিধানযোগ্য। ঠিক এমনি ধারা কথাই আমরা শুনেছি কবি রবীন্দ্রনাথের মুখে ; এটি আমরা বারবার উদ্ধৃত করেছি।

৩। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত 'পথে-বিপথে' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

সুরের ঝরণাধারায় রসিক মনকে ধুইয়ে দেয়, 'সহৃদয়-হৃদয়-সংবাদী' মানুষ আনন্দে সুধা পান করে সেই সার্থক শিল্পের রসধারায়। এই শিল্পভাব হ'ল মহাভাব, হেগেলের ব্রহ্ম, Idea—সার্থক শিল্পে এই মহাভাবই দ্যোতিত হয়। পঙ্গু, অক্ষম শিল্পীর হাতে দেওয়া শিল্পরূপ (form) এই মহাভাবকে সম্যক্‌রূপে ধারণ বা প্রকাশ করতে পারে না; অবশ্য এই মহাভাবকে হেগেলীয় Ideaকে, পূর্ণভাবে রূপায়িত করা যে কোন শিল্পীরই সাধ্যাতীত। তাই দেখি যুগে যুগে নতুন নতুন শিল্পরূপের বিবর্তন—নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে শিল্পীদের হাতে। যদি কোন দিন কোন শিল্পী এই মহাভাবের (Idea) যোগ্য শিল্পরূপ দিতে পারে তবে সেদিন শিল্পবিবর্তন থেমে যাবে। শিল্পের ইতিহাস সেইখানেই ছেদ টানবে। সেই Form এবং Content-এর পূর্ণ মিলনে আমরা সম্পূর্ণ শিল্পকে পাব—সেখানে উভয়ের মধ্যে কোন অসঙ্গতি নেই, কোন বিরোধ নেই। শিল্পভাব এবং শিল্পরূপের এই যে harmony বা মিল, একে যদি আমরা নিখুঁত করতে পারি, তবেই আমাদের নিখুঁত শিল্পের ধারণাকে কাগজে কলমে রূপ দিতে পারব, সার্থক করতে পারব মানুষের চিরসঞ্চিত আশাকে।[১]

শিল্পের আন্তর ভাব ও বাইরেকার বস্তুরূপ এতদুভয়ের মিলনে অথবা বিরোধের ফলেই সিম্বলিক, ক্লাসিক্যাল এবং রোমান্টিক আর্টের জন্ম হয়। যেখানে শিল্পবস্তু ভাবকে রূপ দিতে চায় অথচ ভাবের প্রকাশের দৈন্য শিল্প-রূপায়ণের জড় উপাদানের অমিত আস্ফালনে প্রকট হ'য়ে ওঠে, সেখানে আমরা সিম্বলিক আর্টকে পাই। ভাব এখানে সংকুচিত, আভাসিত মাত্র। জড় উপাদানের বেড়াজালে মহা ভাব বাঁধা পড়ে—তার পরিচয় বোদ্ধাজনের কাছেও ঢাকা থাকে। এখানে শিল্পরূপের (Form) অসম্পূর্ণতা হেগেলীয় Idea-র

১। ষ্টেসের কথায় বলি: "In the ideal work of art, these two sides, content and embodiment, are in perfect accord and union. So that the embodiment constitutes the full and complete expression of the content, whereas the content, on its part, could find no other than this very embodiment as adequate expression for it."—*The Philosophy of Hegel.* পৃঃ ৪৫১-৫২ দ্রষ্টব্য। হেগেলীয় শিল্পদর্শনের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ষ্টেস শিল্পরূপ ও শিল্পভাবের এই একাত্ম মিলনকে সার্থক শিল্পসৃষ্টির পক্ষে অপরিহার্য বলেছেন। আমরা এই কথার অনুমোদন করি।

প্রকাশের অনুকূল নয়—শিল্পভাব ও শিল্পরূপ পরস্পরের সহায়ক ও পরিপূরক না হ'য়ে বিরুদ্ধাচরণ করে, কারণ ভাবের যোগ্য প্রকাশরূপ তখনো শিল্পীর আয়ত্তে আসেনি। স্থাপত্য শিল্প হ'ল সিম্‌বলিক আর্টের উদাহরণ। স্থপতি মন্দির নির্মাণ করে দেবতাকে প্রতিষ্ঠার জন্য—দেবতাকে শীতাতপ থেকে ত্রাণ করার জন্য, কিন্তু দেবতাত্মাকে প্রকাশের শক্তি স্থাপত্যশিল্পের নেই। এখানে আমরা শিল্পরূপায়ণের জন্য স্তূপীকৃত জড় উপাদানের গন্ধমাদনে 'মহাভাবের' বিশল্যকরণীকে হারিয়ে ফেলি, কারণ জড় উপাদানের অহেতুক প্রাচুর্য ভাব ও রূপের পূর্ণ মিলনের অন্তরায় হ'য়ে দাঁড়ায়। কাজেই সিম্‌বলিক স্থাপত্য-শিল্পকে পিছনে ফেলে এগোতে হয়। তারপরেই আসে ক্লাসিক্যাল আর্ট। শিল্পবিবর্তনের এই পর্যায়ে আমরা ভাব ও রূপের একটা সুসঙ্গত মিলন দেখতে পাই! এখানে ভাব রূপায়ণের জড় উপাদানকে খর্ব করা হ'য়েছে, তার অনাবশ্যক বিস্তারকে সুমিত করা হ'য়েছে ভাব প্রকাশের যোগ্য ক'রে। এর উদাহরণ আমরা পাই ভাস্কর্যশিল্পে; মানুষের মূর্তিনির্মাণে ক্লাসিক্যাল আর্ট Form এবং Content-এর পারস্পরিক মিলন সম্পর্ক নিখুঁত বলে একে সবচেয়ে সুন্দর বলা হ'য়েছে হেগেলীয় শিল্পদর্শনে।[১] কিন্তু শিল্পবিবর্তন এখানে থেমে যায় নি। এর পরে আসে রোমান্টিক আর্ট। এখানে ভাব মুখ্য, রূপ ও জড় উপাদান এখানে গৌণ। শিল্পরূপের এখানে কাজ হ'ল শুধু সংকেত করা, ইঙ্গিত করা—শিল্পভাব তাকে অতিক্রম ক'রে বহুদূর চলে যায়, বোদ্ধাকে নিয়ে যায় রসলোকের অন্তঃপুরে। ভাবের ব্যঞ্জনা রূপের বাধাকে বারে বারে অস্বীকার করে, তাকে ভেঙ্গে দিতে চায়। ভাব আপনাকে রূপের সমস্ত বাধা থেকে মুক্ত ক'রে নিতে চায় আন্তর মুক্তি-উন্মাদনার প্রসাদ গুণে। সে শিল্প-রূপের সাথে মিলে-মিশে থাকতে চায় না বলেই ক্লাসিক্যাল যুগের গ্রীকদেবতারা মানুষের আকারে কল্পিত, তাই মূর্তি নির্মাণ ব্যাপারে দেবত্বের আদর্শকে সে যুগের শিল্পী অবয়ব দিয়ে, মূর্তি দিয়ে, রূপায়িত করতে পেরেছিল। খ্রীষ্টীয় যুগের উন্নত দেবত্বের আদর্শ মানবীয় মূর্তির পরিবহণে আপনাকে প্রকাশ করেনি, কারণ সে আদর্শ অসঙ্গ আত্মার (absolute spirit) মহত্তর ধারণা। এই

১। "Classical art, according to Hegel, is the most beautiful for it preceisely harmonises the form and the content, the thought and the material" (*Bosanquet's History of Aesthetic*, পৃঃ ৩৪৭ দ্রষ্টব্য।)

সুমহান্ আদর্শকে যোগ্য শিল্পরূপে রূপায়িত করা যায় না—শিল্পরূপ এখানে কিঙ্কিৎকর হ'য়ে পড়ে। ভাব এখানে দ্যোতিত হয়—তার ব্যঞ্জনা রূপকে অতিক্রম করে। এইখানেই রোমান্টিক আর্টের শ্রেষ্ঠতা। জড়রূপ মহাভাবের নাগাল পায়না—খ্রীষ্টীয় যুগের ভগবান আপনাকে মূর্তিতে প্রকাশ করেন না—তাঁর মহিমা মূর্তির গণ্ডিকে অতিক্রম করেছে।[১]

অঙ্কনশিল্প, সঙ্গীত এবং কবিতা রোমান্টিক আর্ট ব'লে খ্যাত। এই তিন শ্রেণীর শিল্পেই বস্তুরূপের উপাদান ভাবের তুলনায় অত্যন্ত অল্প; তাই ভাবের প্রকাশ অবারিত থাকে। এখানে শিল্পভাব এবং শিল্পরূপের মিলন আরো গভীর। স্থাপত্য অথবা ভাস্কর্যশিল্পে ঠিক এই ধরনের ভাব-রূপের একাত্মতা আমরা পাইনি! অঙ্কন শিল্পের উপাদান কোন জড় বস্তু নয়; এ শুধু রঙ তুলির খেলা, 'Spiritual play of light'। শিল্পরূপ আমাদের চোখের সামনে যাকে তুলে ধরে, ভাবের ব্যঞ্জনা তাকে অতিক্রম ক'রে আমাদের বহুদূর নিয়ে যায় নব নব ভাবলোকের শিখরে শিখরে। হেগেল অঙ্কনশিল্পকেও চরম প্রকাশের মর্যাদা দিলেন না। তাঁর মতে অঙ্কন শিল্প হ'ল 'Too objective' অর্থাৎ একটু বেশী মাত্রায় বস্তুনির্ভর। অঙ্কনের পরে এলো সঙ্গীত। গান objective হওয়ার দোষ কাটিয়ে উঠেছে বললেই চলে। হেগেল গানকে subjective বা ব্যক্তিনির্ভর বলেছেন। গান আমাদের আন্তর অনুভূতির কাছে আবেদন করে। অঙ্কনের মত কাগজ পাথরের তার দরকার হয় না। স্থানের বা স্থানিক বিস্তারের কোন প্রয়োজন নেই সঙ্গীতের। রঙ, আলো, ছায়ার প্রয়োজনও ফুরিয়ে গেছে। বস্তুনির্ভরতা ক্রমেই শূন্য হ'তে চলেছে। মানুষের আন্তরজীবনের ভাব ও ভাবনাকে সঙ্গীত প্রকাশ করছে। তবু সে প্রকাশ হেগেলের মতে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। সুর এবং শব্দ ভাবকে দ্যোতিত

১। হেগেল বলেন: 'And God is known not as only seeking his form or satisfying himself and thus giving himself his adequate figure in the spiritual world alone. Romantic art gives up the task of showing him as such in external form and by means of beauty; it presents him as only condescending to appearance as the divine, as the heart of hearts in an externality from which it always disengages itself."

করলেও পুরোপুরি 'ভাব' হ'য়ে উঠতে পারে নি। সঙ্গীত সম্বন্ধে হেগেল বলেছেন: "It embodies pure ideality and subjective emotion in the configuration of essentially resonant sound rather than visible form."[২] সুরের মূর্ছনায়, শব্দের সুবিন্যাসে যে রূপলোকের সৃষ্টি হয়, সেখানে শিল্পভাবের প্রতিষ্ঠা স্বচ্ছন্দ এবং বহুল পরিমাণে স্বাধীন। তবু অভাব থেকে যায়; শিল্পরূপের উপাদান ভাবের প্রকাশকে ব্যাহত করে, তার পরিমাণ যতই সামান্য হোক্ না কেন। তাই ত প্রয়োজন হয় সঙ্গীত থেকে কাব্যে আসার। কবিতার আবেদন সার্বিক। সঙ্গীতের শব্দ এখানে অর্থবহ বাক্যের রূপ নিয়েছে; ভাবকে সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ করেছে। কাব্যের Form-কে হেগেল বলেছেন 'The sign of an idea, the expression of reason', মানুষের মনন সাধনার প্রকাশ হয় কাব্যে। Idea কে যোগ্য আধারে ন্যস্ত করা হয় অবশ্য ছন্দ-যতির নিয়ম মেনে। সঙ্গীতে শব্দের যে মূল্য ছিল, যে মর্যাদা ছিল, সে মর্যাদা কাব্যে আর নেই। কাব্যের রাজ্যে শব্দ শুধু অর্থকে, ভাবকে প্রকাশ করে—সেখানেই তার মূল্য, তার সার্থকতা। শব্দ এখানে ভাব রাজ্যের দিকে অঙ্গুলি সংকেত ক'রে আমাদের realm of spirit-এর দিকে পথ নির্দেশ করে। কাব্য সুস্পষ্ট অর্থবহ; সঙ্গীতের কুয়াশাচ্ছন্ন ভাবব্যঞ্জনা এখানে নেই। মহাভাব (Idea) আপনাকে কাব্যে প্রকাশ করে সবচেয়ে সুন্দর ভাবে। তাই কাব্যের স্থান হেগেলীয় শিল্পদর্শনে সকলের চেয়ে উচ্চে। শিল্প-পর্বে Idea-কে প্রকাশ করার সর্বশেষ প্রয়াস হ'ল কাব্য। তারপরে আর্ট অতিক্রান্ত হয়, হেগেলীয় ব্রহ্মের দ্বিতীয় পদক্ষেপ ঘটে ধর্মের পটভূমিতে। আর্টের সেখানে মৃত্যু হয়েছে। হেগেলীয় ভাষ্যকার Knox বললেন: "Poetry is consequently, the freest and the most exalted of the arts. Its home is in the sphere of the spirit and it belongs to the life of the soul, of emotion, of reason. At this point in the noblest of the arts, in poetry—art transcends itself for it in the first place here that it deserts the medium of a harmonious presentation of mind in sensuous shape and passes from the poetry of imaginative idea into the prose of the thought, i. e. into the objectivity and universality of spirit which is reality."

২। হেগেলের *Philosophy of Fine Arts*, Vol. IV, পৃঃ ৪ দ্রষ্টব্য।

বরিস পাস্তেরনাকের নন্দনতত্ত্ব

অন্তর্মুখী মানসিকতার অধীশ্বর পাস্তেরনাকের জীবন জিজ্ঞাসা এক মহত্তর শিল্প জিজ্ঞাসায় আত্মস্থ হ'য়ে আছে। জিজ্ঞাসু পাঠকের অন্তর্দৃষ্টি যখন এই শিল্পজিজ্ঞাসার যথাযোগ্য সমাধান খুঁজে পাবার প্রয়াসে এক আনন্দতত্ত্বের মৌল ধারণায় উপনীত হয়, তখন পাস্তেরনাকের নন্দনতত্ত্বের ভিত্তিভূমি তিনি স্পর্শ করেন। সুগভীর জীবন প্রত্যয়ের স্পর্শ তাঁর সমগ্র নন্দনতত্ত্বের বিরাট সৌধের প্রতিটি পঞ্জরে প্রতিটা অস্থিকণায়। এই মহাশিল্পীর জীবনদর্শন যেমন উৎকণ্ঠাপ্রোষিত তেমনি আবার তাঁর নন্দনতত্ত্বও পরামূল্যের লক্ষণাক্রান্ত। তাই বরিস পাস্তেরনাকের নন্দনতত্ত্ব গভীর ভাবে প্রণিধানযোগ্য। অনন্যসাধারণ সাহিত্যকৃতির স্রষ্টা হিসেবে তিনি অতিভাস্বর হয়ে উঠেছেন আমাদের কাছে; সাহিত্যের মূলগত যে অর্থ তা সত্য হয়েছে পাস্তেরনাকের সৃষ্টির বেলায়। দেশেবিদেশের গুণীজনেরা তাঁর সাহিত্যের ভেলায় চড়ে রসলোকে যাত্রা করেছেন; আনন্দ পেয়েছেন; এ আনন্দের রসাস্বাদনকে 'ব্রহ্মাস্বাদসহোদর' বলেছেন প্রাচীন ভারতের আলংকারিকেরা। এই যে রসাস্বাদন, এই যে অলৌকিক আনন্দের উদ্বর্তন এটাই হ'ল শিল্প-লক্ষ্য। এই অলৌকিকের আবির্ভাব ঘটে শিল্প বস্তুকে আশ্রয় ক'রে; শিল্পীর প্রতিভার যাদুস্পর্শে এই অলৌকিকের সৃষ্টি হয়। শিল্পীর এই স্পর্শটুকু ছাড়া এই অলৌকিক তত্ত্বের অন্য কোন ব্যাখ্যা মেলে না। পাস্তেরনাক বললেন যে যাকে আমরা অলৌকিক বলি তা প্রতিভার স্পর্শ পাওয়া সাধারণ লৌকিক ছাড়া আর কিছুই নয়। অর্থাৎ পাস্তেরনাক বলতে চাইলেন যে শিল্পের বিষয়বস্তু বা উপজীব্য অতি সাধারণ, সহজ এবং অ-নাটকীয়ও হতে পারে। মহৎ শিল্পের সৃষ্টির জন্য মহত্তর বিষয়বস্তুর (content) প্রয়োজন নেই। পাস্তেরনাক পুশকিনের উদাহরণ দিয়েছেন। তিনি বললেন যে পুশকিনের রচনার বিষয়বস্তু হ'ল—মানুষের দৈনন্দিন জীবনের খাটুনি, কর্তব্যের বোঝা ও দিনগত পাপক্ষয়ের স্তবগান। মহাকবি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পাস্তেরনাকের এই প্রসঙ্গে একটা সাযুজ্য খুঁজে পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর নন্দনতাত্ত্বিক ঘোষণায় এ কথা আমাদের বললেন যে সাহিত্যের বিষয়বস্তু বা উপজীব্য নির্বাচনের কোন নৈতিক বা আধ্যাত্মিক মানদণ্ড নেই। তাঁরই সঙ্গে সুর মিলিয়ে শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ বললেন যে শিল্পীর জগৎ হল নৈরাজ্যের জগৎ। কোন বিষয়বস্তুই

সেখানে অপাংক্তেয় নয়। কোন শব্দের অপ্রতিহত প্রবেশকে সে লোকে নিষিদ্ধ করা চলে না। বরিস পাস্তেরনাক এই ধরনের মতবাদিতার প্রতিধ্বনি করে বললেন যে যথেষ্ট শব্দ চয়নের অধিকার কবির আছে। তিনি উদাহরণ দিলেন পুশকিনের 'বংশলিপি' কবিতাটি উদ্ধৃত করে: 'বুর্জোয়া, এক বুর্জোয়া, এই হলাম আমি'। পুশকিন অসংকোচে নিজেকে বুর্জোয়া বলে ঘোষণা করলেন; সমকালীন মানুষের চেতনায় বুর্জোয়া কথাটি অসম্মানসূচক বলে গণ্য হয়েছিল। ইংরেজী অলংকার শাস্ত্রে যাকে Bathos-এর উদাহরণ বলা হয়েছে এবং কাব্যে যা অবহিত তেমনি ধারা কাব্য রীতির প্রশংসা করলেন পাস্তেরনাক। তিনি পুশকিনের 'ওনেগিনের যাত্রা' থেকে উদ্ধৃতি তুলে বললেন:

'এখন আমার স্বপ্ন হলেন গৃহিনী
শান্ত জীবন উচ্চতম আকাঙ্ক্ষা,
মস্ত গামলাভরা বাঁধাকপির সুরুয়া'।

মহাকবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর নন্দনতাত্ত্বিক চিন্তা বিবর্তনের কোন এক পর্যায়ে মনুষ্য শিল্পের বিষয়বস্তু হিসাবে পরিশীলিত, সংস্কৃত এবং বিশেষভাবে নির্বাচিত ব্যক্তি চরিত্রের মহত্তর দিকটিকে শিল্পের উপজীব্য বলে গ্রাহ্য করেছিলেন। অবশ্য উত্তর-কালে এই পর্যায়টি উত্তীর্ণ হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ অনায়াসে। পাস্তেরনাক চেকভ এবং পুশকিনের সাহিত্যের মধ্যে মানবজাতির চরম উদ্দেশ্য বা মোক্ষের পথনির্দেশের কোন ইঙ্গিত পান নি বলেই পুশকিনকে এবং চেকভকে সাধুবাদ দিয়েছেন। তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বললেন যে শিশুর মত সহজ এবং সরল মানসিকতার লক্ষণ আমরা চেকভ এবং পুশকিনের মধ্যে দেখেছি। তাইতো পাস্তেরনাকের কাছে তারা এতো প্রিয়। শিল্পের আবেদনকে অসামান্য হতে হলে বিষয়বস্তুর গাম্ভীর্য এবং মহত্ত্ব যে অবশ্য গ্রাহ্য এ তত্ত্বে পাস্তেরনাক বিশ্বাস করেন নি। তিনি বললেন, যে কোন শিল্পকর্মই-নানান্ দিক থেকে আমাদের কাছে আবেদন জানাতে পারে—শিল্পের রূপ ও বিষয়বস্তুর, ঘটনাবলীর সুবিন্যাস অথবা সুষ্ঠু চরিত্রায়ন এরা সবাই শিল্প উৎকর্ষের উৎস হতে পারে। কিন্তু যে কোন শিল্প কর্ম সম্পর্কে প্রথম এবং শেষ কথা হ'ল তাকে 'শিল্প' হয়ে উঠতে হবে। সার্থক শিল্প সৃষ্টির সামনে দাঁড়িয়ে আমারা নীতির কথা ভুলে যাই, আদর্শবাদ আত্মগোপন করে, জীবনদর্শন নেপথ্যে সরে যায়। তাই তো পাস্তেরনাক বললেন যে দস্তয়েভস্কির 'crime and punishment' গ্রন্থটি পড়তে পড়তে আমরা রাস্কলনিকভের দুষ্ক্রিয়ার দ্বারা ততটা অভিভূত হয়ে

পড়ি না যতটা অভিভূত হই এই গ্রন্থটিকে সার্থক শিল্প সৃষ্টি হিসাবে উপলব্ধি ক'রে। শিল্পীর জাদু যা শিল্প সৃষ্টি করে তার চরিত্র কিন্তু দেশে দেশে কালে কালে বদল হয় না। রং, রূপ, ঠাট, কাঠামো এ সব যতই বিভিন্ন হোক্ না কেন শিল্পের অন্তর্লক্ষ্মী যেখানে আসন পাতেন তা যথার্থ শিল্প হয়ে ওঠে। তাই তো রসোত্তীর্ণ শিল্প কালোত্তীর্ণ। পাস্তেরনাক বললেন, শিল্পের এই স্বরূপ লক্ষণকে স্বীকার করলে বলতে হয় যে শিল্পে কোন বহুত্ব নেই। তাঁর কথা উদ্ধৃত করে দিই: "আদিবাসীর শিল্প, মিশরের শিল্প, গ্রীসের কি আমাদের নিজেদের—সব, আমার মনে হয়, আসলে একই, এক এবং অদ্বিতীয়, হাজার হাজার বছর ধরে যা অবিকল থেকে যায়, এ হ'ল সেই। শিল্পের এই যে সার্বভৌম চিত্রটি পাস্তেরনাক আঁকলেন তা কিন্তু 'বিশেষকে' (particular) আশ্রয় করে রসঘন হয়ে ওঠে। এই বিশেষকে আশ্রয় করে যে শিল্প-চারিত্র্য এটি হ'ল শিল্পীর প্রতিভার প্রসাদগুণ। শিল্পী যে আলোয় যেমনভাবে যে ভঙ্গীতে বিশেষকে অবলোকন করলেন, সে রূপটি হ'ল শিল্পীর মানস নেত্রে অতি ভাস্বর। তার সীমা সুস্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্ট। শিল্পী তাকে যেভাবে প্রকাশ করলেন তা হ'ল তার চূড়ান্ত রূপ। তাইতো পাস্তেরনাক বললেন, "আমার বরাবরই মনে হয়েছে যে Art এমন কোন পদার্থ নয় যার পরিধির মধ্যে অসংখ্য ধারণা আর বহু বিচিত্র প্রকাশের অবকাশ আছে।" অর্থাৎ শিল্পীর নিজস্ব ধারণা এবং তার প্রকাশ শিল্পী যেভাবে ঘটিয়েছেন তার দ্বিতীয় সংস্করণ সম্ভব নয়। পাস্তেরনাকের মতে প্রতিটি শিল্পকর্ম হ'ল অনন্যসাধারণ বা Unique। যদি তর্কশাস্ত্রের সূত্র ধরে আমরা অগ্রসর হই এবং পাস্তেরনাকের মূলনীতিকে অনুসরণ করি তাহ'লে আমাদের বলতে হয় যে সাহিত্য কর্মের সার্থক অনুবাদ পাস্তেরনাকের নন্দনতত্ত্বে নীতি হিসাবে অগ্রাহ্য। কেননা, শিল্পীর দেখা যে জগৎ, যে চিত্রকল্পের মাধ্যমে তিনি তাঁর মানসমূর্তিটিকে রসঘন করে তুলেছেন তার নাগাল পাওয়া পাঠকের বা অনুবাদকের পক্ষে অসাধ্য বললেও অত্যুক্তি হয় না। যে অনুভূতি, যে ভাবতন্ময়তা শিল্পীকে আবিষ্ট করেছিল ঠিক তার পুনর্সৃজন কখনই সম্ভব নয়। উদাহরণ দিই পাস্তেরনাকের কবিতা থেকে:

> "উইলো গাছ, আইভিলতা ঘেরা,
> ঝড়ের দিনে লুকিয়েছে তার তলায়,
> এক চাদরেই দু-জনে রই ঢাকা,
> আমার বাহুবন্ধে বাঁধা তুমি।

ভুল হ'লো যে। ঝোপের গাছগুলো
আইভিতে নয়, কড়া নেশায় ঘেরা।
তাহ'লে, বেশ, চাদরটাকে টেনে
নাও মাটিতে পেতে।" (নিশা)

কবি পাস্তেরনাক কথার আঁচড় টেনে যে সম্পূর্ণ রেখাচিত্রটিকে ফুটিয়ে তুললেন তা রসোত্তীর্ণ হয়েছে কবি মনের অনুভূতিনিবিড় স্থায়ীভাবকে আশ্রয় করে। ব্যভিচারী ভাব এবং বিভাবের সংযোজনে সংবেদনশীল মনে যে অনুভবের সৃষ্টি হয় তার ফলেই অনন্যসাধারণ সংবেদনটুকু জন্ম নেয়। সেই মৌল সংবেদনের পুনর্ণবীকরণ কখনও সম্ভব হয় না অপর একটি মনে। সহৃদয়-হৃদয়-সংবাদী রসিক সুজন নতুন করে আপন মনের পটভূমিকায় এই চিত্রকল্পটির হয়তো সৃষ্টি করতে পারেন। কিন্তু উভয়ের মধ্যে ব্যবধানটুকু থেকেই যাবে। কেননা দুজনের শিল্প প্রকরণ কখনই এক হতে পারে না।

শিল্পকর্মের এই অনন্য সাধারণ চরিত্রকে পাস্তেরনাক যুক্ত করেছেন শিল্পীর অলৌকিক শক্তির সঙ্গে। মহাদার্শনিক প্লেতো শিল্পীর এই অলৌকিক শক্তির কথা বলেছেন, প্রত্যক্ষ করেছেন কবির মধ্যে এই স্বর্গীয় উন্মাদনা। তাই উভয়ের কাছেই শিল্পকর্ম অনন্যসাধারণতার দাবী রাখে। পাস্তেরনাক যে তত্ত্বে বিশ্বাস করেছেন সেই তত্ত্বটিকে তিনি প্রতিষ্ঠা করে গেছেন তাঁর সৃষ্ট সাহিত্য কর্মে। এদিক থেকে বিচার করলে তাঁকে আমরা অদ্বৈতবাদী নন্দনতাত্ত্বিক আখ্যায় ভূষিত করতে পারি। তাঁর 'আগস্ট' শীর্ষক কবিতার শেষের কয়েকটি ছত্রে তিনি বললেন :

"বিদায় আমার উন্মুক্ত পাখার বিস্তারকে,
উড়ে চলার স্বাধীন প্রতিজ্ঞাকে বিদায়!
বিদায়, সৃষ্টিশীলতা, অলৌকিক শক্তি,
বাণীর মধ্যে উন্মোচিত বিশ্বরূপ।"

শিল্পীর সৃষ্টিশীলতার মধ্যেই যে বিশ্বরূপটুকু আপন সীমাহীন বৈচিত্র্যে নিত্য উদ্ভাসিত, এ সত্যে পাস্তেরনাক বিশ্বাস করেছেন; আর এটিকে সঙ্ঘটন করায় শিল্পীর চিত্তাশ্রয়ী অলৌকিক শক্তি। এই লোকোত্তর সৃষ্টি উন্মাদনা অতি সাধারণকেও অসামান্যের মর্যাদা দেয়। রবীন্দ্রনাথের সেই অন্তঃপুরের অতি সাধারণ মেয়ে তাকে রসিক পাঠক চেনে না। যাকে অসামান্য করে তুলতে শরৎবাবুর প্রতিভার জাদুর দরকার হয়। সেই মেয়েই ত কবির কাব্যে

দিগ্বিজয়ী দ্যুতিতে আভাসিত হয়। 'অপূর্ব বস্তুনির্মাণ ক্ষমাপ্রজ্ঞা' হল প্রতিভা। ভারতীয় রসশাস্ত্রে তার ধারাবাহিকতা রক্ষিত হ'য়েছে। আধুনিক কালে পাস্তেরনাকের নন্দনতাত্ত্বিক ধারণায় তার প্রভাব অসংশয়িত। এ কথা অনস্বীকার্য যে তাঁর "ডাক্তার জিভাগোর" উপাদান এবং জিভাগোর কবিতাগুচ্ছ খ্রীষ্টীয় প্রেরণায় প্রোজ্জ্বল। ইহুদী বংশোদ্ভব এই মহাশিল্পী বললেন: "খৃষ্ট এসেছিলেন আমার কাছে, তাঁকে না পেলে এই যুগের যন্ত্রণা আমি সহ্য করতে পারতাম না।" জীবনচর্যায় যেমন খৃষ্টের প্রেরণা তাঁকে অনুপ্রাণনা জুগিয়েছে, তেমনি শিল্প-এষণায়ও সেই মহৎ প্রতীতি তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছে নতুন নতুন সার্থক সৃষ্টিতে। জীবন হ'ল শিল্পের প্রতিষ্ঠাভূমি। তাই জীবনচর্যায় যে মন্ত্র শক্তি দেয় সেই মন্ত্রই শিল্পকেও উজ্জীবিত করে। পাস্তেরনাকের জীবনে ও ও মননে খ্রীষ্টতত্ত্ব যে সঞ্জীবনী শক্তির প্রবাহকে উৎসারিত ক'রে দিয়েছিল তা-ই অলৌকিক তত্ত্বরূপে নন্দনতত্ত্ব পর্যালোচনার পটভূমিতে প্রতিভাসিত হ'ল। শিল্পের 'অলৌকিক উৎস' তত্ত্বে তিনি এতই গভীরভাবে বিশ্বাস করেছিলেন যে তিনি তাঁর কাব্যকে কোন গোষ্ঠীভুক্ত করে 'কিউবিষ্ট' বা 'ফিউচারিষ্ট' কবিগোষ্ঠীর একজনা হ'তে চাননি। ইংরেজী ভাষায় অনূদিত 'safe conduct' শীর্ষক আত্মজীবনীতে জীবন রসায়নের স্বাদটুকু হারিয়ে ফেলে একে একে তাঁরা যখন আত্মঘাতী হ'লেন তখন দেখি পাস্তেরনাক তাঁর বলিষ্ঠ বিশ্বাসটুকুকে সম্বল ক'রে একক সংগ্রামে কালজয়ী হ'তে চলেছেন। যে বিশ্বাসের বলিষ্ঠতা তাঁকে এক দুর্দম জীবনবাদে বলিষ্ঠ করে তুলেছিল তা তাঁকে দিয়েছিল এক অনমনীয় আশাবাদ তাঁর শিল্প-দর্শনে। তিনি লিখলেন:

> 'আমাকে বাঁচাবার জন্য আমার পিতা
> পারতেন না কি অক্ষৌহিণী বাহিনী পাঠাতে?
> তা'হলে কার সাধ্য আমার কেশস্পর্শ করে!
> ছত্রখান হতো শত্রুরা, কোন চিহ্ন থাকতো না।
> কিন্তু জীবনগ্রন্থ সেই পাতাটিতে পৌছালো
> যেখানে আছে পুণ্যের পূর্ণতা।
> সেই লিপিকে হ'তেই হ'বে সার্থক,
> তবে তাই হোক। আমেন।' (পথ যেখানে)

এমনিধারা অলৌকিক প্রতিভানের (Intuition) মধ্য দিয়ে সমগ্র শিল্পকর্মটি শিল্পীর মানসলোকে আবির্ভূত হয়। সে আবির্ভাবের কোন

প্রয়োজন নেই; সকল প্রয়োজন-উত্তর সেই আবির্ভাব। পাস্তেরনাকের শিল্পদর্শন এই প্রয়োজনকে উত্তীর্ণ হয়েছে অনায়াসে। তাঁর ভাবনায় জারিত খ্রীষ্টতত্ত্বেও তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন এই প্রয়োজনকে উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ার ঘটনাটুকু। জৈব প্রয়োজনে যে প্রাণের সৃষ্টি হয় সে প্রাণ অপ্রয়োজনের প্রয়োজন নয়। খৃষ্টের আবির্ভাব পাস্তেরনাকের চোখে একদিকে যেমন মুষার বিধানকে অস্বীকার করেছে তেমনি তা তার প্রকৃতির বিধানেরও বিরুদ্ধে। খৃষ্টের জন্ম সম্ভব হয়েছিল অলৌকিক উপায় এবং প্রেরণার দ্বারা। পাস্তেরনাক জীবনের মূলে যেমন বাধ্যতাকে অস্বীকার করলেন ঠিক তেমনি করে শিল্পোৎসবের মূলেও এই প্রয়োজনকে অস্বীকার করলেন। তাঁর প্রেরণাতত্ত্ব আমাদের দিয়েছে সাধারণের বদলে অসাধারণকে, প্রাত্যহিকের বদলে উৎসবকে। তবে এ কথা অনস্বীকার্য যে তাঁর শিল্প-Reality অনুসারে তিনি তাঁর ইউরি চরিত্রের মাধ্যমে বললেন: "আর একটা ব্যাপার নিয়ে সম্প্রতি আমি ভাবছি খুব যে হ'ল জীব জগতে অনুকৃতি, যাকে বলে 'Mimesis'। পারিপার্শ্বিকের বর্ণের সঙ্গে জীবজন্তু কী করে তাদের বহিরাবয়বকে মিলিয়ে নেয়, এই অনুকরণের তত্ত্ব আমাকে মুগ্ধ করে। অন্তর ও বহির্জগতের সম্বন্ধের উপর আশ্চর্য আলো ফেলে এই অনুকরণ—আমার তাই ধারণা।" পাস্তেরনাকের Mimesis, Aristotle এর Mimesis নয়। তাঁর মহত্তর শিল্প প্রেরণায় এই Mimesis অবান্তর। শিল্পকে যদি প্রেরণালব্ধ সম্পদ বলে মনে করি তাহলে Mimesis তত্ত্ব সেই পরিপ্রেক্ষিতে অবান্তর হয়ে পড়ে। পাস্তেরনাকের মানসপুত্র ইউরি সম্বন্ধে তিনি বলছেন: "এরকম মুহূর্তে ইউরির মনে হয় যে তার সৃষ্টির প্রধান অঙ্গটা সম্পন্ন হচ্ছে তার দ্বারা নয়, তার ঊর্ধ্বতন অন্য কোন শক্তি কর্তৃক, সেই শক্তি তার নিয়ন্তা, সেই মুহূর্তে জগতের চিন্তা ও কবিতা বলতে যা বোঝায়, আর ভবিষ্যতে যা কিছু বোঝাবে সবই সেই শক্তি ছাড়া আর কিছু নয়।" ইউরি যখন কবিতা লেখে তখন সেই সৃষ্টি প্রক্রিয়াটিকে যেভাবে পাস্তেরনাক বর্ণনা করেছেন তা উদ্ধৃত করে দিলে শিল্পী সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্যটি পরিস্ফুট হয়ে উঠবে: "দুটি তিনটি স্তবক রচনা করলে যে, তার কয়েকটি চিত্রকল্প তাকেই বিস্মিত করে দিল। এবার আবেশের মত হয়ে উঠলো তার কাজ, সে অনুভব করলো তার আবির্ভাব, লোকে যাকে বলে প্রেরণা। যে সব ক্ষমতায় অনুবন্ধের ধারা শিল্পী-নিয়ন্ত্রিত এ রকম মুহূর্তে তার সংস্থান উল্টে যায়—মাথার উপর দাঁড়িয়ে যায় যেন, তখন তার কর্তৃত্ব থাকে

না শিল্পীর, তাঁর প্রকাশোন্মুখ মানসিক অবস্থারও না; সব দখল করে নেয় ভাষা, যা তাঁর আত্মপ্রকাশের উপায়।" প্রসংগান্তরে পাস্তেরনাক ইউরির 'সন্ত জর্জ ও ড্রাগনের' কিংবদন্তিটি লেখার ইতিবৃত্ত লিখেছেন। ইউরি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছে ছন্দ নিয়ে, যতিপাত নিয়ে। তিনমাত্রা স্বল্প পরিসরে ঘাঁটো-ঘাঁটো হয়ে কথাগুলো বসালো ইউরি; তার উৎসাহ ও উত্তেজনার অন্ত নেই। পংক্তি ভরাতে সঠিক শব্দে চলে এলো পরপর, সেই ছন্দের প্ররোচনায়। যা উক্ত হ'লো না তাও সংকেতে বলা হয়ে গেল। যেমন শপ্যাঁর কোন ব্যালাদ-গীতিকায় ঘোড়ার পায়ের শব্দ শোনা যায়—তেমনি ইউরিও যেন অশ্বক্ষুরধ্বনি শুনতে পেলেন। পাস্তেরনাক ইউরির কাব্যসৃষ্টি চিত্রকল্পটিতে যে রঙের তুলি বুলিয়েছেন সে রঙ আহৃত হয়েছে তাঁর নন্দনতাত্ত্বিক ধারণা থেকে। তাঁর কাছে রূপ পরিগ্রহের আনন্দটুকুই হ'ল সৌন্দর্য এবং শিল্প এই সুন্দরের সেবা করে। শিল্পীর প্রেরণায় যে রূপ সৃষ্টি হয় সেই রূপ সৃষ্টিই হ'ল অনন্ত আনন্দের আধার। শিল্পের জগতে যেমন রূপ মুখ্য তেমনি এই রূপই হ'ল প্রাণীজীবনের মূলসূত্র। পাস্তেরনাক বললেন যে এই রূপটুকু ছাড়া কোন প্রাণীর ভিন্ন অস্তিত্ব থাকতে পারে না। অতএব প্রাণলোকে ও শিল্পলোকে এই অস্তিত্বের আনন্দটুকুই পরম কাব্য। শিল্পরসে এই আনন্দ উদ্ভাসিত; জীবনচর্যারও তার প্রসাদ। অদ্বৈতবাদী নন্দনতাত্ত্বিক পাস্তেরনাক শিল্পানন্দকে 'ব্রহ্মাস্বাদ সহোদর' বলেননি সত্য কিন্তু তাঁর নন্দনতাত্ত্বিক ধারণায় এমন ইঙ্গিতের অপ্রতুলতা নেই যা থেকে আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি যে তিনি শিল্পানন্দকে অপার্থিব মহিমায় মহিমান্বিত বলে ভেবেছেন।

রঁমা রঁলার শিল্পদর্শন

শিল্পদর্শনের ইতিহাসে সে কয়জন মনীষীর স্বাতন্ত্র্য স্বীকৃত হয়েছে চিন্তায় এবং সুউচ্চ ব্যঞ্জনায়, তাঁদের মধ্যে রঁমা রঁলাকে নিশ্চয়ই আমরা অগ্রণী বলে ভাবতে পারি। তাঁর শিল্প ধারণা একদিকে যেমন শিল্পীর স্বাধীনতার ধারণাকে আশ্রয় করেছে অন্যদিকে তেমনি তা তার সত্যের ধারণা থেকেও বিচ্যুত নয়। শিল্পসৃষ্টিতে শিল্পী সর্ব বন্ধন বিমুক্ত হবে; এই বন্ধন বিমুক্তির মধ্যে কিন্ত সত্যের নির্দেশনা ওতপ্রোতভাবে অনুস্যূত। এটা ভাববার কথা যে শিল্পে শিল্পীর সার্বভৌম স্বাধীনতার মধ্যে কিভাবে আমরা সত্যের নির্দেশনাগুলিকে স্থান দিতে পারি। সত্যনিষ্ঠ হয়েও শিল্প কী আপন সার্বভৌম স্বাধীনতাটুকুকে অক্ষুণ্ণ রাখতে পারে? এই প্রশ্নটা হ'ল নন্দনতত্ত্বের অন্যতম দুরূহ প্রশ্ন। প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে যে, শিল্পের স্বাধীনতা হ'ল হৃদয়ের স্বাধীনতা, অনুভূতির স্বাধীনতা, অনুভবের স্বাধীনতা; তার সঙ্গেই সম্মিলিত করতে হবে চিন্তার স্বাধীনতাকে; তা হল বুদ্ধিগত। সত্যের ধারণা এই বুদ্ধিগত স্বাধীনতার উপজীব্য, বুদ্ধিগত স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ণ করে সত্যের ধারণা। উদাহরণ দিই—আমি বলতে পারি না যে, টেবিলের পাঁচটা পা আছে। আমার কল্পনা এখানে আমার বুদ্ধিগত ধারণাকে অতিক্রম করতে পারে না; করলে সত্যের অপলাপ করা হবে। এই যে বস্তুগত সত্যের ধারণা একে আমরা প্রাকৃত সত্য বলে জানি। এই সত্য কাব্যসত্য নয়। প্রথম জীবনে রঁলা ভেবেছিলেন যে এই প্রাকৃত সত্যকে শিল্পে প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং এই সত্যের প্রতিষ্ঠা ছাড়া শিল্পীর অন্য বিশেষ কোন মর্যাদা নেই। তিনি বলেছিলেন, 'If art has to dabble with falsity, I say good bye to all arts.' অর্থাৎ শিল্পী যদি মিথ্যার বেসাতি করে তবে সেই শিল্প তাঁর কাছে সর্বথা পরিত্যজ্য।

এই বুদ্ধিগত সত্যের ধারণা এবং হৃদয়গত সত্যের ধারণা—এদুয়ের সমন্বয়ই রঁলা ঘটাতে চেয়েছেন শিল্পবৃত্তে। শিল্প বলতে, বুদ্ধিগত সত্য বলতে আমরা বস্তুবাদ বা প্রাকৃত সত্যকে বুঝি একথা আগেই বলেছি; আর হৃদয়গত ব্যাপার। এ দুয়ের সম্মিলন ঘটিয়েছেন রঁলা শিল্পের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে। এই সময়ে রঁলা উত্তরকালের পরিণত রঁলা। প্রথম জীবনে তলস্তয়ের প্রভাবপুষ্ট যে রঁলাকে আমরা দেখি, এ রঁলা সে রঁলা নয়। প্রথম জীবনে রঁলার কাছে, তরুণ চিন্তাবিদ রঁলার কাছে বস্তুগত সত্যটাই, প্রাকৃত সত্যটাই বড়

হয়ে উঠেছিল। তিনি তখন সামাজিক কল্যাণকে তাঁর নন্দনতত্ত্বে সবচেয়ে বড় স্থান দিয়েছিলেন। তখন তাঁর মত ছিল, যে শিল্প সমাজের কল্যাণ সাধন করে না, তা 'শিল্প' পদবাচ্য নয়। মানুষের কল্যাণ সাধনই হবে শিল্পের লক্ষ্য। সেই কল্যাণ হ'ল বস্তুগত কল্যাণ। সেই কল্যাণ প্রাকৃত সত্যকে তার পরিপূর্ণ মর্যাদায় স্বীকার করে। তাঁর কথা উদ্ধৃত করে দিই—"I dream of nothing more than to do a litlle good to men and draw them away from the nothingness that kills them." জীবনের এই শূন্যতা ভরিয়ে তুলতে পারে একমাত্র আমাদের সত্যের প্রতি নিষ্ঠা। সত্য-নিষ্ঠাই হল প্রথম পর্যায়ের রঁমা রঁলার নন্দনতত্ত্বের ভিত্তিভূমি। অবশ্য পরিণত রঁলার চোখে এই সত্যের ধারণার রূপ বদল ঘটেছিল। এবার সেকথা বলি।

শিল্পের ক্ষেত্রে Apollonian ও Dionysian এই দ্বিবিধ মুখ্য ধারণাকে তিনি স্বীকার করেছেন। শিল্পে বুদ্ধিগত যে প্রক্রিয়া রয়েছে তাকে রঁলা Apollonian বলেছেন এবং শিল্পের হৃদয়গত উপাদানকে Dionysian আখ্যা দিয়েছেন। নীট্‌শের 'origin of tragedy' গ্রন্থ থেকে রঁলা এই দু'টি শব্দ চয়ন করেছিলেন; তাঁর উপর নীট্‌শের প্রভাবও কম নয়। রঁলা নীট্‌শের উপরি-উক্ত গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন, আমরা তার পুনরুক্তি করছি—"In this book Nietzsche has delineated two types, Apollonian and Dionysian. The former are the disciples of Apollo and stand for pure intellectualism. The latter are the disciples of Dionysians and stand for unbridled emotionalism. The outlook of each on life is sound upto a point. The correct view of life should aim at harmonization of these two attitudes. Apollonian ও Dionysian উপাদানের সমন্বয়ই হ'ল শিল্পসত্তা, একথা রঁলা বললেন অর্থাৎ প্রাকৃত সত্যের সঙ্গে কল্পনার সমন্বয়েই যে নিত্য রূপসৃষ্টি ঘটে সেই রূপই হল শিল্প সত্য। রবীন্দ্রনাথ এই সত্যকে রূপের truth আখ্যা দিয়েছেন। এই রূপের 'truth' বলতে প্রাকৃত সত্যের সঙ্গে কল্পনার যে সমন্বয়টুকু বুঝি তা কিন্তু রঁলার মতে সজ্ঞান মনের ক্রিয়া নয়, চেতন মনের স্বাক্ষর তার উপর পড়ে না। রঁলা বললেন "Such harmonization is always unconscious."—শিল্পাশ্রিত কল্যাণ হ'ল

তাঁর স্বাধীনতার প্রতীক। অর্থাৎ তার সত্যনিষ্ঠা হ'ল প্রাকৃত সত্যের অনুশাসন মেনে চলা অর্থাৎ বস্তুগত সত্যের নির্দেশ মেনে চলা। অবশ্য আমরা যখন এ দুয়ের সমন্বয়কে শিল্প বলি তখন শিল্প কতখানি Dionysian উপাদান এবং কতখানি Apollonian উপাদানের প্রভাবে প্রভাবিত তা নির্ণয় করা প্রায় অসম্ভব বললেই চলে। এ দুয়ের সমন্বয়ে যে রূপ সৃষ্টি হয় তার মধ্যে প্রাকৃত সত্যের আভাস পাওয়া গেলেও তার সুনির্দিষ্ট রূপটুকু শিল্প সত্যের মধ্যে হারিয়ে যায়। এই প্রসঙ্গে আবার আমাদের মনে রাখা দরকার যে প্রাকৃত সত্যের সুনির্দিষ্ট রূপটুকু শিল্পসত্তার মধ্যে তেমন করে প্রতিষ্ঠা না পেলেও যে একেবারে বোঝা যায় না এমন কথাও বলা চলে না। কবি বললেন বটে, 'সেই সত্য যা রচিবে তুমি'—কিন্তু এই সত্য কল্পনাসর্বস্ব নয়। তার মধ্যে কোথাও একটা প্রাকৃত সত্যের নির্দেশনা থাকে। তাই রঁলা বুদ্ধিবৃত্তি এবং হৃদয়বৃত্তির সমন্বয়কে শিল্প আখ্যা দিলেন। সেখানে একদিকে যেমন কল্পনার প্রাধান্য নেই অন্যদিকে তা আবার একেবারে বুদ্ধিগত ব্যায়াম কৌশলেও পরিণত হয়নি। তাঁর কথায় বলি, 'If artists thus indulge in intellectual acrobatics in the name of art, I am sure art will die a natural death.' শুধুমাত্র বিদ্যাবুদ্ধির উল্লম্ফনে যে শিল্প সৃষ্টি হয় না সে কথা রঁলা বেশ জোরের সঙ্গেই বললেন। যদি শিল্প শুধুমাত্র বুদ্ধিগত ব্যাপারে পর্যবসিত হয় তাহলে তা সর্বত্রগামী হবে না। রঁলার কথায় 'It will live for the coterie of the vain group.'

অতএব শিল্পকে তার এই সীমিত-অতি-পরিশীলিত সমঝদার গোষ্ঠীর হাত থেকে বাঁচাবার জন্য রঁলা যথার্থ শিল্পরসিকদের আহ্বান করেছেন; 'সহৃদয় হৃদয়সংবাদী' মানুষের এই বুদ্ধি ও হৃদয়বৃত্তিকে সমন্বিত করে শিল্পের রসটুকু গ্রহণ করতে পারেন। তার জন্য রঁলার নির্দেশনা রয়েছে। তিনি মাইকেল এঞ্জেলো কৃত 'Last Judgement' নামক বিখ্যাত ছবিটির যে নন্দনতাত্ত্বিক মূল্যায়ন করেছেন তা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। শিল্পীর বুদ্ধি এবং স্পন্দনজাত হৃদয়বৃত্তির সমন্বয়ে যে শিল্পের সৃষ্টি হয় তার যথাযথ বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন যে অতি সুকঠিন কাজ তা রঁলা সবিনয়ে স্বীকার করেছেন: "It is dangerous to attempt to describe the last judgement, it is indeed impossible. Analysis and commentaries have been multiplied, but they kill the spirit by taking it in detail.

We must face the vision squarely and lose ourselves in the abyss of the spirit." অর্থাৎ প্রকৃত সত্যের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ এবং চিত্র, সত্যে তার আরোপ, এ সব শিল্পের পক্ষে 'অহ বাহ্য'। বস্তসত্য চিত্রসত্তার যে রূপসৃষ্টি করেছে তার সীমাহীন আত্মার মধ্যে অবগাহন করাই হল শিল্পের যথার্থ রসাস্বাদন। অর্থাৎ রঁলা একথা বলতে চাইলেন যে বস্তসত্য ও প্রাকৃত সত্য এবং শিল্পীর কল্পনা, এরা মিলে যে শিল্প সত্তা সৃষ্টি করে তা প্রাকৃত সত্য থেকেও একদিকে যেমন ভিন্ন, অন্তদিকে তেমনি আবার একান্তভাবে শিল্পীর কল্পিত সত্যও নয়। ভাবান্তরে বলা যায়, রঁলার মতে শিল্পের সত্তা হ'ল প্রাকৃত সত্য থেকে উত্তীর্ণ শিল্পীর কল্পনায় অনির্ভর আরেক ধরনের সত্তা; এই ধরনের সত্তা শুধুমাত্র শিল্পীর কল্পনা প্রসূত নয়। এই সত্তা আবার জীবনের প্রাকৃত সত্তাতেও নেই। শিল্পসত্তার মধ্যে কল্পনার লীলা রয়েছে, একথা রঁলা স্বীকার করেছেন; সহৃদয় সামাজিকের রুচির বিভিন্নতাকে স্বীকার করে রঁলা প্রকৃতপক্ষে শিল্পে কল্পনার কার্যকারিতাকেও পরোক্ষভাবে স্বীকার করেছেন। এই রঁলা হ'ল পরবর্তীযুগের রঁলা। তলস্তয়ের প্রভাবপুষ্ট যে রঁলা পিপলস্ থিয়েটারের কল্পনা করেছিলেন, এ রঁলা সে রঁলা নয়। প্রথম যুগের রঁলা শিল্পের সত্যকে, শিল্পের সত্তাকে 'বহুজন সুখায় বহুজন হিতায়' উৎসর্গ করতে চেয়েছিলেন। জনগণের কল্যাণকামী রঁলা জনগণের বেদীমূলে শিল্পের উৎকর্ষকে উৎসর্গীকৃত করতেও দ্বিধান্বিত হন নি। তাঁর শিল্প তখন শুধু জীবনের দিশারী। সেক্সপীয়র ও হ্বাগ্‌নারকে তাঁর মানসলোক থেকে নির্বাসন দিতেও তিনি বিন্দুমাত্র ইতঃস্তত করেননি এই যুগে। এই তরুণ রঁলার চোখে সামাজিক কল্যাণ অর্থাৎ জীবনের প্রাকৃত সত্যটা বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল। তিনি বললেন, 'Peoples' Theatre should represent the fundamental problems of life in simple and intelligent manner." অর্থাৎ জীবনের সমস্তাসংকুল প্রাকৃত সত্যটা রঁলার চোখে বড় হয়ে উঠল। এই রঁলা অপরিণত রঁলা। তিনি তাঁর 'পিপলস্ থিয়েটার' শীর্ষক গ্রন্থে লিখলেন, "What profit can the people derive from the abnormal. Sentimental complication of wagner the excessive eroticism the physics of valhalla, Tristians death scented love, the mystico carnal torment of the knight of the holy grail." শিল্পীর উদ্দাম কল্পনায় যে সব মহতী শিল্পসৃষ্টি হয়েছিল, পৃথিবীর শিল্প এবং

সাহিত্য জুড়ে, তাদের যে মূল্যায়ন তরুণ রল াঁর হাতে ঘটল সেই মূল্যায়ন প্রবুদ্ধ র ঁলা, প্রাজ্ঞ র ঁলা উত্তরকালে বরদাস্ত করেন নি। শিল্পীকে শিল্পরসিককে তরুণ র ঁলা যেভাবে সাধারণ মানুষের কল্যাণকর্মে আত্মনিয়োগ করতে বললেন এবং যে অর্থে তিনি শিল্পকে সমাজকল্যাণের দাসত্ব করার নির্দেশ দিলেন সেই অর্থ টুকু কিন্তু র ঁলার নন্দনতত্ত্বে দীর্ঘকাল প্রতিষ্ঠা পায়নি। উত্তরকালের র ঁলা, পরিণত মানসিকতার উত্তরাধিকারী র ঁলা শিল্পীদের ডাক দিয়ে বলেছিলেন যে তাদের 'Nepoleons of public taste' হতে হবে। অর্থাৎ জনতার রুচি সৃষ্টি করার ভার তাদের গ্রহণ করতে হবে। জনতার কল্যাণের উদ্দেশ্যে শিল্পকে জনতার রুচির অনুগামী হতে যে নির্দেশ তরুণ র ঁলা দিয়েছিলেন, একথা কিন্তু তার বিপরীতধর্মী। তিনি বললেন, "The people should follow and try to understand the artist. It was the artist's business to lead the public but not the public the artist." অর্থাৎ শিল্পী সাধারণ মানুষের প্রাকৃত প্রয়োজনকে একদিকে যেমন স্বীকার করছে না, অন্যদিকে আবার তা জীবনের প্রাকৃত সত্যকেও অস্বীকার করছে। র ঁলা তাই বললেন যে, রেনেসাঁ যুগের চিত্রকরদের মত শিল্পীকে শুধুমাত্র প্রকাশধর্মী হতে হবে। ছবি আঁকা, গান বাঁধা—এসব প্রকাশকর্ম, শিল্পীর আবেগকে প্রকাশ করাই হ'ল যথার্থ শিল্পসাধনা। প্রাকৃত সত্যের অনুকৃতি সাধন অথবা সামাজিক বহুর কল্যাণ চেষ্টা, এই দুয়ের কোনটাই শিল্পের কাজ নয়, শিল্পীর লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যও নয়। প্রথম জীবনে যে র ঁলা তাঁর শিল্প ধারণার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে একথা বললেন যে শিল্পী যেন তাঁর সমকালীন মানুষদের প্রয়োজনের কথা স্মরণ রাখে, সেই ধারণার কথা পরিণত র ঁলার মুখে আর শুনিনি।

শিল্পে কল্পনার স্থানকে আপন সীমার মধ্যে প্রতিষ্ঠা করলেও র ঁলা এক অর্থে বের্গসঁ কথিত Elan vital অর্থাৎ 'প্রাণবন্যার' ধারণাকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাঁর শিল্প ধারণার ভিত্তিভূমিতে। জীবনে নৈতিক, আত্মিক এবং নন্দনতাত্ত্বিক প্রকাশে তিনি এই অস্থির সর্বগ্রাসী প্রাণবন্যাকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। আমরা যা কিছু করি, যা কিছু ভাবি, যা কিছুর অনুধ্যান করি তার মধ্যেই এই প্রাণবন্যার সঞ্জীবনী শক্তি কাজ করবে এই প্রত্যাশা র ঁলার ছিল। এই প্রত্যাশাই তাঁর চোখে শিল্পকে চলমানতা এবং গতি সমন্বিত করে তুলেছিল; শিল্পে এই চলমানতার ধারণা শিল্প ঐতিহ্যের পরিপন্থী। সৃষ্টির নতুন নতুন ক্ষেত্রে এক অঙ্গন থেকে আরেক আঙিনায় শিল্পীকে নিরন্তর বিচরণ

করতেই হবে, তবেই না নিত্য নতুন সৃষ্টির ফুল ফুটবে শিল্পের নন্দনকাননে। যে শিল্পীর মধ্যে এই চলমানতা নেই রঁল্যার চোখে সেই শিল্পী রুগ্ন, অশক্ত। এই অশক্ত শিল্পীর শিল্পকর্মে শিল্পের আনন্দটুকুর অসদ্ভাব ঘটে। যেখানে প্রাণশক্তির অভাব সেই লোক থেকে আনন্দ নিত্য নির্বাসিত। তাই তো রঁল্যা Goethe-এর কথা উদ্ধৃত করে বললেন 'If the poet is ill ; let him first of all cure himself ; when he is cured let him write.' শিল্পে এই ধারণা হয়ত অনেকের কাছে সম্যক রূপে গ্রহণযোগ্য বিবেচিত নাও হতে পারে। মানুষের অসুস্থ মানসিকতা বা morbidity-কে আশ্রয় করেও সার্থক শিল্প সৃষ্টি হতে পারে। ফ্লবেয়ারের 'মাদাম বোভারি' এমনি একটি শিল্পকর্ম যার মধ্যে অসুস্থ মানসিকতার সার্থক রূপায়ণ ঘটেছে। জরারোগে জীর্ণ সুইফ্‌ট, ক্ষয় রোগাক্রান্ত কীটস্‌ অসুস্থ মানসিকতার প্রতিমূর্তি ষ্ট্রিণ্ডবার্গ—এঁরা সবাই রঁল্যাকথিত শিল্পে সজীবতাতত্ত্বের প্রমূর্ত প্রতিবাদ বিগ্রহ। ভিন্নতর দৃষ্টিকোণ থেকে রঁল্যার শিল্পে প্রাণবত্তাতত্ত্বের সমালোচনা করা সম্ভবপর হলেও একথা অস্বীকার করে লাভ নেই যে শিল্পে এই প্রাণবত্তাতত্ত্ব (Elan vital) কে গ্রহণ করলে আমরা সহজেই শিল্পের বিচিত্রধর্মী বহুমুখী প্রকাশকে ব্যাখ্যা করতে পারি। রঁল্যা এই ধরনের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সঙ্গীতের উল্লেখ করেছেন। দেশে দেশে সঙ্গীতের বিচিত্র প্রকাশভঙ্গী রঁল্যাকে মোহিত করেছে। স্বগত আনন্দের এই বহু বিচিত্র প্রকাশের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে রঁল্যা বললেন : "In every country music passes through several stages. The difference observed at any particular time may possibly be due to a differences to a particular stage of difference. Music has its childhood, growth and decay. The first song of emotion finds expression through a form which is scarcely adequate. Then comes a perfect harmony between emotion and external form and finally a certain formalisation, a stereotyping and decay. If life continues, a new overflow and a new cycle begins again." রঁল্যা সঙ্গীতের মত নিরাবয়বী অমূর্ত শিল্প রূপের মধ্যেও সেই প্রাণবত্তার লীলা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। এই প্রাণবত্তা, স্বাস্থ্য-সম্পদের প্রাচুর্য শিল্পকে উজ্জীবিত করতে থাকে। শিল্প হ'ল নিরাময়তার প্রতীক। শিল্প প্রাণশক্তিকে উজ্জীবিত করে। শিল্প মানুষের

সম্যক জীবনদর্শনের প্রতিচ্ছায়া ; একটি জীবনের সম্পূর্ণতা তাই শিল্পে বিধৃত হয়। এই সামগ্রিকতার মধ্যে জীবনের দুর্বারতা, তার রুক্ষ উত্থানপতন, তার আনন্দ-বেদনার প্রাকৃত সমারোহ এ সবই রয়েছে। রঁলার কথায়—'The wholeness of life includes its rough visibility; and art reflecting this wholeness necessarily reflects the seamy side of life as well". অর্থাৎ জীবনের রুক্ষ বন্ধুরতা, জীবনের পেলব কোমলতার সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে শিল্পে স্থান পায়, শিল্প গতিময় হয়ে ওঠে। এই শিল্পের গতিময়তা রঁলার চোখে শিল্পীর প্রাণপ্রাচুর্যরূপে প্রতিভাত হয় এবং রঁলা কথিত শিল্পের এই প্রাণপ্রাচুর্য ও বের্গসঁকথিত Elan vital এরা সমধর্মী।

শিল্প বৈচিত্র্যের সঙ্গে রসিকের আনন্দ উপলব্ধির যে একটা আত্যন্তিক সম্পর্ক রয়েছে তাকে ব্যাখ্যা করেছিলেন মহাকবি কালিদাস তাঁর "ভিন্ন রুচির্হিলোকাঃ' তত্ত্বে। এই তত্ত্ব আমাদের আধুনিক মনস্তত্ত্বের তথ্য ও তত্ত্বসম্মত। আমরা যখন শিল্পবস্তুকে দেখি, গান শুনি, কবিতা পড়ি ছবি দেখি তখন তাকে নিজের মনের মুকুরে গড়ে নিই। এই যে শিল্পসৃষ্টি এ একেবারে ব্যক্তিনির্ভর হয়ে ওঠে, এর ফলে একদিকে যেমন শিল্পের সঙ্গে সহৃদয় সামাজিকের সম্বন্ধ নির্ণয় করাটা কঠিন হয়ে পড়ে, তেমনি ধারা অন্যদিকে শিল্পের সার্বিকতাকে ব্যাখ্যা করাও দুরূহ হয়ে পড়ে। মানুষ সামাজিক জীব। তাই আমার সৃষ্টির সঙ্গে রাম, শ্যাম, যদু, মধুর সৃষ্টির একটা যোগ থাকা প্রয়োজন বলে মনে হয়। তা যদি না থাকে তা হলে রাম, শ্যাম, যদু, মধুর শিল্পকার্যকে শিল্প হিসেবে বুঝে উঠতে পারব না। আর তা যদি না বুঝি তা হলে শিল্প সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। শিল্প বিচিত্রগামী হলেও সর্বত্রগামী হবে না। রঁলা বললেন যে শিল্প জীবনের সামগ্রিকতাকে প্রতিফলিত করে। তাই শিল্পের মধ্যে আলোর দিকটা যেমন প্রতিফলিত হয়, তেমনি ধারা অন্ধকারের ছায়াপাতও ঘটে শিল্পের মুকুরে। আনন্দে উদ্বেল, উত্তাল হৃদয় সমুদ্রের ও তার সঙ্গে সঙ্গে কঠিনতম, কঠোরতম দুঃখের অতলান্ত সমুদ্রতলের স্পর্শ এসে লাগে শিল্পের রূপে ও রঙে। তবে চলমান জীবনের ক্ষণিকতা যখন শিল্পের উপজীব্য হয়ে ওঠে তখন তা ক্ষণিক এবং নশ্বর হয়ে থাকে না। শিল্পের একটা কালজয়ী সার্বিক সত্তা আছে, একথা রঁলা বললেন আর সেই সত্তার জন্যই হয়তো হোমার, কালিদাস, পিকাসো

মৃত্যুকে জয় করেছেন। কালিদাসের সমকালীন জীবনের ছবি সমাজ থেকে মুছে গেলেও শিল্পে তা অবিনশ্বর হয়ে রইল। সমকালীন জীবনের ছবি, জগতের ছবি কালের চিত্রপট থেকে মুছে গেলেও শিল্পের ছবি আজও গৌড়জনকে আনন্দ দান করছে। রঁলার কথা উদ্ধৃত করে দিই,—"The highest art, the only art which is worthy of the name, is above the temporary loss, it is a comet sweeping through the infinite. It may be that its force is useful it may be that it is apparently useless and dangerous in the existing order of the work-a-day world for it is false, it is movement and fire, it is the lighting darted from heaven; and that for very reason, it is sacred, for that very reason is beneficient. (*John Christopher*. Vol. IV, P. 365).

'জাঁ ক্রিস্তফে' রঁলা সেই সর্বোত্তম শিল্পের কথা বললেন যে শিল্পে সাময়িক এবং সমকালীন রীতিপদ্ধতি আইনকানুন প্রযুক্ত হয় নি। রঁলার এই ধরনের বিশ্বাস ছিল বলেই রঁলা ভারতীয় সংগীতশাস্ত্রের ভাষ্যকার শ্রী দিলীপ কুমার রায়কে পাশ্চাত্য দেশে ভারতীয় সংগীতের প্রচার করতে অনুরোধ করেছিলেন। তিনি দিলীপ বাবুকে বলেছিলেন যে ভাষার বাধা ভারতীয় সংগীতের রসোপলব্ধির পথে পাশ্চত্য দেশের শ্রোতাদের কাছে কোন প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করবে না। স্থান-কালের বাধা শিল্পলোকে বাধা বলে গণ্য হয় না। শিল্পের এই সার্বিক উপাদানের কথা স্মরণ করে রঁলা বারবার বলেছিলেন যে শিল্পের প্রগতিকে সম্ভব করতে হলে আমরা আমাদের শিল্প ঐতিহ্যের প্রতি সশ্রদ্ধ দৃষ্টিপাত করব; অর্থাৎ রঁলা প্রাচীন শিল্পকে নব্য শিল্পের দিশারীরূপে গণ্য করেছেন। রঁলার এক ধরনের প্রাচীন শিল্পে গভীর আস্থা ছিল বলে তিনি রবীন্দ্রনাথকে বলেছিলেন যে, শিল্পসৃষ্টির ও রসোপলব্ধির উপযোগী মানসবলয় সৃষ্টির জন্য শিল্পীর পক্ষে শিল্পবৈরাগ্য একান্তরূপে প্রয়োজনীয়। রবীন্দ্রনাথ রঁলাকে বলেছিলেন যে, ইতালির বিভিন্ন শহর ঘুরে তিনি যে সব শিল্প-কর্ম দেখেছেন তার মধ্যে ফ্লোরেন্সের শিল্পীদের তৈরী শিল্পকর্মে তিনি এই শিল্প বৈরাগ্যটুকু প্রত্যক্ষ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের উক্তির যাথার্থ্য স্বীকার ক'রে ফ্লোরেন্সের শিল্পীদের শিল্প-বৈরাগ্যের তত্ত্বটিকে ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে রঁলা বললেন, 'Lately florentines have been looking back

to their ancestors. This is probably the secret of Florence being a great artistic centre.' অর্থাৎ রঁলা এ কথা আমাদের বোঝাতে চাইলেন যে শিল্পসৃষ্টির ও শিল্পে রসসম্ভোগের উপযোগী মানসিক অবস্থা সৃষ্টি করা হ'লে আমাদের শিল্প ঐতিহ্যকে শ্রদ্ধার সঙ্গে আমাদের সকলকে স্বীকার করতে হবে। অবশ্য রঁলার এই উক্তিটি এই একই প্রসঙ্গে, পূর্বকৃত উক্তিকে খণ্ডন করেছে। রঁলা পূর্বে প্রসঙ্গান্তরে ক্লাসিসিজমের বিরুদ্ধে বলেছিলেন যে ক্লাসিক্স জীবন থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে; ক্লাসিকসের অচলায়তন শিল্পের প্রগতিকে ব্যাহত করে শিল্পের স্বতঃস্ফূর্ত সৃষ্টির প্রেরণা ক্লাসিক্সের অচলায়তনে ধাক্কা খায়, ব্যাহত হয়ে পিছু হটতে শুরু করে, আবার কোথাও কোথাও বা তা থেমে যায়। এমনি ক'রে ক্লাসিক্সের প্রতিবন্ধকতায় শিল্পের প্রেরণা কোথাও কোথাও স্তব্ধ হয়ে যায়। এখানে রঁলা ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে বলেছেন। আমরা পূর্বেই বলেছি যে রঁলার শিল্পদর্শনের মধ্যে এক ধরনের অসঙ্গতি রয়ে গেছে। পূর্ব যুগের রঁলা, অর্থাৎ তলস্তয়ের প্রভাবপুষ্ট রঁলা এবং তলস্তয়ের পরবর্তী যুগের তলস্তয়ের প্রভাবমুক্ত রঁলা—এ দুয়ের মধ্যে এক ধরনের অসঙ্গতি লক্ষ্য করা যায়। শিল্পের ধারাবাহিক ঐতিহ্য বা ক্লাসিসিজম্—এই প্রসঙ্গেও রঁলার বক্তব্য দ্বিধারায় প্রবাহিত হয়েছে। অবশ্য এ দু'টি ভিন্ন মুখী ধারায় রঁলার বক্তব্য বিভক্ত হলেও আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে রঁলা ক্লাসিকস্‌কে আশ্রয় করার দিকেই শেষ পর্যন্ত ঝুঁকেছেন। তাঁর রায়টা সেদিকেই গেছে। ক্লাসিকস্ বা মহাকাব্যের বিরাট ক্যানভাসে ধর্ম, দর্শন, নীতি ও শিল্পৈশ্বর্যের প্রস্রবণ উৎসারিত হয়। তাইতো, মহাকাব্যের রসধারায় সকলেই স্নান ও পান করে ধন্য হয়। এই যে, মানুষের সার্বিক রস পরিতৃপ্তির একটা সম্ভাবনা মহাকাব্যের পরিসরের মধ্যে লুকায়িত রয়েছে, এর ফলে রঁলা ক্লাসিকস্‌কে গ্রহণ করেছিলেন চারুশিল্পের প্রকৃষ্ট নিদর্শন হিসেবে। তাঁর কথায়: "But a great creation in earth must contain in its rich granery elements enough, wherewith to satisfy the spiritual hunger of all—why should you have a great artist suffer, dream and create for just a few initiates." শিল্পে সার্বিকতাকে স্বীকার করেন রঁলা; এই সশ্রদ্ধ স্বীকৃতিকে—তাঁর নন্দনতত্ত্বের অন্যতম প্রধান স্তম্ভরূপে আমরা গ্রহণ করেছি। তাইতো শিল্প ও সমাজের মধ্যে তিনি এক ধরনের ঐকান্তিক সম্পর্ক স্বীকার করেছেন।

শিল্পীর কাছে সমাজ অবশ্য স্বীকার্য। এই তত্ত্বের অবতারণা ক'রে শিল্পীকে কায়িক পরিশ্রমের মর্যাদা ও মূল্য স্বীকার করার জন্য রঁলা শিল্পীদের আহ্বান জানিয়েছেন। শিল্পী অলস হবে, কায়িক পরিশ্রম করবে না, এ কথা রঁলা ভাবতেই পারেন না। তিনি তলস্তয়কে একটি বিখ্যাত পত্র লিখেছিলেন; এই প্রসঙ্গে তার উত্তরে তলস্তয় তাঁকে লিখলেন, "True science and true art have always existed and will always exist just as other form of human activities and it is impossible and needless either to doubt or to prove it." অর্থাৎ তলস্তয় বলেছেন যে, অন্যান্য কাজকর্মের মতই শিল্পকর্ম ও কর্ম রূপে পরিগণিত হবে। অর্থাৎ যিনি শিল্পী তিনি অন্য কোন কাজ করবেন না, একথা রঁলারের পক্ষে গ্রহণযোগ্য নয়। এই প্রসঙ্গে তলস্তয়, রঁলা এবং বঙ্কিমচন্দ্র সমানধর্মী। বঙ্কিমচন্দ্রের বিখ্যাত উক্তি: 'যে রাঁধে সে চুলও বাঁধে'—রঁলা কথিত তত্ত্বকেই সমর্থন জানাচ্ছে। যে শিল্পী, সে জীবনধারণের উপযোগী অন্যান্য কাজে আত্মনিয়োগ করবে না এমন কথা বললে মিথ্যা শিল্প আদর্শকে প্রশ্রয় দেওয়া হবে। শিল্পের সঙ্গে কায়িক পরিশ্রমের এই ঐকান্তিক সম্পর্কটুকু স্বীকার করে রঁলা বলেছিলেন যে, শিল্পীর কাজ হবে সমাজের কল্যাণ সাধন করা। এই কল্যাণের মধ্যে রঁলার সর্ব মানবিকতাবাদের অন্তরশায়ী প্রেমের ধারণাটুকু অনুস্যূত। এই সর্ব মানবিক প্রেমের ধারণা রঁলা গ্রহণ করেছিলেন তলস্তয়ের কাছ থেকে। তিনি বললেন যে, সামাজিক ঐক্যই হ'ল কল্যাণের চরম প্রকাশ; আর সেই কল্যাণকেই তিনি সুন্দর আখ্যা দিয়েছেন। তিনি যখন পিপলস থিয়েটারের পরিকল্পনা করেছিলেন সেই যুগের নন্দনতত্ত্বে তিনি সামাজিক ঐক্য, সামাজিক কল্যাণ এবং সুন্দরকে সমার্থক বলে গ্রহণ করেছেন। তাঁর মতে অনৈক্যই হল কুৎসিত, অনৈক্যই অকল্যাণ; রঁলার এই ঐক্যের ধারণাকে রবীন্দ্রনাথের 'সুমিতিবোধ' এবং 'ছন্দের' ধারণার সঙ্গে আমরা তুলনা করতে পারি। শিল্পদর্শনের coherence theory বা সমন্বয়বাদকে রঁলা কথিত ঐক্যের পটভূমিতে বোঝবার চেষ্টা করতে পারি। এ কথা বললে হয়তো অত্যুক্তি হবে না যে রঁলা তাঁর শিল্পদর্শনে coherence theory বা শিল্পের সমন্বয়ের রূপটুকুকেই সবচেয়ে বড় স্থান দিয়েছেন।

শিল্প যখন সমগ্রতাকে আপনার প্রকাশের উপজীব্য রূপে গ্রহণ করবে তখন আমরা শিল্পকে নৈতিক, এবং শিল্পকে কল্পনাপ্রসূতও বলতে পারি; রঁলা তা

বলেছেনও। শিল্পের এই সার্বিক সামাজিক রূপকে যথাযথরূপে বিশ্লেষণ করতে হলে মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে এর বিচার অত্যাবশ্যক হয়ে ওঠে। রঁলা এই ধরনের বিচার করেছেন। রঁলার মতে শিল্পের সার্থক প্রকাশ আনন্দের মাধ্যমে হলেও দুঃখ এবং আনন্দের মধ্যে খুব বড় একটা প্রভেদ তিনি লক্ষ্য করেন নি। দুঃখের অশ্রু থেকে আনন্দাশ্রুর ভেদটা তাঁর চোখে কোথাও বড় হয়ে ওঠে নি। এই প্রসঙ্গে তিনি বিটোফেনের গভীর দুঃখবোধের কথা উল্লেখ করেছেন; তিনি বিটোফেনের মধ্যে এক ধরনের জীবন ও মৃত্যুর সংগ্রামকে প্রত্যক্ষ করেছেন। সেই সংগ্রাম চলেছিল বিটোফেনের অহমিকা বোধের সঙ্গে তাঁর বাইরের জগতের। একে অপরকে প্রভাবিত করতে চেয়েছে, একে অপরের ওপর জয়কে সম্পূর্ণ করতে চেয়েছিল। রঁলার মতে এই 'আমি' ব্যক্তিত্বের সঙ্গে বহির্বিশ্বের যে যুদ্ধ নিরন্তর চলেছিল বিটোফেনের অন্তরে, সেই সংগ্রাম হ'ল আত্মোপলব্ধির সাধনা। রঁলা বিটোফেনের উপর ১৯২৯ সালে প্রকাশিত তাঁর নূতন গ্রন্থে বললেন যে, বিটোফেনের সংগীত সাধনা যোগসাধনার নামান্তর। যোগসাধনায় মানুষ তার ব্যক্তিস্বার্থের ক্ষুদ্র গণ্ডীকে অতিক্রম ক'রে তার বৃহৎ আমিটার স্থিতিটুকু চায়। তার বিশ্বরূপ দর্শন ঘটে। এই বিশ্বরূপ দর্শনের মধ্যেই তাঁর চিত্তের স্বাধীনতাটুকু লুকিয়ে থাকে। এই অলিম্পীয় উচ্চতায় উঠতে পারলে তবেই মানুষ শিল্পীজনোচিত শিল্পবৈরাগ্যটুকু শিল্পরূপ যোগ সাধনার মাধ্যমে পায়। শিল্পসাধনা এবং যোগসাধনা আমাদের মনের অভিসারকে একই লক্ষ্য মাত্রায় পৌঁছে দেয়। রঁলা বললেন যে, সাহিত্যে আত্ম অনুভূতিকে আত্মস্বতন্ত্র রূপে প্রত্যক্ষ করাই যদি শিল্প হয়, তাহলে এই আত্মবিচ্যুতিই (self-detachment) হল যোগের গোড়ার কথা, একে যোগজ নৈর্ব্যক্তিকতা বলা হয়েছে। আমরা যখন যোগমার্গের সাধনায় এই নৈর্ব্যক্তিকতাকে অর্জন করি তখন তাকে বৈরাগ্য আখ্যা দেওয়া হয়। যোগের নিম্নভূমির যে বৈরাগ্য তাকে অপরা বৈরাগ্য বলা হয়। এই বৈরাগ্যের সঙ্গে নন্দনতাত্ত্বিক বৈরাগ্য বা Aesthetic detachment তুলনীয়। রঁলা আমাদের এই প্রসঙ্গে বলতে চাইলেন যে, উপনিষদে যে যোগের কথা বলা হয়েছে সেই যোগের মধ্যে আত্মবিচ্যুতি বা আত্মস্বতন্ত্রীকরণের ব্যঞ্জনা নেই। তাই উপনিষদকথিত যোগ এবং যোগজ বৈরাগ্যের সঙ্গে নন্দনতাত্ত্বিক বৈরাগ্যের তুলনা অসমীচীন হ'বে। আমরা সাংখ্য এবং যোগদর্শনে যে আত্মবিচ্যুতি ও বৈরাগ্যের কথা বলা হয়েছে তার সঙ্গে রঁলা কথিত নন্দনতাত্ত্বিক বৈরাগ্যের

তুলনা করা হ'লে তা হয়ত তথ্যাশ্রিত হ'বে। তবে এই প্রসঙ্গে রঁলা আমাদের স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, শিল্পীর যে বৈরাগ্যকে আমরা যোগজ-বৈরাগ্যের সঙ্গে তুলনা করছি সেই বৈরাগ্য হ'ল মহাশিল্পীর বৈরাগ্য ; যাঁরা মহতী শিল্পের সৃষ্টি করেছেন তাঁরাই এই বৈরাগ্যের আস্বাদন করেছেন। রঁলা একথা বলতে চাইলেন যে, আমরা যেন এই যোগজ বৈরাগ্যের সমতুল্য মনস্তাত্ত্বিক বৈরাগ্যকে শিল্পসৃষ্টির আবশ্যিক ভিত্তিভূমি হিসাবে গ্রহণ না করি :

"Thus the yogic disunion or detachment is somewhat akin to the artistic disunion of the feeling from the subject. But the deep concentration for the yogic practice is not common place, and if we try to generalise it as a condition precedent for all artistic creation. We will misunderstand Rolland".

(S. K. Nandi, Aesthetic of Romand Rolland, p. 60)

স্বামী বিবেকানন্দের রাজযোগের উল্লেখ করে রঁলা শিল্পসাধনার সঙ্গে যোগজ সাধনার সামীপ্য এবং সাযুজ্যটুকু প্রত্যক্ষ করতে চেয়েছেন তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'The life of Vivekananda and the universal Gospel'-এ ; তিনি বললেন যে, যোগ সাধনার পথে স্বামিজী যেমন যৌগিক ভিত্তিভূমি থেকে অকস্মাৎ তুরীয় লোকে উত্তীর্ণ হতেন ঠিক তেমনি করে বিটোফেন এই প্রাকৃত জগতের চেতনা থেকে মহাশিল্পীর চেতনার জগতে অকস্মাৎ জাগ্রত হয়ে উঠতেন। এই যে উত্তরণের শক্তি, তা যোগীর বা শিল্পীর যারই হোক না কেন তা হল সেই আত্যন্তিক সৃষ্টিশক্তির রূপভেদ মাত্র। রঁলা এই যোগশক্তিকে প্রত্যক্ষ করেছেন একদিকে যেমন স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে অন্তদিকে আবার তাকে প্রত্যক্ষ করেছেন বিটোফেনের মধ্যেও। বিটোফেন রাজযোগ সম্পর্কে পরিপূর্ণরূপে অবগত না হয়েও রাজযোগের অনুরূপ যোগসাধনা করেছিলেন—একথা রঁমা রঁলা বললেন। বিটোফেনের যে বধিরতা, এই বধিরতাকে তিনি রাজযোগের বিধিবহির্ভূত অনুশীলনের ফলশ্রুতিরূপে গণ্য করেছেন। রাজযোগের প্রকরণ পারিপাট্য সম্যকরূপে না জেনেও তিনি এক ধরনের 'সহানুভূতির' মাধ্যমে এই যোগপদ্ধতির উপযোগিতার কথা হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন। তাঁর এই উপলব্ধি হ'ল মিষ্টিক বা মরমিয়া সাধকদের অনুভূতির সমগোত্রীয়। এই মিষ্টিক দৃষ্টিভঙ্গির জন্তই উত্তরকালের রঁলার পক্ষে সমন্বয়বাদী হওয়া একান্তরূপে সহজ এবং স্বাভাবিক হয়ে উঠেছিল। অতএব বলা চলে

যে, রঁলা ভারতীয় Mysticism-এর রসধারায় পুষ্ট না হলেও ভারতীয় Mystic-দের সমন্বয়বাদী দৃষ্টিভঙ্গির অনুরূপ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর নন্দনতত্ত্বের সেই ইসথেটিক দৃষ্টিভঙ্গি হল সমন্বয়বাদী, সমন্বয়ধর্মী ও সঙ্গতিভিত্তিক।

রঁলা ছিলেন গান্ধী এবং রবীন্দ্রনাথের মত মানবহিতৈষী। স্বার্থহীন মন নিয়ে তিনি মানুষকে দিতে চেয়েছিলেন নিঃস্বার্থ সেবা। রঁলার সেবামন্ত্রের দীক্ষাগুরু ছিলেন ঋষি তলস্তয়। কোথায় কোন্ মানুষ জীবনের যুদ্ধে হেরে গিয়ে আত্মগোপন করেছে অমনি রঁলা সেখানে ছুটে গেছেন সাহস দিতে, শক্তি দিতে, কোথায় কে সবলের ভয়ে অন্যায়ের প্রতিকার চাইলেন না সেখানে তিনি গেছেন বরাভয় নিয়ে। নাৎসি শাসনের লৌহভার কোন দিন তাঁর কণ্ঠকে রুদ্ধ করে দেয় নি; তিনি মূখ্যদর্শকের ভূমিকা নিয়ে অসহায়ভাবে বিলাপ করেননি কখনও; অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদ বার বার মুখর হয়ে উঠেছে। আত্মবিস্মৃত দুর্বল মানুষকে ডাক দিয়ে তিনি রবীন্দ্রনাথের মতই বলেছেন:

"যখনই জাগিবে তুমি
তখনই সে পলাইবে ধেয়ে
পথ কুক্কুরের মত।"

আত্মশক্তির উদ্বোধন ঘটাতে হবে প্রতিটি মানুষের অন্তরে; এই আত্মশক্তিই হল মানুষের শক্তির আধার। এই আত্মশক্তির উদ্বোধন ঘটে আত্মজ্ঞানের মাধ্যমে। ভারতীয় জ্ঞান সাধনা এই আত্মজ্ঞানের উন্মেষের কথা বলেছেন, যেমন বলেছেন আরিস্ততল প্রমূখ পাশ্চাত্যদেশের পণ্ডিতেরা। কাজ কাজ আর কাজ, এই কাজকে, কর্মময় জীবনকে রঁলা সাগ্রহে বরণ করে নিলেন; তাঁর স্বপ্ন ছিল কাজকে কেন্দ্র ক'রে; নব নব কর্মলোকে মানুষের জয়যাত্রাকে সার্থক করে তুলতে হবে, এই স্বপ্নই দেখেছিলেন তিনি। কর্মের মধ্য দিয়ে শিল্পীর জীবন শিল্পায়িত হয়ে উঠুক, এই ছিল তাঁর কামনা। শিল্পীর ধ্যানে মানুষের কল্যাণ সূচিত হোক, তার শিল্প এষণায় সমাজে হোক্ ঐক্যবোধের প্রতিষ্ঠা। সুন্দর এবং শিবের প্রতিষ্ঠা ভূমি হ'ল মানুষের ঐক্যবোধ। পারস্পরিক মিলনের এই মহাতীর্থ থেকে চিরদিনই অশিব এবং অসুন্দর নির্বাসিত। প্রেমের পথে, ঐক্যের পথে মানুষের কল্যাণ সাধনের জন্য তপস্যা করেছিলেন ঋষি তলস্তয় আর সেই মহাসাধনার উত্তরাধিকার লাভ করেছিলেন মহামতি রঁলা। তিনি বুঝেছিলেন যে শিল্পীর সৃষ্টি সার্থক হতে পারে না ঐক্যবোধের যদি

অসম্ভাব ঘটে। স্বার্থবিক্ষিপ্ত চিন্তা আর কল্পনা শিল্পীর মানসিক প্রশান্তিকে নষ্ট করে; শিল্পী সহৃদয়ের সঙ্গে অলক্ষ্য নিগূঢ় যোগসূত্রটি হারিয়ে ফেলে। তার ফলে শিল্পের অপমৃত্যু ঘটে। বিভিন্ন মানুষের বিভিন্নমুখী মননের মাঝে রসের সেতু সৃষ্টি করে শিল্পী। মানুষের অন্তরশায়ী একাত্মবোধ জাগ্রত হয়, শিল্পীর আনন্দলোকে শিল্পরসিকের প্রবেশ লাভ ঘটে।

ভারতীয় নন্দনতত্ত্বে সাহিত্যের ব্যাকরণগত অর্থ হল 'সহিত' অর্থাৎ নানা উপকরণের মিলনবোধক যে শব্দ তা-ই 'সাহিত্য'; বিশেষজ্ঞদের মতে সাহিত্যের ক্ষেত্রে যেভাব ব্যক্ত হয়, তা সম্বন্ধ বিশেষ স্বীকার বা পরিহার নিয়মের দ্বারা অনিয়ন্ত্রিত ও সাধারণ গ্রাহ্য। সম্বন্ধ বিশেষ স্বীকার পরিহার 'নিয়মানধ্যবসায়াৎ সাধারণ্যেন প্রতীতৈরভিব্যক্তঃ'। এই সাধারণ প্রতীতির বলে তখনকার মত সকল পরিমিত প্রমাতৃভাব অপনীত হয় এবং উন্মেষিত হয় অন্য কোন জ্ঞেয় বস্তুর সম্পর্ক বিরহিত একটি অপরিমিত ভাব। সকল সহৃদয়ের মধ্যে একটি ভাবগত ঐক্য থাকাতে এই ভাবরসের যথার্থ অনুভূতি ঘটে। শিল্পীর সঙ্গে তার চতুষ্পার্শ্বের মানুষের যদি ভাবগত ঐক্য না থাকে তা হ'লে শিল্প সার্থক হয় না, শিল্পীর সাধনাও ব্যর্থ হয়, এই কথাই রঁলা বারবার বলেছেন। আবার এই কথাই অন্য ভাষায় বলেছেন আমাদের দেশের আলঙ্কারিকেরা। শিল্পলোকের এই ভাবগত ঐক্যকে সামাজিক ঐক্যের পর্যায়ে নামিয়ে এনেছেন রঁলা এবং তার পিছনে আছে তাঁর সমাজহিতৈষণা। মানুষের কল্যাণ সাধিত হয় সর্বমানবীয় ঐক্যে এবং এই ঐক্যের প্রতিষ্ঠার জন্যই রঁলার জীবনব্যাপী সাধনা। যে শিল্প শ্রেণী মানসের স্বাক্ষর বহন করে তাঁর কাছে সে শিল্প কোনদিনই মর্যাদা পায় নি। তাই তিনি 'সাময়িক' আর্টকে স্বধর্মচ্যুত বলে মনে করতেন। কেবল তলস্তয় ছিলেন তাঁর কাছে আদর্শশিল্পী। তলস্তয়ের ধ্যানে মানুষের সঙ্গে মানুষের ঐকান্তিক যোগের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। তলস্তয় সর্বমানবিকতার স্বপ্ন দেখেছিলেন এবং তাঁর শিল্পে এই স্বপ্নের উজ্জীবন বারবার ঘটেছে। রঁলা লিখিত তলস্তয়ের জীবনীতে আমরা পড়ি:

"Yes, the whole of our art is nothing but the expression of a caste, sub-divided from one nation to another, into small opposing groups. There is not one artistic soul in Europe which unites in itself all the parties and races. The most universal in our time was that of Tolstoy. In him we

have loved each other, the men of all the countries and all the classes. And any one who has tasted as we have done, the powerful joy of this vast love, will never again be satisfied with the fragments of this great human soul which the art of the European coteries offers us."

রঁলা তলস্তয়ের সমধর্মী শিল্পীর অন্বেষণ করেছেন সারা জীবন ধরে। কোথায় কোন্ শিল্পীর মধ্যে মানুষের প্রতি ভালবাসা মুখ্য স্থান লাভ করল, তিনি তাঁকেই খুঁজে ফিরেছেন অনন্তচিত্ত হয়ে। যে শিল্প শ্রেণীবিশেষকে আশ্রয় ক'রে শ্রেণী স্বার্থের কথা বলে, সে শিল্প সত্যধর্মী নয়। যে শিল্প শ্রেণী-বিদ্বেষ প্রচার করে, মানুষের সঙ্গে মানুষের বিভেদটাকে বড় করে দেখে, সে শিল্প অপাংক্তেয়। মানুষের কল্যাণ আসে প্রেমের পথে, মিলনের পথে। তাই সর্বমানবীয় মিলনকে রঁলা এতো বড় ক'রে দেখেছিলেন এবং বলেছিলেন যে অবিরোধ এবং ভালবাসার পথই হ'ল সার্থক শিল্পসৃষ্টির পন্থা। রঁলা পরিকল্পিত সার্বজনীন রঙ্গালয়ে (Peoples' Theatre) মানুষের সঙ্গে মানুষের দ্বন্দ্ব বিরোধের কোন কথা নেই। সেখানে অবিরোধী মানবাত্মার ঐক্যকে মুখ্য করে দেখবার চেষ্টা হয়েছে। মানবগোষ্ঠীর সঙ্গে তার পারিপার্শ্বিক শক্তির নিরন্তর সংগ্রামই হল এই ধরনের রঙ্গালয়ে অভিনীত কাহিনীর প্রধান উপজীব্য। কর্মে এবং বিশ্বাসে মানব প্রেমের পূর্ণ অভিব্যক্তি রঁলা প্রত্যক্ষ করেছিলেন তলস্তয়ের মধ্যে। তাই জীবনের এক সন্ধিক্ষণে তিনি তলস্তয়ের মন্ত্রেই দীক্ষা গ্রহণ করলেন। একদিকে সেক্সপীয়র এবং বিটোফেন অন্যদিকে তলস্তয়। একদিকে শুধু শিল্পরসিকের নিগূঢ় আনন্দলোকে কর্মহীন বিচরণ, অন্যদিকে শিল্প-সহায় কর্মের ক্ষেত্রে শিল্প রসিকের আত্ম নিবেদন। একদিকে শিল্পোদ্ভূত অকারণ পুলকে অবসর বিনোদন, অন্যদিকে শিল্পী নির্দেশিত পথে নব নব কর্মের ক্ষেত্রে মানুষের কল্যাণ সাধনের অক্লান্ত প্রয়াস। রঁলা চাইলেন কর্মের মধ্য দিয়ে সমাজের কল্যাণ এবং শিল্প হল সমাজ সেবার অন্যতম বাহন। শ্রম এবং সেবাই শিল্পীর শিল্প প্রচেষ্টাকে সার্থক ক'রে তুলতে পারে। যে শিল্পী সমাজের সেবা করে না, শুধু সেবা গ্রহণ করে, তার পক্ষে সার্থক শিল্প সৃষ্টির চেষ্টা ব্যর্থপ্রয়াস মাত্র। সমাজ তাকে স্বীকার করবে না। তার শিল্পকে মর্যাদা দেবে না কারণ সেবাহীন জীবনে শিল্পীর প্রয়াস কোনদিনই ফুল হ'য়ে ফোটে না, রঁলা এ কথা বিশ্বাস করতেন। যে শিল্পী কাজের পরিবর্তে

গ্রহণটাকেই বড় ক'রে দেখে, সেবাহীন জীবনে অপরের সেবা অকুণ্ঠচিত্তে গ্রহণ করে, তাঁকে রঁলা পরভৃজ পরগাছার সঙ্গে তুলনা করেছেন। সমাজকে কিছু দেবার নৈতিক দায়িত্ববোধটুকুও যার নেই, তার নেবার অধিকারটুকুও রঁলা স্বীকার করেন না। এ বিষয়ে তিনি পুরোপুরি তলস্তয়পন্থী। একপত্রের উত্তরে তলস্তয় রঁলাকে লিখলেন :

"A person who continues to fulfil his duty of sustaining life by the works of his hands and devotes the hours of his respose and of sleep to thinking and creating in the sphere of intellect, has given proof of his vocation. But one who frees himself from the moral obligations of each individual and under the pretext of his taste for science and art takes to the life of a parasite, would produce nothing but false science and false art."

শিল্পীর জীবনে কায়িক শ্রমকে মর্যাদা দিলেন ঋষি তলস্তয় এবং ঘোষণা করলেন যে শ্রমই হ'ল শিল্পের প্রাণ। রঁলা এই শ্রমকে মানবপ্রীতির সঙ্গে যুক্ত ক'রে এক বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে এর মূল্য বিচার করলেন। শিল্প হ'ল মানুষের শুভ সহায়ক। যে শিল্প মানুষকে কর্মে উদ্বুদ্ধ করে, যে শিল্প কর্মের মধ্যে দিয়ে মানুষের মিলনকে, সম্প্রীতিকে দৃঢ়তর করে, সেই শিল্পের সাধনা করলেন রঁলা, প্রচার করলেন সেই শিল্পের মহিমা।

এখন প্রশ্ন জাগে যে শিল্পের মর্যাদা কি মানবসেবা বা বিশ্বসৌভ্রাত্র থেকে অর্জিত? শিল্প কি স্বমহিমায় মহিমান্বিত নয়? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে আর্টের মূল্য বিচারের প্রশ্ন ওঠে। ক্রোচে, জেন্টিলে প্রমুখ সমালোচকেরা বলবেন, আর্টের মূল্য বিচার করতে বসে আমরা যেন ভুলে না যাই যে বাইরের কোন প্রয়োজন দিয়ে আর্টের ধর্ম নির্ণয় করা যায় না। শিল্প হিসেবেই শিল্পের মূল্য বিচার হবে। আর্ট আমাদের কী কাজে লাগল না লাগল সেটা বড় কথা নয়। জল তোলা বা কাঠ কাটা, দাঁড় টানা বা মাল বওয়ার জন্য আর্টের সৃষ্টি হয়নি। আর্ট মানুষকে কর্মে উদ্বুদ্ধ করল কী না, মানুষের নৈতিক চরিত্রের উন্নতিসাধন করল কী না, সে কথা অবান্তর। যদি আমরা শিল্প বা আর্টকে এই ধরনের কাজে লাগাই তবে আর্টের প্রকৃতি ক্ষুণ্ণ হবে। কোন উদ্দেশ্য নিয়ে, কোন পরিকল্পনা নিয়ে শিল্পী যদি সৃষ্টি করে তবে সে সৃষ্টি সত্যধর্মী না হয়ে

প্রয়োজনধর্মী হয়ে পড়ে। তাতে কাজ হয়ত মেটে কিন্তু শিল্পরসিকের প্রাণের দাবী মেটে না। প্রাত্যহিক জীবনের প্রয়োজন মেটাতে হলে আর্টকে স্বধর্ম ত্যাগ করতে হয়। শিল্পী তার বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলে। শিল্পের জাত যায়। দার্শনিকপ্রবর হেগেলও ঠিক এই ধরনের মত প্রকাশ করেছেন। শিল্প হ'ল হঠাৎ হাওয়ায় ভেসে আসা ধন। তাই জোর ক'রে ফরমায়েস মত তাকে বেঁধে আনা যায় না। হঠাৎ লাগা একটুকু ছোঁয়ায়, হঠাৎ শোনা একটুকু কথায় কবি-কল্পনা উদ্দাম হ'য়ে ওঠে. কবি মনে মনে তাঁর ফাল্গুনী রচনা করেন। রবীন্দ্রনাথের কথায় বলি :

"শুধু অকারণ পুলকে,
ক্ষণিকের গান গারে আজি প্রাণ
ক্ষণিক দিনের আলোকে।"

সামান্য কয়টি কথায় অসামান্যরূপে কবি শিল্পের অন্তর লক্ষ্মীর স্বরূপ ব্যক্ত করেছেন। অকারণ পুলকেই শিল্পের জন্ম হয়। হঠাৎ দেখা স্কাইলার্ক (চাতক পাখী) অমর হয়ে ওঠে কবির অকেজো কল্পনায়। সময়ের বেড়া ডিঙিয়ে আজও আমাদের মনের আকাশে উড়ে বেড়ায় শেলীর স্কাইলার্কের অশরীরী আত্মা। প্রমিথিউসের আগুনের স্বপ্ন আজো আমরা দেখি। এরা আমাদের কোন কর্ম প্রেরণায় 'ত' মাতিয়ে তোলেনি। বরং আমরা কাজের কথা ভুলি। ইলোরা ও অজন্তার গুহামন্দিরে ঘুরে বেড়াতে গিয়ে অকারণ খুশিতে মন উপচিয়ে পড়ে, চোখে বিস্ময়ের ঘোর লাগে। কই, কাজের কথা 'ত' মনে পড়ে না। হাজার কাজ ফেলে মানুষ অকাজের পিছনে ছোটে শিল্পের মায়ামৃগকে বাঁধবার আশায়। 'মায়াবন বিহারিণী হরিণী' ছুটে চলেছে যুগ থেকে যুগান্তরে ; কল্পলোকে অকারণ তার বিহার। শিল্পীর দল তার পশ্চাদ্‌চারী হ'য়েছে মানুষের মনে রস-উদ্বোধনের সেই প্রথম দিনটি থেকে। কাজের কথা, প্রয়োজনের তাগিদ তাদের কাছে একেবারে নিরর্থক হয়ে গেছে।

তবে কী র‍ঁলা ভুল বলেছেন? ঠিক যে ধরনের ভুল একদিন মহাদার্শনিক প্লেতো করেছিলেন আর্টের শ্রেণী বিশেষকে তাঁর আদর্শ রিপাবলিক থেকে নির্বাসিত ক'রে, মহামতি র‍ঁলাও অনুরূপ ভুলই করেছেন তাঁর প্রথম জীবনে। ক্ষয়িষ্ণু গ্রীসের মানুষকে নৈতিক অধঃপতন থেকে বাঁচাবার একান্ত আগ্রহে প্লেতো আর্টকে (amusement art) নির্বাসন দিলেন আর র‍ঁলা স্বার্থকলুষিত মানুষের হৃদয়ে বিশ্ব সৌভ্রাত্র্যের সেতু রচনার জন্য আর্টকে কাজে লাগাতে

চাইলেন। মানুষ মানুষের জন্ত কাজ করুক, মানুষের দুঃখ দূর করুক, মানুষকে ভালোবাসুক. এই মহান আদর্শ শিল্পীরা আর্টের মাধ্যমে প্রচার করুক, এ কথা রঁলা বারবার বলেছেন। এটাই কিন্তু রঁলার শেষ কথা নয়। মানবসেবী রঁলার পিছনে পিছনে এলেন শিল্পী রঁলা। এ রঁলা তত্ত্বের প্রভাবমুক্ত। শাশ্বত শিল্পী মন কাজ অকাজের বাধা ঠেলে সুনীতি দুর্নীতিকে অতিক্রম ক'রে ঘোষণা করল :

"But above all if you were musicians you would make pure music, music which has no definite meaning, music which has no definite use, save only to give warmth air and life. (*John Christopher*, Vol. III)

শিল্পের মূল্য কোন বিশেষ প্রয়োজনের মাপকাঠিতে পরিমেয় নয়। শিল্পের অমেয় দান শিল্প-রসিকের অন্তরে রসের প্লাবন আনে। এই অপূর্ব অনির্বচনীয় রসের স্বরূপ নির্ণয়কল্পে রূপকের ভাষায় ভারতীয় দার্শনিক নিবেদন করেছেন : সমস্ত বিচার, বির্তক, উদ্দেশ্য অপসারিত ক'রে ব্রহ্মানন্দ আস্বাদনের সদৃশ অনুভূতির উদ্রেক ক'রে অলৌকিক চমৎকারকারী (ব্রহ্মাস্বাদসহোদরঃ) এই রসস্বরূপের আভাস দেয়। "অন্যৎ সর্বমিব তিরোদধৎ ব্রহ্মাস্বাদমিবানুভাবয়ন্ অলৌকিচমৎকারী···রসঃ" রঁলার মধ্যে শিল্পরসের এই নিগূঢ় তত্ত্ব আমরা পাই না সত্য, তবে একথা রঁলা বলেছেন যে সুচারু শিল্পকর্মের ধ্যানে শিল্পরসিকের মনে যে আনন্দের সঞ্চার হয়, সে আনন্দ যোগজ আনন্দের অনুরূপ। রঁলার চোখে স্বামী বিবেকানন্দের ধ্যানলোকে আত্ম-অন্বেষণ আর বীটোফেনের শিল্পময় তন্ময়তা সমধর্মী। বিবেকানন্দের প্রসঙ্গে রঁলা বলেছেন যে শিল্পীর শিল্প প্রচেষ্টা যেন যোগজ ধ্যান। যুগে যুগে শিল্পীরা এই ধরনের ধ্যানই করেছেন সার্থক শিল্পসৃষ্টির প্রয়াসে। বীটোফেনের সুনিবিড় শিল্পচিন্তা আর 'রাজযোগের' মধ্যে তিনি কোন পার্থক্য দেখতে পাননি। সে যাই হোক, এখন আমরা শিল্পের ব্যবহারিক প্রয়োজনের কথা ভাবছি। হয়ত কখন আমরা জীবনের সংকটময় মুহূর্তে পথের দিশা পাই শিল্পীর কাছে, তাঁর শিল্প-কর্মের কাছে। কিন্তু সেই প্রয়োজনের দিকটাই আর্টের বিচারে মুখ্য নয়। রঁলা তাঁর এক বান্ধবীর কথা বলেছেন। এই বান্ধবীটির কথা আমরা বার বার উল্লেখ করেছি। এই বান্ধবীটি সেক্সপীয়র রচিত 'ওথেলো' নাটকের অভিনয় দেখে তাঁর জীবনের এক জটিল নীতিগত সমস্তার সমাধান খুঁজে পান। তাঁর ধূসর

জীবনে আবার নীল স্বপ্নের বন্যা নামে—জীবন সুন্দর হয়, আনন্দময় হয়। নতুন আশার পলিমাটিতে আবার বন্যা জীবনে ফসল ফলে। সার্থক শিল্পসৃষ্টি কখন কখন এইভাবে মানুষের প্রয়োজন মেটায়। তাই ব'লে আমরা কেউ ওথেলোকে নীতিমূলক নাটকের পর্যায়ে নিশ্চয়ই স্থান দেব না। সেক্সপীয়র ওথেলোর মধ্য দিয়ে কোন নীতি প্রচারের প্রয়াস পান নি, এ কথাই সমালোচকেরা বলেন। যদি আর্ট কোন দিন এমনি ক'রে কারো প্রয়োজন মেটায়, তবে আমরা তাকে বলব আকস্মিক দুর্ঘটনা। আর্ট যেন সুনীল দিগন্তশায়ী প্রভাত সূর্য। অজস্র আলোক বন্যায় শিল্পরসিককে অভিষিক্ত করাই আর্টের ধর্ম। আমরা যদি সূর্যালোকে কাপড় শুকোই বা ঐ ধরনের ছোটখাটো কাজ ক'রে ভাবি সূর্যের আলোর সৃষ্টি এই জন্যই হয়েছে তবে আমরা যে ভুল করব সে কথা বলা বাহুল্য মাত্র। আর্টকেও যদি আমরা ছোটখাটো প্রয়োজনে লাগিয়ে ভাবি যে এতেই আর্টের সার্থকতা, তবে আমাদের ঐ একই ধরনের ভুল হবে। রঁলা আর্টের ধর্ম ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন:

"It is like the sun whence it is sprung. The sun is neither moral nor immoral. It is that which is. It lightens the darkness of space. And so does art." (*John Christopher*, Vol. IV)

সূর্যের মত আর্টও যেন স্বর্ণ-আলোর উৎস। এ আলোয় প্রাণ আছে গান আছে আর আছে আনন্দ। এ আলো প্রাণের অন্ধকারকে সরিয়ে দিয়ে রসের প্লাবনে ভাসিয়ে দেয় 'সহৃদয়ের হৃদয়কে'। সেই আলোর একটুখানি কোথায় কীভাবে প'ড়ে আমাদের প্রয়োজনের কোন দাবীটা হঠাৎ মিটিয়ে দিল সেটা বড় কথা নয়, সেটুকু হ'ল আকস্মিকতা। আবার সূর্যের আলোর গুণবিচারে সুনীতি দুর্নীতির কথা যেমন অবান্তর আর্টের ক্ষেত্রেও নীতিগত প্রশ্ন তেমনি নিরর্থক। দেশে দেশে, কালে কালে নীতিশাস্ত্রের মান বদলায় কিন্তু তাই ব'লে আর্টকেও তার সঙ্গে পা ফেলে চলতে হ'বে এমন কোন কথা নেই। আর যদি সেটাই সত্য হ'ত তবে আর্টে সার্বিকতা ক্ষুন্ন হ'ত। আজ আর কেউ 'মেঘদূত' প'ড়ে যক্ষের জন্য দু ফোঁটা চোখের জলও ফেলত না। আমাদের প্রাণ কাঁদত না হামলেটের অভিনয় দেখে; সে যুগের রুচি প্রবৃত্তি, নীতি আজ আর নেই। আমরা এক নতুন যুগে ভিন্ন জগতে বাস করছি। তবে সে যুগের শিল্প আমরা বুঝি, আনন্দ পাই সেই শিল্প সুধাপান ক'রে। রঁলা

আর্টের এই সার্বভৌম আবেদনকে স্বীকার করতেন। তাই তিনি কলারসিক শ্রীদিলীপ কুমার রায়কে পাশ্চাত্ত্যে ভারতীয় রাগসঙ্গীতের প্রচারের ভার গ্রহণ করবার জন্ত অনুরোধ করেছিলেন। শিল্পের আবেদন সর্বত্রগামী। সেখানে পূর্ব নেই, পশ্চিম নেই, সাদা কালোর পার্থক্য নেই। সত্যধর্মী শিল্প মানুষের কাছে কখনই ব্যর্থ হবে না, এ কথা মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন র‍ঁলা। শিল্পীকে তাঁর সর্বস্ব দিতে হবে তাঁর শিল্পকর্মের মধ্য দিয়ে। শিল্পীর যা কিছু ভালো, যা কিছু সুন্দর, যা কিছু মহত্তর, সেটুকু অকুণ্ঠ চিত্তে দান করতে হবে, তবেই তা সাড়া তুলবে কাল থেকে কালান্তরে, দেশ থেকে অন্ত দেশে। শিল্পীর ভবিষ্যৎ অনন্ত, তার জগৎ সীমাহীন। কোন এক দেশে, কোন এক কালে সে স্বীকৃত হবেই যদি বা তার দেশ তাকে গ্রহণ না করে। তাই র‍ঁলা শিল্পীদের আশ্বাস দিয়ে বলেছেন: "Give what you have to give with both hands. If there is anything of lasting value in your contribution, believe me, it can never altogether miscarry." এর মর্মার্থ হচ্ছে তোমার যা দেবার আছে তা দু'হাতে বিলিয়ে দাও। তোমার সৃষ্টির মধ্যে যদি এমন কিছু থাকে যার স্থায়ী মূল্য আছে তা হ'লে বিশ্বাস কর তা কখনও একেবারে ব্যর্থ হবে না।

র‍ঁলার মতে এই সার্থক শিল্প হবে সবুজ, প্রাণবন্ত। শিল্প হবে সত্য সাধনা আর শিল্পী হবে সর্ববন্ধনহীন। শিল্পীর মনের মুক্তিই 'ত' শিল্পের মুক্তিরূপে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠবে। শিল্পেতিহাস হ'ল শিল্পী মনের ক্রমব্যক্ত সাধন-কথা। একথা আমরা জানি যে শিল্পের গুহ্যতন্ত্রের মর্মবাণী সকলের জন্ত নয়। তাই শিল্পের জগতে সাম্যবাদ বা সাধারণতন্ত্রের কথা এহ বাহ্য। শিল্পী 'ত' সাধারণ জীবনের কথা সকলের বোঝবার মত ক'রে বলে না। তার কথনরীতি তার অনুভূতির আলোকে প্রোজ্জ্বল। তার বুদ্ধি, তার মনন-রীতি, সর্বোপরি তার সাধনা তার শিল্পকর্মকে যে বৈশিষ্ট্য দান করে তা অনুরূপ ভাবুক বা সাধক ছাড়া আর কেউ পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে পারে না। সাধারণ মানুষের অশিক্ষিত অনুভূতি ও যথাযোগ্য শিক্ষার দীনতার জন্ত শিল্পী যদি তার শিল্প-মননকে তাদের বুদ্ধি-অধিগম্য করার জন্ত নামিয়ে আনে তবে শিল্পের অপমৃত্যু ঘটবে। জনসাধারণ যেমনটি চায় ঠিক তেমনি 'গজানন' রচনা করা 'ত' জাতশিল্পীর কাজ নয়। গোষ্ঠীর রুচির উপরে শিল্পী নির্ভরশীল হ'লে শিল্প ক্রমেই পতিত হয়। শিল্পীর কর্তব্য হ'ল সমাজের রুচিকে নব নব প্রাণনায় অনুপ্রাণিত করা,

নতুন রূপে, নতুন গানে তাদের চিত্তে নবতর রসের উদ্বোধন ঘটানো। এ কাজ শিল্পীর স্বনির্বাচিত, এ কাজে শিল্পী সদাব্রতী। রঁলা শিল্পীদের এই মহান দায়িত্বে বিশ্বাস করতেন। সমকালীন মানুষ যা ভাবে, যে আদর্শ সমকালীন সমাজের মহত্তম আদর্শ তার ছায়াপাত যেমন শিল্পীর শিল্পকর্মে থাকবে তেমনি থাকবে অভাবিত অকল্পিত আদর্শের কথা। শিল্পী সেখানে দিক্‌দর্শক। বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এই উভয় কালই বিধৃত হবে শিল্পীর দৃষ্টিতে, তার উৎস হবে ঐতিহ্যময় অতীত। তাই ঋষিদৃষ্টির স্বচ্ছতা থাকে শিল্পীর চোখে। তারাই যথার্থ জন-গণ-মন-অধিনায়ক। গণচেতনা ও তদতিরিক্ত 'কিছু' শিল্পীর চেতনায় শিল্পীর কর্মে আপনাকে প্রকাশ করে। এই 'কিছু'টুকুই অন্ধকার পথের আলো। শিল্পীকে যদি গণ-দেবতার রথের সারথী বলি তা হ'লে বোধ হয় ঠিক বলা হবে। রঁলার ভাষায় বলি: "It was the artist's business to lead the public but not the public the artist." (*John Christopher*, Vol. III, পৃ: ৮৫) শিল্পীর বিরাট দায়িত্বে রঁলা মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন তাই তিনি তাঁর সমকালীন শিল্পী ও সমালোচকদের ক্ষমার চোখে দেখতে পারেননি। তাদের দুর্বল জীবনবাদ, নৈতিক শক্তির অপ্রতুলতা তাঁকে ব্যথিত করেছে। তিনি চেয়েছেন সবল, নির্ভীক, দুর্মদ সমালোচকেরা আবির্ভূত হোক তাঁর দেশে; তারা কালাপাহাড়ী ক্ষিপ্রতায় মিথ্যার জড়তা ও অজ্ঞানকে দূর ক'রে দিক তাঁর দেশ থেকে। তিনি বার বার ভেবেছেন এই কথা যে তাঁর সমসাময়িক ক্রিটিকের দল যদি বীর্যবান হ'তো, অভীঃ মন্ত্রে যদি তারা দীক্ষিত হ'তো তবে মানুষের মনন ইতিহাসে নেপোলিয়ঁর মতই কোন এক অসীম বীর্যবান পুরুষের আবির্ভাব সম্ভব হ'ত। অবশ্য পণ্ডিতপ্রবর কলিংউডের মতে বস্তু ইতিহাস, যে ইতিহাস ঘটনার পারম্পর্য লেখে আর ভাব-ইতিহাস, যে ইতিহাস মনোধর্মের ইতিবৃত্ত লিখে রাখে তারা সমার্থক। অবশ্য রঁলা এই তত্ত্বে বিশ্বাস করতেন না। তবে একথা তিনি গ্রহণযোগ্য ব'লে বিবেচনা করতেন যে শিল্পী প্রমুখ মননধর্মের সাধকেরা বস্তু ইতিহাসকে রূপ দেয়, তার গতিনির্দেশ করে প্রতিটি যুগ সন্ধিক্ষণে। এখানে আমরা রঁলার নন্দনতত্ত্বে ফরাসী দর্শনের Occasionalism-এর ছায়াপাত লক্ষ্য করি। রঁলা তাঁর সমকালীন শিল্পীদের মধ্যে কোন জাগ্রত আদর্শবোধ লক্ষ্য করেন নি। তাঁর আজীবন ক্ষোভ রয়ে গেল যে শিল্পীগোষ্ঠী সাধারণ পথভ্রান্ত মানুষকে পথের নিশানা না দিয়ে তাদের চিত্তের দুর্বলতা, বিকৃতি ও মালিন্যের

সুযোগ নিয়ে আপনাদের ব্যবসায় বুদ্ধিকে প্রাধান্য দিল; শুভবুদ্ধির উদ্বোধন হ'ল না এই সব শিল্পীদের মধ্যে। জাতীয় চরিত্রের এই বিকারগুলো তাদের শিল্পের উপজীব্য হ'ল। তারা ঘরে বাইরে অর্থ উপার্জন করল এই বিকৃতির কথা বিক্রী ক'রে। জাতীয় চরিত্রের দৈন্য, ব্যক্তিচরিত্রের ব্যাধি তাদের শিল্প ব্যবসায়ের মূলধন হ'ল। রঁলা গভীর দুঃখ পেলেন তাঁর সমকালীন শিল্পীদের ব্যবহারে, আচার এবং আচরণে।

এই শিল্পীরা ভাসা ভাসা মানব প্রেমের, মানবিকতার আদর্শ প্রচার করল। ফরাসী সমাজের উপরতলার মানুষের শ্রমবিমুখতা, আলস্য ও আরামপ্রিয়তা এবং ইন্দ্রিয়পরায়ণতা সে যুগের শিল্পে স্থান পেলো এবং যারা মেহনতী মানুষ তাদের শুভবুদ্ধিকে, তাদের কর্তব্যবোধকে প্রভাবিত করল এই উপরের তলার মানুষের জীবনদর্শন। ছবিতে, গানে, কবিতায় ও রঙ্গালয়ে এই অলস মানুষের জীবন দেখানো হ'ল পরম গৌরবের সঙ্গে, আর দেশের জনসাধারণ তাদের অনুকরণ ক'রে ক্রমে পঙ্গু হয়ে গেল এই নিকৃষ্ট শিল্প-মাদকতার প্রসাদে। এইভাবে অবিবেচক অদূরদর্শী শিল্পীদের হাতে প'ড়ে আর্ট সেদিনের ফরাসী জাতির নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক মৃত্যু ঘটাল। এর জন্য রঁলা বিলাপ করেছেন, ধিককৃত করেছেন সেই সব আর্টিস্টদের যারা স্বধর্মচ্যুত হয়েছিল। শিল্পীর কাজ হ'ল রুচি সৃষ্টি করা। সর্বপ্রকার বিরুদ্ধ সমালোচককে অগ্রাহ্য ক'রে শিল্পীকে তার মহৎ কর্তব্য পালন করতে হয়। রঁলার মতে জাত শিল্পীর মনোবৃত্তি হবে রেনেসাঁসের শিল্পীদের মত। তাঁরা আঁকলেন এ কথা জেনে যে তাঁদের শিল্পকৃতি তাঁদের নিজস্ব ধন নয়। সুতরাং তার ভবিষ্যৎ ভাববার ভার শিল্পীদের ওপর নেই। অঙ্কনোত্তর কোন দায়িত্ব তাঁদের নেই; এঁকেই তারা খালাস। এই ধরনের নিস্পৃহ দৃষ্টিভঙ্গী হ'ল যথার্থ শিল্পীজনোচিত। কবি ক্ষণিকের আনন্দটুকু ধরতে চান তাঁর ছন্দে। তা নাই বা রইল শাশ্বতকালের খাতায় জমা। ক্ষণ-মুহূর্তের আনন্দ বেদনাটুকুর দামও 'ত' কম নয়। আর যদি সে আনন্দের কথা, সে বেদনার কাহিনী শাশ্বত কালের কুক্ষিতে অক্ষয় হ'য়ে থাকে তাতেও কবি বা শিল্পীর কিছুই এসে যায় না। তাঁর কাজ শুধু সৃষ্টি করা। রঁলার মতে এখানেই শিল্পীর কাজটুকু শেষ হয়েছে।

শিল্প হবে সত্যানুগ। শিল্পী হবে সত্যসাধনায় উৎসর্গীকৃতপ্রাণ। রঁলার শিল্পধারণায়ও সত্যের আসন ছিল সর্বোচ্চে। তাই রঁলার শিল্পকে সত্যের তাঁবেদারি করতে হয়েছে। শিল্প হবে বাস্তবানুগ; এ সত্য রূপের

ট্রুথ নয়, এ হল দার্শনিকদের correspondence বা জীবনের প্রতিরূপ। যদি শিল্প এই বস্তুসত্যকে লঙ্ঘন করতে চায় তবে রঁলা আর্টকে জলাঞ্জলি দিতেও প্রস্তুত ছিলেন। শিল্পীর সত্যানুসন্ধান তাকে তার ধ্যানে ঐকান্তিকতা দেবে, তাকে বিনয় নম্র করে তুলবে। একথা স্মরণযোগ্য যে সত্য যদি শিল্পের মধ্যে প্রতিষ্ঠা পায় তবে সে শিল্প কালজয়ী হয়। শিল্পকর্ম মহৎ হয় যদি তার মধ্যে সত্যের প্রমূর্তনা ঘটে। রঁলার মানসপুত্র জন্ ক্রিস্টোফার তাঁর পিতৃব্য কর্তৃক তিরস্কৃত হন কেননা জনের বাঁধা গানে সহানুভূতির ছাপ ছিল না। লিখতে হয় বলেই, গান বাঁধতে হবে বলেই যেন তিনি লিখেছিলেন। তাই তাঁর পিতৃব্য গট্‌ফ্রিড তাঁকে বললেন যে তুমি লেখার জন্যই লিখেছ, তোমার অনুভূতিতে সত্যের ছাপ নেই ; তাই তোমার গান কালান্তরে বাঁচবে না, এর আবেদন পৌঁছুবে না রসিকজনের মনের খাস দরবারে। রঁলার কথা উদ্ধৃত ক'রে দিই ; "Be true even though art and artist have to suffer for it ! If art and truth cannot live together, then let art disappear." (*John christopher* Vol. II, পৃঃ ২১৫) যদি শিল্পকে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়, যদি শিল্পীকে ক্ষতি স্বীকার করতে হয় তবুও সত্যকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে, এ কথা রঁলা মনে প্রাণে বিশ্বাস করেছেন। যদি সত্যের সাথে আর্টের একটা মূলগত বিরোধ থেকে যায়, যদি তারা একসাথে না থাকতে পারে একে অপরকে আশ্রয় ক'রে তা হ'লে রঁলা শিল্পেরই মৃত্যু কামনা করবেন। 'শিল্পের জন্যই শিল্প' এই শ্লোগান সাধারণের জন্য নয়। বাস্তববোধবর্জিত, সত্যানুশ্রয়ী শিল্পকলার আদর্শ সামান্য কয়েকজন মানুষের কাছে গ্রহণীয়—তাদের কাছে জীবনই শিল্পের মহনীয়তায় মহিমান্বিত। জীবনে এবং শিল্পে কোন ভেদ নেই। তাই এক লোক থেকে অন্যলোকে গতায়াতটা অত্যন্ত অনায়াসেই সাধিত হয়। এঁদের কাছে জড় বস্তুর অন্তর্ছন্দ শিল্পকর্ম রূপেই প্রতিভাত ; সাধারণ, অতিচেনা বস্তু জগতের রূপান্তর ঘটে শিল্পীর কল্পলোকের স্পর্শ পেয়ে। এই সব শিল্প-চেতনা-ধন্য মানুষের চোখে এই দুই তত্ত্ব সমার্থক হ'য়ে যায়। জীবন ও শিল্প পরস্পরের আশ্রয়ধন্য হয়। এঁরা বলেন যে উত্তাল জীবন-উন্মাদনা, অতি প্রখর জীবনছন্দকে একটু শান্ত একটু সুশীল ক'রে তোলার জন্যই শিল্প। এই শিল্প হ'ল জীবনের সম্রাট, জীবনের রাজা। এই শিল্পের জনক যে শিল্পী তিনি হলেন একনিষ্ঠ জীবনবাদ, গগনচুম্বী আদর্শ ও

মহত্তর জীবনচর্যার শ্রদ্ধাশীল। র‍ঁলার মানসপুত্র ক্রিস্টোফার একজন শখের শিল্পসমালোচককে (সিল্‌ভিয়া কোহন) বলছেন :

"For that you need talons, great wings and a strong heart, but you are nothing but Sparrows, who when they find a piece of carrion, rend it here and there, squabbling for it and twittering 'art for art's sake." *(John Christopher Vol. III*, পৃঃ ৮২)

যাঁরা 'শিল্পের জন্য শিল্প' এই ধুয়ো তুলে নিজেদের ক্ষীণ, অক্ষম কল্পনার বিকারগুলোকে শিল্প বলে চালাবার চেষ্টা করেন তাঁদের কষাঘাত করেছেন র‍ঁলা। এই রুগ্ন ভাববিলাসিতাকে তিনি প্রীতির চোখে দেখেন নি। তিনি চেয়েছেন মানুষের বলিষ্ঠ মনের বলিষ্ঠতর ভাব কল্পনা শিল্পে প্রমূর্ত হয়ে উঠুক। যে মানুষ জীবনকে সুন্দর দেখে, মহৎ দেখে, সেই মানুষই শিল্পকে মহত্তর মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করে। এ হ'ল র‍ঁলার গভীর প্রত্যয়ের কথা। অবশ্য আমরা এখানে র‍ঁলার সাথে একমত হতে পারি নি। শিল্পসৃষ্টির জন্য মানুষের নন্দনতাত্ত্বিক বিশ্বাসে একটা বলিষ্ঠ জীবনবাদ থাকার যে আবশ্যিকতার কথা র‍ঁলা বলেছেন সে কথা আমরা স্বীকার করি না। শিল্প হ'ল শিল্পীর আন্তর ভাবকে প্রমূর্ত করা। আত্মঅনুভূতিকে পরোক্ষ হিসেবে দেখা, আত্মস্বতন্ত্ররূপে প্রত্যক্ষ করা। বস্তুজীবনের সঙ্গে এ অনুভূতি লোকের সম্পর্কের নৈকট্য এবং সাযুজ্য অত্যন্ত অল্প। আজকের যুগের সুররিয়ালিষ্ট বা কিউবিষ্টের দল যে শিল্পের সৃষ্টি করেছে তা' বাস্তববোধ বর্জিত। শিল্পীকে শিল্প সৃষ্টি করার জন্য স্বামী বিবেকানন্দ বা মার্টিন লুথার না হলেও চলবে। আমাদের মতে যে মানুষ দুঃখ পায় আর যে মানুষ শিল্পসৃষ্টি করে তারা একই দেহাশ্রিত হলেও তাদের মধ্যে আকাশ-মাটির ব্যবধান। আমরা এখানে এলিয়টের মতকেই সমর্থন করি।

র‍ঁলার মতে শিল্পেই শুধু মহাপ্রাণের দুর্নিবার শক্তির স্বাক্ষর থাকে না, সে স্বাক্ষর থাকে মানুষের নৈতিক জীবনে ও ধর্মে। যা কিছু মানুষের মনোধর্মের স্বীকৃতি পায় তারা হবে প্রাণ সম্পদে সমুজ্জল। স্বাস্থ্যে সম্পন্ন হওয়া র‍ঁলার মতে, অতি বড় কথা। সুস্থ ও বলিষ্ঠ মনন ধর্মই শিল্প সাহিত্যের জনয়িতা। এখানে র‍ঁলার মত গ্যেটের অনুপন্থী। গ্যেটে বলেছিলেন যে কবি যদি রুগ্ন হয়, তবে আগে সে সুস্থ হোক্, তারপর তার

কবিতা লেখা হ'বে। প্রাচীন গ্রীক পণ্ডিতদের মত গ্যেটে বিশ্বাস করতেন যে রুগ্ন দেহে সুস্থ মন বাস করতে পারে না, আর রুগ্ন মনে শিল্পতরু মুকুলিত হয় না। রঁলার গ্যেটের মতানুসারী। রঁলার মানসপুত্র জন ক্রিষ্টোফার অত্যন্ত বিস্তৃত আনন্দ-সম্পদের অধিকারী ছিলেন কেননা তাঁর ছিল অমিত প্রাণ প্রাচুর্য। দুঃখের তিমিরেও এই আনন্দটুকু অম্লান থাকত তাই ক্রিষ্টোফার কখন পলায়নী মনোবৃত্তিকে আশ্রয় করেন নি। চরম ক্ষতির দিনেও ছিলেন তিনি আনন্দিত তাঁর সদাচঞ্চল প্রাণশক্তির প্রেরণায়। এই শক্তি, এই বীর্য ক্রিষ্টোফারের মনের আনন্দের আলোটুকুকে অনির্বাণ রেখেছিল। রঁলার কথা উদ্ধৃত ক'রে দিই :

"To live is to live too much !...A man who does not feel within himself the intoxication of strength, this jubilation in living even in the depths of misery is not an artist. That is the touchstone. True greatness is shown in the power of rejoicing through joy and sorrow." (*John Christopher, Vol. II*, পৃঃ ১৭৭)

যে মানুষ আনন্দের সুধাপাত্র থেকে সর্বকালে তার প্রাণ পাথেয় আহরণ করে, সে হ'ল শিল্পী। যেখানে প্রাণের প্রাচুর্য নেই, সেখানে আনন্দের অভাব, শিল্পেরও অপমৃত্যু। তাই রঁলা ম্যুজিয়মে রক্ষিত শিল্পকলার নিদর্শনগুলোকে শিল্পের অগ্রগতির সমাধি ব'লে গ্রহণ করেছেন। এই মৃত মমীগুলো কেন নবীন শিল্পীর অফুরন্ত কল্পনাকে সীমায়িত করে দেবে? তারা মানবে কেন অতীতের এই মৃত স্তূপের উদ্ধত নির্দেশনা? ক্লাসিকের প্রাণহীন বিরাটত্ব নতুন যুগের নতুন শিল্পীদের চোখে অর্থহীন। রঁলা বললেন যে আমরা তখনই ভাগ্‌নারের সৃষ্টিকেও দলিত মথিত ক'রে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারব নবতর সৃষ্টির সম্ভাবনার ক্ষেত্রে যেদিন আমরা ভাগ্‌নারের অতীতকে পূজা না করার তত্ত্বকে পুরোপুরি গ্রহণ করব। জীবনের স্রোত 'ত' ইতিহাসকে সম্ভ্রম ক'রে তার দ্বারে থেমে থাকে না। সে নিত্য-নতুন ইতিহাসের সৃষ্টি ক'রে চলেছে। শিল্পীকে জীবনের সঙ্গে তাল রেখে চলতে হবে। এই জীবনের স্পর্শটুকু পেলে শিল্পীর আত্মরতির অবসান হয়, তার বন্ধনমুক্তি ঘটে। সমাজের দাসত্ব, ঐতিহ্যের বন্ধন ও আইনের নাগপাশ শিল্পীকে পীড়িত ক'রে না। শিল্পকে বলা হয়েছে 'নিয়তিকৃতনিয়মরহিতা'। কোন নিয়মের কাছে দাসখত লিখে দিলে মহৎ শিল্প ক্ষুণ্ণ হয়। সেখানে রসাভাস ঘটে। সর্ববন্ধন থেকে

মুক্তি দেয় মহৎ শিল্প সাধনার অবকাশ। পর্দা ঢাকা বন্ধঘরের কোমল সোফায় ব'সে যে শিল্পী সাহিত্য রচনা করে বিদ্যুৎ আলোর নীচে ব'সে সে সাহিত্যে এই বদ্ধ ঘরের পাংশু প্রাণের ছাপ পড়বে। সে সাহিত্য উজ্জ্বল মণি-কান্ত হ'য়ে কোনদিনই রক্ষিত হবে না বিশ্বের সাহিত্য ভাণ্ডারে। রঁলার স্মরণ পথে বার বার উদয় হয়েছে বীটোফেনের কথা। বীটোফেন মেঠো পথ দিয়ে হেঁটে যেতেন দুরন্ত ছেলের মত। জলে ভিজে রোদে পুড়ে ছোটাছুটি ক'রে বেড়াতেন পাহাড়তলীর পথে পথে। তার প্রাণপ্রাচুর্য আপনাকে সহস্রধারায় প্রকাশ করেছে কাজে এবং অকাজে। রঁলা এই স্বর্ণ প্রাণশক্তির বিকাশ দেখতে চেয়েছিলেন ফরাসী সাহিত্যে, শিল্পে এবং সঙ্গীতে। তাঁর বিশ্বাস ছিল এই প্রাণের লীলাটুকুই শিল্পকলায় প্রকট হয়। কিন্তু এই প্রত্যয় প্রত্যক্ষবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। আমরা জানি বহু শিল্পী, বহু গুণী ইতিহাসে তাঁদের রুগ্ন দেহের (তথা রুগ্ন মনেরও) সৃষ্টিকে অক্ষয় সৌন্দর্যে, অমেয় সম্পদে মহিমান্বিত ক'রে রেখে গেছেন। কবি কীটসের ক্ষয় রোগের কথা আমরা জানি। সে মহাব্যাধিও তাঁর কাব্য সৌন্দর্যকে কোথাও ক্ষুণ্ণ করেনি। অসুস্থ রবীন্দ্রনাথ ইংরেজীতে গীতাঞ্জলির অনুবাদ করলেন। ভগ্নস্বাস্থ্য কবি লিখলেন 'ডাকঘর' নাটক। তারা 'ত' অত্যুৎকৃষ্ট শিল্প হ'য়েছে, রসিক মনকে আনন্দধারায় অভিষিক্ত করেছে প্রতিনিয়ত। কবি হাউসম্যানের স্বীকারোক্তির কথা জানি। তিনি বলেছেন যে অসুস্থ না হ'লে তাঁর হাত দিয়ে ভালো কবিতা বেরোয় না। রুগ্ন দেহ মানুষের পশুপ্রবৃত্তিকে স্তিমিত করে রাখে তার শুদ্ধ সত্তাকে সর্বমালিন্য থেকে মুক্ত থাকতে সাহায্য করে। প্রাণশক্তির স্তিমিত স্রোত অন্যায়ের অনুকূল হয় না বলে আমাদের ধর্মে অনশনের প্রবর্তনা। শুধু প্রাচ্যদেশীয়দের কথাই বা বলি কেন পশ্চিমদেশীয় পণ্ডিত প্যাস্‌ক্যালও 'ত' এই মতের সমর্থন করেছেন। তিনি ভগ্নস্বাস্থ্যকে, রুগ্নজীবনকে নীতি এবং ধর্মের আদর্শ পীঠভূমি হিসেবে গণ্য করেছেন। আলডুস্ হাক্সলি প্যাস্‌ক্যালের মতের পুরোপুরি সমর্থন করেননি যদিও আংশিক সমর্থন কখন কখন জানিয়েছেন। যে তত্ত্ব নীতি এবং ধর্ম জীবনে প্রযোজ্য, তার প্রয়োগ শিল্প-জীবনেও ঘটবে কেননা মানুষের জীবন একটা সামগ্রিক সত্তা। যখন মানুষের আভ্যন্তরীণ পশুশক্তি স্তিমিত হ'য়ে আসে তখন আত্মিক শক্তির পূর্ণতর উন্মেষ ঘটে। সে শক্তি শিল্পে, ধর্মে, নীতিতে ও দর্শনে আত্মপ্রকাশ করে। হাক্সলি সাহেবের কথায় বলি :

"When not excessive sickness or physical defect may act as a reminder that the things of this world are not quite so important as the animal and the social climber in us imagine them to be. A mind which has made this discovery and which then succeeds as a result of suitable training in ignoring the distractions of pain and overcoming the temptation to think exclusively of its sick body has gone far to achieve that suprarational concentration of the will, at which the religious self education aims." *(Ends and Means*, পৃঃ ৩০৪)

মানুষের অধ্যাত্ম জীবনে ব্যাধি বা রুগ্নতা, প্রাণ প্রাচুর্যের অভাবের প্রয়োজনীয়তার আংশিক স্বীকৃতি লাভ করল। হাক্সলি সাহেব প্যাস্কালের কথায় সায় দিলেন।

রঁলার প্রাণ প্রাচুর্যের সঙ্গে শিল্পকে যুক্ত করার প্রয়াসটুকু গ্রীক ঐতিহ্যের দ্বারা প্রভাবিত বলে আমরা মনে করি। যে কোন জাতির শিল্প ইতিহাস অনেক শিল্পীর দারিদ্র্য, অনশন, ভগ্নস্বাস্থ্য ও ব্যাধির কথা আড়াল করে রেখেছে। এই দুঃখের, সর্বনাশের অনুচরদের শিল্পের মূল্য কমিয়ে দেবার বা তার মর্যাদা হানি করবার কোন শক্তি নেই। বরং এই দুঃখ, এই ব্যাধি, এই ক্ষতির দহনে শিল্পীর মনের আগুন জলে ওঠে অনির্বাণ শিখায়। প্রমিথিউসের আদিম স্বপ্ন বুঝি সার্থক হয়। শিল্পীর কল্পনা স্রোতে জলোচ্ছ্বাস ঘটে, এই দুঃখের, ব্যথার সংকীর্ণতায় ব্যাহত হয়ে ফোয়ারা সৃষ্টি হয়। আর কবি কল্পনার অনুপম শোভা সম্পদ রসিকজনকে যুগে যুগে আনন্দ দেয়। তাই বলি কবি-কল্পনাকে উজ্জীবিত করার জন্য কবির স্বাস্থ্যাধিক্যের প্রয়োজন নেই। বরং ব্যাধি, দারিদ্র্য, অনশন এদের প্রয়োজন আছে শিল্পীর জীবনে। আমাদের সবচেয়ে মধুময় গীতি-কণিকাটুকু চরম দুঃখের কথা বলে। সে দুঃখটুকুর, সে বেদনাটুকুর, সে অভাবটুকুর প্রয়োজন আছে শিল্পীর জীবনে। তাই রঁলার এই আনন্দের উপরে, স্বাস্থ্যের উপরে, প্রাণপ্রাচুর্যের উপরে আত্যন্তিক নির্ভরতা আমরা সমর্থন করতে পারি না। শিল্পীর জীবনে হয়ত এদেরও প্রয়োজন আছে। কিন্তু সে প্রয়োজন সামান্য। আরো বড় প্রয়োজন আছে অভাব-বোধের। সে অভাব হ'ল প্রাচুর্যের অভাব, স্বাস্থ্যের অভাব, পরিণতির অভাব। এই অভাববোধই শিল্পীকে নব নব প্রেরণায় প্রাণিত করে। সৃষ্টি কমল ফোটে সীমাহীন কালের স্পন্দিত সাগরে।

পিকাসোর শিল্প-দর্শন

পাব্‌লো পিকাসোর চিত্রকলা সম্বন্ধে নানান্‌ মুনির নানান্‌ মত। অধিকাংশ নির্বোধ দর্শকেরা ছবির নীচে পাব্‌লো পিকাসোর নাম লেখা না থাকলে পিকাসোর আঁকা ছবিগুলিকে নিঃসন্দেহে জঞ্জাল ফেলার ঝুড়িতে নির্বাসন দিতেন। আশ্চর্যের কথা, দু'চারজন বোদ্ধা সমালোচকের প্রশংসার কথা রাষ্ট্র হয়ে গেলেই সাধারণ দর্শকেরা অমনি শিল্পীকে বাহবা দিতে শুরু করেন। এই নির্বোধ সাধুবাদ দেওয়ার পিছনে বুদ্ধিদৃপ্ত বোধের কোন কারুকর্ম থাকে না। আমরা জানি, রবীন্দ্রনাথের ছবির বেলাতেও ঠিক এই কথাই সত্য। পল্‌ ভেলেরি, আঁদ্রে জিদ, প্রমুখ কলা-সমালোচকেরা প্যারিসে অনুষ্ঠিত রবীন্দ্র চিত্র প্রদর্শনীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে না উঠলে জানি না রবীন্দ্রনাথের ভাগ্যে চিত্রশিল্পী হিসেবে দেশেবিদেশে এতটা অভিনন্দন জুটত কিনা। পাব্‌লো পিকাসোর ছবি সম্বন্ধেও সেই একই কথা বলা চলে। খ্যাতনামা সমালোচকের চোখে ছবি ভাল লাগল; আর সেই ভাল লাগার খবরটা ছড়িয়ে পড়ল দেশেবিদেশে সংবাদপত্রে, রেডিও, টেলিভিশনের মাধ্যমে; লোক না বুঝে বাহবা দিল। সাংবাদিকের দল চটকদার বিশেষণে ভূষিত করে পাব্‌লোর ছবির জয়গান করলেন। ১৯২২ সালের আঁকা অতি সাধারণ ছবি "Mother & Child", ১৯২৯ সালে আঁকা 'Still life', ১৯২৪ সালে আঁকা 'Paul in clown suit' প্রমুখ ছবিকে নির্বোধ প্রশস্তিতে দর্শক সাধারণ ভরিয়ে তুলল। কিন্তু জয়গান করা ও সাধুবাদ দেওয়া এক কথা এবং সত্যি সত্যি ছবি ভালো লাগাটা হ'ল অন্য কথা। এই ছবি ভালো লাগাটা হ'ল হৃদয়ের ব্যাপার, বোধির ব্যাপার। বুদ্ধি এখানে তেমন ভাবে ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে না। ছবি দেখলাম, ছবি ভাল লাগল, সেটাই বড় কথা নয়। বিশ্লেষণ করে যদি অপরকে বলতে হয় যে ছবি কেন ভাল লাগল তাহ'লে আমাকে এমন যুক্তি-তর্কের অবতারণা করতে হবে যা বুদ্ধি আশ্রয়ী; আমাকে এমন ভাবায় আমার ভাল লাগাটাকে বোঝাতে হবে যা' অপরের কাছে বুদ্ধিগ্রাহ্য। এখন আমরা কিউবিষ্ট পাব্‌লো পিকাসোকে বোঝার চেষ্টা করি। তাঁর ছবির নানান্‌ পর্যায়; ব্লু পিরিয়ডের ছবি 'women ironing' ১৯০৪ সালে আঁকা, ১৯০৫ সালে আঁকা 'At the Latin Angle'; মনের এক একটা 'যুগ-অনুভূতি' এক একটা বিশেষ রংকে আশ্রয় ক'রে প্রকাশ পেয়েছিল; সে রং কখন ব্লু বা সাগর-নীল

আবার কখনো বা পিঙ্ক বা রক্ত গোলাপের মত। এই রং-এর ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে শিল্পী মানস নির্ভর ; এর কোন বস্তুতান্ত্রিক বা বিষয়-আশ্রয়ী ব্যাখ্যা নেই, যা একান্তভাবে নন্দনতাত্ত্বিক। এর মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা সম্পূর্ণরূপে শিল্পী মন আশ্রয়ী। পিঙ্ক পিরিয়ডের অথবা ব্লু পিরিয়ডের পিকাসোর চিত্রশৈলীর উৎসকে হয়ত আবিষ্কার করা যাবে কয়েকটি সমাজতান্ত্রিক, অর্থনৈতিক এবং ঐতিহাসিক সূত্রকে অবলম্বন ক'রে। এই তিনটি সূত্রকে আশ্রয় ক'রে যে জটিল ব্যাখ্যা প্রণালী উদ্ভূত হ'বে তা ব্যক্তিমানসে কীভাবে প্রতিক্রিয়া করে সেটুকুও বুঝতে হ'বে। কেননা সেটুকু না বুঝলে সহৃদয় হৃদয় সংবাদীর অনুভবের বার্তাটুকু আমাদের কাছে পৌঁছুবে না। তাই ঐ সূত্রত্রয়ীকে অবলম্বন ক'রে সবশেষে আমরা একটি মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যাসূত্র গ্রহণ করব। তবেই আমরা জীবন নাটকের কোন একটি দৃশ্যকে যথাযথভাবে অনুভূতিমূল্যে গ্রহণ করতে পারব ; বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারী ভাবের সংযোগে তবেই যথাযথ রসনিষ্পত্তি ঘটবে। হিটলার স্পেনের কোন পারাবত নীড়কে বিধ্বস্ত করল আর তার ছায়া ফুটে উঠল পিকাসোর ছবিতে। সংবেদনশীল শিল্পীমানস ব্যথা বেদনায় উদ্বেল হয়ে উঠল, সে উদ্বেলতার স্বাক্ষর রইল পিকাসোর ছবিতে। ১৯২৭ সালে আঁকা 'গুএরণিকা' ধর্মী আর একখানি বিখ্যাত ছবি ; Weeping Woman", সেই মূক বেদনার, নেই নিঃশব্দ ব্যথার পারাবার অশ্রুর মুক্তা ছড়িয়ে দিয়েছে দর্শকের মনের বেলাভূমিতে। ইতিহাসের পৈশাচিক 'ব্যতিক্রম' মানুষের সম্যক অনুভূতির সুউচ্চলোকে উত্তীর্ণ ক'রে দিয়েছে। এ সত্য ঐতিহাসিক সত্য, এ সত্য শিল্পী মনকে এমনিভাবে নাড়া দেয় ; সেই আলোড়নে রূপে রসে সমৃদ্ধ নতুন নতুন ছবির জন্ম হয়। এ সত্য সহজ মনস্তাত্ত্বিক সত্য। এটি শুধু যে পিকাসোর জীবনেই ঘটেছে তা' নয়, বিশ্ববরেণ্য অনেক শিল্পীর জীবনেই এটি ঘটেছিল। ইংরেজ কবির সেই বিখ্যাত উক্তি; 'I lisp in numbers for the numbers came'—কাব্যের যে স্বভাব গতির ইঙ্গিত করে বোধহয় তারই ইঙ্গিত রয়েছে পিকাসোর সেই ঐতিহাসিক উক্তিতে : 'Painting is stronger than I am. It makes me do what it wants' ; ছবি আঁকার ব্যাপারটা একটা স্বাভাবিক মানস প্রক্রিয়া —অবশ্য পিকাসোর পক্ষে ছবি আঁকতে না চাইলেও তাঁকে ছবি আঁকতে হ'ত। তা'হলে পিকাসোকে সাধুবাদ দেওয়ার বিশেষ কারণটি কি? এটি আমাদের প্রণিধান করে দেখতে হবে।

কিউবিস্ট পিকাসোর শিল্প দর্শন নিপুণ বিশ্লেষণ সাপেক্ষ। মুখকে চাঁদের সঙ্গে কবিরা উপমিত করেছেন। চাঁদের রূপ কিন্তু সরল রেখায় টানা যায় না; এরূপকে ফোটাতে হ'লে বক্র রেখার আশ্রয় নিতে হয়। সোজা লাইনকে ভেঙ্গেচুরে গোলাকৃতি করে তুলতে হয়। তারপর এখানে ওখানে একটু আধটু ভাঙ্গন ধরিয়ে চাঁদের মূর্তিটি গড়ে তোলা হয়। জ্যামিতি বাক্সের কম্পাসে পেন্সিল পরিয়ে ধাঁ ক'রে একটা পূর্ণবৃত্ত অঙ্কন করলে চাঁদের রূপটুকু পাওয়া যায় না। আবার গোলাকৃতি হ'লেও চাঁদের বৃত্তবলয় আর মানবমুখের বৃত্তবলয়ের মধ্যে অনেক তফাৎ থেকে যায়। তবুও কবিরা চাঁদের সঙ্গে মানুষের মুখের তুলনা করেছেন কেননা সরলরেখাকে একই পদ্ধতিতে বক্র ক'রে তুলতে চাঁদের সৌন্দর্যকে মানুষের মুখাবয়বের মধ্যে প্রত্যক্ষ করা যায়। রেখাকে বঙ্কিম করে অর্থাৎ সরল রেখায় নানান্ ধরনের ভাঙ্গচুর করে সুন্দরকে রেখাশ্রয়ী করে তোলা যায়। সুতরাং সুন্দরকে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে এক্ষেত্রে সরলরেখাকে বক্ররেখা করে তুলতে হবে। স্বভাবোক্তিকে বক্রোক্তির রূপরেখায় প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। শিল্পপ্রাণ হিসেবে বক্রোক্তির ব্যাখ্যা বক্রোক্তি-জীবিতকার কুন্তকাচার্য করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন বক্রোক্তিই রসের জীবাতু। রসোত্তীর্ণ কাব্য লিখতে হ'লে বক্রোক্তির মধ্য দিয়ে কবিকে তার কাব্য কথা বলতে হবে। শিল্পীরাও এর ব্যতিক্রম নন। এই কাজটিই শিল্পীরা করেছেন আবহমান কাল ধরে। বাল্মীকি, হোমার, কালিদাস, এঁরা সবাই এই কাজটুকুই করেছেন। বড় বড় চিত্রশিল্পী, বাইজান্তিয় চিত্রশিল্পী, প্রাচীন ভারতীয় চিত্রশিল্পী, এঁরা সবাই বক্রোক্তিবাদী। রবীন্দ্রনাথ সেদিন বলেছিলেন: "সহজ সুরে সহজ কথা শুনিয়ে দিতে তোরে সাহস নাহি পাই।" পৃথিবী জোড়া বক্রোক্তিবাদের বন্যার সামনে দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথ সহজসুরে সহজ কথা বলতে ভয় পেলেন। পাব্‌লো পিকাসো নির্ভীক অথচ দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে গিয়ে এই বক্রোক্তিবাদকে প্রতিহত করলেন। কিউবিস্ট পিকাসো সোজা সোজা লাইন টানলেন। প্রকৃতির বাইরের জটিলরূপের অন্তরে তিনি দেখলেন সরলরেখা আশ্রিত নানান ধরনের জ্যামিতিক রূপ, সে সব জ্যামিতিক রূপ কিন্তু সরলরেখার দ্বারা গঠিত। এই সরলরেখার জাদু আমরা বিস্মৃত হতে বসেছিলাম। একদিন এই জাদু কাজ করেছিল প্রাচীন মিশরীয় শিল্পে, প্রাচীন নিগ্রো আর্টে। যে শক্তি, যে বীর্য, যে সৌন্দর্য, এই সরলরেখাকে আশ্রয় করল পাব্‌লো পিকাসোর

কিউবিষ্ট ছবিতে, তার সঙ্গে পরিচয় আছে শিল্প ইতিহাসের ছাত্রদের। তাই পিকাসো যখন সরলরেখার আশ্রয়ে চিত্ররূপ ফুটিয়ে তুলতে চাইলেন তখন তাত্ত্বিকেরা কিউবিজমের শিল্পদর্শনটুকুকে দুটি সহজ প্রাচীন প্রবাদে প্রকাশ করলেন: (১) Strength is beauty এবং (২) A straight line is stronger than a curved line.

আদিম মানুষের শক্তিপূজার তত্ত্বটি ঐ প্রথমোক্ত বচনের মধ্যে নিহিত। মানুষ শক্তিমানকে 'ভয়ঙ্কর সুন্দর' ভেবে পূজো করেছিল, শ্রদ্ধায় নয়, ভয়ে। শক্তি এবং সৌন্দর্যের সমীকরণ পরিণত মানুষের পরিশীলিত মননের কাছে তেমনভাবে আবেদন করে না। ফুল বা নারীর সৌন্দর্য শক্তির দ্যোতক না হ'য়েও আমাদের মনোহরণ করে। সুন্দরী রমণীর মুখের ডৌলটি গোলাপের পাপড়ির অপূর্ব ব্যঞ্জনা বক্ররেখাকে আশ্রয় ক'রে প্রমূর্ত হয়ে ওঠে। সমান্তরাল সরলরেখার চেয়ে আবার বক্ররেখা যে অনেক শক্তিশালী সেটা বাস্তুকার এবং স্থপতিরা জানেন। তাই তাঁরা সেতু নির্মাণে দিগন্তবিস্তারী সমান্তরাল রেখার চেয়ে বৃত্তাকার রেখাকে বেশী প্রাধান্য দেন; সেতুর শক্তি বৃত্তাকার 'আর্চের' শক্তি। তা হলে কিউবিজমের মূল দু'টি সূত্রকেই বর্জন করতে হয়।

এ কথা আমরা পূর্বেই বলেছি যে সরলরেখার জাদুই হল কিউবিষ্ট আর্টের মর্মকথা। রিচার্ড ও অগডেন কথিত "Meaning of Meaning" পিকাসো ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন তাঁর এই কিউবিষ্টধর্মী ছবিতে; এই জাদুতেই মুগ্ধ হয়েছেন এক শ্রেণীর দর্শক ও সমালোচকের দল। ছবি পরিচিত অর্থকে অতিক্রম ক'রে অনাস্বাদিত-পূর্ব ব্যঞ্জনায় মণ্ডিত হ'য়ে উঠেছে তাদের চোখে। বহু সমালোচকের চোখে তাও ধরা পড়ল। তাঁর প্রথম পর্যায়ের কিউবিজমে পিকাসো চোখে দেখা প্রাকৃতিক রূপগুলোকে, মানুষের মুখ, তার বহিরাবয়ব, নিসর্গ শোভা—এ গুলোর অন্তরে অনুস্যূত জ্যামিতিক রূপকে ধ'রে দিলেন তাঁর ছবিতে। এই যুগের বিখ্যাত ছবি: 'Head of a lady in a Mantilla'। তার পরে তাঁর কিউবিষ্ট চিত্রশৈলী যখন আরো পরিণত হ'য়ে উঠল তখন তাঁর শিল্পে দ্বিতীয় যুগের সূত্রপাত। জ্যামিতিক রূপগুলোর স্থানান্তরীকরণ ঘটল এ যুগে: তারা তাদের প্রাকৃতিক ক্রমকে লঙ্ঘন করে ছবির পরিপ্রেক্ষিতে ব্যতিক্রম স্থানে আরোপিত হ'ল। উদাহরণ দিই পিকাসোর "Potrait of M. Kahnweilar" ছবিটির; বলতে পারি পিকাসো চোখে দেখা জ্যামিতিক রূপের অনেকগুলো টুকরো নিয়ে গাণিতিক permutation

ও combination এর খেলায় মেতে উঠলেন। সাদা চোখে অদেখা রূপের জগত ফুটে উঠল পিকাসোর ছবিতে। তাঁর সব ছবির সৌন্দর্য ও ব্যঞ্জনা যে আমাদের চোখে ধরা পড়েছে তা নয়। তবু এ কথা বলা চলে যে তিনি রূপের জগতের একটা নতুন দিক উদ্ঘাটিত ক'রে দিয়েছেন। পরাতাত্ত্বিক, দার্শনিক যেমন নতুন ক'রে আমাদের পরিচিত জগতকে দে'খে তার অদ্ভুত ধরনের বিশ্লেষণ দিয়েছেন ঠিক তেমনি ক'রে পিকাসোর ছবির জগত একটা অদ্ভুত রূপের জগতকে আমাদের কাছে মেলে ধরেছে। অদ্ভুত রস ও ভারতীয় রসশাস্ত্রে রস ব'লে স্বীকৃত ; অতএব কিউবিষ্ট পিকাসো অদ্ভুত রসের প্রবর্তন করলেও তাঁকে ভারতীয় নন্দনতত্ত্বের ব্যাখ্যা সূত্র দিয়ে বুঝে নিয়ে মহৎশিল্পীর মর্যাদা দেওয়া যায়। সরলরেখাই সৌন্দর্যের আকর এবং শক্তিই সৌন্দর্য—এই ধরনের অযৌক্তিক ব্যাখ্যাসূত্র গ্রহণ না করেও আমরা পিকাসোর কিউবিষ্ট চিত্রশৈলীকে সাধুবাদ দিতে পারি। অদ্ভুত রস ও ব্যঞ্জনা আশ্রয়ী। সে ব্যঞ্জনা আমরা কেউ কেউ প্রত্যক্ষ করেছি পিকাসোর কোন কোন ছবিতে। সবাই যে তা করতে পারি নি এটা সত্য। অবশ্য আমরা সবাই ত' সামনে রাখা টেবিলটাকে তার 'সম্পূর্ণরূপে' দেখতে পাই না ; তার কিছুটা দেখি এবং কিছুটা কল্পনা ক'রে নিই। এই সহজ সত্যটিকে আমরা সহজে স্বীকার করতে চাই না। কেননা টেবিলটাকে দেখার সময় 'দৃশ্য' অংশ এবং 'কল্পিত' অংশের ভেদটুকু করতে আমরা ভুলে যাই। এই ভেদটুকু দার্শনিকের চোখে ধরা পড়ল। তেমনিধারা পিকাসোর চোখে নানান্ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা প্রাকৃত জগতের যে রূপটুকু ধরা পড়ল তা আমাদের মত অধিকাংশ মানুষের চোখেই অদেখা। আমরা প্রাকৃত রূপটুকুকে অভ্যাসগত প্রাকৃত রূপেই দেখি। পিকাসো সেই প্রাকৃত রূপের সহজ ছন্দোময় রূপটুকুকে সরল রেখাশ্রয়ী ক'রে প্রত্যক্ষ করলেন। তাই তাঁর দেখা এবং আমাদের দেখার মধ্যে পার্থক্য রইল। সেই পার্থক্যটুকু যখন ছবিতে ফুটে উঠল তখন আমাদের মনে তা অদ্ভুত রসের সৃষ্টি করল। পিকাসোর ছবি তাই রসোত্তীর্ণ হ'ল। আর তা কেমন ক'রে হ'ল সে তত্ত্ব হ'ল অনির্বচনীয় তত্ত্ব। আমরা আবার তন্ত্রশাস্ত্রের উপমাটি উদ্ধার করে বলব যে শিল্প হ'ল পাখীর এক গাছ থেকে আর এক গাছে উড়ে যাওয়া। আকাশে উড়ে যাওয়ার চিহ্ন থাকে না কোথাও। পিকাসোর শিল্পের যাত্রাপথও তাই এই অনির্বচনীয় রহস্য ঘেরা। যারা তাকে বুঝবে তারা 'আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি'।

কার্ল মার্কসের নন্দনতাত্ত্বিক সূত্র

কার্ল মার্কস্ ও এঙ্গেলসের নন্দনতত্ত্বের তুলনামূলক আলোচনা দিয়ে এই প্রবন্ধের সূত্রপাত করি। এমন কথা পশ্চিমদেশের পণ্ডিতেরা বলেন যে কার্ল মার্কসের রুচি ছিল ইউরোপীয় রুচি এবং ফ্রিডিক এঙ্গেলসের রুচি ছিল মূলতঃ জার্মান এবং তার বনিয়াদও ছিল আঞ্চলিক উৎকর্ষ-অপকর্ষ ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। মার্কসের নন্দনতাত্ত্বিক ধারণা বস্তুতান্ত্রিক বাস্তবতা বিবর্জিত বললে সত্যের অপলাপ করা হবে না; অপরপক্ষে এঙ্গেলস্ বাস্তবতা তত্ত্বে ঘোরতর বিশ্বাসী ছিলেন। এঙ্গেলস্ হাতে কলমে সাহিত্য সমালোচনার কাজ করেছিলেন, মার্কস দেশের ক্ল্যাসিক্যাল সাহিত্য-ঐতিহ্যকে সাগ্রহে গ্রহণ করেছিলেন। বন্ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথিতযশা অধ্যাপক শ্লেগেলের কাছে তিনি দর্শন এবং নন্দনতত্ত্বের পাঠ নিয়েছিলেন। এইভাবে উভয়ের মধ্যে ভিন্নধর্মী নন্দনতাত্ত্বিক মানসিকতা গড়ে উঠলেও তাঁরা তাঁদের শিল্প চেতনায় পরস্পরকে যে প্রভাবিত করেছিলেন, সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নেই। নির্বস্তু চিন্তনে এবং সুসম্বদ্ধ তর্কজাল বিস্তারে কার্ল মার্কস ছিলেন অনন্যসাধারণ প্রতিভা। এঙ্গেলসের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত সংবেদনশীলতা অতি মাত্রায় সুপ্রকট। বিশ্ববিদ্যালয়ের ধারাবাহিক শিক্ষা-শৃঙ্খলা কার্ল মার্কসের মানসিকতায় যে সুবিন্যস্ত পারম্পর্য বোধ সৃষ্টি করেছিল তার কিন্তু অভাব ছিল এঙ্গেলসের মনে। ঐতিহাসিক বলেন, কার্ল মার্কস দু-দুবার ধারাবাহিকভাবে নন্দনতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করার জন্য প্রয়াসী হয়েছিলেন। ১৮৪১-৪২ সালের শীতে মার্কস্ হেগেলের শিল্পতত্ত্ব ও ধর্মতত্ত্বের বিস্তৃত পর্যালোচনা করার জন্য যে প্রস্তুত হয়েছিলেন তার সাক্ষ্য প্রমাণ রয়েছে এই মনীষীর জীবন ইতিহাসে।

মার্কসীয় নন্দনতাত্ত্বিক ধারণাকে এক কথায় 'হিষ্টোরিসিজম্' কথাটির দ্বারা সূচিত করা হয়ে থাকে। শিল্প হ'ল মানুষের সাংস্কৃতিক কর্মকুশলতার নিদর্শন। সামাজিক-ঐতিহাসিক বিবর্তন ধারার মধ্য দিয়ে মানুষ আপনার অন্তরস্থ সত্যটুকুকে উপলব্ধি করে এবং সেই উপলব্ধির পথে শিল্প হ'ল একটি পদক্ষেপ। মানুষের বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক কৃতি সমূহের একটি যে এই শিল্পকলা তা মানুষের অন্যান্য কর্মকুশলতাকেও প্রভাবিত করে। মানুষের নৈতিক কর্ম, তার ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ ও তার শিল্প চেতনায় রূপান্তর ঘটায়। এই ধরনের পারস্পরিক প্রভাবের জোয়ার ভাঁটা মনুষ্য

সমাজ গঠনে আমৃত্ত কাল জুড়ে চলেছে এবং চলবে। কোন একটি বিশেষ কালের পরিপ্রেক্ষিতে যেমন মানুষের ভিন্নধর্মী ক্রিয়ার পারম্পর্যকে প্রভাবিত করার এই তত্ত্বটুকু সত্য বলে মার্কস্ স্বীকার করেছেন তেমনি আবার নিরবধিকালের পটভূমিকায় মানুষের বিভিন্ন ধরনের অতীত কীর্তি কলাপ যে ভবিষ্যৎকালের সাংস্কৃতিক কৃতিকে প্রভাবিত করে, এ কথাও বলেছেন অসংকোচে। এই সুবৃহতত্ত্বের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি 'Synchronic ও diachronic' প্রভাবের কথা স্বীকার করেছেন। সমাজশ্রেণীর আভ্যন্তরীণ সাধারণ দ্বন্দ্ব ও আনুষঙ্গিক বিবর্তন মানুষের দৃষ্টিভঙ্গীর আদর্শবাদী রূপ দেয়; এই রূপান্তরিত দৃষ্টিভঙ্গী আবার মানুষের শিল্পকর্ম এবং নন্দনতাত্ত্বিক ধারণাকে ক্রমান্বয়ে প্রভাবিত করে। মানুষের মনে যখন কোন বিশেষ ধরনের আদর্শান্বিত ভাব-ভাবনা বাসা বাঁধে তখন তা চূড়ান্ত বলে কখনোই চিরকাল গণ্য হয় না। কিছুদিনের মধ্যে নতুন ধরনের চিন্তার উদ্ভবের ফলে নতুন ধরনের দৃষ্টিভঙ্গী জন্ম নেয়। এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গী পুরাতন ভাব-ভাবনাকে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে আহ্বান করে এবং তাদের পরাস্ত করতে গিয়ে নিজেদের মধ্যে কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটিয়ে ফেলে। এই ব্যাপারে মানুষের অনুভূতি এবং ইচ্ছাশক্তির ভূমিকা খুবই সক্রিয়। শিল্পের উৎপত্তি এবং শিল্পের ভূমিকা সম্বন্ধে মার্কসের সমস্ত নন্দনতাত্ত্বিক বিচারই ইতিহাস আশ্রিত; অর্থাৎ ইতিহাসের পটভূমিতে শিল্পের মূল্যায়নের কথা কার্ল মার্কস্ বললেন। এঙ্গেলস্ তাঁর সঙ্গী এ ব্যাপারে এক মত হলেন। মানুষের সভ্যতার বিবর্তনের পরিপ্রেক্ষণায় শিল্প-বিবর্তনের গুহ্য তত্ত্বটুকু অবারিত হয়ে ওঠে। এই সভ্যতার বিবর্তন বলতে মার্কস বুঝেছেন শ্রেণী সংগ্রাম আর অত্যাচার, অবিচার এবং অনির্বাণ ক্ষুধার হাত থেকে সংগ্রামী মানুষ যে নিত্য মুক্তি কামনা করেছে, তার সেই মরণজয়ী মুক্তি কামনাটুকুকে। এই সভ্যতার বিবর্তনের পথে 'Homo Faber' অর্থাৎ যে মানুষ হাতে কলমে কাজ ক'রে জিনিসপত্র তৈরী করে সেই মানুষই তার হাড়ভাঙ্গা খাটুনী ও জগৎ জোড়া অজ্ঞানতার বিনিময়ে এক ধরনের সহজ জীবনযাত্রা খুঁজে পাবে; এই সহজ জীবনযাত্রা হবে খেলার মাধুর্যে এবং সরলতায় ভরপুর। মার্কসীয় এই লীলাতত্ত্বে বলা হয়েছে যে মানুষ তার নন্দনতাত্ত্বিক এষণার পূর্ণ অভিব্যক্তি ঘটাবে এই ধরনের লীলাময় জীবনযাত্রার মাধ্যমে। 'Homo Faber' অর্থাৎ মেহনতী মানুষ 'Homo Aestheticus' অর্থাৎ শিল্পী মানুষে রূপান্তরিত হবে। তার শিল্পী জীবনের সবটুকু সম্ভাব্যতা সত্য হয়ে উঠবে। মানুষের শিল্প কর্ম

তাঁর অন্যান্য নানাবিধ ক্রিয়াকলাপের দ্বারা অন্বিত। মার্কসের মতে মানুষের এই শিল্প এষণা ও শৈল্পিক প্রকাশের আপেক্ষিক স্ববশতা রয়েছে। তাঁর ইতিহাসবাদ বা Historicism শিল্পের এই আনুপাতিক স্ববশতাকে স্বীকার করেছে।

ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতার সঙ্গে তার মৌল ভাব-ভাবনার সঙ্গে শিল্পের একটা নিগূঢ় সম্পর্ক কার্ল মার্কস্ স্বীকার করেছেন। মার্কসবাদীদের নন্দন-তাত্ত্বিক ধারণা যে তিনটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত তারা হল: (১) মানুষের সকল কৃষ্টিমূলক কৃতির মূলে যে পরিশ্রম রয়েছে সেই পরিশ্রমটুকু; (২) জাতির অগ্রগতির জন্য যে সামাজিক বিপ্লব মূলতঃ দায়ী সেই বিপ্লবের কালটুকু এবং (৩) কমিউনিজমকে লক্ষ্য হিসেবে অগ্রগণ্য করা—তা এবং তার ঐতিহাসিক গতিশীলতার পূর্ণচ্ছেদের বাস্তব রূপায়ণ যে কমিউনিজমে তাদের এই উভয়বিধ ধারণাটুকু। কায়িক পরিশ্রমকে শিল্পচেতনার মূল উপাদান হিসেবে গ্রহণ করার কথা কার্ল মার্কস্ বললেন। অলস জীবনের কর্মহীন স্রোতোপথে যে শিল্পের সৌন্দর্য শতদল প্রস্ফুটিত হয় না, সে কথা তিনি দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে ঘোষণা করলেন। এই প্রসঙ্গে আমরা ফরাসী মনীষী রঁলার কথা স্মরণ করতে পারি। তিনিও বার বার বললেন যে অলস শিল্পীর জীবন সার্থক শিল্পকৃতির ঐশ্বর্যে কখনই ঐশ্বর্যবান হয়ে ওঠে না। মানুষের কায়িক পরিশ্রম সর্ববিধ শিল্প এষণার পাদপীঠ; শিল্পকৃতি কখনই মেহনতী মানুষের মেহনত বা কায়িক পরিশ্রম থেকে জাত বিষয় নয়। বৈপ্লবিক সামাজিক পরিবর্তন যে পথে আসে, সেই সংগ্রামী মানুষের মৃত্যুপণ করা সংগ্রামের প্রতি সাধারণ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গীটুকু নিরূপিত ও নির্ধারিত করে দেয় চারুশিল্প। তাই কার্ল মার্কস্ বললেন যে চারু শিল্প সম্বন্ধে আগের যুগের ধারণা ছিল যে শিল্প মানুষের রুচির নিয়ন্তা; তা মানুষের রুচিকে সুরুচির মর্যাদা দেয়। শিল্পের মুক্ত আকাশে মানুষের চিত্ত মুক্তি পায় স্বচ্ছন্দ বিচরণে। সেই স্ববশ স্বচ্ছন্দ বিহারী-শিল্পকলাকে মার্কস্ দেখলেন কমিউনিস্ট আদর্শ ও আন্দোলনের বাহন হিসেবে। শিল্প মেহনতী মানুষের মুক্তির পতাকা বহন করবে। এই সত্যটুকু তিনি প্রচার করলেন।

সমাপ্ত

নন্দনতত্ত্ব

গ্রন্থপঞ্জী

অলংকার কৌস্তভ : কবিকর্ণপুর

অভিনবগুপ্ত : ধ্বন্যালোকলোচন

অরবিন্দ, শ্রী : (The) Foundations of Indian Culture
The Future of Poetry
Hindu Drama
The Human Cycle
Kalidasa
Last Poems
Letters of Sri Aurobindo on Savitri
Life, Literature and Yoga
The National Value of Art
Our Ideal
Two Letters of Criticism
Vyasa and Valmiki

আইজেনবর্গ, এ : Aesthetic Function of Language

আইয়ুব, এ, এ, স, : The Aesthetic Philosophy of Tagore

আনন্দবর্ধন : ধ্বন্যালোক

আবোল তাবোল : সুকুমার রায়

আরনেষ্ট ক্যাসিরের : An Essay on man

আরিস্ততল : Poetics

আরুইন এডম্যান : Art and the man

ইয়েটস : The Rose in the heart

ইণ্ডিয়ান পেন্টিং : Times of India Annual

এলিয়ট, টি, এস্, : Tradition and Individual Talent.

এ্যাবারক্রম্বি, লেজলি Principles of Literary Criticism

এ্যারিষ্টটল অন্ দি আর্ট
অব পোয়েট্রি : অনুবাদক : ইনগ্রাম বাইওয়াটার
ওকাকুরা : Ideals of the East
ওগডিন ও রিচার্ডস্ : The Meaning of Meaning
ওয়ালেক ও ওয়ারেন : Theory of Literature
ঔচিত্যবিচারচর্চা : ক্ষেমেন্দ্র
কডওয়েল ক্রিষ্টোফার : Illusion and Reality
কনটেম্পোরারি ইণ্ডিয়ান
ফিলজফি : Edited by S. Radhakrishnan & Muirhead
কবির হুমায়ুন : Poetry, Monod and Society
কলিংউড, আর জি : The Principles of Art.
কাজিন, এম ভি : Lectures on the True, the Beautiful and the good.
কাজিনস্ জে এইচ : Tagore on Tagore.
কাণ্ট, ইমান্বুয়েল : Critique of Judgment.
কালিদাস : শকুন্তলা, বিক্রমোর্বশী, উত্তররামচরিত
কার উইলডন : Philosophy of Croce.
কুন্তক : বক্রোক্তিজীবিত
কুমারস্বামী : রত্নার্পণ
কুমারস্বামী আনন্দ কেন্টিশ : Arts and crafts of India and Ceylon, Citralaksana, History of Indian & Indonesian Art, Introduction to Indian Art, The Indian craftsman, Raj Put Painting, The Indian origin of the Buddha Image, The Dance of Siva, Some ancient elements in Indian decorative Art.
কেয়ার্ড, এডওয়ার্ড : Hegel,
Idealism and the Theory of knowledge.

কোরজিবিস্কি এ্যালফ্রেড: Science and Soceity.

ক্যারু টমাস: To a Lady that desired I would love her.

ক্যারিট: What is Beauty.
Theory of Beauty.

শ্রীকৃষ্ণদাসকবিরাজ: চৈতন্যচরিতামৃত

ক্রোচে বেনেদেত্তো: Aesthetic, My Philosophy, The Esence of Aesthetics, What is living and what is dead in the philosophy of Hegel.

গীতিচর্চা: দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত

গুপ্ত অতুলচন্দ্র: কাব্যজিজ্ঞাসা

গুপ্ত নলিনীকান্ত: Tagore, a great poet, a great man.

গুপ্ত মনোরঞ্জন: রবীন্দ্রচিত্রকলা

গ্রাউসে রেনি: The Civilisation of the East.

ঘোষ, এস্ কে: Sri Aurobindo on Indian Aesthetics.

ঘোষ মনমোহন: প্রাচীন ভারতের নাট্যকলা

ঘোষ শান্তিদেব: রবীন্দ্রসঙ্গীত

চক্রবর্তী অজিত: কাব্যপরিক্রমা

চক্রবর্তী আর এন সম্পাদিত: Early works of Abanindranath Tagore.

চট্টোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্র: আনন্দমঠ

চট্টোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র: তত্ত্বজিজ্ঞাসা

চট্টোপাধ্যায় সুনীতিকুমার: Master Artist and Innovator.

চণ্ডীদাস: শ্রীরাধার পূর্বরাগ

চৌধুরী প্রবাসজীবন: Tagore on Literature and Aesthetics,
রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য দর্শন

চৌধুরী বিশ্বপতি: কাব্যে রবীন্দ্রনাথ

চৌধুরাণী ইন্দিরাদেবী: The Music of Rabindranath Tagore.

জগন্নাথ: রসগঙ্গাধর

জার্নাল অব দি ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েণ্টাল আর্ট (সুবর্ণ জয়ন্তী সংখ্যা) জার্নাল অব ঈসথেটিকস্ এণ্ড আর্ট ক্রিটিসিজিম্ ১৯৪৮-৫০

জীফ পল : Semantic Analysis.

জীমার : The Arts of Indian Asia.

জেণ্টিলে : The Theory of Mind as pure Act.

জেলার : Outlines of Greek Philosophy.

ঠাকুর অবনীন্দ্রনাথ : বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী, ভারত শিল্পে মূর্তি, ভারত শিল্পের ষড়ঙ্গ, ঘরোয়া।

ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ : অচলায়তন, অরূপরতন, আকাশ-প্রদীপ, আত্মশক্তি, আধুনিক সাহিত্য, আশ্রমের রূপ ও বিকাশ, ইতিহাস, উৎসর্গ, ডাকঘর, গীতাঞ্জলি, ধর্ম, Modernity in Literature, Religion of Man, যাত্রী, সাহিত্যের পথে, সাহিত্যের স্বরূপ, শান্তিনিকেতন, শিক্ষা, শ্যামলী, পঞ্চভূত Personality, Religion of an Artist, ঋতু উৎসব, কালমৃগয়া, কালের যাত্রা, কল্পনা, কালান্তর, চিরকুমার সভা, চৈতালি, চিত্রাঙ্গদা, চিত্রলিপি, চিত্রবিচিত্র, ছিন্নপত্র, জীবনস্মৃতি, জন্মদিনে, ডাকঘর, তপতী, তাসের দেশ, খাপছাড়া, পরিশেষ, পরিচয়, পথে ও পথের প্রান্তে, পুনশ্চ, প্রান্তিক, প্রভাত সঙ্গীত, সন্ধ্যাসঙ্গীত, বলাকা, বনবাণী, বিদায় অভিশাপ, বিবিধ প্রসঙ্গ, বীথিকা, বিশ্বপরিচয়, শেষ লেখা।

ডোনাল্ডসন্ আই : Essays in Criticism.

ডিউই : Philosophy of Civilisation.

ডিজাইন এণ্ড ফিগার কার্ভিং : E. G. Tangerman.

ডিজাইন এণ্ড এক্সপ্রেশান ইন্ দি ভিজুয়াল আর্টস : F. A. Taylor.

ডিজাইন্ ফর আর্টিস্ট্ এণ্ড ক্রাফটসমেন : Louis Wolchonok.

তৈত্তিরীয় উপনিষদ

দত্ত ধীরেন্দ্রমোহন : Contemporary Indian Philosophy.

দান্তে : Epistle.

দাশগুপ্ত শশীভূষণ : শিল্পলিপি।

দাশগুপ্ত সুধীরকুমার : কাব্যালোক।

দাশগুপ্ত সুরেন্দ্রনাথ : কাব্যবিচার, Fundamentals of Indian Art.

দে বিষ্ণু : Rabindranath Tagore—Our Modern Painter.

ধনঞ্জয় : দশরূপক

ধাওয়া : History of Symbolism.

নক্স, এ : The aesthetic theories of Kant, Hegel & Schopenhauer.

নরবানে ভি. এম্ : The Ethics of Rabindranath Tagore.

নন্দী সুধীরকুমার : Aesthetics of Romain Rolland, An Enquiry in to the nature & Function of Art, On Aesthetic & Ethical values, Studies in modern Indian aesthetics, রবীন্দ্রদর্শন অন্বীক্ষণ, ললিতকলা ও জনমানস, রূপান্তরের দুর্গমপথে, দর্শন-চারিত্র্য।

নাহম ম্লিণ্টন সি : Structure and the Judgment of Art.

নিবেদিতা সিষ্টার : Art reviews in modern Review, ১৯০৭ এবং ১৯১০।

নিয়োগী পৃথ্বীশ : Centenary Folio of Tagores Paintings.

পন্টি, মেরিলিন : The Phenomenology of perception.

পুনেকর শংকর মোকাশি : The later phase in the development of W. B. Yeats.

প্লেতো : Republic ; Ion ; Phaedrus ; Complete Works of Plato.

প্লুতার্ক : How a youngman ought to study Poetry.

প্রিন্সিপলস্ অব আর্ট হিষ্টি : Heinrich Wolfflin.

ফলকেনবর্গ রিচার্ড : History of Modern Philosophy.

ফাইফ্ ডব্লু হ্যামিল্টন্ : Aristotle's Art of Poetry.

ফাউন্ডেশনস্ অব মডার্ন আর্ট : Amadee Ozanfant.

ফ্রাই রোজার : Vision and Design.

ফ্রোবেল : Education of Man.

বউমগার্টেন : Aesthetica.

বওমার, এস্ : An Introduction to Tagore's Mysticism.

বওয়ার অটো : Die Nationalitatenfrage und die Sozialdemokratie.

বওয়িক : On the Laws of Japanese Painting.

বসু, এস্ এন্ : The Art of Pirandello.

বন্দ্যোপাধ্যায় অসিত কুমার : সাহিত্য জিজ্ঞাসায় রবীন্দ্রনাথ

বন্দ্যোপাধ্যায় কণক : রবি পরিক্রমা।

বন্দ্যোপাধ্যায় হিরণ্ময় : রবীন্দ্র দর্শন,
রবীন্দ্রশিল্পতত্ত্ব।

বসু অরবিন্দ : The Integration of Spritual Exprience.

বসু, এ : Dr. Brojendra Nath seal as a literary Critic.

বসু ধীরেন্দ্রমোহন : আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল।

বিবেকানন্দ, স্বামী : স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা।

বিষ্ণুপুরাণ :

বুদ্ধ ঘোষ : অথশালিনি

বেল ক্লাইভ : Art.

ব্যাবিট, আরভিং : The New Laokoon.

ব্ল্যাক ম্যাক্স : Language and Philosophy.

ব্রজেন্দ্রনাথ শীল : পশ্চিমে ও পূর্বে রবীন্দ্রনাথের আদানপ্রদান : শতবার্ষিকী গ্রন্থ।

ব্রাডলি : Appearance & Reality.

ব্রুক রুপার্ট : Great Love

বিনিয়ন : The Flight of Dragon.

বিদ্যাধর : একাবলী

বিশী প্রমথনাথ : রবীন্দ্রকাব্য-প্রবাহ
রবীন্দ্রনাট্যপ্রবাহ
রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প

বুঁলো মার্গারেট : Psychical distance as a factor in Art and an Aesthetic Principle

বুচার : Poetry & Fine Arts

বিশ্বনাথ : সাহিত্য দর্পণ

বোপদেব : মুক্তাফল

বার্নার্ড বোসাংকে : History of Aesthetic
Principle of Individuality & Value

ব্রেশ্‌ট বের্ট্রোল্ড : Three Penny opera : The life of Galileo, Man is man ; Mother Courage ; Baal ; Dream in the night ; The Rise and fall of Mahoganny city ; The Exception and the Rule ; The Measures taken ; The seven deadly sins ; Caucasian chalk circle ; The good woman of Setzuan ; Puntilla and her man Malti.

ভট্টাচার্য বিষ্ণুপদ : কাব্য কৌতুক
সাহিত্য মীমাংসা

ভরত : নাট্যশাস্ত্র

রায় বিনয় গোপাল : The Philosophy of Rabindranath Tagore

রীড হার্বার্ট : The Meaning of Art

শ্রীমধুসূদন সরস্বতী : ভগবদ্ভক্তিরসায়ন।

মম্মটভট্ট : কাব্যপ্রকাশ

মহিমভট্ট : ব্যক্তিবিবেক

মারসেল গ্যাব্রিয়েল : The Metaphysical Journal

মায়া গুপ্ত : রবীন্দ্রনাথ

মিল্টন : Paradise Lost

মুরে জি. আর. জি. : Aristotle

মুখোপাধ্যায় ধূর্জটিপ্রসাদ : Tagore's Music

মুখোপাধ্যায় প্রভাতকুমার : রবীন্দ্রজীবনী

মুখোপাধ্যায় ডঃ রমারঞ্জন : Literary Criticism in ancient India; রসসমীক্ষা

ম্যাকটেগার্ট : Studies in Hegelian Cosmology

মৈত্র সুশীল কুমার : Studies in Philosophy & Religion

রঁমা রঁলা : John Christopher,
People's Theatre,
Beethoven the Creator,
Life of Tolstoy,
Life & Gospel of Vivekananda.

রঁলা এবং টেগোর : Ed. Alex Aronson & Krishna Kripalani

রঁলা Alex Aronson

রাজা কে কে : Indian Theories of Meaning

রাধাকৃষ্ণন সর্বপল্লী : Philosophy of Rabindranath Tagore

রায় নীহাররঞ্জন : রবীন্দ্রদর্শনের ভূমিকা,
বাঙালীর ইতিহাস,
An Artist in life

রায় দিলীপকুমার : Among the Great

শ্রীরূপগোস্বামী : ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, উজ্জ্বলনীলমণি

লাটা আর : Monadology

ল্যাং কোনরড্ : Das Wesen Der Kunst

ল্যাংফেল্ড হার্বার্ট সিডনি : The Aesthetic Attitude

লিস্টোয়েল : A Modern History of Aesthetics
A Critial History of Modern Aesthetics

লুন ভ্যান্ : The Arts of Mankind

লেজনি, ভি : Rabindranath Tagore : his personality and work

শোয়েগলার এ : History of Philosophy

লোয়েনফেল্ড মার্গারেট : Play in Childhood

শারদাতনয় : ভাবপ্রকাশন

শোপেনহয়ার : The world as Will and Idea

শাস্ত্রী কে. এস্. আর : Rabindranath Tagore : Poet, Patriot, Philosopher

পারশি, বি, শেলী : A Defence of Poetry

শীল ব্রজেন্দ্রনাথ (ডাঃ) : Positive Sciences of the Ancient Hindus, New Essays in Criticsim, Autibiography, Quest Eternal

শ্রীবাস্তব, এস্ এন্ এল : The Philosophy of Rabindranath Tagore

ষ্টিফেন ও ব্রাউন : Realm of Poetry

ষ্টিফেন জুভিগ : Romain Rollnd : The Man and his work

ষ্টাইলস্ ইন পেন্টিং : Paul Zucker

ষ্ট্রাবো : Geography

ষ্টেস, ডব্লু, টি : The Philosophy of Hegel

সরকার বিনয় কুমার : Creative India
The Aesthetics of Young India
Tagore's Chitralipi

সরকার সরসীলাল : রবীন্দ্রকাব্যে ত্রয়ী পরিকল্পনা

সান্তায়ন জর্জ : The Sense of Beauty

সেথনা কে ডি : The Poet of Integralism

সেন প্রবোধচন্দ্র : রবীন্দ্রনাথের ধর্ম চিন্তা

সেন তারকনাথ : Keat's Idea of Beauty

সেনগুপ্ত সুবোধচন্দ্র (ডাঃ) : রবীন্দ্রনাথ

সেলকার্ক, জে, বি : Ethics & Aesthetics of Modern Poetry

স্পিয়ারিং : The childhood of Art

স্পেণ্ডার ষ্টিফেন : The Destructive Element

হফার এরিক : Ordeal of Change

হাউসম্যান্ এ, ই : The name and nature of Poetry

হালদার হীরালাল : Hegelianism and human Personality

হার্টম্যান এন্ : এথিকস্

হেগেল : Philosophy of Fine Arts (Osmaston edition)

হিরিয়ানা এম্ : Outlines of Indian Philosophy, The Essentials of Indian Philosophy

হোয়াইটহেড এ, এন্ : Adventure of Ideas

হুইটম্যান ওয়াল্ট : The Grass

হুক সিডনি : The Import of Ideological diversity

হল্‌মে জে, ই : Speculation

নন্দনতত্ত্ব

পরিভাষা-পঞ্জী

অগ্রগামী ন্যায় সমবায়—Progressive Train of Reasoning
অতিপ্রাকৃত—Supernaturalism
অতিবস্তুবাদ—Surrealism
অদ্ভুত—Marvellous
অর্থাপত্তি—Logical Postulation
অদ্যোতক পদ—Non-Connotative Term
অধম—Bad
অধীন বিপরীত বচন—Sub-contrarey Proposition
অনবস্থা—Vicious Infinite
অনিত্যদোষ—Faults
অনুকরণ, অনুকৃতি, অনুকার—Imitation, Mimesis
অনন্যনিষ্ঠ—Categorical
অন্যোন্যাশ্রয়—Mutual dependence
অনুকূল বচন—Subaltern Proposition
অনুকরণবাদ—Copy Theory
অনুগাহ্যব—Consequent
অনুভূতি বিরেচন—Katharsis
অনুমান, অনুমিতি—Inference
অনুষঙ্গ—Association
অনেকার্থক—Equivocal
অন্তরাবর্তন—Inversion
অন্যনিষ্ঠ—Hypothetical
অন্যায়—Unjust
অন্বয়ী—Affirmative
অন্যমত—Alternative theory

অন্বয়ী বিকল্পন্যায়—Constructive dilemma
অপদ শব্দ—Acategorematic word
অপরতম জাতি—Infima Species
অপরিহার্য আগন্তুক ধর্ম—Inseparable Accidens
অপ্রধান পদ বা পক্ষ—Minor Term
অপ্রধান (হেতুবাক্য) বা পক্ষাবয়ব—Minor Premise
অপ্রস্তুত—Non-Contextual
অবচ্ছেদক—Differentia
অবয়ব—Physique
অবধারণ—Judgement
অবরোহানুমান—Deductive Inference
অবস্তুবাদ—Formalism
অবরোহ তর্কশাস্ত্র—Deductive Logic
অবেক্ষণ—Observation
অব্যাপক বচন—Particular Proposition
অব্যভিচারী সম্বন্ধ—Invariable relation
অব্যাপ্য পদ—Undistributed term
অভাববাচক বা নঞর্থক পদ—Negative term
অমাধ্যম অনুমান—Immediate Inference
অলংকার—Ornamentation
অলংকারশাস্ত্র—Poetics
অসম্পূর্ণ ন্যায়—Enthymeme
অসীম পদ—Infinite term
আকার—Form
আকারগত—Formal
আকারগত সত্যতা—Formal Truth
আকাঙ্ক্ষা—Expectancy
আনুপাতিক—Proportional
আত্মবিচ্যুতি, আত্মস্বাতন্ত্রীকরণ—Desubjectification
আত্মাশ্রয়—Self-dependence

আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান—Normative Science

আনন্দ—Transcnental pleasure

আবর্তন—Conversion

আবয়বিক—Physical

আবশ্যিক বচন—Necessary Proposition

আরোহমূলক তর্কশাস্ত্র—Inductive Logic

আরোহাভাস—Process Simulating Induction

আসঙ্গ—Association

উত্তম—Good

উদ্দেশ্য—Purpose

উদ্দেশ্যাতীত উদ্দেশ্য—Purposiveness without a purpose

উপমা, উপমানুমান—Analogy

উপজাতি—Species

উপাধি—Attribute

উহ্যাবয়বী ন্যায়শৃঙ্খল—Sorites

একবাচক পদ বা বিশেষপদ—Singular Term

একশাব্দিক পদ—Single worded Term

একার্থক পদ—Univocal Term

একরূপতা বিধি (প্রকৃতির)—Law of Uniformity of Nature

কবিতা—Poem

কাব্য—Poetry

কাব্যকলা—Art of Poetry

কলা, কলাবিদ্যা বা প্রয়োগবিদ্যা—Art

কারুকলা—Craft

কার্যকারণ সম্বন্ধবিধি—Law of Causation

করুণ—Tragic

কল্পনা—Hypothesis ; Imagination

ক্ষোভ—Agitation

গভীরতা (পদের)—Intension or Depth

গীত—Music

গীতিকলা—Art of Music

গুণ—Quality

গুণবাচক পদ—Abstract Term

গৌণসংস্থান পরিবর্তন—Indirect Reduction

ঘোষক বচন—Assertory Proposition

চক্রক—Circle

চক্রক দোষ—Fallacy of Argument in a Circle

চর্চা—Practice

চর্ষা—Intense practice

চমৎকৃতি—Charm

চারুকলা, চারুশিল্প—Fine Art

চিন্তা—Anxiety

চিন্তা—Thought

চিন্তার মূল-সূত্রাবলী—Fundamental Principles of Thought

চিত্রকলা—Painting

চিত্রী—Painter

চিত্রকল্প—Imagery

ছক—Design

ছবি, প্রতিচ্ছায়া—Image

জটিলাবর্তন—Conversion per accidens

জাতি—Class

জাতিবাচক পদ—Class-name ; General term

জ্ঞান—Knowledge

জ্ঞাননিষ্ঠ বিজ্ঞান—Positive Science

তর্কশাস্ত্র—
তর্কবিজ্ঞান— } Logic
প্রমাণশাস্ত্র—

তাৎপর্য—Purport

তমঃ—Hardness

তাদাত্ম্য নিয়ম বা একরূপতা বিধি } Law of Identity

তুলনা—Comparison

তুলি—Brush

তুল্য—Comparable

দিব্য—Divinity

দুর্বল ন্যায়—Weakned Syllogism

দুঃখ—Sorrow

দ্যোতক নাম—Connotative Term

দ্যোতনা—Connotation

দ্বিকল্প-ন্যায়—Dilemma

দ্রব্যবাচক পদ—Concrete Term

ধারণা—Concept

নাম—Name

নিত্যদোষ—Blemishes

নিদ্রা—Sleep

নিরপেক্ষ বচন—Categorical or Unconditional Proposition

নিরপেক্ষানুমান—Immdiate Inference

নিশ্চয়বুদ্ধি—Belief

নিশ্চিতি—Modality

নিশ্চিত সম্বন্ধ—Invariable Relation

নিষেধাত্মক—Destructive

নিষেধাত্মক দ্বিকল্প-ন্যায়—Destructive Dilemma

নিয়ত পূর্ববৃত্তি স্বভাব—Invariable antecedent

নিঃশেষ গণনাভিত্তিক আরোহ—Induction by Complete Enumeration or Perfect Induction

ন্যায় বা মাধ্যমানুমান—Syllogism

ন্যায় সমবায়—Polly Syllogism or Train of Syllogistic Reasoning

নৃত্য—Dance

নৃত্যনাট্য—Dance Drama

পদ—Term

পূরক—Condition

পরতন্ত্রার্থবাচক শব্দ—Syncategorematic word

পরজাতি—Genus

পরতন্ত্রীকরণ—Objectification

পরতম জাতি—Summum Genus

পরিকল্পনা—Plan, design

পরিহার্য আগন্তুক ধর্ম—Separable Accident

পরিপ্রেক্ষিত—Context

পরীক্ষণ—Experiment

পর্যাপ্ত হেতুবিষয়ক নিয়ম—Law of Sufficient Reason

পুরোগামব বা পুরোবৃত্তি—Antecedent

প্রতিলোম ভেদ—Inverse Variation

প্রসঙ্গ—Context

প্রস্তুত—Contextual

প্রাসঙ্গিক অর্থ—Contextual meaning

প্রত্যক্ষ—Perception

প্রত্যয়—Idea

প্রকৃতি-রস—Basic Rasas

প্রকৃতিবাদ—Naturalism

প্রাকৃত—Natural

প্রধান পদ (সাধ্য)—Major Term

প্রধান হেতুবাক্য বা সাধ্যাবয়ব—Major Premise

প্রাত্যন্তিক—Epilogue

প্রেয়—Pleasant

বচন—Proposition

বর্ণনা—Description

বস্তু—Matter, Thing

বস্তুগত সত্যতা—Material Truth
বস্তুবাদ —Realism
বাস্তব—Real
বাস্তবতা—Reality
বহুশাব্দিক পদ—Many Worded Term
বাক্য—Science
বাচ্যাবাচকভাব—Relation of the signifier and the signified
বাচ্যার্থ—Denotation
বিকল্প প্রতিষেধনিয়ম—Law of Excluded Middle
বিকাশ—Blooming
বিক্ষেপ—Perplexity
বিজ্ঞান—Science
বিধেয়ক—Predicables
বিপরীত পদ—Contrary Term
বিবরণ—Description
বিভজন —Division
বিভজনভিত্তি—Fundamentum Divisionis
বিরুদ্ধ বা বিরোধী পদ —Contradictory Term
বিরূপ বচন—Opposed Proposition
বিরূপানুমান—Inference by opposition
বিশেষ পদ—Singular term
বিশ্লেষক বচন—Analytical Proposition
বিষয়—Content
বিস্তৃতি—Extension
বিস্তার—Expansion
বিকৃত—Unnatural
বিকল্পিক বচন—Disjunctive Proposition
বৈয়াকরণ—Grammarian
ব্যতিরেকী বচন—Negative Proposition
ব্যবহারিক বিজ্ঞান—Practical Science

ব্যভিচারী—Transient
ব্যষ্টিবাচক পদ—Distributive Term
ব্যাপকতা—Quantity
ব্যাপক বচন—Uuiversal Proposition
ব্যাপ্তি (পদ)—Distribution of Terms
ব্যাপ্য পদ—Privative Term
ব্যাধি—Sickness
বিবর্তন—Obversion
বিবর্তনপূর্বক আবর্তন বা সমবিবর্তন—Contraposition
বিপরিবর্তন—Inversion
ব্যঞ্জনা—Suggestiveness
বীভৎস—Disgustful
বীর—Heroic
ভয়ানক—Frightful
ভাববাচক পদ বা সদর্থক পদ—Positive Term
ভাস্কর্য—Sculpture
ভূয়োদর্শন মাত্রাভিত্তিক আরোহ—Induction by Simple Enumeration
মদ—Intoxication.
মধ্যম—Mediocre
মধ্যমপদ (হেতু)—Middle Term
মানুষ—Human being
মিথ্যাত্ব—Falsity
মিশ্র-ন্যায়—Mixeed Syllogism
মূর্তি (ন্যায়ের)—Mood
মূর্তি—Figure, Statue
মৌলিক অনুভূতি—Intuition
মৌলিক ন্যায়—Fundamental Syllogism
যৌগিক বচন—Compound Proposition
রসাভাস—Semblance of Emotion

রজ—Fickleness

রস—Emotions

রসবিরোধ—Antinomy of Emotions

রৌদ্র—Furious

লক্ষণ—Definition

লক্ষণ দোষ—Fallacy of Definition

লক্ষণা—Indication

শব্দ—Word

শিল্প—Art

শিল্পী—Artist

শৃঙ্গার—Erotic

শান্ত—Calm

শ্রেয়—Good

শ্রেণীকরণ—Classification

সত্ত্ব—Goodness

সরল বচন—Simple Proposition

সদৃশানুমান—Eduction

সঙ্গতি—Consistency

সঙ্গীত—Music

সত্যতা—Truth

সদৃশ যুক্তিভিত্তিক অনুমান—Parity of Reasoning

সমষ্টিবাচক পদ—Collective Term

সম্বন্ধ—Relation

সম্ভাব্য—Probable

সহাবস্থান—Co-existence

সম্ভাব্য বচন—Problematic Proposition

সহোপজাতি—Co-ordinate Species

স্থাপত্য—Architecture

স্থূলারোহ—Approximate Generalisation

সহমর্মিতা—Empathy, Einfuhlung

স্বজ্ঞা, প্রতিভান—Intuition
স্বজ্ঞাবাদ—Intuitionism
সংবেদন—Sensation
সংজ্ঞা বা লক্ষণ—Definition
সংশ্লেষক বচন—Synthetic Proposition
সংস্থান (ন্যায়ের)—Figure
সাপেক্ষ পদ—Relative Term
সামান্য পদ—General Term
সামীপ্য—Proximity
সামান্যাভিকরণ—Colligation of facts
স্বার্থানুমান—Inference of Informal type
সাক্ষাৎ প্রাপণ—Direct Reduction
স্থায়ী—Permanent
সিদ্ধান্ত—Conclusion
সুখ—Pleasure
স্বতন্ত্রার্থবাচক শব্দ—Categorcmatic Word
হাস্য—Comic, Laughter
হেতু (মধ্যম পদ)—Middle Term
হেতু বাক্য বা যুক্তিবাক্য—Premise
হেত্বাভাস—Fallacy

নন্দনতত্ত্ব

নির্ঘণ্ট